শনিবারের চিঠি

CUL-Hol 9 পু-৭ -2- P3562

বৈশাখ ১৩৫৫—আশ্বিন ১৩৫৫

7571
7 07175

ষাণ্মাসিক সূচি

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রতি রায়

মতী বাণী রায়

সমর সোম

[illegible]ৎসা—শ্রীসুকুমার রায়

[illegible]বাল-ভাবোল—শ্রীভোলা সেন

[illegible]রায়—শ্রীআরাত রায়

[illegible]তিহাস-রচনার প্রণালী ও ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব—শ্রীযদুনাথ সরকার

[illegible]দেশ-ওদ্দেশ—শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তী

[illegible]ত্রিপত্র

[illegible]রিশচন্দ্র মিত্রের 'কবিকলাপ'—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

[illegible]য়েকটি সনেট—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

[illegible]ব কহিনা হাসি—"চণ্ডরূপ"

[illegible]প-স্ট্রিক-কাব্য—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

[illegible]ত্র

[illegible]ণী-কথা

[illegible]ণীচরিত্ত—শ্রীনির্মলকুমার বসু ১, ৯৫, ১৯১, ৩১৯, ৩৮৫

[illegible]ন্তী-বাণী-কণিকা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[illegible]ক্তিবাদী—শ্রীমতী বাণী রায়

[illegible]রঞ্জয়ী—

[illegible]বন-বাণী

[illegible]কুরি

[illegible]না—"বনফুল" ১৬, ১০৯, ২০১, ৩৫৪, ৩৯৪, ৪

[illegible]রে নয় কাছে এস—শ্রীসমর সোম

P 3056 2

ক-বর্ষ—বর্ষফল"
নিবেদন কথা—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ৫৩৫,
কথা—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
চিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮, ১৫৮, ২৪৮,
পরার-প্রশস্তি—শ্রীভোলা সেন
গলা-গায়কের কবিতা—অ.ক.ব.
প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ—শ্রীযদুনাথ সরকার
প্রতাপাদিত্যের পতন—শ্রীযদুনাথ সরকার
প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী—শ্রীযদুনাথ সরকার
প্রসঙ্গ কথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
—শ্রীনির্মলকুমার বসু
—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ীন বাংলা-লেখকগণ—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ধি-বিভ্রাট—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
—সু.চ.ব.
বাবুপুরাণ-দা—শ্রীননীমাধব চৌধুরী
বালু
বিষামৃত—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
বৃথা
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা—রাজনারায়ণ বসু
ব্যবস্থাপত্র—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
ভগবান যদি এখানে আসেন—অসিতকুমার
ভূত-বালক-কথা—"সম্বুদ্ধ"

নিবেদন ওয়েবি—"পুলাস্ত্যি" ১৮, ১০৬, ২৩১, ৩৮৯
চুর পূর্বে—শ্রীমতী বাণী রায় ২৭
থে কেষ্ট ৩৭
ভা—শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক ৪৭
মেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৯, ৪০১, ৪৯৫
গ—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৪৫৪
ক্ত প্রার্থনা—অসিতকুমার ৪৪৭
ন্দ্রের দুইখানি পত্র ১০৩
ং গচ্ছামি—শ্রীমতী বাণী রায় ১২৪
বাদ-সাহিত্য ৮০, ১৮১, ২৭২, ৩৭৬, ৪৭৩, ৬২৬
াজ ও সংস্কৃতি—শ্রীসুনীল পাল ৫৮৭
কারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা—শ্রীযোগজীবন ভট্টাচার্য ২১১
ত্ত্ব ও রসতত্ত্ব—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ২৫৫
ীনতা-দিবস—শ্রীঅমলা দেবী ৫২৮
ীনতা-সঙ্গীত—শ্রীশান্তি পাল ৫২৭
ীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ ৩৩৮

পরিচয়ের চিঠি
১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৫

গান্ধীচরিত

সত্য

১৯৪২ সালের আন্দোলনে এবং সেই বৎসর দুর্গাপূজার সময়ে বিপুল ঝ
বং বন্যায় মেদিনীপুর জেলাকে বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তা
ত্তেও তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করি
নিজেদের সাধ্যমত দেশের শাসনকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। ইংরে
কার বহু বিধ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগকে কাবু করিতে পারে নাই
যবশেষে গান্ধীজী মুক্তিলাভের পর যখন কংগ্রেসকর্মীগণকে গোপনে থাকি
নিষেধ করেন, তখনই শুধু মেদিনীপুরের কর্মীগণ সরকারের নিকট আত্মপ্রক
রলেন। মেদিনীপুরের শৌর্য, দৃঢ়তা প্রভৃতির সংবাদ গান্ধীজীর নি
ছিলে তিনি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। আবার যে
র্যের জন্য মনে হইয়াছিল যে, কংগ্রেসকর্মীগণ অহিংসার পথ হইতে বিচ্
য়াছিলেন, সেগুলির জন্য তিনি তাঁহাদিগকে সমালোচনা করিতেও বিন্দুম
ভস্তত করেন নাই।

১৯৪৫ সালের শেষভাগে গান্ধীজী বাংলা, আসাম এবং মাদ্র
করে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি ওয়ার্ধা হইতে যখন যাত্রা ক
হার অব্যবহিত পূর্বে আমি আশ্রমবাসী জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে পত্র প
ন গান্ধীজী বাংলায় পৌঁছিলে আমি অতি-অবশ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ক
ভম্বর মাসের ২ তারিখে গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে পৌঁছিলে তিনি আম
কিয়া পাঠান এবং অল্প কয়েক মিনিট কথাবার্তার পর আমি চলিয়া আ
য়-বৈশিষ্ট্য কথা বলিবার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেন।

মহাত্মাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় আমার কখনও ছি
ত্রে লিখিয়াছি, তাঁহার লেখা সংগ্রহ করিয়া পুস্তক রচনা কর
ত্রে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর
য়ার্ধা আশ্রমে একবার তাঁহার সহিত দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ
রিয়াছিলাম, দুই দিন প্রায় তিন ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কও করিয়াছিলাম; কিন্তু

হাকে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয় বলে, তাহার সূত্রপাত ১৯৪৫ সালের শষভাগেই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ, বেলা ৪-১৫ মিনিটের সময়ে তিনি তাঁহার কালীন আহারের সময়ে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেবারত কর্মীগণ হার জন্য দুধ, ফল প্রভৃতি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। পিয়ারেলালজী অন্যত্র ন্ত ছিলেন, নিকটে আমি একাই বসিয়া রহিলাম। তিনি আরম্ভ করিলেন :

তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহার একটি কারণ আছে। তুমি আমার লেখা তে সংকলন প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু তুমি শুধু তাহা তো কর না, আমার তামত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও কর। সেখানে তোমার একটি ভুল হইয়া কে, আমি সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে চাই।

কথাটি শুনিয়া একটু ঘমিয়া গেলাম। ভয়ও হইল। কারণ পাছে কোথাও া হয়, আমার নিজের সংস্কারের প্রভাবে পাছে গান্ধীজীর মতামতকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলি, এই আশঙ্কায় আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন রিয়াই চলিতাম। আমি জানিতাম, গান্ধীজী গভীরভাবে ভগবানে বিশ্বাস রন। তাঁহার নিকট ভগবান এবং মানুষ এক হইয়া গিয়াছে। আমি ীবাদের ব্যাখ্যাকালে, স্বীয় সংস্কারের বশবর্তী হইয়া গান্ধীজীর ভগবদ্ভক্তির টি কখনও প্রকট করি নাই, কিন্তু মানবাত্মার প্রতি তাঁহার অবিচল প্রেম ং স্থির বিশ্বাসের প্রকাশ যথেষ্ট করিয়াছি। ইহাকে একদেশদর্শিতা হয়তো া যাইতে পারে, কিন্তু গান্ধীজী যে ভাবে আমাকে ভ্রান্তির, বা হয়তো ব্যাখ্যার অপরাধ দিলেন, জ্ঞানত সেরূপ কিছু করিয়াছি বলিয়া মনে করিতে রিলাম না। তাই আশঙ্কা হইল, কোথাও অজ্ঞানিতে কিছু কি ভুল করিয়া য়াছি? মৌন হইয়া তাঁহার নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

গান্ধীজী তখন বলিলেন, তুমি আমার লেখারই শুধু সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ য়াছ। কিন্তু আমাকে কাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে দেখ নাই। আমি যাহা খ, তাহাতে আমার যে রূপের প্রকাশ, তাহা তো আমার সমগ্র প্রকৃত রূপ । তুমি যদি আমার কাছে থাক, আমার সঙ্গে ভ্রমণ কর, তখন প্রতিদিনের াবলীর ভিতরে এমন অনেক বস্তু চোখে পড়িবে যাহার দ্বারা তুমি আমাকে ও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বহুদিন পূর্বে মেদিনীপুরে আমি একবার সফরে

গিয়াছিলাম। তখন নাড়াজোলের রাজবাটীতে আমি অতিথি হই। সেখানে সোনার থালায় আহার পরিবেশন করা হয়। সোনার থালায় খাওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু তখন মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া, কিছু না বলিয়াই আহার করিলাম। এমনই দুর্বলতা আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাহার পরিচয় না পাইলে তুমি আমার সম্যক্ পরিচয় পাইবে না; আদর্শ হইতে আচরণে কতখানি অন্তর পড়িতেছে, তাহা না জানিলে আদর্শকেই ঠিকমত বুঝিতে পারিবে না। পুনরায় উদাহরণ দিয়া কহিলেন, একবার ট্রেনে চলিয়াছি, আমার আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেদিন আঙুর খাইতেছিলাম দেখিয়া জনৈক সহযাত্রী সমালোচনার ভাষায় আমাকে বলিলেন, তুমি দিনে ছয়-পয়সার মত আহার কর শুনিয়াছিলাম, গরিবের সঙ্গে এক হইয়া চল শুনিয়াছিলাম, এই কি তাহার নমুনা? আমি বন্ধুটিকে আদর করিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি চাই, আপনি আমার দোষ-ত্রুটিগুলি প্রকাশ করিয়া দেন, লোকে আমার সত্য পরিচয় লাভ করুক।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বামী— তেমনই আমাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে আমি নিজে লোক খারাপ নয়, কিন্তু যাহারা আমার চারিদিকে থাকে তাহারা কপট এবং মিথ্যাচারী। আমি স্বামীজীকে বলি যে, আমি তো সঙ্গীদের লইয়া সমবেতভাবে একটি আদর্শ সাধনার চেষ্টা করিতেছি। সে ক্ষেত্রে যদি কোনও দোষত্রুটি ঘটে তাহা হইলে আমি ভাল এবং তাঁহারা খারাপ, এরূপ কখনও হইতে পারে না। দোষ নিশ্চয়ই আমার মধ্যে আছে, আমারই কোনও ত্রুটির বশে আদর্শ বিকৃত আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

এই কথা শুনিবার সময়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। কারণ গান্ধীজীর মত কোনও মানুষ সাধনার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে লব্ধ আদর্শকে নিজের অন্তরের সত্যতম প্রকাশ না বলিয়া, বরং আচরণের মধ্যে যতটুকু আদর্শকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, শুধু তাহাকেই নিজের প্রকৃত প্রকাশ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—ইহাতে বাস্তবিকই আশ্চর্য হইবার কথা। আর শুধু তাহাই নহে, আমার মত অজ্ঞানিত এক ব্যক্তির নিকটে অকুণ্ঠিতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলাম। তিনি অবশেষে এমন নিমন্ত্রণও করিলেন যে, স্বীয় আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যে-সকল বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেগুলিকে

তাঁহার উপস্থিতির সময়ে এবং অনুপস্থিতিকালেও কার্যরত অবস্থায় যেন আমি নিরীক্ষণ করি। তবেই সত্য ও অহিংসার আদর্শকে বাস্তবিক কতখানি কার্যত আয়ত্ত করা যায়, আমি বুঝিতে পারিব। শুধু, মানুষ চিন্তার শিখরে উঠিয়া যাহা লাভ করে, তাহাতে তাহার আশা বা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়; বাস্তব তাহা হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। বাস্তবকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনই বেশি, তবেই আমরা আদর্শকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিবার কৌশল আয়ত্ত করিব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার ভয় হয়, পাছে তাঁহার অবর্তমানে এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

১৯৪৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর আমার নিকট স্মরণীয় দিন। গান্ধীজীর নূতন একটি রূপ আমার নিকটে প্রতিভাত হইল। কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে একটু সুরের আভাস কানে বাজিয়াছিল, যাহা কিছুক্ষণের জন্য আমার ভাল লাগে নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার উপরোক্ত স্বামীজীর প্রসঙ্গে যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন একবার এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালে সেই স্বামীজীর নিজের চরিত্রে কতকগুলি দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তিনি লোকচক্ষে খারাপ বলিয়া ধরা পড়িয়া যান। গান্ধীজীর মুখে এই ক্ষীণ নিন্দাসূচক বাক্য ভাল লাগে নাই; এবং আরও ভাল লাগে নাই এইজন্য যে, ক্ষণেকের জন্য আমার মনে হইয়াছিল, তিনি হয়তো নিন্দাস্তুতির প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। হয়তো আমার ভুল হইয়া থাকিতে পারে; হয়তো বা সত্যই তাঁহার মধ্যে অপরের সমর্থনের (প্রশংসার নয়) প্রয়োজন অথবা সমালোচনারও প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে পরমহংসদেবের কথা সময়ে সময়ে স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি যে, সিদ্ধপুরুষগণেরও জীবনে অহং-কারের দাগ থাকিয়া যায়। পদ্মফুলের পাপড়ি অথবা নারিকেল-সুপারির বালতো খসিয়া গেলেও যেমন তাহার দাগ থাকিয়া যায়, ইহাও তেমনই। ইহাতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না।

যাহাই হউক, সেই দিন মানুষ হিসাবে গান্ধীজীর সান্নিধ্য এবং পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বিহারযাত্রার বিষয়ে আলোচনা

২৭এ ডিসেম্বর ১৯৪৬। অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। গান্ধীজী তখন দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালি জেলার শ্রীরামপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেছেন। সঙ্গে দুই জন মাত্র সাথী, তাহার মধ্যে পরশুরাম নামে ত্রিবাঙ্কুরের জনৈক তামিল কর্মী ছিলেন, তাঁহার বয়স তিরিশের কিছু কম হইবে। নোয়াখালিতে তখন গান্ধীজী প্রতিদিন হিন্দু এবং মুসলমানের সহিত মিশিয়া উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে বিহারের দাঙ্গা শেষ হইয়া গিয়াছে; তাহার ফলে অনুমান সাত-আট হাজার লোক মারা গিয়াছে। বিহারে দাঙ্গা থামাইবার জন্য গান্ধীজী আংশিক উপবাসের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পত্র ও লোক মারফৎ বিহারের মন্ত্রী-মণ্ডলীকেও মুসলমানদের পুনর্বসতির বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিতেছিলেন অর্থাৎ সে কাজ দূর হইতেই পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু নোয়াখালির দুরূহ কাজকে তিনি নিজের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এমনই সময়ে একদিন শ্রীরামপুর গ্রামে আমি লক্ষ্য করিলাম, গান্ধীজী পরশুরামের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন রহিয়াছেন। পরশুরামের দৃঢ় বিশ্বাস গান্ধীজীর পক্ষে এখনই নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া বিহারে যাওয়া উচিত, নয়তো নোয়াখালির মুসলমানের নিকট তিনি কোন্ মুখে হিন্দুদের প্রতি সুব্যবহারের প্রত্যাশা করিবেন? আর গান্ধীজী তাঁহাকে ধীরভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, বিহারের কাজ তিনি কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রীদের মারফৎ চালাইয়া যাইতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার এখন সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই। পরশুরাম কিন্তু কিছুতেই সে কথা মানিতে প্রস্তুত নন। প্রায় এক ঘণ্টা তর্ক করিয়াও গান্ধীজী তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেন না; অথচ গান্ধীজীর এক ঘণ্টা যে কত মূল্য তাহার হিসাব করা যায় না। অতিশয় গুরুতর প্রশ্ন আলোচনা করিতে আসিলেও আমরা বহু ব্যক্তিকে পনরো-কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দিতে পারিতাম না। সেইজন্য পরশুরামের সঙ্গে আলোচনার পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি আজ এমনভাবে সময় নষ্ট করিলেন কেন? পরশুরামকে নিষেধ করিলেই তো পারিতেন। তিনি উত্তর দিলেন: সময় কিছুই নষ্ট হয় নাই। পরশুরাম সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ ব্যক্তি। তাহাকে আমার বিহার না যাওয়ার কারণ যখন বুঝাইতে পারিলাম না, তখন আমি

যুক্তির মধ্যে কোথাও না কোথাও ত্রুটি আছে। যদি আমার যুক্তি নির্দোষ হয়, তাহা হইলে শুনিবামাত্র পরশুরামের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিত। তাহা যখন হয় নাই, আমি আলোচনা করিয়া যুক্তির দুর্বলতা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

নিজের সত্যদৃষ্টিতে ভুল হইতে পারে, অতএব অপরের সমালোচনা বিচার করা উচিত—গান্ধীজী সর্বদা এই নীতি মানিয়া চলিতেন। প্রতিদিনের চিঠি-পত্রের মধ্যে তিনি দেশের মতামত এবং আবহাওয়ার সম্যক্ পরিচয় পাইতেন। নানা সময়ে নানা জন গান্ধীজীকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দামূলক চিঠিগুলি পাত্রবিশেষে গালিগালাজ পর্যন্ত নামিয়া আসিত। সমর্থনসূচক চিঠি গান্ধীজী পড়িতে চাহিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল সমালোচনাসূচক চিঠির উপরে। সেগুলিকে পড়িয়া তিনি কোনও সার পদার্থ আছে কি না তাহা যাচাই করিবার চেষ্টা করিতেন। কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলে সে বিষয়ে প্রার্থনান্তিক সভায় আলোচনা করিতেন, কখনও বা 'হরিজনে'র জন্য প্রবন্ধাদিও লিখিতেন।

কলিকাতায় অনশন

আরও প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল। মুসলিম-লীগের ঘোষিত 'ডিরেক্ট অ্যাক্শনে'র দিন হইতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িকতার যে তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছিল, অকস্মাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিদিবসকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার পরিবর্তে শহরে অভাবনীয়ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির ঘটনা দেখা গেল। ১৫ই আগস্ট হইতে ৩০এ পর্যন্ত শান্তিতে কাটিল। কিন্তু ৩১এ তারিখে পুনরায় শহরে প্রচণ্ড আকারে দাঙ্গা শুরু হইয়া গেল। ১লা সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর শিবিরের পাশেই মুসলমান-শরণার্থীবাহী একটি লরির পরে বোমার আঘাত হয় এবং দুই-তিনজন তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে। এবারকার দাঙ্গার বিশেষত্ব, হিন্দু-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই প্রথম আঘাত আরম্ভ হয়।

গান্ধীজী সমস্ত শহরের বৃত্তান্ত শুনিয়া শহরবাসীর শুভবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমরণ অনশনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাংলার তখন মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রদেশপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

প্রভৃতি গান্ধীজীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গান্ধীজী সংবাদপত্রে দিবার জন্য একটি বিবৃতি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা রাজাজী প্রমুখ কয়েক জন নিকটতম বন্ধুকে দেখানো হইল। রাজাজী নানা ভাবে গান্ধীজীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি দুই দিনের সময় ভিক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, কংগ্রেস এবং গবর্মেণ্টের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া শহরে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইবে, অতএব অন্তত এই দুই দিন গান্ধীজী যেন অনশন হইতে বিরত থাকেন। গান্ধীজীর পক্ষে যুক্তি ছিল, এই দুই দিন কি তিনি নিজে কিছুই করিবেন না, শুধু অপরের চেষ্টা নিরীক্ষণ করিতে থাকিবেন? তাঁহার উচিত প্রতি নগরবাসীকে ইহাই বুঝানো যে, আজ ভারতবর্ষে হিন্দুই হউক অথবা মুসলমানই হউক, উভয়ে সমান-অধিকারভোগী প্রজা। প্রত্যেকে যাহাতে রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য স্বীকার করে সেজন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দ্বারা সে কার্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়া যাইবে, অতএব দাঙ্গা পরিহার করিয়া উভয়ে কি করিয়া ভ্রাতৃভাবে থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। গান্ধীজী বলিলেন, শরীর আমার এত পরিশ্রম কুলাইবে না; এবং ব্যক্তিগতভাবে উন্মত্ত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের কিছু বুঝাইতেও পারিব না। অন্তত গতরাত্রে যাহারা বেলেঘাটার শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মুখের কথায় শান্ত করিতে আমি অসমর্থ হইয়াছিলাম। অতএব আমাকে অনশনের দ্বারা সর্বসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে হইবে, তখন তাহারা যুক্তির কথা শুনিবে। আমরণ অনশনের ব্রত এই নিমিত্তই গ্রহণ করিতেছি।

রাজাজী সমস্ত শুনিলেন এবং গান্ধীজীর প্রস্তাবিত বিবৃতিটি পড়িয়া লাগিলেন। তাহার মধ্যে এক জায়গায় ছিল—

What my word in person cannot do my fast may. may touch the hearts of all the warring elements even the Punjab if it does in Calcutta. I therefore begin fasti from 8-15 p.m. to end only if and when sanity returns Calcutta. I shall as usual permit myself to add salt & soda bicarb and sour limes to the water I may wish drink during the fast.

রাজাজী এই অংশটি পড়িয়া বলিলেন, যদি আমরণ অনশনের ব্রতই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে লবণ ও সোডা যোগ করার কথা বুঝি, লেবুর রস জলে মেশাইবার হেতু তো বুঝিলাম না। গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ 'and sour limes' এই তিনটি কাটিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি অল্প দিন আমার সঙ্গে রহিয়াছ, রাজাজী দীর্ঘদিন আমাকে অন্তরঙ্গভাবে জানেন। সেই জন্য সত্যই যে মুহূর্তে আমার দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই মুহূর্তে উহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। শরীরের প্রয়োজনে, উপসর্গ নিবারণের জন্য লবণ ও সোডাই যথেষ্ট; লেবু অনাবশ্যক; এবং আমার বাঁচিয়া থাকিবার বাসনার বশেই অসতর্ক মুহূর্তে আমি উহা যোগ করিয়াছিলাম।

নিজের অন্তরে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য, সে সম্বন্ধে এরূপ নিরলস জাগ্রত দৃষ্টি আর কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিজ্ঞানসেবীদের বেলায় বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য এই সতর্কতা অভ্যস্ত ব্যাপার, তেমন বৈজ্ঞানিকও দর্শন করিয়াছি। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রাত্যহিক আচরণের ব্যাপারে গান্ধীজীর মত রূপ সতর্কতা, এই সত্যনিষ্ঠার তুলনা আর কোথাও পাই নাই।

অবচ এমন কথাও বলিব না যে, ইহা হইতে কখনও তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে খি নাই। বিচ্যুত হইতে সময়ে সময়ে দেখিয়াছি বটে; কিন্তু সে বিচ্যুতির ত্র স্বল্পপরিসর এবং কাল সংকীর্ণ। বেশিক্ষণ সে অবস্থা থাকে নাই; সাহসভরে স দেখাইয়া দিলে তিনি সাধ্যমত তাহা বিচার করিয়াছেন এবং স্বীকার রিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র জীবনের মুহূর্তগুলি একত্র রিলে এমন সজাগ দৃষ্টি এবং বিচারশীল মনের পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। ্যকেই তিনি সর্বদা সর্বোত্তম আসনে বসাইতেন। এবং সেই সত্যের সন্ধানে জের বিচারের উপরে যেমন নির্ভর করিতেন, অপরের সমালোচনাকেও মনই মর্যাদার স্থান দিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

"দেশের ছেলেরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিবার পর ভয়ানক বিপদে পড়িয়া ।। ইহার পর তাহারা কি করিবে, তাহা খুঁজিয়া পায় না। প্রকৃত শিক্ষা হাকেই বলিব, যদ্দ্বারা মানসিক শক্তি বোধশক্তি ও শারীরিক শক্তির বিকাশ বে। শিক্ষাকে হইতে হইবে বেকারের বীমার স্বরূপ—যাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লেই শিক্ষানুরূপ কাজ পাইবে।"—মহাত্মা গান্ধী

নব-বর্ষ

আজ নব-বর্ষের প্রথম দিনে প্রণাম জানাই তোমাকে হে পূজনীয়, প্রী
নিবেদন করি হে বন্ধু, আশীর্বাদ করি হে কল্যাণীয়। আজ শ্রদ্ধাভরে
করি তাঁহাদের, যাঁহারা সেই বহু বহু শতাব্দী পূর্বে সিংহ-ব্যাঘ্র-ঋক্ষ-উদ্র-
মাতঙ্গ-অধ্যুষিত অরণ্যের নিবিড়তায় আরম্ভ করিয়াছিলেন মানবজীবনের
জয়-যাত্রা। বল্গার উপকূলে, পামীরের উপত্যকায়, ইরাণের পর্বতচূ
কাশ্মীরের ভূস্বর্গে, সপ্তসিন্ধুর তীরে তীরে ভ্রাম্যমান আমাদের সেই নগ্ন অ
পূর্বপুরুষগণকে, জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর সংঘর্ষে সমুদ্যত রাখিয়াছিলেন যাঁ
প্রাণবন্ত আত্মমহিমার বিজয়-বৈজয়ন্তী।

একান্ত আশাভরে আজ কামনা করি সেই ভবিষ্যৎকে, যে ভবিষ্যতে
হইবে কবির স্বপ্ন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির
মানব-জাতি'।

হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, নীচতার কারাগারমুক্ত সেই স্বাধীন মানবতাকে
অভিনন্দন জানাই—যাহার পদধ্বনি শুনিয়াছি ইতিহাসের ঘটনা-জটিল
পথে, যাহার বাণী শুনিয়াছি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি-ঋষির ছন্দ-সুন্দর কাব্য-ম
নীলাকাশের বিস্তারে যাহার আদর্শ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যে যাহার প্রতিচ্ছ
তপস্বীর তপস্যায় যাহার উপলব্ধি।

জীবনের দুঃখ গ্লানি অভাব-অভিযোগে আমরা যেন ভগ্ন-হৃদয় না
আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—জীবনের উদ্দেশ্য অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়,
নয়,—আনন্দ।

আমাদের দোষ অনেক আছে, দুর্বলতার সীমা নাই, পদে পদে পতন
ভুল আমরা অনেক করি। তবু আমরা যেন হতাশ না হই। এই বিখ
শ্লোকটি আমরা যেন মনে রাখি—

খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গঃ বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ সরুজপদযমঃ সর্বভক্ষো হুতাশঃ
ব্যাস মৎস্যোদরীয় সলবণ উদধি পাণ্ডবা জারজাতা
রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন জাতঃ

(ধ্রুবানন্দ মিশ্র)

ইন্দ্র ভগাঙ্গ, চন্দ্র কলঙ্কী, কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে পালিত, বশিষ্ঠের মত ঋ

[redacted]র্ষ-বৈঠকে পঠিত। ১লা বৈশাখ, ১৩৫৫

গ্রাপুত্র, বিমাতার অভিশাপে সর্বশক্তিমান যমের চরণও শীর্ণ, অগ্নি সর্বভুক, স মেছুনীর পুত্র পাণ্ডবগণ জারজ, রুদ্র প্রেতাস্থিধারী। এ কথা কে না নে, ত্রিভুবনে আসিয়া দোষ কাহার না ঘটিয়াছে?

আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, দোষ-দুর্বলতা-ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা ষ, আমরা সত্য-সন্ধানী, আমরা শিব-উপাসক, আমরা আনন্দকামী, আমরা দর্শতীর্থের যাত্রী।

কঙ্কর কণ্টক কর্দম নয়, পথই বড়।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের উত্তরাধিকার যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

সর্বশেষে প্রণাম করি তাঁহাকে

সবার চলায় যাঁহার চলা
সবার সুরে যাঁহার বাঁশী
পূর্বাচলে যাঁহার ছটা
অস্তাচলে যাঁহার হাসি
নিবিয়ে ঝড়ে ছোট্ট প্রদীপ
জ্বালেন আলো আকাশ-ভরা,
ছোট্ট ডোবা ডুবিয়ে যিনি
বহান নদী কলস্বরা;
মিথ্যারূপেও সত্য যিনি
আলোক যিনি অন্ধকারে
পঙ্ক যিনি পদ্ম যিনি
প্রণাম করি আজকে তাঁরে।

"বনফুল"

মুসাফিরের ডায়েরি

পরাজয়

জীবনের অনেকটা পিছনে ফেলে রেখে এককভাবে পথ চলতে চলতে সহসা সব চরিত্রে চোখ ঠেকে যায়, অমিতাভ ছিল তারই একজন। ব্যক্তিত্বে, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে ভরপুর ছিল তার অন্তর বাহির। অতি মামুলিভাবে এক জনীন সভায় ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

অদ্ভুত এই শহরে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সভ্যতার নির্মোক। একই
আমরা লালিত-পালিত হয়েছি, একই শিক্ষায়তনে সংশ্লিষ্ট থেকেছি—হ
কখনও একই চলচ্চিত্রের গৃহে বা খেলার মাঠে পাশাপাশি ব'সে রস
করেছি; তবু কেউ কাউকে চিনতুম না। তারপর নানা আলাপে আলো
প্রীতির আদানপ্রদানে নিবিড় পরিচয়ের পর ওর দিকে চেয়ে চেয়ে আ
বিস্ময়ের সীমা থাকত না। এমন বলদৃপ্ত, কর্মবিলাসী, অনুভূতিশীল মানুষ
কোথায়?

জীবনের তটে তটে ফিরেছি। কত ঘাটে বাটে মাঠে চলেছি। উ
শ্যামল প্রান্তরের মাঝে, সূত্ররেখার মত উজ্জ্বল পথে, বনানীতে আচ্ছন্ন বে
বাটেতে, উষর বালুকাতটে অথবা মানবসমাজের গভীর আবেষ্টনীর মধ্যে
মানুষের সঙ্গসুখ আস্বাদন করেছি, কত যাত্রীর দর্শন পেয়েছি, সাহচর্য পেয়ে
কত চিত্তলোকে ভ্রমণ করেছি, তবু ভরে নাই চিত্ত। তবু তাদের সহযাত্রী
হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারি নি—একাত্মবোধের উন্মেষ তো হয় নি।
সবের মূলে নারদমুনির মত ম্যামনদেব রয়েছেন তাঁর তর্জনী উঁচিয়ে।

আমরা বৈশ্যশাসিত যুগের পথিক। বিশেষ এতদিন বণিকজাতির দা
স্বীকার ক'রে যেন বুড়ো-বেলে ব'নে গেছি। জীবনে সকল ক্ষেত্রেই
সাত-পাঁচ বিচার ও হাতের কড়ি বজায় রাখার আকুল আকাঙ্ক্ষা দেখা
এক বিরাট দৃষ্টি নিয়ে সমগ্রতার ছবি মনে জাগে না—এ যে 'স্পেশালাইজে
এর কাল। অন্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গে
কি বিষয় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, তার সার্থকতা আছে কি না—এ বি
ঘুলিয়ে গেছে। তাই বিকৃত রুচি ও মনের অপলকা কাঠামো নিয়ে
লেন-দেনের হিসাব কষি। সদাই ভয় হয়—হারাই হারাই, বুঝি লোকসান
গেল। আত্মসচেতন স্পর্শকাতর মন নিয়ে কেবল যাচাই করি, কে ক
সমাদর সম্মান দেখালে—কে সামান্যতম অবহেলা করলে। ফলে ওই গো
ধাঁধাতেই পাক খেয়ে মরি—এ সবকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারি
প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ধূলি গায়ে ছড়িয়েই থাকে। শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবার
মালিন্যের কল্পিত স্পর্শ থেকে আর মোহমুক্তি হয় না।

এ হেন বৈশ্যবৃত্তির উপাসক আমি নিরন্তর মনের দেওয়া-নেওয়া দ
দাওয়ার হিসেবে মগ্ন থেকে মাথা নীচু ক'রে সজাগ-দৃষ্টিতে থলির সম্পদ মা

তে পথ চলেছি, হঠাৎ এ নবাগত যাত্রীর সহজ স্পষ্ট পদক্ষেপে চকিত হয়ে তুলে দেখি—এক ব্রাহ্মণ। দীর্ঘ ঋজু গঠন, চিন্তাচঞ্চল মুখ। আজকাল ত ব্রাহ্মণের দর্শন দুর্লভ। ক্রমশ জানলুম, উদাসীন সাধনমগ্নচরিত্র। শিবের সনায় এমন যতচিত্ত যে, চারিপাশে দৈনন্দিন গ্লানিকে, কলহকলরব-াধকে অতি সহজে বিনা আয়াসে উপেক্ষা ক'রে চলে—নিজের আন্তর দ দিয়ে সকল অশুভকে দূর ক'রে আত্মমর্যাদার স্নিগ্ধতায় ছেয়ে দেয়।

আমি আশৈশব জেদী ও খেয়ালী প্রকৃতির। অপরের আশ্রয় পেয়ে পেয়ে ই ক'রে রিরোধ ক'রে উচ্চকণ্ঠে নিজের চাহিদা মেটাতেই অভ্যস্ত। তিহতগতিতে চ'লেও এসেছি, প্রায়শ প্রতিবেশী-পরিজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ছে। এ ক্ষেত্রেও কতবার অসহিষ্ণু হয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছি, আঘাত ার চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে তাঁর অক্ষয়কবচে ঠেকে বিফল হয়ে ফিরে ছে। আমার সকল অস্ত্র ভোঁতা হয়ে ঝ'রে পড়েছে। নিজের কাছে নিজে া পেয়েছি। অপরকে আঘাত করব না, এবং অপরকেও আঘাত করতে না—এই যেন তাঁর ব্রত। নিরাবরণ মৈত্রীর মাঝে দিন কাটছে। ওর মধুর হারের জন্য বহু বন্ধু-বান্ধব গুণমুগ্ধ ভক্ত। আমরা অনেকেই মনে করতুম, মই বুঝি তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাথী, আমার অধিকার ওর ওপর খুব বেশি, আমার রোধ কদাচ উপেক্ষা করবে না।

বড় ধোঁকায় প'ড়ে অপ্রস্তুত ব'নে গিয়েছিলুম একবার, তারই এ কাহিনী। বহুদিন পরে দুজন একত্র হলুম সেবার। নানা গল্প চলছে। একটি বয়স্ক তাঁর কাছে ঘোরাফেরা করছে, নব-পরিচিত জ্ঞানলুম। ওর জিনিস-র আংশিক জিম্মেদার হয়েছে। তার হাবভাবে মনে হ'ল, ওকে তদারক র দায় পেয়ে সে খুব খুশি—চঞ্চলভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা ক। অমিত বললে, এবার একে পেয়েছি পথে, ভারি মিষ্টি স্বভাব, নেহাৎ মানুষ। আমার অনেক কাজে সাহায্য করে, যত্ন নেয়; বেশ নিশ্চিন্ত ছু ওর অভিভাবকগিরির আওতায়। ওর নাম কল্যাণ।

তাই নাকি? তোমার দেখছি অসংখ্য ভক্ত, 'গোরা নাম নিব কত'-গোছ া। যেখানেই যাও দু-একজন জুটে যায়। সবাই সেবা ক'রে ধন্য হয়।

অমন কথা বলছ কেন? তোমাদের স্নেহ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মি কি অমৃত-সম্পদের অধিকারী—তোমাদের সকলের দানে আমি পূর্ণ।

তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভ'রে যায়। তোমরাই তো আ চিত্তকে সরস কোমল ক'রে রেখেছ।

দেখ, কে কাকে সরস রেখেছে ও-তর্কের শেষ নেই, ও থাক্। জান ঋষিবাক্য—ওঁ বাদো নাবলম্বঃ।

কল্যাণ, সেই চিঠি ও বইগুলো কোথায় কোন্ ঝোলায় আছে দেখ ভাই, এঁকে দিতে হবে।—ব'লে অমিত আমার দিকে চেয়ে বললে, তোম লেখা চিঠি আর কিছু পড়ার মত ভাল বই, গড়িমসি ক'রে আর পাঠানে নি। শুনেছিলুম তুমি আসবে, তোমাকে রোজ প্রত্যাশা করেছি, তাই পাকিলতি।

মনে কেমন অভিমানের মেঘ জমল। চিঠি লিখে দেবার তাগিদ নে এত অবহেলা আমাকে! আবার সে চিঠি জমা আছে ওই নবীনের কা ওর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হবে? থাক্। তাড়াতাড়ি মৃদু হেসে তাচ্ছি দেখিয়ে বললুম, থাক্ না চিঠি, তাড়া কিসের? ছেলেটির কাছে নিজ ম ও দাবির ওজন দেখাবার জন্য বললুম, না ভাই, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। ওস কিছু দরকার নেই, এই তো দেখা হ'ল, সব কথা হবে 'খন। বেচারী, ত ভাল সামলাতে সামলাতে তোমার প্রাণ গেল, যত বাজে কাজের ভার তো ওপর। তোমাকে আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে অত খাটতে হবে না।

কল্যাণ কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললে, না, বাজে কাজ আর কি। ওগু কোথায় রেখেছি, পাচ্ছি না। কি করি বলুন তো? উনি যে আপনাকে কি বললেন, নিশ্চয় দরকারী কিছু, না হ'লে ব'য়ে আনবেন কেন?

আরে, না না, ও আমার চাই না—ওর ও একটা খেয়াল মাত্র। পরে পাও তো ছিঁড়ে ফেলো, কি বা ওর মূল্য। একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করে যাক, ওকে অনেকটা হারিয়ে দিয়েছি, ও যাকে অমূল্য ধন মনে ক'রে ব্য হচ্ছে, আমি তাকে উপেক্ষা করতে পেরেছি। প্রমাণ করেছি, ত এমন ঘনিষ্ঠ যে, অমিতের কথাও হেলাফেলা করতে পারি। কল্যাণকে খা 'পেট্রোনাইজ' করলুম বিজয়ীর মত। অমিত আর পীড়াপীড়ি করলে না; বললে, তোমাকে দেব ব'লেই ওগুলো রেখেছিলুম।

এমনই ঘটনাচক্র—তার পরদিনই অমিতের জন্মদিন। বিদেশবিভূঁই আমরা যাত্রী, কি করি! একটা কিছু প্রীতির নিদর্শন দেবার ইচ্ছা হ

ও ভাবলুম, কল্যাণ কত সম্ভ্রমে দূরে থাকে, সেবা ক'রে তৃপ্ত হয়, আমি যে ন সমপর্যায়ের এটা প্রমাণ করা চাইই। অমিতের সুরুচির সঙ্গে খাপ খায় কিছু সেই ক্ষুদ্র নগরে পেলুম না, একটা দামী ফুলদানি কিনে আনলুম। মিনার নক্‌শার চাকচিক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমিতের জন্ম ীতি জন্মতিথির আজিক পরমায়ু ফরমাশ দিলুম।

কল্যাণ আমার আত্মীয়তার দম্ভ দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। ওকে য় বললুম, এ ছাই দেশে কি কিছু পাওয়া যায়, ভাল ফুলের তোড়াও নেই, দিতে রাজি আছি, তবু মনোমত জিনিস মিলবে না। গন্ধরাজ ও ক্যানা কটা অনেক তল্লাস ক'রে পেলুম, গুছিয়ে রাখ তো ভাই। কল্যাণ নিবে- া গলায় জিজ্ঞেস করলে, এ ফুলদানিটার খুব দাম নিয়েছে নিশ্চয়?

হ্যাঁ, দামের জন্ম ভাবি না, পেয়েছি এই যথেষ্ট, অমিতকে তো যা-তা দেওয়া না।

অমিতের মধ্যে যে দরদী মানুষ আছে, যার জন্য ও সকলের প্রিয়, সেই ষটির কিছু দৃষ্টি এড়ায় নি। ও কল্যাণকে হঠাৎ কাছে ডেকে বললে, াণ ভাই, আজ জন্মদিন, খুব শুচিশুদ্ধ হয়ে নবজীবন লাভ করতে ইচ্ছে ে। সব বড় নোংরা হয়ে আছে, তুমি একটু মন দিলে এগুলোর গতি আর শোন, আজ তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে, তা কাছে তো নেই। এই বইখানায় আমার হাতে নাম লেখা থাক্, কেমন?

কল্যাণ পরমানন্দে অমিতের জামাকাপড় নিয়ে ছুটল। বইখানা এক ত প্রার্থনার গানের সঞ্চয়ন।

আজ এই ঠাণ্ডা দিনে তোমার ওসব কি ভিজে থাকবে?

থাকুক ভিজে, এখনই তো চাই না। কল্যাণটা একটা কাজে রত থাকুক, ন মুষড়ে পড়েছে, ওর মনে ধারণা হয়েছে যে, ও আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর পড়েছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ!

রাতে শোবার সময় অমিত আমার উপহারটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে ল, খুব জমকালো জিনিস দেখছি, কেন অত টাকা নষ্ট করলে? ফুলের নিয়ে বললে, সাদা ফুলের মধ্যে গন্ধরাজের গন্ধটা বড় তীব্র, না? এসব ন ক'রে যোগাড় করলে? আবার খাবার নিয়ে কি হাঙ্গামা করছ, মাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

পরদিন দুপুরে খাওয়ার পর জটলা করছি, পিওন এল। আমিই বাড়িয়ে নিলুম পত্রভার। একখানা খামে পরিচিত হস্তাক্ষর দেখে উঠলুম, এ যে বিভবের লেখা, নিশ্চয় তোমার জন্মদিনের শুভকামনা বহন এনেছে এ চিঠি।

বিভব অমিতের বহুদিনের বন্ধু—ওর দুঃখের দিনের সাথী।

খামটা ছিঁড়ে চিঠি বের করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বিশীর্ণ সাদা গোলাপাপড়ি ঝ'রে পড়ল। তখনও তাদের অঙ্গে ম্লান সুরভির আভাস লেগে আছে

অমিত সহসা আবেগভরা সুরে ব'লে উঠল, অতীন, দেখ, আমি গোলাপের মৃদু গন্ধ ভালবাসি, বিভব তা ভোলে নি, ঠিক সেই ফুলই পাঠিয়ে ও আমার মন দর্পণের মত দেখতে পায়।

ফুলের একটি পাপড়ি আঙুলে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দ'লে ছিঁড়ে ফেললু সেই ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে খড়ি পেতে আঁক কষতে লাগলুম। মনে হ'ল, খেয়ে গেছি। আমি প্রীতির আধিক্য দেখাতে গিয়ে যে বাহুল্য প্রকট করে তা অমিতের আপন-ভোলা শিল্পীমন গ্রহণ করতে পারে নি। আমি পা আঘাত পাই, তাই কিছু বলে নি। ওই উগ্রগন্ধা ফুলও ওকে তৃপ্তি দেয় সব ব্যর্থ মনে হ'ল। হিংসা ও দর্পে মত্ত হয়ে এ কি করেছি। শুধু বস্তু জড়ো ক'রে ওকে দিয়েছি, যা ঢেলার মতই ওর কাছে অপ্রয়োজনীয়। ই হ'ল, ওর ঝোলা থেকে ফুলদানিটা নিয়ে দূরে ফেলে দিই—নিশ্চিহ্ন করি আ এই স্থূল মনের পরিচয়। বিভব যা দিয়েছে তা অতি ক্ষণস্থায়ী, তার কো অস্তিত্ব থাকবে না উত্তরকালে। তার যতটুকু তৃপ্তি দেবার দিয়ে নিঃশেষে হ হয়ে যাবে শুধু ওর মৃদু সুবাস ও তার পিছনে প্রিয়জনকে খুশি করব আন্তরিকতা অমর হয়ে থাকবে। প্রবাসী অমিতের মনের পটে একটা শ মাধুর্যের ছোঁওয়া রেখে যাবে।

ফুলদানিটা কোথায়?

যত্ন ক'রে ঝোলায় তুলে রেখেছি, আজ তো যাত্রা শুরু হবে, যদি ভ হয়ে যায়!

ওটা আবার তোমার বোঝা বাড়াল। ওর খবরদারি করতে হবে, সা রাখতে হবে। হয়তো চলার পথে সর্বক্ষণ ঠুং-ঠুং ক'রে জানিয়ে দেবে, আ আছি।

তুমি অমন ক'রে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন, জান তো, ফুল কত ভালবাসি। নে ফুল পাব ওর মধ্যে রেখে দেব।

আমার জিনিসটা একটা ভার হয়ে থাকবে আর বিভবের ফুল শিথিল মুঠি ক খ'সে ঝ'রে শুকিয়ে পড়লেও অমিতকে বিন্দুমাত্র সচকিত হতে হবে না— কথাটা মনে খচখচ করতে লাগল। ভাগ্যে কল্যাণের কাছে আমার ওর দৈন্য (বা উদ্বেলতা) ধরা পড়ে নি। কালকের 'হিরো'র আজ হ'লে অপমৃত্যু ঘটত।

"মুসাফির"

ডানা

৮

ডানা ভিতর থেকে এসে আবার বসল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক—

এইবার আমরা যে সব হাঁস পেয়েছি, সেইগুলোকে দেখি আসুন। এই পাঁচটা দেখছেন, এগুলো হ'ল Lesser Whistling Teal—বাংলায় ধল হাঁস বলে, হিন্দী সিল্‌হী। এরা হচ্ছে Ducks যারা Pedestrian এবং rching, অর্থাৎ হেঁটে বেড়াতে পারে, গাছেও চড়ে। এদের সঙ্গে oose-এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এদের ঠোঁট এবং গোছ প্রায় সমান। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে এক রকম, গায়ে বেশ রঙ আছে। Whistler চার ম হয়। এগুলো হচ্ছে Lesser Whistling Teal। Large Whistlerও ছে এক রকম। আরও দু রকম আছে—Wandering Whistler এবং otted Whistler—তারা এ দেশে আসে না, East Indies এ থাকে। লার ছাড়াও আরও কয়েক রকম Pedestrian Perching হাঁস আছে, মন চখা—আমরা পেয়েছি; নাকি হাঁস—আমরা পেয়েছি। Common eldrake—শাহ চখা এ দেশে আসে না প্রায়, Cotton Teal—পেয়েছি, ংলায় এদের বলে ঘাংরিয়েল, হিন্দী গিররি। সবচেয়ে ছোট Duck এরা। তকালে খুব আসে। এ দেশে থাকেও। এ দেশে ডিমও পাড়ে। এদের ণীতে আরও দু রকম আছে, Wigeon আমরা পাই নি, আর Mandarin ucks এ দেশে আসেই না। আচ্ছা, আর কি কি Ducks পাওয়া গেছে

দেখা যাক—Pedestrian Perching-এর মধ্যে Lesser Whistling Teal, চখা, Cotton Teal।

রূপচাঁদ আর একটি সিগারেট ধরালেন। কবি বললেন, Pedestrian Perching-এর বাংলা করুন কিছু। বড় কটমট শোনাচ্ছে। আমি ভেবে একটা ঠিক করেছি। Swan-গুলোকে মরাল, Geese-দের রাজহংস, Mergansers না কি বললেন—

হ্যাঁ। আমরা একটা পেয়েছি,—এই যে, স্মিউ (Smew)।

চমৎকার দেখতে তো!

চমৎকার। এদের আরও দু রকম আছে, Goosander আর Red-breasted Merganser, সে দুটো দেখতে আরও চমৎকার। এরা বরফের দেশে সমুদ্রের জলে থাকে, এ দেশে আসে না। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা আলাদা রঙের হয়, আর দুজনেই দেখতে সুন্দর।

কবি বললেন, তা হ'লে এদের বিচিত্র-হংস নাম দেওয়া যেতে পারে এবং Ducks-দের শুধু হংস।

বাঃ, তা হ'লে তো চমৎকার হয়। Ducks-দের মানে হংসদের তিনটে ভাগ আছে—Diving Ducks, Pedestrian and Perching এবং Surface Feeding Ducks।

কবি বললেন, Diving Ducks ডুবুরি হাঁস, Pedestrian and Perching-দের ভূমিচর ও তরুচর বললে মন্দ কি! Surface Feeding Ducks কি রকম?

তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ডুবও দেয় না, কিংবা গাছেও চড়ে না। এরা জলের উপর থেকে কিংবা মাঠে যা সামনে পায় খায়। শভেলারের (Shoveller) ঠোঁট তো অদ্ভুত, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে যা পায় শুষে নেয়।

তা হ'লে এদের সম্মুখভোজী বলুন, সামনে যা পায় খায়।

হ্যাঁ, বেশ হবে।

ডানা কতকগুলো হাঁসকে দেখিয়ে বললে, ওইগুলো টীল বললেন না?

হ্যাঁ, ওগুলো কটন টীল। টীল মানে ছোট হাঁস। এ অনেক জাতের আছে। এই এগুলো দেখুন—Lesser Whistling Teal, এই দেখুন এদের ল্যাজের উপর দিকে মেরুন রঙের ছোপ রয়েছে। Larger Whistling

Teal-এর ক্রীম রঙ থাকে এখানটায়। তা ছাড়া এ দুটোও দেখুন Teal, কিন্তু এরা ও-জাতের নয়, এরা হ'ল আনন্দবাবুর নামকরণ অনুসারে সম্মুখ-ভোজী। কমান টীল (Common Teal)—যাকে বেলেহাঁস বলে। সম্মুখ-ভোজীদের দশ রকম আছে। তার মধ্যে পাঁচ রকমের স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা একরকম দেখতে—Wood-Duck, Pink Head, Marbled Teal, Shoveller, Pintail। Pintail আমরা পেয়েছি। এর কথা পরে বলছি। স্ত্রীপুরুষ দেখতে আলাদা আলাদা—Mallard, Gadwal, Bronze cap আর Teal। এই Teal তিন রকম। Common Teal, Andaman Teal, Oceanic Teal। শেষের দুটো এ দেশে পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছি কমান টীল। আর এক রকম আছে—Garganey। এদের Blue-winged Teal-ও বলে। এটা কি?—বাঃ, চমৎকার! একটা Spot-bill-ও পেয়েছি দেখছি, এও হচ্ছে Mallard জাতের, Indian Mallard বলে কেউ কেউ, এর বিশেষত্ব—দুটো কমলা রঙের ফোঁটা ঠোঁটের দু পাশে কপালের কাছে। আর ডগাটা হলদে। এই দেখুন। পালকের প্যাটার্নটা অনেকটা আঁশ-আঁশ গোছের—সুন্দর, নয়?

ওগুলো কি বললেন?—ডানা প্রশ্ন করলে।

নাকি হাঁস—Comb-Duck। এরা হচ্ছে Pedestrian and Perching, কি নাম করলেন এর আনন্দবাবু?

ভূমিচর ও তরুচর। একসঙ্গে ভূ-তরু-চরও করা যায়।

মন্দ নয়। চলতি ভাষায় এদের 'নাকটা' বলে। এদের পুরুষদের নাকের কাছে একটা উঁচু ঢিবির মত থাকে, দেখতে পাচ্ছেন? Breeding Season-এ এটা আরও উঁচু হয়ে ওঠে। অধিকাংশ হাঁসই শীতের সময় এ দেশে আসে, এরা কিন্তু এ দেশেরই বাসিন্দা। ডিমও পাড়ে এ দেশে, গাছের শুঁড়ির ফাটলে বা গর্তে ডিম পাড়ে—

কবি বাধা দিলেন।

ডিমের কথা থাক্ এখন। পাখিদের পরিচয় শেষ করুন আগে।

আচ্ছা বেশ, ডিম নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। ও নিয়ে প্রবন্ধই লেখবার ইচ্ছে আছে একটা।

ডানা আর একটা হংস-স্তবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, এগুলো কি?

এ দেশে ওগুলোকে লালশর বলে। অর্থাৎ লাল মাথা। কিন্তু মজা আছে সবগুলো এক জাতের নয়। Diving Ducks মানে ডুবুরি-হংসদের মধ্যে যেগুলো লালশর তাদের Pochard বলে। তিন রকম আছে—Red-crested Pochard, বাংলায় এদের পুরুষটাকে অনেক জায়গায় দুমার বা ডুমার বলে। এদের পা-ও হয় লাল বা অরেঞ্জ। এরা শুধু ডুব-সাঁতারই দেয় না, মাঠে চরেও। এদের সকলেরই সাদা রঙের Wing-Bar আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার লালশর—Red-headed Pochard-এর এই Wing Bar নেই।

Wing-Bar কি আবার?

এই যে ডানার এই পালকগুলোকে Wing-Bar বলে। Red-headed Pochard-এর এটা নেই। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে এই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী লালশর। এদের বাংলায় ভুতিহাঁসও বলে, ইংরেজী—White-eyed Pochard। এদের পুরুষগুলোর চোখের বিশেষত্ব সাদা চোখ। এদের পেটের নীচেও একটা সাদা ওভাল (oval) প্যাচ আছে, এই দেখুন। যখন ওড়ে তখন দেখা যায়। ডুব-সাঁতার কাটতে এরা প্রায় অদ্বিতীয়। ডানা এক-আধটা ছররা লাগলে এদের ধরা শক্ত। এমন ডুব-সাঁতার কেটে লুকিয়ে বেড়াবে যে, পাতাই পাওয়া যাবে না। এরা নির্জন স্থানে থাকতে ভালবাসে। ধানের ক্ষেতেও চরতে দেখেছি ভোরবেলা। উত্তর মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে এরা প্রতি বছর শীতের সময় আসে এ দেশে। এই তো গেল ডুবুরিদের মধ্যে, লালশর ভূমি-তরু-চরদের মধ্যেও আছে। Wigeon-এর উল্লেখ আগেই করেছি, Wigeon-কেও কোথাও কোথাও ছোট লালশর বলে। আর এইটে দেখুন, ইনি হচ্ছেন সম্মুখভোজী, একেও লালশর বলে, কিন্তু ইনি হচ্ছেন Pink-headed Duck গোলাপী লালশরও বলে কেউ কেউ। কি চমৎকার রঙ দেখেছেন! এ কিন্তু একেবারে এ দেশী পাখি। ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ—এই ধরনের ডাক। আর একটা কথা ব'লে নি—শুধু লালশর নয়, নীলশর-সবুজশরও আছে। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে যাকে Eastern White-eye বলে, তার মাথা হচ্ছে Dark glossy green। এ দেশে আসে না। পুলিনবিহারীদের মধ্যে নীল বা সবুজ মাথা নেই তেমন। সম্মুখভোজীদের মধ্যে আছে, Mallard-এর মাথা সবুজ, হিন্দীতে কিন্তু নীলশির বলে।

ডানা মুখের সামনে বাঁ হাত রেখে হাই তুলতেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, ময়টা বোধ হয় হৃদয়রোচক করতে পারছেন না তিনি। ক্লাসে বক্তৃতা ওয়ার মত হয়ে যাচ্ছে। অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একটা হাঁস তুলে লেন, আচ্ছা, এটার কি বিশেষত্ব চোখে পড়ছে কোনও?

সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। কোনও উত্তর বা উত্তরের ভাস কারও মুখে দেখতে পেলেন না। রূপচাঁদ গুম হয়ে ব'সে ছিলেন তাঁর াচ্ছন্ন চিন্তালোকে। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। মনা কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে ছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল ঘুবংশ। ইন্দুমতী যখন স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ-নিসে প্রত্যেক রাজাই বিভিন্ন রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ আন্দোলিত রেছিলেন লীলাকমল, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে কেয়ূরের প্রান্ত-লগ্ন মালাটি ঠিক রেছিলেন, কেউ কনক-পাদপীঠে নখরাঘাত ক'রে করেছিলেন ইঙ্গিত, অঙ্গুলি ান্দোলন ক'রে রত্নাঙ্গুরীয়চ্ছটায় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কেউ, কেউ নজের রত্ন-শোভিত মুকুটে হাত দিয়েছিলেন, কেউ বামস্কন্ধ ঈষৎ উন্নমিত ক'রে প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধ, কেতকীপত্র ছিন্ন করেছিলেন কেউ ধীরচিত্তে। কিন্তু এর কোনটাই তো সম্ভব নয় এখন। তাঁর মনে হচ্ছিল, য়ংবরসভাতেই এসেছেন তিনি, ইন্দুমতীও এসেছে, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে নোভাব জানাবেন! এ কি অদ্ভুত পরিস্থিতি!

বৈজ্ঞানিকের কথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। তিনি সবিস্ময়ে চেয়ে দখলেন, অমরবাবু একটা মরা হাঁস তুলে ধ'রে আছেন। চকলেট রঙের াখাটা ঝুলে পড়েছে এক ধারে। ডানাটা বিচিত্র। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

ডানা বললে, ওর ল্যাজটা একটু বেশি ছুঁচলো মনে হচ্ছে।

ঠিক বলেছেন। এর নামই পিন-টেল (Pintail)—এর ল্যাজের জন্য। বাংলায় এর নাম হচ্ছে দিগ-হাঁস, শোলঞ্চও বলে কেউ কেউ। পশ্চিমেরা বলে সিংক-পার। এর মাংস খেতে খুব চমৎকার। এরা আসে উত্তরমেরু থেকে। এখানে কটন টীলকে অনেকে দীর্ঘোচ বলছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলোই দীর্ঘোচ। বাংলা দিগ-হাঁসের সঙ্গে বেশ মিল হয়। না? এটা পুরুষ, মেয়েটা

এত সুন্দর নয়। মাথায় এ রকম চকোলেট রঙ নেই, এ রকম Bronze-green Wing-Bar ও নেই।

একটু হেসে তারপর বললেন, পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি অলঙ্কৃত।

ব'লেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

সব সময় অবশ্য নয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের মেয়েটাও কম সুন্দর নয়। তা ছাড়া, এই হাঁসেদের মধ্যে যাদের Merganser বললাম, আর বাবু যাদের বিচিত্র-হংস নাম দিলেন, তাদের Female-গুলো চমৎকার। এই যে স্মিউটা দেখছেন, এর সঙ্গিনীও কি কম সুন্দর? তার মাথাটা বাদামী কালো নয় এর মত। Goosander-ও তাই। শাহ-চখার স্ত্রী-পাখিটাই বে হয় বেশি সুন্দর। সাধারণ চখার স্ত্রী-পাখিটার গলায় কেবল কণ্ঠী নেই, কি আর সবই এক। মানে—

অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে গেলেন। যদিও এটা অবিসম্বাদিত সত্য পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি সুন্দর, তবু নিজে পুরুষ হয়ে একজন মহিলার সামনে গলায় তা প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটু অভব্যতা প্রচ্ছন্ন আছে এ কথাটা স্পষ্টভাবে মনে হওয়ামাত্র সব গুলিয়ে গেল তাঁর।

সবচেয়ে বড় হাঁসটা কি বললেন?—ডানাই প্রশ্ন করলে আবার।

ও, ওটা বার-হেডেড গুজ (Bar-headed goose), এটাও পুরুষ। স্ত্রীর মাথায় এই কালো দাগটা থাকে না। এদের গায়ের রঙ ডগমগে নয়, দেখেছেন বেশ আভিজাত্য আছে। এদেরই আর একটা জাত এ দেশে আসে, তার Grey Lag বলে। তাদের গায়ের ধূসর বর্ণ একটু বেশি। Grey Lag-এর বাংলা হচ্ছে কলহংস, সংস্কৃত কাদম্ব। এরা যখন আকাশে ওড়ে, মনে হয় মস্ত উড়ে যাচ্ছে একটা। অনেক সময় লম্বা রেখায় ওড়ে, অনেক সময় আর V-shaped, চমৎকার দেখায়। ডাকও চমৎকার। এরা নিশাচর। দিনে বেলা বিশ্রাম করে, রাত্রে চরতে বেরোয়। দল বেঁধে আকাশপথে উড়ে যায় তখন ডাকতে ডাকতে। একজন ইংরেজ লেখক তা শুনে লিখেছেন, থ্রিলিং-

তার চেয়ে ঢের ভাল ক'রে বলেছেন কালিদাস।—কবি ব'লে উঠলেন হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক যে বাজে কচকচিতে ডানার সমস্ত মনোযোগ দখল ক'রে রেখেছেন, এ যেন আর সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

কি বলেছেন?

P30562

কামঞ্চ হংসবচনং মণি-নূপুরেষু—মণি-নূপুরের নিক্কণের সঙ্গে তিনি মিত করেছেন হাঁসের ডাককে। আমরা যে চোখে রাজহংসকে দেখি, সে খে সাহেবরা দেখতে পারবে না ওকে। আমরা ওর সঙ্গে জড়িত করেছি য়ন্তীকে, সরস্বতীকে, যক্ষের বিরহ-বেদনাকে, হিমালয়ের স্বপ্নকে, আকাশের ন্তকে। লীলাঞ্চিতা মদালসার রূপমাধুরী, বধূদুকূল, সন্নতাঙ্গী গৌরীর ীরধ্বনি—কত কি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। শুধু 'থ্রিলিং' বললে কিছুই া হয় না।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, বিজ্ঞানের ভাষা একটু সংযত কিনা। তার বলই ভয় হয়, পাছে সে এমন কিছু ব'লে ফেলে, যা সে প্রমাণ করতে পারবে । কাব্যের তো সে দায়িত্ব নেই।

কে বললে নেই? কাব্যও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য যাচাই বার যন্ত্র আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, রসিকের কাছে আছে।

ডানার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।—ওগুলো চখা বুঝি? ৎকার রঙ তো!

যদিও প্রশ্নটা অবান্তর তবু ডানা দেখলে, প্রশ্ন করা ছাড়া তর্কের মোড় রিয়ে দেবার আর কোন উপায় নেই।

হ্যাঁ। ইংরেজীতে বলে ব্রাহমিনি ডাক্‌স্।

কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সংস্কৃতে চক্রবাক।

মৃদু হেসে ডানা বললে, সংস্কৃতে ওর আর একটা নাম বোধ হয় রথাঙ্গনামা।

?

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কবি।

আপনি সংস্কৃত জানেন?

হ্যাঁ। বি. এ.তে আমার সংস্কৃত ছিল। কালিদাসের শ্লোক মনে আছে নেও।

ব'লেই সে আবৃত্তি ক'রে দিলে—

অত্র বিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি
ন্যানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সম্পৃহ মীক্ষিতানি।

বৃত্তি ক'রেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল একটু। নিজের বিদ্যা জাহির করার

মত শোনাল যেন। কিন্তু এঁদের কাছে আত্মপরিচয় না দিয়েও সে পারলে না কিছুতে। মনে হ'ল, কেন দেবে না?

কবি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন শুধু ডানার দিকে। বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছিলেন। অতিশয় অবহেলাভরে তিনি যে আশ্রয়হীনাকে এই প'ড়ো বাড়িটাতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে যে হঠাৎ এমন ভাবে কালিদাস আবৃত্তি করতে পারবে, তা তিনি প্রত্যাশাই করেন নি। রূপচাঁদও করেন নি। শুধু বিস্মিত নয়, চমকে গিয়েছিলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তিনি চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি চকচক করছিল।

ডানা সামলে নিয়েছিল নিজেকে। অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে আবার, আচ্ছা, কবিরা যে কল্পনা করেছেন, চখাচখীরা সমস্ত দিন এক-সঙ্গে থাকে, কিন্তু রাত্রে দুজনে নদীর দু পারে চ'লে যায়, এর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি?

বৈজ্ঞানিক বললেন, না। বরং এ নিয়ে ঠাট্টাই করেছেন দু-একজন। তবে দিনের বেলায় যে ওরা একসঙ্গে থাকে, মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকে, তাতে কোনও ভুল নেই। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।

বৈজ্ঞানিকের এই কথায় কবি প্রতিবাদ করলেন না। কবি ল্যাণ্ডরের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে প'ড়ে গেল তাঁর—I strove with none, because none was worth my strife। তাঁর মনে হ'ল, এই সব বৈজ্ঞানিকেরা অতি অদ্ভুত রকম শিশু-প্রকৃতির লোক, সামান্য মাটির পুতুল নিয়ে মেতে থাকে, আকাশের দিকে চাইবার অবসর পায় না। উচ্চাঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ হ'লে মানুষের মুখভাব যেমন হয়, কবির মুখভাব তেমনই হয়ে উঠল। ডানার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর, তিনি নিজেও কি একটা খেলনা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েন নি? কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর মন এ অভিযোগের জবাব দিলে কবিতায়। তাঁর মনে গুনগুন ক'রে উঠল।

তুচ্ছ ক্ষুদ্র খেলনা নয় ও
আকাশ নেমেছে উহারই কাছে

নয়নে রয়েছে নীলের আভাস
চাহনিতে ওর বিজলী নাচে

গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ-পাশে
নিবিড় মেঘের মহিমা প্রকাশে
মহা-আকাশের অন্ত-হীনতা
ওই তনু-দেহে লুকায়ে আছে।

কবিতাটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত হয়তো, কিন্তু চা এসে পড়ল। রূপচাঁদ একটি কথা বলেন নি এতক্ষণ। চা আসাতে ঈষৎ ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে শেষ টানটি দিয়ে ফেলে দিলেন সেটা এবং চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চা খেতে লাগলেন নীরবে। চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল। বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করছিলেন, হংসবিষয়ক বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়াটা এর পর শোভন হবে কি না। কিন্তু ডানাই প্রশ্ন করলে আবার, আচ্ছা, কালিদাস যে বলেছেন চক্রবাক উৎপল-কেশর খায়, তা সত্যি নাকি?

জানি না। আমি যতদূর জানি, ওরা সব খায়। শুগলি শামুক পোকা-মাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ, এমন কি মড়া পর্যন্ত।

মড়া খায়?

আমি নিজের চোখে খেতে দেখি নি। বইয়ে পড়েছি—

কবি হেসে বললেন, ঠিকই পড়েছেন। একটা কথা কিন্তু পড়েন নি এবং বিজ্ঞানের বইয়ে সম্ভবত তা পাবেনও না। সেটা শুনে রাখুন। যে চখা-চখীরা উৎপল-কেশর খায়, নিশীথে যাদের মাঝখান দিয়ে বিরহের নদী ব'য়ে যায়, মত্তমাতঙ্গদের সংস্রব বর্জন করে যারা, তাদের নাগাল বৈজ্ঞানিক পায় নি কখনও, শিকারীর গুলিতে মারা পড়ে নি সেই হিরণ্য-হংসদম্পতি আজও।

বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, কিন্তু এক জায়গায় তারা ধরা পড়েছে শুনেছি।

কোথায়?

কবির কল্পনাজালে।

রূপচাঁদ বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চাকতে একবার চেয়ে সিগারেট ধরালেন। ডানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৌতুকের দীপ্তিতে।

কবি বললেন, নিশ্চয়।

তারপর হেসে বললেন কবিতাতে—

কল্পনা-জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাঙ্-মানস-গোচরও তাহাতে
ধরা প'ড়ে যায় বারংবার।

ডানা ব'লে উঠল, বাঃ, বেশ কবিতা তো! কার লেখা?

চুপ ক'রে রইলেন কবি। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ-পঞ্জরে মাথা কুটতে হঠাৎ। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না তাঁর। নীরবে ব'সে রা তিনি। বৈজ্ঞানিকই উত্তর দিলেন।

উনিই বানালেন বোধ হয়। চমৎকার কবিতা লিখতে পারেন পাখি নিয়েই কত কবিতা লিখেছেন।

তাই নাকি! দেখাবেন আমাকে? কবিতা বড় ভাল লাগে আমার

কবির মনে হ'ল, কল্প-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন ি মন্দাকিনীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। ক্ষি জন্য তাঁর চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন সব। খানিকক্ষণ যখন আত্মস্থ হলেন, তখন শুনলেন, বৈজ্ঞানিক শরাল-হাঁস আর বালি-হ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে চলেছেন, ডানা নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। রূপচাঁদ নীরবে উদ্গীরণ ক'রে নিজের চতুর্দিকে আবার একটা অস্পষ্টলোক সৃজন ক'রে আছেন তার মধ্যে।

হঠাৎ মধুরকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল কে যেন অন্ধকারের ভিতর থে সংস্কৃত গান, সেই পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকটা—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

চমকে উঠলেন সবাই। রূপচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল আরও।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এখানে আর কেউ নাকি?

আমার তো জানা নেই, আর কেউ আছে। আনন্দবাবু যে চাকরটা গিয়েছিলেন, সে-ই আছে কেবল। ওই যে—

াকরটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব।
তামার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?
ই তো।
তবে কে?
ানি না।
ন্সি, দেখে আয় তো, আলোটা নিয়ে যা। নদীর ধারে আউট-হাউসটার থকেই গানটা আসছে মনে হচ্ছে।
ন্সী আলোটা নিয়ে চ'লে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দাটা। অদ্ভুত তময় অন্ধকার। মনে হ'ল, অন্ধকারের পরতে পরতে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু তাদের মনে তার চারিদিকে যেন আছড়ে পড়ছে অনুক্ত ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ। দূরে রের ভিতর থেকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত গানটা তখনও ভেসে ল। হঠাৎ থেমে গেল সেটা। একটু পরেই দেখা গেল, মুন্সি ফিরছে, পিছু পিছু আর একটি লোক। লোকটি কাছে এসেই নমস্কার করলে ক। অদ্ভুত চেহারা। খুব লম্বা। মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি। পা। গায়ে কালো কম্বল জড়ানো একটা। শ্যামবর্ণ। চোখের দৃষ্টি এবং প্রশান্ত। ব্যক্তিটির অসাধারণত্ব লেখা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।
জোনিক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?
ামি একজন পথিক। সন্ধ্যাবেলায় এসেছি এখানে। রাত্রের মত নিয়েছি ওই প'ড়ো ঘরটাতে।
রিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে। রূপচাঁদ এটা প্রত্যাশা করেন নি। আরও হয়ে গেল তাঁর কপাল।
থা থেকে আসছেন আপনি?
গ্রামপুর থেকে।
য়্যার সময় সেখান থেকে আসবার কোনও ট্রেন তো নেই!
ামি হেঁটে এসেছি।
ই অপ্রত্যাশিত উত্তরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। ত্রিশ মাইল আসবার কল্পনাও কেউ করে না আজকাল, বিশেষত ট্রেন আসে যখন থেকে।

কোথায় যাবেন আপনি ?—বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

তা ঠিক করি নি এখনও। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, ওই প'ড়ো ঘরটাতে কাটিয়ে যেতে পারি দিন কতক। নদীর ধারটা ভাল লাগছে বেশ।

এই কথায় কবির অন্তর পুলকিত হ'ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, বাড়ি কোথায় আপনার ?

কোথাও নেই।

কি করেন ?

কিছুই করি না।

এর পর কি জিজ্ঞাসা করবেন—জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে কি না—কবি ভেবে পেলেন না। চুপ ক'রে রইলেন।

রূপচাঁদ বললেন, চলে কি ক'রে আপনার ?

কি চলবার কথা বলছেন ?

পেট।

পোস্ট-অফিসে আমার কিছু টাকা আছে, তার সুদ থেকে চলে।

কথাটা ব'লে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল লোকটি, পোস্ট-অফিসে টাকা থাকাটা যেন অপরাধ। আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সবাই। লোকটিই নীরবতা ভঙ্গ করলে।

আমি যদি কয়েকদিন ওখানে থাকি, আপত্তি আছে কি আপনাদের ? যদি আপত্তি থাকে, কাল সকালেই আমি চ'লে যাব।

বৈজ্ঞানিক বললেন, আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইনি এখানে থাকেন, এঁর যদি অসুবিধা না হয়—

ডানার দিকে চাইলেন তিনি। সকলেই তার দিকে চাইলেন। ডানা দেখছিল লোকটিকে। আপাতদৃষ্টিতে তার লম্বা চুল, কুঞ্চিত ঘন গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল-জড়ানো, খালি পা, দেখলে ভয় হবার কথা। কিন্তু কিছুমাত্র ভয় করছিল না ডানার। একটা অদ্ভুত আশ্বাস যেন ক্ষরিত হচ্ছিল লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে। অতি পবিত্র, অতি নির্মল, অত্যন্ত আনন্দময় একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল যেন। ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, নির্ভরযোগ্য একটা কিছু পাওয়া গেল। রূপচাঁদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ডানার

দিকে। চোখোচোখি হতেই তিনি বাম-চক্ষুটা ঈষৎ বুজে এবং মাথাটা ঈষৎ নড়ে যে ইঙ্গিতটা করলেন, তার মর্ম জানা যে বুঝতে পারলে না তা নয়, কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে সে বললে, না, আমার কিছু অসুবিধা হবে না। বরং কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক যদি থাকেন, ভালই তো।

আগন্তুক এর পর দাঁড়িয়ে রইল আরও মিনিট খানেক। তারপর বললে, এবার আমি যেতে পারি কি?

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনাকে এমনভাবে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।

প্রতি-নমস্কার ক'রে আগন্তুক চ'লে গেলেন। তারপরই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, রাত্রি শেষ হয়েছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সহসা পাখিরা কলরব ক'রে উঠল একযোগে। ঐক্যতান-বাদন শুরু হয়ে গেল যেন। মনে হতে লাগল, নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হবে এইবার।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে কবির দিকে ফিরে বললেন, শুনছেন?

কি?

ওই যে, ওই যে—

কবি শুনতে পেলেন এইবার। মধুর গিটকিরিভরা একটা সুর। মনে হ'ল, প্রভাতের আলো যেন কাঁপছে। বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। দূরের নিক্কণ, বাঁশীর সুর, তার মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে যেন কেউ, সতারের মীড়ের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও কত কি—যা অবর্ণনীয়, মিনতি-ভরা আহ্বান, সোহাগ-ভরা আবেদনের সঙ্গে প্রাণ-ভরা বলিষ্ঠ সঙ্গীতময় পৌরুষের কি অদ্ভুত সমন্বয়।

কবির মুগ্ধভাবটা বৈজ্ঞানিক উপভোগ করছিলেন। যেন কৃতিত্বটা তাঁরই, সুরের নয়। উন্মনা কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে ছিলেন স্বচ্ছায়মান অন্ধকারের দিকে, যেন প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন অদ্ভুত এই সুর-সমন্বয়কে। আশা করছিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই কোনও অপরূপ অপ্সরাকে দেখতে পাবেন বুঝি এইবার···। ঘাড় ফেরাতেই চোখোচোখি হ'ল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে।

তিনি বললেন, দোয়েল।

ও।

দেখেছেন কখনও?

না।

চলুন, দেখিয়ে দেব এখুনি।

তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা, চলি এবার আমরা। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন।

তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, চলুন। সোৎসাহে নেবে পড়লেন দুজনেই বারান্দা থেকে। মুন্সি মরা হাঁসগুলোকে পুরতে লাগল বোরার মধ্যে। মুন্সিও যখন চ'লে গেল, তখন রূপচাঁদ কথা কইলেন।

আমি অবাক হয়ে গেছি। শুধু অবাক নয়, ভয় পেয়ে গেছি একটু।

কেন?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

আপনার সংস্কৃত শুনে। সত্যি আপনি বি. এ. পাস করেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে?

হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে ডানা চেয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে।

সত্যি নেই? রূপচাঁদের চোখের দৃষ্টিতেও হাসির ঝলক খেলে গেল একটু

নিমগাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে ডাকছিল দোয়েলটা। কবি আর বৈজ্ঞানিক দুজনেই ব'সে ছিলেন একটা ঝোপের ধারে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন, আর বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছিলেন ফিসফিস ক'রে।—

আমার মতে কোকিলের ডাক নয়, দোয়েলের ডাকই এ দেশে বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কোকিল তো এ দেশে বারো মাসই ডাকছে। দোয়েল কিন্তু শীতকালে ডাকে না তেমন, বসন্ত পড়লে ডাকে। বাই দি বাই, আমরা যাকে কোকিল ব'লে থাকি, ইংরেজীতে তার নাম Cuckoo নয়, Koel হিন্দীতে কোয়েলই বলে। ইংরেজীতে যার নাম Indian Cuckoo—বাংলায় তিনি হচ্ছেন 'বউ কথা কও'। একটু গরম পড়লে সেগুলোর ডাক শোনা যাবে আমবাগানে।

কবি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দোয়েলের গান। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে ঢুকছিল, কিন্তু মনে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল—

আমরা কেবল সদরে গলিতে
ধূলায় পঙ্কে কাদায় পলিতে
রঙ-বেরঙের নানান থলিতে
নানান রকম স্বার্থ ভরিয়া
করি কলরব করি বাড়াবাড়ি
করি হুড়োমুড়ি করি তাড়াতাড়ি
করি মারামারি করি কাড়াকাড়ি
অপরের শির লক্ষ্য করিয়া
কাদা ছুঁড়ি আর ইঁট মারি।

শাখার শিখরে ও দোয়েল পাখি
চটিয়া গিয়াছ তাই তুমি নাকি
পুচ্ছটি বুঝি তাই থাকি থাকি
আকাশের দিকে ধরিতেছ তুলি
হানিতে চাহিছ সবার প্রাণেতে
তীব্র মধুর তীক্ষ্ণ তানেতে
অবাধ সুরের 'মেশিন গান'-এতে
মর্ম-ভেদিনী এ কি গোলা-গুলি
পিটকারি-ভরা টিটকারি।

কবির মনে হ'ল, শীতের তীক্ষ্ণতা হঠাৎ ক'মে গেছে যেন। কনকনে পূবে হাওয়ার ভিতরও ভেসে আসছে যেন দক্ষিণা বাতাসের আমেজ। মানসপটে ভেসে উঠল, কর্ণিকার মুকুলের গুচ্ছ বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠেছে, অশোক-শাখা মুকুলভারনম্র। আকুল নয়নে তিনি খুঁজতে লাগলেন কোথায় নবমল্লিকার দল, কোথায় পদ্মবন…

এদের নিকট-আত্মীয় শ্যামা মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড়।—কবি শুনলেন, বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছেন, কতক্ষণ থেকে ব'লে চলেছেন কে জানে।—এরা কিন্তু খুব মানুষ-ঘেঁষা। বাগানে প্রায়ই দেখতে পাবেন। এমন কি এরা ডিমও পাড়ে আমাদেরই ঘরের কাছাকাছি। সেবার আমার মালীর ঘরের পিছনের দিকের কার্নিশে দেখেছিলাম ওদের বাসা। ডিম ওদের—

বাধা পড়ল। পাশের ঝোপ ভেদ ক'রে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হ হলেন মল্লিক। সনাতন মল্লিক, তাঁর হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার। বাদাড়ে ঘুরে ভদ্রলোকের কাপড়ে লেগেছে অজস্র চোর-কাঁটা। পাঞ্জ পকেটটা কি লেগে যেন ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে। এঁদের দেখতে পেয়ে কচলাতে কচলাতে অতিশয় কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন ি বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, কাল সন্ধ্যে আপনাকে খুঁজছি।

আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম এঁদের নিয়ে। কেন, কিছু দরকার ? নাকি ?

আপনার পাখির জন্যে যে ফড়িং দরকার তা তো আমি জানতাম না, ব বলছি, জানতামই না। মুন্সি ব্যাটা মিছিমিছি লাগিয়েছে আমার মায়ের কাছে। তিনি কাল একটা চিঠি দিয়েছেন আমাকে। কি আ সামান্য ব্যাপার, আমাকে একটু বললেই চুকে যেত। ফড়িঙের ভাবনা আমার বাগানে তো যথেষ্ট ফড়িং, দেখুন তো, মিছিমিছি কি কাণ্ড!

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ঠিক। বললেন, কি ? কে দিয়েছে ?

এই যে দেখুন না, সামান্য ব্যাপার, ছি ছি!

একটি ছোট চিঠি বার ক'রে দিলেন তিনি। রত্নপ্রভার চিঠি। রত্নর গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

ওঁর পাখির জন্য ফড়িং যোগাড় ক'রে দেবার ভার আপনাকে নিতে হ যদি না পারেন কাজে ইস্তফা দিন, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। ইতি রত্নপ্রভ

বৈজ্ঞানিক ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ ক'রে গেলেন। তারপর আড়চে চাইলেন একবার সনাতনবাবুর দিকে। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুত পড়েছিলেন তিনি। কি যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। মল্লিক ব চলেছিলেন, সামান্য ফড়িঙের জন্যে এত কাণ্ড করার দরকারটা কি-ি মুন্সির।

অকারণে গলাটা ঝেড়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, আমি এর বিন্দুবিসর্গ কি

য় না। তবে আমার পাখিগুলো ফড়িঙের অভাবে ম'রে যাচ্ছে। গোটা চক ম'রে গেছে।

আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।

ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, এ চিঠির কথা আমি কিছুই জানতাম না।

তাঁর একবার ইচ্ছে হ'ল যে বলেন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু প্রভার আত্মসম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে চুপ ক'রে গেলেন। মল্লিক বিকশিত ক'রে হেসে ফেললেন খুব খানিকটা। তারপর বললেন, উনি ব, আমি চাকর, হুকুম দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ওঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু ায় ফড়িং, দেখুন দিকি!

বৈজ্ঞানিক অপ্রতিভমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

এই কথাটা বলবার জন্যেই খুঁজছি আপনাকে কাল থেকে। এক-আধটা প্রচুর ফড়িঙের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আজই লাগিয়ে দেব ছোঁড়াগুলোকে। াকে দেবেন পাঠিয়ে, সেও ধরবে। ফড়িঙের আবার ভাবনা! আচ্ছা, চলি ার তবে।

নমস্কার ক'রে মল্লিক চ'লে গেলেন।

কবির দিকে চেয়ে একটু হেসে বৈজ্ঞানিক আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, দোয়েলের ডিমের কথা হচ্ছিল। এদের ডিম্ চমৎকার দেখতে, লেন?

কবি হেসে উত্তর দিলেন, এখন একটি কথা ছাড়া আর সমস্তই অবান্তর এ হচ্ছে আমার কাছে।

বৈজ্ঞানিক একটু থমকে গেলেন।

সে কথাটি কি?

বসন্ত এসেছে। যার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলেছেন—

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধিঃ
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।

উদ্ভাসিত চক্ষে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, ও, সার্টেনলি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গান্ধী-বাণী-কণিকা

(ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত)

(১)

হিংসার হবি যোগাইয়া পলে পলে
দেহের কুণ্ডে জীবনযজ্ঞ চলে ;
এ ব্রহ্মাণ্ড বলয়িত যেন
হত্যার শৃঙ্খলে।
জীবকরুণায় সিক্তচিত্ত
চিরবনবাসী যারা
তারাও রুধিতে পারে না এ দেহে
অনাদি হিংসাধারা।
প্রতি নিশ্বাস সাথে
অসংখ্য প্রাণ লভে নির্বাণ
অদৃষ্টে অজ্ঞাতে।
অহিংসাপথ-পথিকের তাই
মর্মের প্রার্থনা
দেহবন্ধন ঘুচায়ে আত্মা
পায় মহাসান্ত্বনা।

(২)

পরাজয় কভু যেনো না মহৎ ব্রতে ;—
প্রার্থনা-দৃঢ় চিত্ত
তুমি রাখো রাখো সুপবিত্র,
রাখো প্রত্যয়, নিশ্চিত জয়
নামিবে ঊর্ধ্ব হ'তে।

(৩)

বন্ধু, যাহারা দিতে চাও মোরে সম্মান,
আপন জীবনে আমার মত ও
পথের করহ সন্ধান।

আস্থা না থাকে যদি,
প্রাণপণে মোরে বাধা দাও ভাই
নিরন্ত নিরবধি।

(৪)

প্রেম ও সত্য দুয়ে একত্র হ'লে
নিখিল বিশ্ব লুটাবে চরণতলে।
রাষ্ট্রজগতে সত্য প্রেমের
সাগ্রহ সাধনাই
সত্যাগ্রহ ভাই!

(৫)

সত্যাগ্রহ মম
অস্ত্র শ্রেষ্ঠতম,
অনায়াসে শত সঙ্কট নাশে;
দ্বি-ধার কৃপাণ সম।
যে হানে, যাহারে হানে
উভয়েরই কল্যাণে
রক্তমসী না মাখিয়া এ আস
পশে মর্মস্থানে।

(৬)

সত্যাগ্রহী অকুতোভয়
শঙ্কিতে না অপ্রত্যয়,
বিশ বারও যদি বিশ্বাস ভাঙে
একুশ বারে সে পিছপা নয়।
মানুষধাতে বিশ্বাস
এদের প্রাণের নিশ্বাস।

(৭)

ধর্মযুদ্ধে মিথ্যা শাঠ্য গুপ্ততার ত
নেই স্থান,

সত্যাগ্রহী সৈন্য ; স্বয়ং সেনাধ্যক্ষ
ভগবান।
হঠাৎ সৈন্য পায় পায়,
ঘনাচ্ছন্ন নিরুপায়।—
সেনাধ্যক্ষ পাঠায় তখনি উদ্ধারণের
অভিযান।
সে নয় ধর্ম্মযুদ্ধ যেখানে নেই ক
ঐশী আহ্বান।

(৮)

শত শত যবে সত্যাগ্রহী
মরণ বরণ করে,—
নহি অকরুণ, তবু দেখে যাই
সানন্দে অকাতরে।
অন্তরমাঝে আমি জেনেছি যে
এই মরণেরই অক্ষয় বীজে
ভবিষ্যতের কোটি জীবনের
অকাল মরণ হরে।
হাসিবে বিশ্ব অমল প্রাণের
শ্যামল শস্যভরে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

টুক্‌রি

শব্দ হল ব্রহ্ম তাই মানুষের বাণী
কভু না হারায় এই ব্রহ্মাণ্ড-আবাসে,
পবন কখন কার কানে দেয় আনি
তারি লাগি প্রতীক্ষিয়া ভাসে শূন্যাকাশে।

* * * *

ভাল কথা ঊনে শুনে প'চে গেল কান,
কিঞ্চিৎ খারাপ কথা শুনাও সুহৃৎ—
মিষ্টতর হয় কিসে খাঁটি ছাঁচি পান,
সংস্কৃত প্রেম হয় প্রাকৃতে পীরিত।

প্রাচীন বাংলা-লেখকগণ

বিপ্রদাস, নারায়ণ দেব এবং শ্রীকর নন্দী

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ধারা কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবহমান ছিল। একটি ছিল লাউসেনের কীর্তিকাহিনী। এটি ছিল ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, ঘনরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, শ্যাম পণ্ডিত, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, সেন পণ্ডিত, প্রভুরাম, দ্বিজ ভগীরথ প্রভৃতি কবি সকল ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ময়ূরভট্টই সকলের চেয়ে প্রাচীন, তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়বস্তু ছিল কালকেতুর উপাখ্যান। তৃতীয় ছিল ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত। এই দুইটিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপজীব্য হয়েছিল। প্রথমে বোধ হয় চণ্ডীমঙ্গলে একটি মাত্র উপাখ্যান থাকত। পরে অন্যটি যোগ করা হয়। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। তাঁর সময় অনুমান খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে। তারপর মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মুক্তারাম সেন, দ্বিজ হরিরাম, ভবানীশঙ্কর, জনার্দন প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন।

চতুর্থ বিষয়বস্তু ছিল বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি বাংলার বাইরে থেকে এ দেশে এসেছিল। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ময়মনসিংহের কঙ্ক ছিলেন এর আদিম লেখক। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন ব'লে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিজ শ্রীধর গৌড়ের সুলতান ফিরোজশাহের আদেশে (১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই আদি কবি। তারপর গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম দাস, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন, প্রাণরাম চক্রবর্তী, নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন, কবীন্দ্র মধুসূদন, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর দাস প্রভৃতি কবিগণ এই বিষয়ে কাব্য লেখেন। কবি কঙ্ক জনৈক পীরের আদেশে তাঁর কাব্য লেখেন। এতে সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য কবিরা এই বিষয়বস্তু নিয়ে কালিকামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন। একজন মুসলমান কবি সারিবিদ খান বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখেছেন। তাঁর পুথিখানি খণ্ডিত। তবে প্রাচীন রচনা বটে। নেপালী ভাষাতেও বিদ্যাসুন্দরের কাব্য আছে।

পঞ্চম বিষয়বস্তু বেহুলা ও লক্ষীন্দরের কাহিনী। এই বিষয়টি নিয়ে শতাধিক কবি মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ রচনা করেছেন। গল্পটি বিহার থেকে এ দেশে এসেছিল। কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃতে এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন এখনও বিহারী ভাষায় এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে। পদ্মানদীর সঙ্গে মনসাকে অভিন্ন ক'রে মনসার নাম বোধ হয় পূর্ববঙ্গে পদ্মা হয়। যদি বিদ্যার দেবী সরস্বতী, নদী থেকে অভিন্ন হতে পারেন, তবে কেনই বা মনসা পদ্মানদীর সঙ্গে অভিন্ন হবেন না? চৈতন্যদেবের সমকালে এই সকল লৌকিক দেবতার পূজার যে খুব একটা ঘটা ছিল, তা চৈতন্য-ভাগবতে নীচের উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায়।—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলী পূজায় কেহ দিয়া বহু ধনে॥ (আদি খণ্ড)

বিষহরি মনসার নামান্তর। মনসামঙ্গলের আদি লেখক কানা হরি দত্ত বিজয় গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণে কানা হরি দত্তের নাম করেছেন।—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত কৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাই কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই, নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥ (স্বপ্নাধ্যায় পালা)

হরি দত্তের কয়েকটি পদ মাত্র প্রাচীন পুথিতে রক্ষিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের কবি। সৌভাগ্যের বিষয় বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয় থেকে আমরা তাঁর পদ্মাপুরাণের সন-তারিখ পাই—১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। তখন হুসেনশাহ গৌড়ের বাদশাহ।

ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥
পাশ্চমে ঘাগরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥

—এই ফুলশ্রী বর্তমান বারশাল জেলার গৈলা গ্রামের একটি পাড়া। তাঁর পিতা-মাতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন।—

সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ তব পদ সাথ॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনার পর-বৎসরে বিপ্রদাস তাঁর মনসামঙ্গল রচনা করেন। আমরা এখানে কবির আত্মপরিচয় উদ্ধৃত করছি।—

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চপ্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা কৈলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের সুলতান॥
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রত গীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত॥
পদ্মাবতী চরণ সরোজ মধুলোভে।
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপ শোভে॥

এর থেকে রচনার সময় ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ দাঁড়ায়। বাদুড়্যা-

খটগ্রাম অধুনা চব্বিশ পরগণায় বসিরহাট মহকুমায় বাদুড়িয়ার নিকটবর্তী স্থান। গ্রন্থের প্রথমে গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থসূচী আমাদের জানিয়েছেন।—

প্রথমে কহিব তত্ত্ব শুন নর একচিত্ত
মহাযজ্ঞ করে দেবগণ।
গঙ্গা হরের ঘরে নিরঞ্জন আসি তাঁরে
যেন মতে দিলা দরশন॥
নাগইন্দ্র রক্ষা কাজে কালীদহে গজরাজে
মনসা জন্মিল যেন মতে
চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড় পরমাদ
নির্বাসিলা সিঙ্গুয়া পর্বতে॥
কহিব যজ্ঞের কথা কশ্যপ নন্দন যথা
ব্রহ্মা মনমথে মহারণ।
ব্রহ্মশাপ ইন্দ্রে হৈল লক্ষ্মী জলধি গেল
ক্ষীর নদী করিল মথন॥
বিশ্বেশ্বর পশুপতি আসিয়া ত্বরিত মাত
যেন মতে করাইল চেতন।
বিষ কাঁটি দিলা নাগে মনসার বিভাযোগে
জরৎকারু মুনি মহাজন॥
আস্তীক কুমার হৈল নাগইন্দ্র রক্ষা পাইল
জন্মেজয় যজ্ঞ নাশ করি।
মায়া পাতিয়া গিয়া রাখালের পূজা লইয়া
বধিলেন হাসনের পুরী॥
ত্রাস লইল নিয়স্থানে হরিল চাঁদোয় জ্ঞানে
হেন মতে বধি ধন্বন্তরি।
ধনা মনা বধ করি চাঁদোয় ছয় পুত্র মারি
অনিরুদ্ধ উষা আনে হরি॥
নৃপতি পাটনে যায় লখাই বেহুলা হয়
চাঁদ রাজা আইল নিজ দেশে।

উজানি নগরে গিয়া লখাই বেহুলা বিয়া
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে ॥
সূতার সঞ্চারে আসি লোহার মন্দিরে পশি
দংশিলেক কাল নাগিনী।
মান্দাসে ভাসিয়া গেল মৃতপতি জিয়াইল
সুরপুরে করিল মেলানি ॥
তাহা দেখি চাঁদো রাজা করিল পদ্মার পূজা
লখাই বেহুলা স্বর্গবাসী।
সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত
বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি ॥
এ সব অপূর্ব গীত যেই শুনে একচিত
ধনপুত্র সিদ্ধ পুরে আশ।
পদ্মাপদ পঙ্কজে পুট চাটু করি ভূজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস ॥

চাঁদ সদাগরের যাত্রা-প্রসঙ্গে নদীপথের বৃত্তান্তে অনেক ভৌগোলিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। রাজঘাট, রামেশ্বর, পরে ধর্মখাল, অজয় নদী, উজানি, শিবানদী ও সাড়াই বা সাখাই, পরে উজানি, কাঁটোয়া, ইন্দ্রঘাট, পরে ইন্দ্রানি নদী, আঁবুয়া, ঘুগিয়া, গুপ্তিপাড়া, মীর্জাপুর, ত্রিবেণী, পরে সপ্তগ্রাম। এখানে সপ্তগ্রামের অতি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তখন সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি দশা। সপ্তগ্রামের পরে কুমারহাট, পরে ডাহিনে হুগলি, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকীনাড়া, পরে মূলাজোড়া, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, পরে ডাহিনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর, পরে বামে বাকীবাজার, পরে দেগঙ্গা, নিমাই-তীর্থ, চানক, বুড়লিয়া, রামলাল, আকনা, মাহেশ, খড়দহ, ডাইনে রিষিড়া, বামে হুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাহিনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ, পশ্চিমে ঘুষড়ি, পরে চিতপুর, পরে পূর্বকূলে কলিকাতা, তারপর বেতড়, কালীঘাট, চুড়াঘাট, ধনস্থান, বারুইপুর, পরে তুলিয়ার গাঙ, ছত্রভোগ, বদরিকা কুণ্ড, হাসির গড়, তারপর সাগরসঙ্গম। বোধ হয় কলিকাতার উল্লেখ ইই সর্বপ্রথম।

পদ্মাপুরাণের আর একজন প্রাচীন লেখক নারায়ণ দেব, তিনি আ পরিচয়ে বলেছেন,—

নারায়ণ দেব কহে জন্ম মগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্টবিশারদ॥
শূদ্র কুলে জন্ম মোর সৎ কায়স্থ ঘর।
মোদ্গল্য গোত্র মোর গাঞি গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব মোর, নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্বপুরুষ মোর অতিশুদ্ধ মতি।
রাঢ় তেজিয়া বোর গ্রামেত বসতি॥

—উদ্ধৃত অংশে যে মগধশব্দ আছে, মধ্য-বাংলায় তার অর্থ—হীন, মূর্খ। কে কোন পুথিতে আছে—

বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধরণ।
রাঢ় দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন॥

অন্য কোন পুথিতে পাই—

নারায়ণ দেবের জন্ম হ'ল বঙ্গদেশ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্বগুণ যুত॥

নারায়ণ দেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম, বর্তমানে ময়মনসিংহ জিলায় কিশোর মহকুমার অধীন নসিরুজিয়ান পরগনার ভাড়াইল থানার অন্তর্গত। এখ সেখানে তাঁর বংশধরেরা বসবাস করছেন। তাঁরা নারায়ণ দেব থে আঠারোর পর্যায়ে। চার পুরুষে একশো বৎসর গণলে নারায়ণ দেব আজ থে সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে ছিলেন অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু আসা প্রাপ্ত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে চৈতন্যদেবের বন্দনা পাওয়া যায়। এ মনে হয়, তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ আসামী ভাষাতেও বর্তমান আছে। দরজ জিল লোকে এখনও তাঁর পালা-গান ক'রে থাকে। তারা বলে যে, নারায়ণ দরঙরাজার আড্ডায় পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। এই দরঙরাজা বিখ্যাত রা

নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৪৩ থেকে ১৫৮৪ খৃঃ। এতে ক'রে নারায়ণ দেবের সময় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যেই পড়ে। নিম্নে মৃত্যুকালে লক্ষীন্দরের খেদোক্তি উদ্ধৃত করছি—

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঢ়ী হইলা খণ্ডব্রত ফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর॥
মাও সোনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিবে পরাণি॥
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্রশোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ॥
আমার মরণে মাও হইবে পাগল।
মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে সহর॥
ছয় পুত্রে পাসরিল আমাকে দেখিয়া।
কেমনে ধরাবে দুঃখ মা ঘরে রইয়া॥
খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া।
মায়ে পুত্রে মরিবেক চিতাতে পুড়িয়া॥
চিতা সাজাইবে নিয়া গুড়রীর তীরে।
আমা সঙ্গে পাশবে অগ্নির মাঝারে॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব নাচাড়ী॥

যার জন্ত নীচে আসামী পাঠ দিচ্ছি।—

দিহা—বেহুলা জাগ, উঠা মোর প্রিয়া।
উঠা উঠা প্রাণেশ্বরী কত নিদ্রা যাস।
মোক খাইলা কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস॥
তোর সম অভাগি নাহিকে ক্ষিতিতলে।
অকালত রাড়ী ভৈলি খণ্ডব্রতর ফলে॥

কতজন্মে খণ্ডব্রত কৈলি বহুতর।
সেহি দোষে তোক এরি বাউ লক্ষীন্দর॥
মান সনেকা মোর মরণ শুনিলে।
অগনি জালিয়া মার গাবর অকলে॥
আমার মরণে মার মরিব পুরিয়া
খ্যাতি রাখিবো মাবে সংসার জুরিয়া॥
বিষর জালত লখাই বিনায়ে বচন।
কাল নিদ্রা হৈয়া বেহুলার নাহিকে চেতন॥
কায়া আঙ্গুলীর বিষে ব্রহ্মার ঘার পাইলা।
বেহুলা বেহুলা লখাই ডাকিবে লাগিলা॥
সুকবি নারায়ণ দেবর সরস পাঞ্চালী।
লখাইব করুণা বুলি একষে লেচারী॥

আসামী পদ্মাপুরাণের নাম সুকনাম্নি। শব্দটি আসলে সুকবি নারায়ণী। এক বাঙালী কবিকে আসামীরাও যে নিজের ব'লে সম্মান করেছেন, এটা আমাদের গৌরবেরই কথা। আমরাও মৈথেলী কবি বিদ্যাপতিকে একরকম আমাদের ক'রে নিয়েছি।

আমার এই প্রবন্ধের প্রথমে মধ্যযুগের কাব্যের যে পাঁচটি প্রধান বিষয়-বস্তুর কথা বলেছি, সেগুলির সঙ্গে আরেকটি বিষয়-বস্তুর যোগ হয় চৈতন্যদেবকে নিয়ে। তাঁর অলৌকিক জীবনী সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে। আর একটি প্রধান বিষয়-বস্তুর কথা বলা হয় নি, সেটি পদাবলী। পদাবলী চৈতন্যদেবের পূর্বেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব আর শিক্ষার প্রভাবে এই পদাবলীর অপূর্ব সমৃদ্ধি হয়। এ পর্যায়ে আমরা দুই শতের বেশি পদকর্তার পদাবলী পেয়েছি। বড়ু চণ্ডীদাস ও যশোরাজ খান ভিন্ন সকলই চৈতন্যের সমকালীন বা পরবর্তী। মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি বিষয় ছল অনুবাদ। প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ অনেকে করেছিলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদের পূর্বে কয়েকজন কবি বাংলায় মহাভারত রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীকর নন্দী একজন প্রাচীন কবি। এখন তার সম্বন্ধে কিছু বলছি।

৺দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বলেছেন যে, রবীন্দ্র

রমেশ্বর সুলতান হোসেনশাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের আদেশে
ংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। আর পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের
াদেশে শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন। আমি অনেক বছর
াগে ঢাকার 'প্রতিভা' পত্রিকায় দেখিয়েছিলুম যে, শ্রীকরণ নন্দীর উপাধি
বীন্দ্র পরমেশ্বর। কাজেই তাঁরা দুজন নন। শ্রীকরণ নন্দী নামটি ভুল।
ারপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এ
ম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। শ্রীকরণ নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল
ানের আদেশে প্রথমে সপ্তদশ পর্ব মহাভারত শেষ ক'রে শেষে অশ্বমেধপর্ব
ারম্ভ করেন। অশ্বমেধপর্বের পরীক্ষিতের জন্ম-উপাখ্যান শেষ হবার পূর্বেই
স্তবত পরাগল খানের মৃত্যু হয়। তখন পরাগল খানের উপযুক্ত পুত্র ছুটি
ানের আদেশে কবি অশ্বমেধপর্ব শেষ করেন। কবি মহাভারতের ভূমিকায়
হোসেনশাহ ও পরাগল-খানের প্রসংশায় বলেছেন,—

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরমসুখ্যাতি॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইলন্ত চলিয়া।
চট্টগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি-হরষিত মতি॥

অশ্বমেধপর্বের ভূমিকায় কবি নসরৎ শাহ ও ছুটি খানের প্রশংসা করেছেন।—

নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসেন শাহা তনয় সুমতি।
সাম দণ্ড ভেদে পালে সর্ব বসুমতী॥

তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান।
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া হৈল সন্নিধান॥

* * *

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমর বিজয়ী ছুটি খান মহাশয়॥
আজানু লম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিশাল হৃদয় মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
চতুঃষষ্টি কলায় বসতি গুণনিধি।
পৃথিবীর কল্পতরু সৃজিলেক বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য ধৈর্য গাম্ভীর্য বীর্যের নাহি সীমা॥
কপটের গন্ধ নাহি প্রসন্ন হৃদয়।
রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥

কবি শ্রীকর নন্দী সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) শেষভাগে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন এবং নসরৎ শাহের রাজত্বের (১৫১৯-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম ভাগে শেষ করেন।

মধ্যযুগের নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের সিদ্ধাদের ও রাজা গোপীচাঁদের সম্বন্ধে এক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অনেক চমৎকার কথা বলা যেতে পারে। বোধ হয় হোসেন শাহের সময়ে সত্যপীরের পালা প্রচলিত হয়। এ সমস্ত ছিল মধ্যযুগে সাহিত্যের ধারা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

রাখে কেষ্ট

অকালে মরিছে যারা ডালি দিয়ে নিজেদের আয়ু,
দীর্ঘজীবী করে তারা কতিপয় ভাগ্যবান জনে,
শূন্য "পকেটে"র কলে উদাস বহিতে থাকে বায়ু,
ক্রমেরে করিতে ক্রম এরও এরও রয় বনে।
নিঃস্ব যশোহীন করি সাধারণ অনেক মানুষে,
বিত্তযশে ধনী হয় কেহ কেহ দেখি এ সংসারে,
তুমি জর্জরিত হও বৃথা মন্দ, ঈর্ষার কলুষে—
কেষ্ট যারে করে রক্ষা ইহলোকে কে তাহারে মারে।

প্যাথি-বিভ্রাট

সনাতন সার্বভৌমের একমাত্র কন্যা—ভারতী ;
সারা পল্লীর দুলালী সে,
তারই হ'ল সঙ্কটাপন্ন পীড়া।
পাড়াতেই থাকেন দুঃখহরণ
আয়ুর্বেদরত্ন মহাভিষগশাস্ত্রী ;
তিনিই নিলেন চিকিৎসার ভার।
তাই তো,—সুষুম্না পিঙ্গলা ঈড়া
ত্রিনাড়ী আশ্রয় ক'রে ত্রিদোষজ পীড়া!
চলতে লাগল দীর্ঘ দিন যথাশাস্ত্র চিকিৎসা ;
বটিকা চূর্ণ কষায় আসব
ইত্যাদি সব বিবিধ মহৌষধি।
কিন্তু রোগের মেলে না অবধি,
সে নিত্য চলে বেড়ে।
শাস্ত্রী বললেন,—আছে বটে
চরকে সুশ্রুতে বাগভটে
অসাধ্য ব্যাধিরও শাস্ত্রীয় ঔষধ।
উপস্থিত অবস্থায় প্রয়োজন—
ক'টি নপুংসক ছাগ,
আর যথা-বিধানে করতে হবে তাদের বধ।
তার পর যা যা কর্তব্য
সে সব আমিই করব ;
তোমরা কেবল—
কৃষ্ণপক্ষ পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে,
উত্তরাস্য হয়ে, স্বামী-স্ত্রী একত্রে,
পদ্মপত্রে যে জল
করছে সদাই টলমল,
সেই জল কিছু করবে সংগ্রহ ;

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে কর্ত্তার জন্মগ্রহ,
মিলিয়ে নিয়ে রাশি গণ
যথাযথ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সাজ ক'রে,
ত্রিকটু ত্রিফলা পঞ্চতিক্ত দশমূল
শালপানি বেড়েলা ইত্যাদি
সপ্ততোলা চৌষট্টি মসলা-যোগে,
পরম শুদ্ধাচারে,
যে মহা ভেষজ হবে প্রস্তুত,
তাতেই হবে সুফল ;
আর সে ফল হবে—
অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত !

তত দিন রোগী টিকবে কি না
সে সন্দেহ স্বতই উঠল সনাতনের মনে।
ডাকলেন তিনি—বিলাতী-ডিগ্রীধারী
পশ্চিম পাড়ার ডাক্তার মিস্টার গন্‌এ।
শাস্ত্রীমশায় সুতরাং গেলেন চ'টে,
মনে মনে বললেন,—বটে !
তবে পাড়াপড়শী, আত্মীয়তার স্থান,
আসেন,—নাড়ী দেখে যান।

চিকিৎসা করছেন ডাক্তার গন্
খাঁটি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ;—
মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষান্তে
রোগটা যখন পারা গেল জানতে,
চলল নানা ঔষধ,
প্রলেপ পট্টি বিবিধ ইন্‌জেক্‌শন।
কিন্তু রোগ গেল এমনই বেড়ে
যে ধাতই এল ছেড়ে।

গন্ বললেন,—
হার্টের যা অবস্থা, তাতে
যে ট্যাব্‌লেটে হবে নিশ্চিত ফল,
এক ক্যালিফর্নিয়া আর মস্কৌতে
তার আছে দুটি কল।
এখানকার আমদানি বা প্রস্তুতি দাওয়াই,
বিশ্বাস হয় না ছাই।
ক্যালিফর্নিয়া বা মস্কৌ থেকেই আনা চাই,
যদি হন রাজি,
এয়োপ্লেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি
সব করতে পারি আজই।

অত টাকাই বা কোথায়?
আর রোগীর এমন অবস্থায়
অত দেরি সইবে কি না
স্বতই সন্দেহ হ'ল সনাতনের মনে।
নিরুপায় হয়ে ডাকলেন
ভিন্নপাড়ার হোমিওপ্যাথ একজনে
ডাক্তার গন্ গেলেন খুবই চ'টে;
মনে মনে বললেন,—বটে!
তবে, খবরাখবর নিয়ে থাকেন,
মেয়েটার আর কত দেরি
জনে জনে শুধিয়ে দেখেন।

বন্ধ হ'ল রঙিন দাওয়াই প্রলেপ ইন্‌জেক্‌শন,
চলতে লাগল সূক্ষ্মশক্তি উচ্চ ডাইলিউশন
তুচ্ছ খাঁটি জল।
তাতেই কিন্তু মনে হ'ল একটু-আধটু ফল।
শুনে শাস্ত্রী উঠেন হেসে,
ডাক্তার করেন ব্যঙ্গ;—

এই রোগেতে হোমিওপ্যাথি।
হায় রে কপাল, হাতে ঠেলবে হাতী।
যে কারণেই হোক—
শেষে হাতী কিন্তু নড়ে।
হপ্তা খানেক পরে
ফিরে এল রোগীর নাড়ী,
প্রলাপ ছেড়ে জ্ঞানের কথা কয়,—
পাড়াসুদ্ধ সবাই বলে—
হোমিওপ্যাথির জয়।

এরই ক'দিন পরে আমি এলাম গ্রামে ফিরে।
সকল কথা শুনে দেখতে গেলাম ভারতীরে।
শীর্ণশ্রী শক্তিহারা দেহ,
সদ্য-ফিরে-পাওয়া প্রাণের টাটকা হাসিটুকু
জাগায় বুকে সশঙ্কিত স্নেহ।
মনে হ'ল—
কি বাঁচাটাই বেঁচে গেছে এবার!
এখন শুধু প্রয়োজন এর
সুপথ্যের আর অক্লান্ত সেবার।

বাড়ি ফিরতে পথে হ'ল দেখা,
গঙ্গাস্নান সেরে ভিষগ্‌শাস্ত্রী
ফিরে আসছেন একা।
কথা উঠল ভারতীর ;—
বেঁচেছে, না, ছাই!
মকরধ্বজ দেওয়া ছিল,—তাই।
মাসখানেক—বড় জোর,
তারপরেই দেখতে পাবে
কি যে ঘটে ওর।
নাড়ীতে জ্বর লেগেই আছে ;

ভায়া, নাড়ী বোঝা চাই ;
ইনি উনি যিনিই হোন না
নাড়ীজ্ঞান তো নাই।
নমস্কার ক'রে যাচ্ছি চ'লে,
দেখি—চলেছেন ডাক্তার গন্
জরুরী এক 'কলে'।

আমায় দেখে বললেন,—কবে এলেন ?
সনাতনের মেয়ের কথা
বোধ হয় শুনেছেন ?
আহা, মেয়েটাকে কোঅ্যাক ডেকে
মেরে ফেললে ওরা !
আমি তো সব দেখছি আগাগোড়া,—
ভিটামিনের অভাবে সব শুকিয়ে দিলে টিস্থ ;
এখন যত পিপু এবং ফিস্থ
বলছে—মেয়ের রোগ গিয়েছে সেরে !
ফুঃ,—গেছেই যদি সেরে,
এক হপ্তার উপর হ'ল
ভাত খাচ্ছে, দুধ খাচ্ছে,
উঠল না কই বেড়ে ?
সেই যে গোড়ায় দেওয়া ছিল ভি-ডি ইন্‌জেক্‌শন,
তাই এখনও টিকে আছে ;
কিন্তু,—কতক্ষণ ?

ঘরে ফিরে উঠল মনে নানা কথার ঢেউ।
মেয়েটা যে বেঁচে আছে, হয়তো বেঁচে গেছে,
কি কবিরাজ কি ডাক্তার
খুশি নয়কো কেউ।
দুজনাতেই চাইছে ওরা বাক্যকায়মনে
হোমিওপ্যাথির বাঁচা রুগী
মরবে কতক্ষণে ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত'

[শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি, সুতরাং মাত্রাজ্ঞান-বিরহিত। একটি সামান্য মশা মারিবার জন্য তিনি মারাত্মক কামান দাগিয়াছেন। যে ব্যক্তি বি. এ. ডিগ্রী মাত্র সম্বল করিয়া নিজেকে বার বার পি. এইচ-ডি. উপাধি ভূষিত করিতে লজ্জিত হন না, বাংলা সাহিত্যে গবেষণার নামে যিনি অনবরত যাহা-খুশি-তাহাই লিখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহার বিপুল গ্রন্থাবলী আথমাড়াই-কলে নিংড়াইলেও ছোবড়া ছাড়া কিছুই বাহির হইবে না। তাঁহার একটি "রাবিশে"র প্রতিবাদে ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদের আট পৃষ্ঠা নষ্ট করিবেন, ইহা আমরা পছন্দ করি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তি এই যে, নিরীহ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সর্বনাশ যাহাতে না ঘটে (ঐ পুস্তক পাঠে), তাহার ব্যবস্থা করাও তো সামাজিক কর্তব্য। এই যুক্তি মানিয়া লইয়াই এই "প্রসঙ্গ" পত্রস্থ করিতেছি। পাগলা-গারদের রোগীকে আয়ত্তে রাখা যাঁহাদের কর্তব্য, তাঁহারা যদি সে কর্তব্য পালন না করেন, তখন জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সতর্ক করিয়া দিতেই হইবে। তাহা ছাড়া, ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ পাঠে দেখিতেছি, এই ব্যক্তির পাগলামির মধ্যে ঘোরতর মতলববাজিও আছে। আমরা ইঁহার পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা মাত্র পড়িয়া পাণ্ডিত্যের যে নমুনা দেখিলাম, তাহাতে আর অগ্রসর হইতে পারি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু নমস্য ব্যক্তি, তিনি পরহিতায় বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় এই মহাগবেষক লিখিতেছেন :

"তবে কি বাঙ্গালী নাটক লিখিতে জানিতেন না? তা নয়, কিন্তু পূর্বে নাটক লিখিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। জয়দেবের মধুর সঙ্গীত 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বরনারী' 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' প্রভৃতিই কেবল সর্বত্র শ্রুত হইত না…"

ভদ্রলোক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কখনও চোখেও দেখেন নাই, কানেও শুনেন নাই, অথচ পাণ্ডিত্যের লোভটুকু ষোল আনা আছে। "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" এ দেশের শিশুতেও জানে। ইনি জয়দেবকে চেনেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মারফৎ। স্বামী সত্যানন্দ জয়দেবের পংক্তিটি একটু বিকৃত করিয়া "বনমালী" স্থলে "বরনারী" ব্যবহার করিয়া অন্যান্য সন্তানদিগকে সংজ্ঞাহীনা কল্যাণীর সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন। "বরনারী"টি

সম্ভবত গবেষকের বড় মিঠা লাগিয়াছিল, তাই মূল "বনমালী"কে খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। গবেষণাকার্যে এই বিকৃতবুদ্ধিই তাঁহাকে বরাবর চালিত করিয়াছে, এই কারণে আমরা দীর্ঘকাল তাঁহাকে হিসাব হইতে বাদ দিয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু আবার নূতন করিয়া হিসাবের খাতা খুলিলেন, এইখানেই আমাদের আপত্তি।—স. শ. চি.]

সম্প্রতি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত' নামে ১৯২ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন :— "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপকের গৌরবময় আসন দিয়া নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যে সুযোগ দিয়াছেন এই গ্রন্থ রচনার সে সুবিধাও কম নয়।" বিশ্ববিদ্যালয়ের "গিরিশ-লেকচারারে"র গবেষণা কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব। না দিয়াও বোধ হয় উপায় নাই ; তাঁহার ন্যায় গবেষক স্বকীয় গ্রন্থের বহু স্থলে আমাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন ; আমার একমাত্র অপরাধ বোধ হয় এই যে, আমি একখানি 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' রচনা করিয়াছি। হেমেন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ কতটা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহার বিচারের ভার সুধীজনের উপর দিয়া আমার বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

"প্রথমাভিনীত বাংলা নাটক" : হেমেন্দ্রবাবুর মতে, রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'ই* "প্রথমাভিনীত বাঙ্গলা নাটক—প্রথমে ইহার অভিনয় হয় ১৮৫৬ খ্রীঃ।...'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে তিনি [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] যে তারিখ দিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক" (পৃ. ২৬, ৬৫)।

১৮৫৬ সনে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনয়ের কথা প্রথমে প্রচার করেন— মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় ('মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', ১ম সং, ১৮৯৩ দ্রষ্টব্য)। হেমেন্দ্রবাবু ও আরও কেহ কেহ এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র ; ভাবিয়া দেখেন নাই যে, স্মৃতিকথায় বর্ণিত ঘটনার তারিখ নির্বিচারে গ্রহণ করিলে অনেক সময়ই বিভ্রমে পড়িতে হয়। হইয়াছেও তাহাই। প্রকৃতপক্ষে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক

* হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে সর্বত্র (অন্ততঃ ১২ বার) নাটকখানির নাম 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' মুদ্রিত হইয়াছে। 'চা-কর দর্পণ নাটক'ও সর্বত্র 'চাকর দর্পণে' পরিণত হইয়াছে। এরূপ মুদ্রণে অর্থান্তর হয় কিনা বিবেচ্য।

প্রথম অভিনীত হয়—১৮৫৭ সনের মার্চ মাসে, নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাটীতে (১৮৫৬ সনে নহে)। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়; তাহারই উল্লেখ করিয়া সহযোগী 'হিন্দু পেট্‌রিয়ট্' ১৮৫৭, ১৯এ মার্চ লেখেন :—

"*Friday, the 13th March*....The **Educational Gazette** states that the well-known farce of Koolino Kooleshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success. We are glad to see these **new pieces** acted."

সমসাময়িক সংবাদপত্রের এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। হেমেন্দ্রবাবুর অবগতির জন্য জানাইতেছি, যে-গৌরদাসের স্মৃতিকথা অবলম্বনে তিনি ১৮৫৬ সনে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন, সেই স্মৃতিকথার ঐ ভ্রমাত্মক অংশ পরবর্তী কালে (৩য় সং, ১৯০৫†) বর্জিত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে :—

The credit of organizing the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayram Bysack...who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house, on which was formed, in MARCH 1857, the sensational Bengali play of *Kulin Kula Sarvasva*.

এই তারিখের সহিত 'এডুকেশন গেজেটে' প্রদত্ত অভিনয়কালের হুবহু মিল আছে।

হেমেন্দ্রবাবুর মতে, 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র "পরে অভিনীত হয় নন্দকুমার রায় অনূদিত শকুন্তলা নাটক" (পৃ. ৪১)। প্রকৃতপক্ষে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র দেড় মাস পূর্বে, ১৮৫৭ সনের ৩০এ জানুয়ারি, শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য; তিনি লেখেন :—"প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকসপিয়র নাট্যক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্যক্রীড়া চেষ্টা করেন নাই।" এই উক্তিও প্রমাণ করে যে, শকুন্তলাই "প্রথমাভিনীত বাংলা নাটক"; ইহার পূর্বে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' বা অন্য কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নাই।

'মায়া-কাননে'র প্রথমাভিনয়-কাল: হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন

† মৃত্যুর (ইং ১৮৯৯) অব্যবহিত পূর্বে, গৌরদাস ৩য় সংস্করণ মাইকেল-জীবনীর জন্য তাঁহার স্মৃতিকথাটি সংশোধন করিয়া গিয়াছিলেন, এরূপ মনে করাই সঙ্গত হইবে।

পৃ. ৬৫) :—"বেঙ্গল থিয়েটারে মায়াকানন অভিনীত হয় ১৮৭৩, ৩০শে আগষ্ট।"* এই তারিখের সমর্থনে তিনি যে পাদটীকাটি দিয়াছেন তাহা এইরূপ :—" 'মধুসূদন দত্ত' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখিয়াছেন 'মায়া-কানন' ১৮৭৪ এপ্রিল মাসে প্রথম অভিনীত হইয়াছে ইহা ভ্রমাত্মক। নাট্যাচার্য্য অমৃত বসুর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য—পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৩২, ১৩৩ পৃ.।"

আমরা 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্যায় সযত্নে পাঠ করিয়াছি, তাহার কুত্রাপি হেমেন্দ্রবাবু-প্রদত্ত 'মায়া-কাননে'র অভিনয়-কাল "১৮৭৩, ৩০শে আগষ্ট" খুঁজিয়া পাই নাই। প্রকৃতপক্ষে 'মায়া-কাননে'র প্রথমাভিনয়-কালে আমি কোন ভুল করি নাই। অভিনয়ের পূর্বদিন 'ইংলিশম্যানে' যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে :—

The Bengal Theatre.—...Next Saturday, Maya Kanan, or the Enchanted grove, the posthumous production of the late Michael Modusudan Datta, will be produced. (17 April 1874)

ইহার পরের সপ্তাহে (২৫এ এপ্রিল) 'মায়া-কাননে'র "দ্বিতীয় অভিনয়" হয়, ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে তাহার উল্লেখ আছে।

তারিখ-নির্ণয়ে ঔদাসীন্য : হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের সর্বত্র সঠিক তারিখ নির্ণয়ের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াছি। ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) 'কীর্ত্তিবিলাস নাটকে'র প্রকাশকাল সম্বন্ধে তিনি বলেন (পৃ. ১০, পাদটীকা) :—"প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় ১৮৫১ সালের উল্লেখ আছে।" 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই নাটকের এক খণ্ড আছে, তাহার আখ্যা-পত্রে কেবলমাত্র "১২৫৮ সাল" মুদ্রিত আছে। হেমেন্দ্রবাবু কোথা হইতে "১৮৫১ সাল" পাইলেন ?

(২) হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে (পৃ. ৪২) আছে :—"১৮৫৪ সালে Captive Lady প্রকাশ।" বইখানির নাম—*Captive Ladie*; প্রকাশকাল—"মাদ্রাজ, ১৮৪৯"।

---

* হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার 'গিরিশ-প্রতিভা'য় (পৃ. ৫৭৭) 'মায়া-কাননে'র প্রথমাভিনয়-কাল আবার "৫৩এ আগষ্ট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) তাঁহার মতে রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু-তারিখ "১৮৯৪ সালের ৫ই মার্চ" (পৃ. ১৭৬)। আমাদের তো "১১ই মার্চ" বলিয়াই জানা আছে।

* * *

কিন্তু এ তো গেল হেমেন্দ্রবাবুর বিচারবুদ্ধিহীনতা ও ঔদাসীন্যের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন। এবার যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা চিরদিন তাঁহার গবেষণা-গরিমার কলঙ্কস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ: গিরিশচন্দ্রের চরিতকারগণ বলেন "রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। শিল্পী গিরিশচন্দ্রের হস্তে এই ছন্দ যে সার্থক ও সুন্দর হইয়াছিল, ইহা সর্বজন বিদিত; কিন্তু তিনি এই ছন্দের প্রথম প্রবর্তক নহেন। আমি 'শনিবারের চিঠিতে'ই ইতিপূর্বে (অগ্রহায়ণ ১৩৫২) দেখাইয়াছি যে, অভিনয়-সৌকর্যার্থে বাংলা নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথম এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নামে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচন করেন; তিনিই বাংলা নাটকে—কাব্যেও বটে—ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক।

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' একই বৎসরে, ১২৮৮ সালে, প্রকাশিত হইলেও, অভিনয় ও পুস্তক-প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী:—

পুস্তক-প্রকাশকাল	অভিনয়-কাল
'হরধনুর্ভঙ্গ'...২৮ জুলাই ১৮৮১	২৮ জুলাইয়ের পূর্বে বেঙ্গলে অভিনীত
'রাবণবধ' ... ৫ নবেম্বর ১৮৮১	৩০ জুলাই ১৮৮১

১৮৮১, ২১এ মে 'আনন্দ রহো' অভিনীত হইবার অব্যবহিত পরেই গিরিশচন্দ্রের মনে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাব্যতার কথা উদিত হয়; ইহারই দুই মাসের ব্যবধানে 'রাবণবধ' রচিত হইয়া ৩০এ জুলাই (অর্থাৎ রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশের দুই দিন পরে) প্রথম অভিনীত হয়। ভক্ত হেমেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে আভিনয়িক ছন্দের প্রথম প্রবর্তক-রূপে দেখিতে ইচ্ছুক; তিনি তাই কৌশলী উকিলের ন্যায় বলিতেছেন:—

"দুই মাসের পূর্ব্বে কোন পঞ্চাঙ্ক নাটকেরই পাবলিক থিয়েটারে অভিনয়ই সম্ভব নয়, তাই আনন্দরহোর পরেই দুই তিন মাস রিহার্সেল

দিয়া গিরিশ রাবণবধ নাটক ৩০ জুলাই মঞ্চস্থ করেন।...এই সময়ে রাজকৃষ্ণবাবুর নিজস্ব একটী প্রেসও ছিল—উহার নাম বীণা যন্ত্র। সুতরাং একশত* পৃষ্ঠার পত্যের একখানি বাহ নিজের কথায়ই ৫।৬ দিন লিখিতে ও নিজের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে সর্ব্বসমেত পোনর দিন লাগিতে পারে। আড়াই মাস পূর্ব্ব হইতে রাবণবধ অভিনয়ের কথা ও কবিতার আবৃত্তি সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে, সেই সন্ধানটুকু অবলম্বন করিয়া কোন কবি ও নাট্য-কুশল ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ও মনীষার সহায়তায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বহি বা নাটক বাহির করিতে পারেন তাহা অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। সুতরাং রাবণবধের অভিনয়ের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে প্রবেশকাল হইলেও রাবণবধই যে মৌলিক এবং নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। আর যাহার নিজের প্রেস আছে সে পুস্তকে প্রবেশকাল আগষ্ট মাসে হইলেও ২৮শে জুলাই তারিখ স্বচ্ছন্দে বসাইতে পারে...।" (পৃ. ১৬২-৬৩)

হেমেন্দ্রবাবুর ওকালতির দাপটে নিরীহ রাজকৃষ্ণ অসাধু ও জুয়াচোরে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু কোন "বিচার সম্পন্ন ব্যক্তি" যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন, "মহাশয়, আপনি তো বলিলেন 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি লিখিতে ও নিজের প্রেসে মুদ্রিত করিতে রাজকৃষ্ণের সর্বসমেত ১৫ দিন লাগিয়াছে। কিন্তু তবে যে অনেকটা ফাঁক রহিয়া গেল? ব্রজেন্দ্রবাবু যে বলিতেছেন, নাটকখানি কাশের পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল; ইহা সত্য হইলে, আপনারই যুক্তি অনুসারে পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি পাবলিক থিয়েটারে মহলা দিতে অন্তত দুই মাস সময় লাগিয়াছিল, তাহার পর অভিনয়, এবং সর্বশেষে ২৮এ জুলাই নাটক প্রকাশ। এরূপ হিসাব করিলে তো গিরিশচন্দ্রের প্রাধান্য বজায় থাকে না। তাহার কি করিতেছেন?" হেমেন্দ্রবাবু যে কথাগুলা ভাবেন তাই তাহা নহে। তিনি আসল কথাটি সজ্ঞানে গোপন করিয়া নির্লজ্জভাবে এই যুক্তি দিয়াছেন :—

(১) "ব্রজেন্দ্রবাবু কতকগুলি অবান্তর অনুমানের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ভর করিয়া আরও বিচারশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে রাজেন 'হরধনুর্ভঙ্গে'র প্রকাশকালের পূর্বে উহা বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত

* এক শত পৃষ্ঠার নহে;—৮০+১২০ পৃষ্ঠার।

হইয়াছিল, ইহা নিতান্তই অলীক ও কাল্পনিক কথা।...নাটকের প্রকাশ-কালের পূর্ব্বে অভিনয় হইয়া থাকিলে নাটকে এই বিষয়ে উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার—নিশ্চয়ই থাকিত।" (পৃ. ১৬৪, ১৬৬)

(২) "৺রাজকৃষ্ণ রায় তখন [১৮৮১ সনে 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশকালে] কোন থিয়েটারের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তখন তিনি নং নাট্যকার।" (পৃ. ১৬৫)

(৩) "বস্তুতঃ প্রহ্লাদচরিত্রের পূর্ব্বে (১৮৮৪), বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণবাবুর কোন নাটক অভিনীত হয় নাই।" (পৃ. ১৬৬)

হেমেন্দ্রবাবু সত্যনিষ্ঠ হইবেন, ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। দুঃখের সহিত তাঁহার তিন দফা "প্রলাপোক্তি"র প্রতিবাদ করিয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি। পাঠকগণ মিলাইয়া পড়ুন :

(১) হেমেন্দ্রবাবু গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাদিও আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।" কিন্তু তিনি যদি পরিষদে রক্ষিত মূল 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানির আখ্যা-পত্রের প্রতি নেত্রপাত করিতেন তাহা হইলে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত—"বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত" কথাগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার নজরে পড়িত। অর্থাৎ নাটকখানি প্রকাশের পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠকের জন্য আখ্যা-পত্রটি নকল দিলাম :—

হরধনুর্ভঙ্গ / পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য। / .... / শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত / **বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত** / কলিকাতা / ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া যাবাযন্ত্রে / শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে / শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / ১২৮৮ /

(২) ১৮৮১ সনে 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশের সময় রাজকৃষ্ণ "নবনাট্যকার" ইহা (হেমেন্দ্রবাবুর ভাষায়) "অলীক ও কাল্পনিক কথা।" যখন গিরিশচন্দ্রে কোন নাটকই প্রকাশিত হয় নাই, তখন রাজকৃষ্ণের একাধিক নাট্যও প্রচারিত হইয়াছে। 'হরধনুর্ভঙ্গে'র পূর্বে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের নাট্যগ্রন্থগুলি প্রকাশকাল সহ তালিকা :—

১।	পতিব্রতা (নাট্যগীতি) ...	৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫
২।	নাট্যসম্ভব (উপরূপক) ...	১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬

৩। অনলে বিজলী (নাটক) ... ৭ এপ্রিল ১৮৭৮
৪। দ্বাদশ গোপাল (প্রহসন)... ১১ জুলাই ১৮৭৮
৫। লৌহকারাগার (নাটক) ... ২৮ জানুয়ারি ১৮৮০
৬। তারকসংহার (নাটক) ... ২০ জুলাই ১৮৮০

'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশকালে রাজকৃষ্ণ "কোন থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন " বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। রাজকৃষ্ণের সুহৃৎ ও একদা-সহকর্মী চন্দ্র দেব এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট বে মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার প্রথম নাটক 'অনলে-বিজলী'। তিনি চেষ্টা করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির ্যক্ষগণের দ্বারা উহার অভিনয় করাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উক্ত ভূমির সহিত তাঁহার সম্পর্ক আরম্ভ হয়।...রাজকৃষ্ণবাবু বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য :ম-নাট্যসম্ভব, দ্বাদশ গোপাল, লৌহকারাগার, বিক্রমাদিত্য, হরধনুর্ভঙ্গ ও :মের বনবাস রচনা করেন।...রামের বনবাসের অভিনয় কিছু বেশী দিন চলে, সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে 'তরণীসেন বধ' লিখিয়া দেন। বাল্মীকি রামায়ণ', ৪র্থ সং: জীবনী)

(৩) ১৮৮৪ সনে প্রহ্লাদচরিত্রের পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণের ান নাটক অভিনীত হয় নাই—ইহাও (হেমেন্দ্রবাবুর ভাষায়) "প্রলাপোক্তি"। হ্লাদচরিত্রে'র পূর্বে রাজকৃষ্ণের অন্তত আটখানি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে ারবে অভিনীত হইয়াছিল; যে-কেহ রাজকৃষ্ণের মূল গ্রন্থগুলি দেখিয়া দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। নাটকগুলি :—

১৮৭৬ : নাট্যসম্ভব
১৮৭৮ : অনলে বিজলী; দ্বাদশগোপাল।
১৮৮০ : লৌহকারাগার
১৮৮১ : হরধনুর্ভঙ্গ
১৮৮২ : রামের বনবাস
১৮৮৪ : যদুবংশধ্বংস
রাজা বিক্রমাদিত্য।

সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে কৃত প্রমাদের ভূরি ভূরি নিদর্শন এই পুস্তকের সর্বত্র ইয়া আছে। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিবার ধৈর্য আমার নাই— ধ হয় আর তাহার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রাচীন বাংলা-লেখকগণ"

চৈত্রের (১৩৫৪) 'শনিবারের চিঠি'তে বন্ধুবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লা সাহেবের "প্রাচীন বাংলা-লেখকগণ" প্রবন্ধটি পড়িলাম। প্রবন্ধের বিষ যৎসামান্য আলোচনা-প্রয়োজন। শহীদুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছেন, "সেন রাজা সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। যাতে ক'রে পরে বাংলা সাহিত্যে এক নূ ধারা এসে জোটে। সেটি হচ্ছে ধর্মপূজার প্রবর্তন।" এ কথাটা নূতন, কি কথাটা ঠিক নয়। ধর্মরাজ-পূজার প্রবর্তন হয় পাল-রাজাদের সময়ে। পা সম্রাট প্রথম মহীপালের সময়েই ধর্মরাজ-পূজা প্রবর্তিত হয়, এ কথা জোর করি বলা চলে। দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী ভূমিপাল রাজেন্দ্র চোল ঈশাই অব্দ ১০ দশ শত চব্বিশে বাংলা আক্রমণ করেন। তিনি মেদিনীপুর দাঁতনের রা দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপালকে যুদ্ধে নিহত করেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বং গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। খুব সম্ভব উত্তর রাঢ়ের মহীপা সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া যান। পালসম্রাট প্রথম মহী —"অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য গৌড়েশ্বর" গৌড় হারাইয়া রাঢ়ের বনময় প্রদে মুর্শিদাবাদের গয়েসপুর অঞ্চলে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁ রাজ্যাভিষেকও এই নূতন রাজধানীতেই হয়। নিভৃতে বলসঞ্চয় কা পরে তিনি হৃতরাজ্য পুনরাধিকার করেন। দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল মহীপালের ভা বিপর্যয়ের সুযোগে অজয়তীরবর্তী প্রাচীন ত্রিষষ্টী গড় বা ঢেকুর গড় বা সু প্রাচীন রাজধানী (শ্যামারূপার গড়) অধিকারপূর্বক সেখানে এক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ঢেকুরের রাজা তখন কর্ণসেন। বাণভ হর্ষচরিতে ইঁহারই পূর্বপুরুষ দেবসেনের কথা উল্লিখিত আছে। যিনি "দেবর রক্তা মহিষী দেবকীর বিষচূর্ণচুম্বিত কর্ণোৎপলে" মৃত্যুবরণ করিয়াছিলে সুহ্মের দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত এক সময় ইঁহাদের রাজধানী ছিল। ধর্ম কর্ণসেনের রাজ্যে যাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, তাঁহার নাম সোম ঘো রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে ধর্মপালের মৃত্যু হইলে সোম ঘোষের পুত্র ই ঘোষ সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে কর্ণসেনকে তাড়াইয়া দেন এবং নিজে ঢেকু রাজা হইয়া বসেন। কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন মহীপালের সহায়তায় ইছাইকে বধ করিয়া পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। কর্ণসেন বাঁকুড়া জে

াগড়ে বিবাহ করিয়া সেখানেই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। রামাই
ত ময়নাপুরের অধিবাসী। লাউসেনের সাহায্যের জন্য সামরিক প্রয়োজনে
ন ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন এবং লোয়ার, খয়রা, ডোম, বাগদী, ভল্ল, হাড়ী
তি সেকালের যোদ্ধজাতিকে ধর্মঠাকুরের নামে একতাবদ্ধ করিয়া একটি
ম সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন। সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের
য়ে ধর্মরাজ-ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। রাঢ় দেশ (বীরভূম, বাঁকুড়া,
ান এবং মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরের কতকটা) ভিন্ন সারা বাংলার অন্য
থাও ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

অনেক ধর্মমঙ্গলেই লেখা আছে—"ধর্মপাল রাজা মলো অরাজক দেশ।
মিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ॥" ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের গৌড়যাত্রার কথা
ছ। যাইবার পথে তিনটি স্থানে তিনটি ঘটনা ঘটে। এই তিনটি
নর নামে ধর্মমঙ্গলে তিনটি পালা আছে। প্রথম জলন্দার গড় পালা।
ীয় জামতী পালা। তৃতীয় গোলাহাট পালা। ইহার পরেই গৌড়
খানী। জলন্দা, জামনা বীরভূমের মধ্যে, গোলাহাট মুর্শিদাবাদে ময়ূরাক্ষীর
র। ইহার পরেই গয়েসপুর সেকালের পাল-রাজধানী। পরবর্তী মঙ্গল-
-রচয়িতাগণ সকলেই এই তিনটি পালা রচনা করিয়াছেন এবং তাহার
ই গৌড় রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গয়েসপুরের কথা
ক ভুলিয়া গিয়াছিল। রাজধানী বলিতে গৌড়ই বুঝাইত। কিন্তু পথের
টি স্থানের নাম ও ঘটনা লোকে মনে রাখিয়াছিল। কবিগণ কিম্বদন্তী
য়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিরঞ্জনের উষ্মা বহু পরের রচনা এবং যোজনা।
াদের সময় হইতেই বাংলা রচনার সূত্রপাত হয়। সেনেদের সময়ে কবি
ধবের প্রভাবে বাংলা লেখা সহজসাধ্য হইয়া আসে। ময়ূর ভট্ট, কানা হরি
মানিক দত্ত প্রভৃতি কবি বড়ুচণ্ডীদাসের পূর্ববর্তী। চণ্ডীদাসের রচনা
য়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্বেই বাংলা কবিতার একটা গড়ন
ইয়া গিয়াছিল, ভাষা এবং ছন্দ বেশ মার্জিত হইয়া আসিয়াছিল। বড়ু-
াসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই ইহার পরিচয় রহিয়াছে। "অষ্টাদশ পুরাণানি"
কটি সেন-রাজাদের বহু পরের রচনা। ওই একটি মাত্র শ্লোক দেখিয়া
ন সিদ্ধান্ত করা অন্যায্য। রাজদরবারে বাংলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন
স্মরণ-পরায়ণ রাজা দনুজমর্দন দেব বা রাজা গণেশ, এবং তৎপুত্র যদু বা

জেলালউদ্দীন। পরবর্তী গৌড়েশ্বরগণ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক মাত্র।

মালাধর বসুকে গুণরাজ খান এবং তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত বসুকে সত্যরাজ উপাধি কে দিয়াছিল, অনুসন্ধান আবশ্যক। চণ্ডীদাসের বাংলা ও প্র বাংলার মাঝখানে সঙ্কিস্তর একটা ছিল নিশ্চয়ই। এই স্তরের কবিদের পা প্রয়োজন। মিথিলায় যেমন বিদ্যাপতির, তেমনই বীরভূমে চণ্ডীদাসেরও এ আশ্রয়দাতা ছিলেন, ইঁহার নাম কিপ্তিকন, ইনি হিন্দু ভূস্বামী। কৃত্তিব আশ্রয়দাতা গৌড়েশ্বর যে রাজা গণেশ, সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই নিরা অবশ্য যশোরাজ খান, দামোদর এবং কবিরঞ্জন—ইঁহারা মুসলমান সুলতা আশ্রিত ছিলেন। রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি।
যশোরাজ খান আদি সবে রাজসেবী॥

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র যাহাই বলুন না কেন, কবিরঞ্জন শ্রী অধিবাসী, তিনি পদাবলী-রচয়িতা এবং তাঁহার ছোট বিদ্যাপতি উপাধি ছি এসব কথা ঐতিহাসিক সত্য। শ্রীখণ্ডের ওই রামগোপাল দাস নরহরি নির্ণয় ও রঘুনন্দন শাখা নির্ণয় গ্রন্থে তিন শত বৎসর পূর্বে এসব কথা লি গিয়াছেন। "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ বৈশাখে।" রসকল্পবল্লী গ্রন্থ ১৫৬৫ শকাব্দায় ১৬৪৩ ঈশাই অব্দে রচিত তাহারই কিছু পরে শাখা নির্ণয় রচনা। প্রায় ত্রিশ বৎসরেরও পূর্বে শ্রী ঠাকুর-বাড়ি হইতে শাখা নির্ণয় ছাপানো হইয়াছে। স্বর্গগত দীনেশ মহাশয় যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন, গতানুগতিকভাবে সে সব কথার সম দিন চলিয়া গিয়াছে। নূতন উপকরণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন অনুসন্ধান আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে। শহীদুল্লাহ সাহেবের নিকট আমরা তাহাই প্রত্যাশা করি। চবৈতুহি পাদপূরণ—অন্তত তাঁহার পক্ষে অশোভন।

যশোরাজ খানের পদে পাঠ ভুল হইয়াছে। "কোনে মিলন জোর" হই হইবে "কোলে মিলন জোর", "আধ পদ হেরি" হইবে না, হইবে "আধ পদ চ

শ্রীখণ্ডের চক্রপাণি মহানন্দের সঙ্গে চিরঞ্জীব, সুলোচনের উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপা

পোরাণা পকিতী

পণ্ডিত নেহেরু আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া যে বেতার বক্তৃতা াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির শান্তি, ধ, নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইলে সকল দেশেরই একটা moral law-এর ার ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা চালাইতে হইবে।

Morality, Moral law—কথা দুইটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া ঠিন। নৈতিক আচরণ কথাটি দ্বারা হয়তো ইহার যথার্থ ভাব প্রকাশিত তে পারে।

ইংরেজীতে Diplomacy বলিয়া যে শব্দটি আছে, বাংলায় তাহার অনুবাদ রিয়া বলিয়া থাকি কূটনীতি। এই কূট কথাটি দ্বারাই ইহার যথার্থ রূপ াশিত হয়। যাহা কূট, তাহা নৈতিক আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে র না। সত্যকে ইচ্ছা করিয়া গোপন করা, মিথ্যাকে সত্যের আবরণে াইয়া প্রচার করাই কূটনীতি। যাহার সঙ্গে শত্রুতা করিব স্থির হইয়াছে, হার প্রতি কপট প্রেম দেখানো কূটনীতির অঙ্গ। আজ যাহার সঙ্গে মিত্রতা, র্থসিদ্ধির পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার সঙ্গে শত্রুতা কূটনীতির একটি ণিত রূপ।

দেখা গিয়াছে, যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি রাষ্ট্রশাসনের ভার গ্রহণ করেন, ারা ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে হয়তো প্রকৃতই সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ এবং লোক, কিন্তু রাষ্ট্রচালনায় তাঁহারাও কূটনীতির আশ্রয় লইয়া থাকেন। এই া বদ্ধমূল হইয়া আমাদের মনে ক্রিয়া করে যে, রাষ্ট্রনীতিতে নৈতিক রণের স্থান নাই।

সেই মেকিয়াভেলির যুগ হইতে আজ মার্শেলের যুগ পর্যন্ত কূটনীতির কত ণিত রূপ আমরা দেখিলাম! ভারতবর্ষের চাণক্য-নীতি এক কালে হয়তো করী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে নাই। কলিঙ্গ য়ের পর অশোক কূটনীতি বর্জন করিয়া রাষ্ট্রকর্ম নৈতিক আচরণের ভিতেই পরিচালিত করিয়াছিলেন। পালি ভাষায় এই নৈতিক বিধানের ছিল—পোরাণা পকিতী, ইহার অর্থ বোধ হয় চিরাগত চিরন্তন ধর্মনীতি, সর্বকালে সকল ধর্মের সকল শ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করিতে পারে।

মহাত্মাজী এই নৈতিক আচরণের ভিত্তির উপরই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যব প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষণে আমরা সে আদর্শেরই পরিচয় পাইতেছি। মহাত্মাজীর চালনায় যে সংগ্রাম ব্রিটিশ-শাসনে বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহাও নৈতিক আচরণের ভিত্তিতেই চলিতেছিল তাঁহার সেই সত্য-ন্যায়-অহিংসার যুদ্ধে ব্রিটিশ-কূটনীতি পরাস্ত হইয়াছিল, ই ইতিহাসে একটি বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিবে।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই কূটনীতির বিষে কলুষিত না হয়, তাহার জ নেতৃস্থানীয়দের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। কূটনীতির পরিণাম—বিবা বিসম্বাদ, যুদ্ধ। ভারতবর্ষ শান্তিকামী, তাহার পররাষ্ট্র-লোলুপতা নাই, সুতর ভারত-রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কূটনীতির স্থান থাকা উচিত নয়।

এই পোরাণা পকিতীর স্বরূপ লইয়া তর্ক চলিতে পারে না। চিরন্তন সত চিরন্তন নীতিকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

এই পোরাণা পকিতীর একটি মাত্র রূপ লইয়া এখন একটু আলোচ করিব।

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকা উচিত নয়—এ কথা সকলে স্বীক করিলেও কর্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা বিভেদের সৃষ্টি করি রাখিয়াছি। ভারতবর্ষের আদর্শ এই বিভেদের প্রতিকূল। কত দে বিদেশের কত বিভিন্ন ধর্ম-আচরণের লোক আসিয়া এই ভারতবর্ষে এ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতায় তাহার উজ্জ্বল বর্ণনা আ পাইয়াছি—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা-ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলিতেই হইবে। বিশ্বমানবের জন্য একটি বিরাট হিয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই ভারতের রাষ্ট্ররথ পরিচালিত করিতে হইবে। বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবহার এই আদর্শেই পরিচালিত হইতে থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটি গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শুধু বহির্বিশ্বে নহে, আমাদের দেশের অভ্যন্তরেও পোরাণা পাকতীর আদর্শে সমস্ত রাষ্ট্র ও সামাজিক কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ এখন যেমন কদর্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনই হিন্দু-সমাজও অস্পৃশ্যতা-জাতিভেদের বিষে জীর্ণ হইয়া আছে। ইহার উপর নূতন রোগ দেখা দিয়াছে—প্রাদেশিকতা; এই বিভেদ আমাদের জাতীয় শক্তি ক্ষয় করিতেছে। আজ মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ প্রায় লোপ পাইয়াছে। অসততা আমাদের সর্বনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। যেমন ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে, তেমনই সমষ্টিগত সামাজিক জীবনেও আমরা আদর্শভ্রষ্ট হইয়া বর্বর-যুগের মানুষের মত পরস্পরকে প্রতারণা করিয়া, পীড়ন করিয়া, হত্যা করিয়া লাভবান হইবার কুকর্মে রত হইয়াছি। স্বাধীনতা লাভ করিয়াও এই জন্যই অনুভব করিতেছি না যে, সত্যই আমরা স্বাধীন হইয়াছি। দেশময় এই অসততার মহামারী এখনই প্রশমিত করিবার জন্য তেমন কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই। ইহা আক্ষেপের বিষয়। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নেতাগণ যে পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, যতক্ষণ সমাজের অধিকাংশ লোক অসৎ থাকিবে। Grow more food—আরও খাদ্য উৎপাদন কর, এই আন্দোলনের সঙ্গে Grow more honest,—আরও তোমরা সৎ হও, এই আন্দোলনও শক্তিশালী হওয়া উচিত, নহিলে কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

গান

১

ওরে পাখি, এই বসন্তে বাঁধবি কি তোর বাসা ?
হাতছানিতে ডাক দিয়েছে নীড়ের ভালবাসা।
অসীম উদার নীল আকাশে
ঘরের মায়া ছায়ায় ভাসে,
বুকে কি তোর উথ্‌লে ওঠে নতুন সুখের আশা !
ওরে পাখি, এই বসন্তে বাঁধবি কি তোর বাসা ?

দূর সুদূরের সুর কেটেছে কাছের রাগিণীতে,
হঠাৎ যেন লাগছে ভাল পরম পরিচিতে।
(ও তুই) পড়বি বাঁধা প্রেমের ডোরে
খবর যে তার হাওয়ায় ওড়ে,
গড়ার টানে হার যে মানে ভাঙন সর্বনাশা।
ওরে পাখি, এই বসন্তে বাঁধবি কি তোর বাসা ?

২

ওরে নীড়হারা পাখি,
অসীম শূন্যে কোথা পাবি ঠাঁই আসে কালবৈশাখী।
কার অভিশাপে ভেঙে গেল ঘর,
ক্লান্ত পাখাই শুধু নির্ভর—
ভগ্ন কুলায়ে প্রিয়-আহ্বান এখনো শুনিস নাকি !
ওরে আশাহত, ওরে দিশাহীন, ওরে নীড়হারা পাখি।

ওরে পাখি, ওরে আশ্রয়হারা, সুমুখে দীর্ঘ পথ,
নিবিড় তিমির আবরিয়া আছে অন্ধ ভবিষ্যৎ।
শুধু উড়িবার নিয়তি যে তোর—
কেন আর পায়ে বাঁধা মায়া-ডোর—
সব পথ তোর রুদ্ধ হ'ল রে এক পথ শুধু বাকি,
শেষ আশ্রয় আশ্রয় কর্ ওরে নীড়হারা পাখি।

৩

সহজ কি তা সবাই জানে, কঠিন আ
আমার) মন যে কোথায়, সেই কথাটাই ভা
আপনাকে তাই ছিঁড়ে
খুঁজে খুঁজে প্রায় দেখি
হাত ধ'রে যে চালায় মোরে লুকিয়ে থা
সহজ কি তা সবাই জানে, কঠিন আমি

নিজের ভিতর লুকে
আর কতকা
আঁধার ভয়ে পালি
সূর্যি ওঠে যে

আলোর কমল ফোটা বু
মনের ধাঁধা যাবে চুকে
বাহিরে তুই প্রকাশ পাবি মনের খাঁচা
সহজ কি তা সবাই জানে, কঠিন আমি

আহ্বান

প্রভাতের তোরণ-দুয়ারে,
জাগো যাত্রীদল,
চলিষ্ণু শিখায় কাঁপে
প্রত্যূষের ধূসর
আঁধার বেদনাবিদ্ধ
—আলোকের
হঠাৎ হাওয়ায় কাঁপে
তন্দ্রায়িত নীড়
অস্ফুট কাকলী-রব
থেমে যায় দারুণ

আহ্বান

সমুদ্রের সর্পায়িত ঢেউ
শুভ্র ফণা হানে শূন্যতায়,
আকাশের স্তব্ধ বেদনায়
প্রত্যূষের ত্রস্ত প্রত্যাঘাত।
অসীম বিস্ময়ে জাগে
মুহূর্তের কম্পিত হৃদয়,
বিস্মরণ ভিক্ষার সময়
হ'ল আজ, জাগো যাত্রীদল।
বন্দরের একান্ত সীমায়
বাণিজ্যের ভরাডুবি শেষ,
বৈশাখীর উড়ন্ত পাখায়
বৈদগ্ধ্যের আসিছে সংবাদ।

জাগো যাত্রীদল,
সঙ্গীতের কাল এ তো নয়,
চূর্ণ কর মৃদঙ্গ তোমার,
পদধ্বনি-ছন্দে কর লয়
নিশীথের অস্থায়ী বিলাপ।

ঝড় এল মেঘের পাখায়,
রাঙা ধূলি উড়িছে চঞ্চল,
ছিন্নভিন্ন বিজয়-নিশান,
তোরণের দ্বার ভেঙে যায়,
জাগো যাত্রীদল।

শ্রীআরতি রায়

পদচিহ্ন

অমূল্যের স্ত্রীর আত্মহত্যার প্রয়াস যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই বীভৎস।

গোয়াল-ঘরের মধ্যে অন্ধকারে নির্জনে ব'সে গরুর জন্য খড়-কাটা বঁটি দিয়ে কাটবার চেষ্টা করেছে, বেশ খানিকটা কেটেও ফেলেছে, খাদ্যগ্রহণের টা প্রায় সম্পূর্ণ ই কেটে গিয়েছে, তারপর আর পারে নি, প্রচুর রক্তস্রাবের ছটফট ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল গোবর এবং চোনার মধ্যে। স্থানীয় ারখানার ডাক্তারটি তরুণ ও দুঃসাহসী, তিনি কাটা নলীটিকে ক্ষিপ্রতা এবং ধীরতার সঙ্গে জোড়া দিয়ে সেলাই করলেন, এবং রোগিণীকে খানি তক্তার উপর শুইয়ে তার সঙ্গে বেঁধে দিলেন, যাতে না নড়তে পারে।

কালীর বউ শিউরে উঠলেন তার অবস্থা দেখে। মনে প'ড়ে গেল, ছিন্নমস্তা পর কথা। ডাক্তার তাঁকে দেখে বললেন, আমার যা করবার, আমি লাম। এখন আপনার হাত। দেখবেন, কোন রকমে যেন এতটুকু না ড়। আর জ্ঞান হওয়ার পর যেন কোন রকমে উত্তেজিত না হয়। এ কাজ পনি যদি পারেন, অন্য কেউ পারবেন ব'লে মনে হয় না।

কালীর বউ ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, আমি পারব?

ডাক্তার বললেন, আপনি পারবেন। আপনাকে আমি দু দিন দু ক্ষেত্রে খলাম। বিশ্বেশ্বরী ব'লে মেয়েটি পুড়ে মরল—সেদিন দেখেছি, চারু বিষ য়েছিল—সেদিনও দেখেছি। আপনি পারবেন।

কালীর বউ বললে, আজ কিন্তু ভয় হচ্ছে।

ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে মা?—বলতে বলতে এগিয়ে এল অমূল্যের দিদি। সাথে তার রূঢ় ক্রোধের দীপ্তি ঝকমক ক'রে উঠল। এগিয়ে এসে তাঁর মুখের াছে মুখ এনে নিষ্ঠুরভাবে বললে, এ সব তোমার কীর্তি, তোমার কীর্তি। াজ ভয় পেলে চলবে কেন মা? বসতে হবে তোমাকে। যদি মরে, তাহাকে দায় পুরোতে হবে।

মণিভূষণ এসে ধমক দিয়ে উঠল, এই শৈল! শৈল!

শৈল ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে মণিভূষণের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতই র্জন ক'রে উত্তর দিলে, কি?

কাকে কি বলছিস? বেরিয়ে আয়। চুপ কর্।

শৈল ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কেন? চুপ করব কেন?

মণিভূষণের চোখ ক্রোধে প্রখর হয়ে উঠল, স্থির গম্ভীর স্বরে মণিভূষ
বললে, শৈল! মণিভূষণের এ দৃষ্টি এবং এ কণ্ঠস্বরকে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী
সকলেই ভয় করে। শৈল বেরিয়ে এল, কিন্তু কথা বলতে ছাড়লে না
বললে, আমি চুপ করছি, আমাকে চুপ করতে হবে বইকি। আমি
কুলীনের মেয়ে, আমি যে তোমাদের গলার কলসী। আমার যদি আব
রোজকেরে স্বামী থাকত, গায়ে গয়না থাকত, তবে কে আমাকে চুপ করে
বলত, দেখতাম।

সে কেঁদে ফেললে, কাঁদতে কাঁদতেই আবার বললে, আমি বললেই দোষ
তোমরা বললে দোষ হয় না। তোমরা যে মাতব্বর, জমিদার; থানা-পুলি
যে তোমাদের হাত-ধরা।

মণিভূষণ আবার ধমক দিয়ে উঠল, শৈল!

শৈল বললে, কেন? শৈলকে চোখ রাঙাবে কেন? বল নি, তোম
নিজেরা বল নি, ও কাশীর বউই গাঁয়ের আপদ হয়েছে—ওকে তাড়াতে হ
গাঁ থেকে? বল নি?

মণিভূষণ নেমে এল ঘরের দাওয়া থেকে, তার স্থির দৃষ্টি শৈলর উপ
আবদ্ধ, মুখ রূঢ় কঠোর, চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রখর দৃষ্টি। সম্ভবত
রাগে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু তা
বাধা দিতে কারও সাহস হ'ল না। এক বাধা দিতে পারতেন অমূল্যের
মণিভূষণের জ্ঞাতিদিদি হ'লেও তিনি তার মায়ের বয়সী, এই পরিবারটি
মধ্যে সর্বজনমান্যা। কিন্তু তিনি পুরানো রোগে মৃত্যুশয্যাশায়িনী, দীর্ঘদি
ধ'রে বিছানায় প'ড়ে আছেন, চোখের দৃষ্টি নাই, কানেও শোনেন না, সম্ভব
যন্ত্রণাবোধশক্তিও বিলুপ্ত হয়েছে।

শৈল চীৎকার ক'রে উঠল, এস, এস, কি করবে কর। দেখি।

ঠিক এই মুহূর্তে এসে ঢুকলেন রজনী-ঠাকরুণ—বিশ্বেশ্বরীর মা। বিশ্বেশ্বরী
মৃত্যুর পর তিনি গিয়েছিলেন গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুরে। সঙ্গতি নাই, কা
বৃন্দাবনে যেতে পারেন নি, বিশ মাইল দূরবর্তী গঙ্গাতীরের এই পুণ্যতী
গ্রামখানিতে কয়েকদিনের জন্য সান্ত্বনা লাভ করতে গিয়েছিলেন। ফিরেছে
এই এখনই, গাড়ি থেকে নেমেই সমস্ত শুনে ছুটে এসেছেন। তিনি কিছু
না শুনেও মণিভূষণের গতিভঙ্গী এবং মুখের চেহারা দেখে এবং শৈলর

ংকার শুনে কি ঘটতে চলেছে, এটা সঠিক
ণিভূষণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, মণি
মণিভূষণ চমকে উঠল, রজনীদিদি!
হ্যাঁ। এই এলাম আমি। এসেই শুনল
আঃ, বাঁচলাম দিদি। বউটা হয়তো বাঁচ
রজনী-ঠাকরুণ ম্লান হাসি হেসে বললে
ণই ভাল।
পিছন থেকে শৈল ব'লে উঠল, হ্যাঁ।
লেকারির জোড় মিলবে। বলতে পাবে,
ও, মরেছে।
মণিভূষণ আবার ঘুরে দাঁড়ালে। রজ
ন ওর উপর রাগ করছিস মণি? ওর
সে সাহস নাই, তাই এইভাবে গালাগাল
তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, অ
মাথা হেঁট ক'রে মণিভূষণ বললে, দু
রিয়েছে। শুনছি, সাহাদের দোকানে প'
ঘরের দরজায় এসেই রজনী-ঠাকরুণ অসী
সছ ভাই কাশীর বউ?
কাশীর বউ এরই মধ্যে নিঃশব্দে নিজে
য়ের পাশে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বা
তিটিই পরোক্ষভাবে এসে তাঁকে বিদ্ধ করা
হতভাগিনীর পাশে নীরবে স্থিরভাবে
ল্যের বউয়ের মুখের দিকে। ভাস্ত
ট ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
ছিলেন না।
রজনী-ঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে এক
শুন।
রজনী দেবী কাশীর বউয়ের রিপরীত দি
ল্যের বউকে কিছুক্ষণ দেখে বললেন,

কেন এ কাজ করলি মা? যদি যাস, তুইই তো যাবি। দু দিন পরে সবাই তোকে ভুলে যাবে।

যন্ত্রণায় রোগিণীর হাতে পায়ে আক্ষেপ জেগে উঠল। কাশীর বউ তার একটা হাত একটা পা ধ'রে বললেন, আপনি ওদিকটা ধরুন।

রাত্রি তখন কতটা কে জানে, তবে অনেক রাত্রি। ঘরের মধ্যে জলছি একটা চিমনি। ওটা পাঠিয়ে দিয়েছে পবিত্র। মণিভূষণ আছেন ঘরে তত্ত্বাবধানে, পবিত্র তার নিয়েছে বাইরের। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ওষুধ খানা, গ্রামের গুজব—এ সমস্তের ব্যবস্থা সে করেছে। থানায় খবর দিয়েছে আকস্মিক দুর্ঘটনা ব'লে। পা পিছলে খোলা বঁটির উপর প'ড়ে গিয়ে গলা চোট লেগেছে এই সংবাদ দিয়েছে, ডাক্তারও তাই সমর্থন করেছে।

চিমনির আলোটা জলছিল রোগিণীর মাথার দিকে। রাত্রির প্রথম দিকে ক্লান্ত রজনী-ঠাকরুণ ঘুমিয়ে ছিলেন, কাশীর বউ ব'সে ছিলেন জেগে। ঘুম ভেঙে রজনী-ঠাকরুণ বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, তুমি একটু শোও ভাই কাশী বউ। আমি অনেক ঘুমিয়েছি। বাইরে দেখলাম, রাত্রি বোধ হয় শেষ হ'য়ে এসেছে। সাত ভাইয়ের লেজটা ঘুরে গিয়েছে।

কাশীর বউ শুলেন না। বললেন, ঘুম আমার আসবে না ঠাকুরঝি আপনি বরং শুয়ে পড়ুন। সমস্ত দিনটাই প্রায় পথে এসেছেন।

রজনী-ঠাকরুণও শুলেন না। বললেন, তবে দুজনে গল্প করি। রাত্রি দুপুর পার হয়েছে। দুটো দুঃখের কথা বলি ভাই তোমাকে।

কাশীর বউ একটু হাসলেন।

রজনী দেবী বললেন, তুমি ভাই বড় কম কথা বল। সকল কথাতেই হাস। আগে মনে হ'ত, তোমার বড় অহংকার। বিশুর মৃত্যুর পর থেকে সে ভুল ভেঙেছে। কিন্তু তবু, তুমি চুপ ক'রে থাক, আমি হাঁপিয়ে উঠি, তোমায় যেন নাগাল পাই না।

কাশীর বউ বললেন, ছেলেবেলা থেকেই আমি কম কথা কই ঠাকুরঝি আর—

আর?

আর নিজের দুঃখের কথা ব'লেই বা করব কি? বলবই বা কাকে? বলি মনে মনে ভগবানকে।

রাধাকান্ত মারা গেছে, সে দুঃখ তোমার অনেক। কিন্তু সে তো—। রজনী-ঠাকরুণ চুপ ক'রে গেলেন কিছুক্ষণের জন্ত, তারপর বললেন, কি বলব বুঝতে পারছি না। অদৃষ্ট যদি বলি, তবে তো আমার উঢ়ে কুলীনে বিয়ে ওয়াও অদৃষ্ট, বিশুর উঢ়ে কুলীনে বিয়ে—তাও অদৃষ্ট, বিশুর মিথ্যে কলঙ্ক—গাও অদৃষ্ট, সে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে ম'ল—তাও অদৃষ্ট। এই চারুর কলঙ্ক—তাও অদৃষ্ট, সে বিষ খেলে, বাঁচল—সেও অদৃষ্টের খেলা, তার ফলে স্বামী তাকে নিলে না—সেও অদৃষ্টের লেখা। অমূল্য মাতাল বউকে মারে—সও অদৃষ্ট। সে গলায় ছুরি দিয়েছে—সেও তাই। কিন্তু—

আবার তিনি চুপ করলেন, চুপ ক'রে ঘরের কোণের দিকে শূন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ভেবে যেন তিনি কিনারা পাচ্ছেন না। গঙ্গাতীরে সান্ত্বনা পতে গিয়েও তিনি এই কথাই ভেবেছেন। গঙ্গার ঘাটে ব'সে চলমান জলস্রোতের দিকে চেয়ে এই ভাবতেন। উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট প্রসিদ্ধ শ্মশান। গঙ্গার পশ্চিমে, তিন দিকে বিশ ক্রোশ থেকে এখানে দাহক্রিয়ার জন্ত ব আসে পরলৌকিক-সদ্গতিলাভের জন্ত। সেখানে গিয়েও তিনি ব'সে াকতেন, দেখতেন মৃতের বয়স-বিচার নাই, শিশু মরে, বালক মরে, বালিকা রে, যুবক মরে, যুবতী মরে, প্রৌঢ় মরে, বৃদ্ধ মরে। কিন্তু তবুও এ দিয়েও বশুর মৃত্যুর দুঃখ ভুলতে পারেন নাই, সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পারেন নাই। যখনই ই দেখিয়ে মনকে বোঝাতে গিয়েছেন, তখনই মনের মধ্যে থেকে কেউ যেন লেছে, বিশু যদি রোগে মরত, তবে এ কথা মেনে নিতে পারতাম। ঘরে াগুন লেগেও যদি সে ঘরের মধ্যে পুড়ে মরত, তাও বুঝতাম। এমন কি হঠাৎ দি তার কাপড়ে আগুন লাগত, তাতে সে মরত, তাতেও মেনে নিতাম। ত্যুর কাছে বয়স নাই, এ সত্য। কিন্তু বিশু মৃত্যুকে ডাকলে যে। না ডাকলে প তো আসত না। সে ডাকলে কেন? তবে? যারা দুঃখ দিয়ে তাকে ত্যুকে ডাকতে বাধ্য করলে, তাদের দায়ী না ক'রে তার মন মানবে কেন?—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে রজনী-ঠাকরুণ বলতে গেলেন, সেই সব থাই তো বলব ভাই তোমাকে—। কিন্তু বলা হ'ল না, তিনি আতঙ্কে স্তব্ধ য় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রোগিণীর দিকে। সে চোখ মেলে

তাকাচ্ছে। রক্তহীন চোখের পাণ্ডুর শুভ্রচ্ছদের মধ্যে কালো তারা দুটি এদিক ওদিক ফিরে বুঝতে চাচ্ছে, স্মরণ করতে চাচ্ছে—বর্তমান এবং অতীতকে।

রজনী-ঠাকরুণ ওদিকে কাশীর বউয়ের দিকে তাকালেন। কাশীর বউ ঘুমে ঢুলে পড়েছেন। তিনি ধীরে ধীরে তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, কাশীর বউ লজ্জিত হয়ে সোজা হয়ে ব'সে কাশীর বউ বললেন, একটু ঘুম এসেছিল।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রজনী দেবী আঙুল দেখিয়ে বললেন, তাকাচ্ছে।

কাশীর বউ একটু ঝুঁকে তাকিয়ে দেখে বুঝলেন, জ্ঞান হয়েছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই অমূল্যের বউ অস্পষ্টস্বরে বললে, মরি নি?

কাশীর বউ এবং রজনী-ঠাকরুণ দুজনেই একসঙ্গে কথা ব'লে উঠলেন। রজনী দেবী বললেন, কেন এমন কাজ করলে মা?

কাশীর বউ বললেন, একটু জল খাবে?

ডাক্তারের নির্দেশমত সন্তর্পণে রবার পাইপ দিয়ে খানিকটা দুধ খাওয়ালে কাশীর বউ। তারপর অল্প অল্প প্রায় ফোঁটা ফোঁটা ক'রে খানিকটা জল দিলেন এবং কণ্ঠনালী ভিজিয়ে সরস ক'রে দিলেন। রজনী-ঠাকরুণ এক হাতে বাতাস করলেন, অন্য হাতে কপালে পরম স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হতেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কেন এমন কাজ করলে বউমা?

কপালে ঠেকাবার জন্যই বোধ হয় সে হাত তুলতে গেল, কিন্তু পারলে না। হাত বাঁধা ছিল, অগত্যা কপালে কুঞ্চনরেখা টেনে অস্পষ্টস্বরে বললে, কপাল।

তারপর বললে, কপাল বইকি! নইলে, বিশু আমায় ডাকলে, স্নেহল আমায় ডাকলে, ডেকে, নিলে না কেন? এখনও আমি মলাম না কেন?

থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন রজনী-ঠাকরুণ। বললেন, কি বলছ বউমা?

অমূল্যের বউ বললে, স্বামীর মার খেয়ে জীবনে ধিক্কার হ'ল। অনে কাঁদলাম। ভাতের থালাটা ফেলে দিতে গেলাম গোয়ালে গরুর ডাবা সেখানে—

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ অমূল্যের বউ, সে যেন স্মরণ করছি সে যেন মনশ্চক্ষে দেখছিল। অস্পষ্টস্বরে আস্তে আস্তে বললে, অন্ধকার ঘর এক কোণে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, বউ! আমি দেখলাম, বিশু। কি সুন্দর দেহ, কত রূপ হয়েছে তার! আমি তাকে বললাম, তু

ও? সে বললে, হ্যাঁ। তোমাকে ডাকতে এসেছি। আমি বললাম, তুমি
গা পুড়েছিলে, এমন রূপ কি ক'রে হ'ল তোমার? সে বললে, আমি যে
র্গে এসেছি, এখানে অমৃতকুণ্ডে স্নান করলাম, আমার সব পোড়ার ঘা ভাল
ল, দাগ মিলল, এই রূপ হ'ল। পাপের পৃথিবীতে থেকো না, তুমিও এস,
ামারও এমনই রূপ হবে। অনেক সুখ, অনেক শান্তি এখানে। আমি চুপ
'রে থাকলাম। সে বললে, এই দেখ, স্নেহলতাও তোমাকে ডাকতে এসেছে।
খ তার রূপ। তাকে জিজ্ঞেস কর। বিশুর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল স্নেহলতা,
াকে দেখলাম। কি রূপ, কি হাসি, কি সুখ তার! সেও ডাকলে। বললে,
লে এস। আগুন লাগুক পৃথিবীতে, আগুন লাগুক সমাজে, আগুন লাগুক
র—যে ঘরে অজানা আগুনের জ্বালায় দেহ গেল শুকিয়ে, মন গেল পুড়ে
াক হয়ে। জ্বলুক, সব ধুধু ক'রে জ্বলুক। বললে, তোমার হাতেই দেশলাই
ছে দেখ। লাগাও আগুন কাপড়ে। দেখলাম, সত্যিই আমার হাতে
শলাই। আর আমার ভয় হ'ল না, দেশলাই খুললাম, কিন্তু আমার কপাল—
ক্সে কাঠি ছিল না। আমি বললাম, কাঠি নাই। কি দেশলাই দিলে?
খন এদিক ওদিক চেয়ে বিশু বললে, তবে ওই দেখ, ওই খড়-কাটা বঁটি, ওই
ট দিয়ে কেটে ফেল, গলাটা কেটে ফেল। বঁটির কাছে বসলাম। ওরা
খালে, হাত দিয়ে নেড়ে দেখালে, এমনই ক'রে কাট। আমি কাটলাম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে, আমার কপাল! আমি মরলাম না।
ামার মরণ হ'ল না। বলতে বলতে দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জল
জস্রধারায়।

শুনতে শুনতে কাশীর বউ এবং রজনী-ঠাকরুণ দুজনেই যেন পাথর হয়ে
য়েছিলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রজনী-ঠাকরুণ কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার
খ মুছিয়ে দিলেন। কাশীর বউ পাখাটা তুলে নিতে গিয়ে শিউরে উঠলেন।
ার ক্ষতস্থানে তুলো ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে। তিনি বললেন, আ-
থা ব'লো না তুমি বউমা। না। ডাক্তার বারণ ক'রে গিয়েছেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরই মেয়েটির চোখ বন্ধ হয়ে এল। বোধ হয় ঘুমিয়ে
ড়ল সে।

শেষ রাত্রির গাঢ় স্পর্শে পৃথিবী আচ্ছন্ন। অগণ্য কোটি কীট, যারা রাত্রির
ন্ধকারের মধ্যেও অবিরাম ডেকে চলে, তারাও এ সময়ে স্তব্ধ হয়ে এসেছে।

রজনী-ঠাকরুণও ঢুলে পড়ছেন। কাশীর বউও ঢুলছিলেন। হঠাৎ তিনি চমকে জেগে উঠলেন। কেউ তাঁকে ডাকলে কি? তিনি তাকালেন ঘরে কোণের দিকে। সেখানে কি বিশু এবং স্নেহলতা দাঁড়িয়ে আছে?

থরথর ক'রে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল তাঁর। কিন্তু তাঁর সাহস অপরিসীম মনের স্থৈর্য অসাধারণ। তিনি স্মরণ করলেন ইষ্টদেবতাকে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন চারিদিক। তারপর উঠে গিয়ে চিমনির আলোটা বাড়িয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকতে থাকতে মনে মনে অকস্মাৎ আকুল হয়ে উঠলেন, তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য—গৌরীকান্তের জন্য। তিনি রজনী-ঠাকরুণকে ডাকলেন। বললেন, ঠাকুরঝি, আর বোধ হয় ঘণ্টাখানেক রাত্রি আছে। এইটুকু আপনি জেগে থাকুন।

রজনী দেবী লজ্জিত হয়ে বললেন, তুমি শোও বউ, আমি শুধুই ঘুমুচ্ছি তোমার ঘুমের আর দোষ কি বল?

তিনি সোজা হয়ে বসলেন। কাশীর বউ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি বাড়ি যাচ্ছি ভাই ঠাকুরঝি।

বাড়ি যাবে? এই রাত্রে?

আমি চ'লে যাব—এই তো।

নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ির দোরে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বৃদ্ধ গোক্ষুর চলেছে মন্থর গমনে।

তাঁর শ্বশুরের আমল থেকে সে আছে। কচিৎ কখনও লোকের চোখে পড়ে। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতেই সেও স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। গিয়ে ঢুকল তাঁদেরই প্রাচীন আমলের ভাঁড়ার-ঘরে। তিনি তাঁকে নমস্কার করলেন। আবার চলতে উদ্যত হতেই হঠাৎ তাঁর কানে এসে ঢুকল গৌরীকান্তের কণ্ঠস্বর।

এত রাত্রে গৌরীকান্ত জেগে?

তিনি দরজায় এসে মৃদু করাঘাত ক'রে ডাকলেন, গৌরী! গৌরী!

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অহিংসা

"হিংসাবৃত্তি বড় ঘৃণ্য ব্যাপার'—মানুষ যুগে যুগেই ঘোষণা করেছে, কিন্তু হিংসা না হ'লে তার চলে না।—এই কথাটি মধুবাবু ভাবছিলেন। বাজার থেকে ফেরবার পথে এই কথাটা মনে হ'ল একটা খোদাই ধাঁড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। হাত থেকে ইলিশমাছটা ফসকে গিয়েছিল আর কি! ভিখিরিটার শ্যেনদৃষ্টিতে কি হিংসে নেই? মনে মনে হয়তো ভাবছে, তুমি দিব্যি ইলিশমাছ খাচ্ছ, আর আমি দু মুঠো খাবারের অভাবে কষ্টে ম'রে যাচ্ছি। ব্যাপারটা আরও বেশি মনে হ'ল একটা মাংসওয়ালার দোকানের সামনে, যেখানে একটা বিরাট খাসী ঝুলছে, কুকুর কয়েকটা কাছেই ঝগড়া শুরু করেছে অচিন্তিত আশায়। মধুবাবু চলেছেন এড়িয়ে বলের মত। পৃথিবীতে দুটো পথ-চলার পদ্ধতি আছে, এক হচ্ছে সহিংস গতি, আর একটি অহিংস। সহিংস গতিতে শুধু বেগ, যেন ভেঙে চলাই উদ্দেশ্য; আর অহিংস গতি?—মধুবাবুকে দেখে বিশ্বাস করা যায়, এই হচ্ছে অহিংস গতি। ধীর মন্থর বেগে চলেছেন অবিরাম, মুখের ভাবটি স্থির, অচঞ্চল। হিংসা না হ'লে বেগ সৃষ্টি হয় কি? এ প্রশ্নটাও মনে জাগে।

ইলিশের ঝকঝকে রূপটি মনকে খুশি করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুবাবুর মনে হচ্ছে যে, পরিতৃপ্তি শুধু একটি নতুন বস্তুকে পেলেই আসে না। এই পরিতৃপ্তির মূলেও একটা বিশেষ অর্থ নিহিত রয়েছে। একটা পছন্দসই জিনিস কিনলে আপনারও মনে পরিতৃপ্তি জাগবে। এই পরিতৃপ্তির মূলে রয়েছে সেই ব্যাপার—হিংসা। বড়বাবুর বাড়িতে রোজ দুটো ইলিশ যাচ্ছে, অতএব—। অথবা এও হতে পারে, হাতের জিনিসটি দেখে অনেকে ভাবছে, আহা, বেশ জিনিসটি, আমি বুঝি পেলুম না।' মানুষের মনের এই প্রচ্ছন্ন বৃত্তিকে কি ক'রে দূর করা চলে? অবচেতনা থেকে কি ক'রে যে সে রক্তের ধারা বেয়ে জীবনের মধ্যে চেতন মনে প্রকাশিত হয়, তাকে নিরোধ করা চলবে কি ক'রে? মহাত্মার অহিংসা-ধর্মের প্রসঙ্গে দু দিন ধ'রে কত কথাই মনে হচ্ছে।

সহসা বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন। মনের সামনে স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন, ইলিশমাছ কেনবার পয়সা হাতে আসে, অথচ ব্লাউজের কাপড়টা কেনবার বেলায় পয়সা থাকে না? এ অভিযোগ কি হিংসাশ্রয়ী নয়? কাপড়টা হয়তো অন্যকে ব্যবহার করতে দেখেছেন, তাই ওটা চাই। এর পর

আবার হয়তো বলবেন, এর চেয়ে পাণ্ডীর মা অল্প পয়সায় ভাল মাছ কিনতে জানে। কি যে এনেছ!

গৃহিণীকে প্রত্যুত্তর দিতে হয়, দাও না কেন পাণ্ডীর মাকেই কিনতে।

তখন গৃহিণী বলবেন, উঃ, কি হিংসে, বাপ্‌স্! এ মাসে কিন্তু ধারধোর চলবে না ব'লে দিচ্ছি।

তাই তো, এ কি পাণ্ডীর মাকে হিংসে ক'রে বলা হয়েছে? এক কথা গৃহিণীরই মনের রূপটি প্রকাশিত হয়। আবার হয়তো বলবে, যাঁরা মাইনে পান বেশি, তাঁরা নয় ইলিশ খাবেন রোজ, কিন্তু তুমি কেন কিনবে?

আসল রাগটি কোথায়, মধুবাবু তাও জানেন। আপিসের সহকর্মীরা বাঁ হাত বাড়িয়ে টাকা আমদানি করেন, ডান হাত তাও জানে না। তাঁদের গৃহিণীরা এসে মধুবাবুর সহধর্মিণীর কাছে ব'লে যায় গর্ব ক'রে। মধুবাবুর ঔদাসীন্য স্ত্রী মনে উষ্মার সৃষ্টি করে, মেজাজ বিগড়ে যায়, কাজে মন যায় না, গাম্ভীর্য মুখে ওপর এসে পাথরের মত চেপে বসে, রান্নায় ব'সে ডালের কাঠি নাড়তে নাড়তে বলেন, সহদেববাবুর স্ত্রী এসে ব'লে গেলেন, এ মাসে তাঁদের এক শো টাকা ওপর আয় হয়েছে, আর তোমার সততার কথা শুনে হাওয়া খেয়ে বাঁচি।

মধুবাবু হয়তো বলবেন, নাও, ঘাট হয়েছে, আর ইলিশমাছের দরকা নেই।

স্ত্রী বলবেন, ও মা, আমি কি সে কথা বলেছি? খাবে, তাতে কি কিন্তু হিসেব করা দরকার, আয় বাড়ানো দরকার।

মধুবাবু বলবেন, ডিয়ার্‌নেস্ অ্যালাউন্স তো পাচ্ছি।

স্ত্রী বলবেন, খরচের সময় যে প'ড়ে রয়েছে সামনে। এ কথা ভুলছ কেন?

মধুবাবু এবার হেসে বলবেন, হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, আর খাব না, যদি তোমা একটা মেয়ে হয়। আপিসের মিস গোম্‌স কাল বলেছে, মিস্টার ভাট, এবা তোমার একটা মেয়ে হবে। (মিস গোম্‌স আপিসের একজন কেরানী।)

মধুবাবু আপন মনে হেসে উঠলেন। রাস্তায় কে তাঁর এ হাসি লক্ষ করলে, মধুবাবু তা মোটেও ভাবলেন না। বেশ মজার কথাটি বলবেন তিনি কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হবে ভীষণ। মেয়ে হবার কথাটিতে গৃহিণী চটবেন কারণ আপিসের বড় সায়েবের ছেলে হয়েছে, অ্যাকাউন্টেন্টবাবুর ছেলে অন্নপ্রাশনে সেদিন পয়সা খরচ ক'রে নেমন্তন্ন গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়ে ে

য়? কেন মেয়ে হবে? কিন্তু দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি গৃহিণীর কাছে অসহ্য। সে ল নারী-কেরানী মিস গোম্‌স। মিস গোম্‌সকে ভাল বললে অর্ধাঙ্গিনীর াগ হয়, মিস গোম্‌সকে সুন্দরী বললে তিনি অকারণে বারুদের মত ফেটে ন। কিন্তু মিস গোম্‌স মেয়েটি বেশ ভাল, কথায় কথায় সে গান্ধীজীর কটি উক্তি আবৃত্তি করে, Woman is the incarnation of Ahimsa. himsa means infinite love, which again means infinite apacity for suffering (নারী হচ্ছে অহিংসার অবতার। অহিংসা মানেই চ্ছে অনন্ত প্রেম, যার অন্য অর্থ হচ্ছে দুর্ভোগের অন্তহীন ক্ষমতা।) মিস গোম্‌স গান্ধীজীর এই কথাটি ব'লে বড় পরিতৃপ্ত হয়। গান্ধীজী যে মেয়েদের ীবনকে মহিমান্বিত ক'রে দিয়েছেন, এই কথা বলতে বলতে গোম্‌সের মুখ জ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু মধুবাবু স্ত্রীর কাছে মিস গোম্‌সের কথাটি বলতে হিণী, গান্ধীজী আর মিস গোম্‌সকে এক সঙ্গে যা করেন তা অভাবনীয়।

যাক, মধুবাবুর মনে হচ্ছে, এর পর মুখভার ক'রে রান্নার কাজ চলবে। হসা হয়তো স্ত্রী রান্না সেরে বলবে, ওগো, রান্না হয়েছে, তাড়াতাড়ি চান সেরে স। মাছের লোভে লেট হয়ে যাবে যে!

লেট, কে বললে লেট! (এই প্রসঙ্গটি মনে হতেই মধুবাবু দ্রুতগতিতে াস্তায় এগিয়ে চললেন।) কে বললে লেট?

স্ত্রী। ওই তো তুমি প্রায়ই লেট হও। এজন্যেই তোমার উন্নতি হয় ।। মহাদেববাবুর মাইনে বাড়ে, তোমার বাড়ে না। কে জানে, আপিসে ালি খালি গোম্‌স-মাগীর দিকে চেয়ে কাটাও কি না! (এর নাম কি হিংসা!)

মধুবাবু ভাবছেন, আর যেন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার দরকার নেই। রাস্তায় রিচিত লোকের নমস্কার ও মাছের দর জিজ্ঞাসায় সমস্ত প্রসঙ্গটা মন থেকে র হয়ে যায়। মৎস্যটির দিকে একবার চেয়ে এসে দাঁড়ান মুদীর দোকানের ামনে। দোকানী বলে, দিব্যি মাছটি তো! আসুন স্যার।

মধুবাবু দাঁড়িয়ে ভাবছেন, সরষে কতটা কেনা দরকার? আড়াই পো কললে মণের দরে মিলবে, কিন্তু এতটা পরিমাণ কেনবার দরকারটা কি?

সহসা মুদীটা চেঁচিয়ে উঠল, আ-হা-হা, নিয়ে গেল! সর্বনাশ করলে আহা- ।। এমন চমৎকার জিনিসটি—

হতবুদ্ধি মধুবাবু লক্ষ্য করছেন। একটা চিল ইলিশটিকে ছোঁ মেরে মহা শূন্যাকাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর অপেক্ষা করছে না, একদম পাকা কাজ

এবারে মুদীর বক্তৃতা কানে প্রবেশ করতে লাগল, চমৎকার মাছটা ছিল কাক-চিলগুলো আজকাল যা হয়েছে, তা আর বলতে! এই ব্যাটা চিলটা বড্ড পাজি, মিষ্টান্নের দোকানের ওপর ব'সে তাক্ করে আর ভোজ লাগায় আর ময়রা ব্যাটাই বা কি রকমের লোক দেখুন, দু পয়সা বেশি বিক্রি হবে ব'লে মানুষের অপকার করাচ্ছে চিলটাকে দিয়ে। পুষেছে চোরাবাজার থেকে চিনি কিনে,—এই ব্যবসার টাকা কদিন থাকবে? ওর দু পয়সা বিক্রি হবে ব'লে আমার মনে কোন হিংসা নেই, কিন্তু আমি দশজনার অপকার সহ্য করতে পারি নে।

মধুবাবুর স্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল, বললে, দাও তো আধ সের আলু। মাছের তেমন দরকার ছিল না, ঘরে চিংড়ি আছে, কিন্তু তবু এনেছিলুম।

মুদী বললে, এই তো একটু শাস্তির জন্যে তো? তাতেও ভগবানের হিংসে? তবে, চিংড়িকে ছোঁ মারতে পারবে না বাবু, চিংড়ি লাফিয়ে চলে কিনা!

লজ্জা ঢাকতে গিয়ে মধুবাবু মিথ্যে কথাটিকে আর একটু বাড়ালেন, চিংড়ি ভাজা হয়ে আছে একেবারে।

মুদী বললে, তাতে কি বাবু? একবার আমার শ্বশুরবাড়িতে ভাজা গলদা-চিংড়ির লাফ দেখে বহু লোক জ'মে গেল।

মুদীটা কি বলতে চায় বুঝতে পারলেন না মধুবাবু। বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বললেন, আজ মাছের বড় বেশি দর, ইলিশ কিনব ভেবেছিলুম—

গৃহিণী উত্তর দিলেন, এত দেরি হ'ল, ভাবলুম, কত রাজ্যের বাজার আসছে আজ। কেন আনলে না? পাণ্ডীর মা আজ ভাল ইলিশ এনেছে বললে।

দাড়ি কামিয়ে উঠে মধুবাবু তাড়াতাড়ি স্নানে যাবেন। গুনগুন সুরে অন্যমনস্ক হয়ে গান করছেন। জানলার ফাঁকে চেয়ে দেখলেন, প্রশান্ত নীলাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—যারা অকারণে হিংসে ক'রে বেড়ায়; অথচ সে জানে না, কি ভীষণ ক্ষতিই করেছে পরের।

আজও হয়তো লেট হতে হবে।

শ্রীসুকুমার রায়

সংবাদ-সাহিত্য

মাস কয়েক আগে সরকারী কাজে ইংরেজীর বদলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। পরিভাষা সৃষ্টির জন্য একটি পরিভাষা-সংসদ্ গঠিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে পরিভাষার প্রথম স্তবক" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃত ভাষার উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছে। "মুখবন্ধে" এইরূপ করিবার একটি প্রধান কারণ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—নির্ধারিত বাংলা প্রতিশব্দগুলি যেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গৃহীত না হইলেও বোধগম্য হইতে পারে। যে সমস্ত কারণে সংসদ্‌কে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে একটি প্রধান।"

সংসদের সদস্যেরা "ভূমিকা"য় তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতির অনুকূলে যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের সংকলিত ও রচিত পরিভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত দুর্বোধ বা শ্রুতিকটু মনে হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এতদিন ইংরাজী ছিল আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং দেশীয় ভাষা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম না। অতীতে অনেক স্থলেই আমরা ইংরেজীর প্রতিশব্দ বাহির করিবার কোন চেষ্টাই করি নাই, অথবা করিলেও সে চেষ্টা বেশি-দূর অগ্রসর হয় নাই। যে কোনও দিনের সংবাদপত্র খুলিলেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এপর্যন্ত "Accounts" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দরূপে আমরা হয়ত "হিসাব" এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছি, "Accountant"কে কোন কোন সময় "হিসাব-রক্ষক" নামে অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু "Accountant-General" পর্যন্ত আমরা কোনদিনই পৌঁছাই নাই। "Accounts" অর্থে "হিসাব" শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে, এতাবৎকাল আমরা তাহা চিন্তা করি নাই। "গণন" শব্দটি "Accounts"এর প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিলে এ অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়, কেন না এই এক "গণন" হইতেই আমরা "গাণনিক" (Accountant) ও "মহাগাণনিক" (Accountant-General) অনায়াসেই লাভ করিতে পারি। "গাণনিক" শব্দ বহু পুরাতন, "হিসাব-রক্ষক" অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও যুক্তাক্ষর বর্জিত, কাজেই এই শব্দ গ্রহণে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ "Court" শব্দের অর্থ "আদালত" বা "বিচারালয়" করিলেও স্থলবিশেষে আমাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে

হইতে পারে। "High Court" "প্রধান বিচারালয়" নামে চলিতে পারে কিন্তু "Small Causes Court"এর বেলা "বিচারালয়" শব্দটি রাখা বিশেষ সুসাধ্য নহে, এক্ষেত্রে হয়ত আমাদের "ছোট আদালত"এ নামিয়া আসিতে হইবে। অথচ "আদালত" শব্দ "High Court"এর বেলা সুসংগত বলিয়া অনেকেরই মনে হইবে না। কিন্তু "Court"কে "অধিকরণ" করিলে "High Court"কে অনায়াসে "মহাধর্মাধিকরণ", "Criminal Court"কে "দণ্ডাধিকরণ" ও "Civil Court"কে "ন্যায়াধিকরণ" করা চলিবে। এক অধিকরণ শব্দ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে। এই শব্দটিও বহু পুরাতন। "Account" বা "Court"এর একপ্রকার প্রতিশব্দ প্রচলিত থাকিলেও "Registration" বা "Registrar"এর বাংলা প্রতিশব্দ দেখা যায় না। খুব বেশি যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা এ পর্যন্ত "Registration"এর অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন "রেজিষ্টরীকরণ"। কিন্তু "Registration" ও "Registrar"এর অনুবাদ "নিবন্ধন" ও "নিবন্ধক", কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং প্রাচীন তাম্রশাসনসম্মত।

"আমাদের পরিভাষা সম্পর্কে অভিযোগ হইতে পারে যে আমরা অতিমাত্র সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইয়াছি। কিন্তু বাংলার পরিভাষা রচনা করিতে গেলে গত্যন্তর নাই। বাংলাও, তাহার স্বস্থানীয় হিন্দি, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার মত, আর এখন ইংরাজীতে যাহাকে বলে building language তাহা নহে, ইহা borrowing language হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহা নিজের বিশেষ উপাদানের সাহায্যে নূতন শব্দ আর গড়িয়া তুলিতে অভ্যস্ত নহে, মাতৃস্থানীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া বা সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়যোগে সংস্কৃত মতে নূতন শব্দ গঠিত করিয়া লইয়া ব্যবহার করে; বাংলা, মারাঠী, হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এখন "পরতন্ত্র", আর সম্পূর্ণরূপে "স্বতন্ত্র" নহে। সংস্কৃতের সহিত বাংলার এবং অন্যান্য বহু প্রদেশের ভাষার সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। সংস্কৃত শব্দ যত সহজে বাংলার সহিত মিশিয়া যাইবে, সহজে আর কোন ভাষার শব্দই মিশিতে পারিবে না। সংস্কৃত হইতে প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তিকাল হইতে, অর্থাৎ বিগত আড়াই হাজার বছর ধরিয়া সংস্কৃতের সহিত এই সম্পর্কই চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত ভাষা শব্দ-সম্পদে প্রায় অতুলনীয়, শব্দ সৃষ্টির এমন সুবিধাও ভারতবর্ষের আর কোন ভাষার

ওয়া যায় না। একমাত্র "কৃ" ধাতু হইতে "করণ", "করণিক", "মহাকরণ", "অধিকার", "অধিকর্তা," প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ রচনা চলিতে পারে। শুধু সুবিধা এই যে এতদিন আমাদের মাতৃভাষা অনেকটা অবহেলিত ছিল বলিয়া আমরা এই সকল শব্দের বহু অর্থ ভুলিয়া গিয়াছি। ইংরাজী ভাষাকে আয়ত্ত করিবার জন্য আমরা এতদিন যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার এক চতুর্থাংশও যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার আলোচনায় ব্যয় করি, তাহা হইলে যে সকল শব্দ আমাদের নিকট এখন অপরিচিত বোধ হইতেছে, সেগুলি আর অপরিচিত বা দুর্বোধ থাকিবে না।"

এই যুক্তি এই প্রথম প্রযুক্ত হইতেছে না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী লিখিয়াছিলেন—

"...Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

"It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other; ...

"The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; ...four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALEE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE

UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT LANGUAGES OF THE EAST.'

সে যুগের আরও কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত অনুরূপ ছিল। তাঁহারা বাংলা শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষাকেই আশ্রয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং জোর গলায় বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাংলা ভাষার শব্দকোষ পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা সহজ, অর্থাৎ বাংলাতে সর্বপ্রকার পরিভাষা সৃষ্টির কাজ সহজেই হইতে পারে। কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স কেরী ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাংলা ভাষায় 'অ্যানাটমি' একটি সুবৃহৎ অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই চেষ্টার ফলে বাংলা দেশের আদালত প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে তৎকালে প্রচলিত ফারসীর ব্যবহার রহিত হয় এবং তাঁহারাই বাংলা ব্যাকরণ-অভিধানগুলিকে সংস্কৃত করেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সকলে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিয়া বর্তমান সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে আজ যাঁহারা অভিযান করিতে চাহিতেছেন তাঁহারা নিজেদের প্রগতিমনোভাবসম্পন্ন মনে করিলেও আসলে তাঁহারা যুক্তিহীন সংস্কারেরই দাস হইয়া পড়িতেছেন।

এই প্রসঙ্গে পরিভাষা-সংসদের পদস্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় যে নিবন্ধটি পাঠাইয়াছেন, তাহা এখানে মুদ্রিত করিতেছি।—

দেশী পরিভাষায় সংস্কৃতের উপযোগ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরকার-নিযুক্ত পরিভাষা-সংসদ সরকারী কাজে ব্যবহার্য পরিভাষার প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন, এ দিকে মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষৎ-সমূহে প্রযোজ্য ইংরেজী শব্দগুলির হিন্দী পর্যায় দিয়া একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

দুই প্রদেশ হইতে সমকালে প্রকাশিত পুস্তিকাদ্বয়ের বিষয়বস্তু এক নয়। পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষায় আছে প্রশাসনকার্যের উপযুক্ত শব্দ (terminology to be used in Public Services) আর মধ্যপ্রদেশের পরিভাষায় আছে

ব্যবস্থা-পরিষৎ সম্পর্কিত শব্দ (words of general use in the Legislative Assemblies)।

পরিভাষা-সংকলন বিষয়ে উভয় প্রদেশের মধ্যে কোনরূপ সহযোগ সম্ভবপর নাই, তথাপি সংকলিত পরিভাষায় সাধারণ শব্দগুলির মধ্যে অদ্ভুত রকমের ল দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, যাঁহারা পরিভাষা সংকলন রিয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এইরূপ, যাহাতে নবনির্মিত পরিভাষা সমগ্র রতে গ্রাহ্য হইতে পারে। উভয় প্রদেশেই পারিভাষিকগণকে সংস্কৃতমূলক ব্দর উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, সংস্কৃত পদ বাংলার চলতি পথে অচল। সংস্কৃত ব্দর সঙ্গে বাংলার গণমনের যোগ নাই। এমন শব্দ দিয়া পরিভাষা সৃষ্টি রিলে অপরিচয়জনিত উদ্বেগে পদে পদে কষ্ট পাইতে হইবে। এই শ্রেণীর ক্তগণ পরিভাষায় চলতি কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য রিয়া মধ্যপ্রদেশের পরিষৎপাল শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্ত তাঁহার পরিভাষা-পুস্তিকার বন্ধে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন—

"The words in common parlance are loose and do not express fine shades thought."

রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা ব্যবহারের পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়া গিয়াছেন এবং নি সংস্কৃতমূলক সাধু ভাষাকে কৃত্রিম ভাষা নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী বি পরিভাষা সম্পর্কে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। তিনি ষ্ঠবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—

"সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষা-গুলিকেও এমনি করেই গ্রীক লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারি-ভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার করে নেওয়া কিংবা তারি উপাদান নিয়ে তারি ছাঁচে ঢালা।"—'বাংলা ভাষা পরিচয়' পৃ. ৫০

যাঁহারা সংস্কৃতের সঙ্গে অপরিচয়জনিত শঙ্কায় উদ্বেগ বোধ করেন, হাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, excise, customs, appraiser-ধ মত ইংরাজী শব্দগুলির সহিতও জনমনের যোগ নাই। সাধারণ শিক্ষিত

লোকেও এই সকল পদের শব্দগত অর্থ ধরিতে পারে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নবগঠিত আগমশুদ্ধ, অন্তঃশুদ্ধ ও মূল্যনিরূপক শব্দের অর্থ সকলে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এইরূপ আশা করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে বারংবার প্রয়োগের ফলে শব্দের গহনতা দূর হইয়া যায়। বাংলায় বহুপ্রচলিত "বিসর্জন" পদের পরিত্যাগ অর্থটি সুপরিচিত না হইলে কোন বাঙালী বালকের পক্ষেই প্রতিমা-বিসর্জনের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না অভ্যাসের ফলে এইরূপ হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিবে আজ যে শব্দটি কঠিন বোধ হইতেছে, অভ্যাসের গুণে উহার কঠিনতা অচিরে লোপ পাইবে। সাংবাদিকগণ উদ্যোগী হইলে নূতন পরিভাষা অতি অল্প দিনেই জনায়ত্ত হইয়া যাইবে। তুর্কীতে যখন কেমাল পাশা দেশী ভাষার প্রবর্তন করেন, তখন সংবাদ-পত্রের সহায়তায়ই তিনি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ। সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্য সুস্থিত রাখিবার জন্য একটা রাষ্ট্রভাষা চাই—এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এতদিন ইংরেজী ভাষা এ বিষয়ে কাজ করিয়া আসিতেছে। আমরা প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যুক্তিতে উহা আমাদের কৃত্রিম ভাষা। ভবিষ্যতে যদি হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে তাহাও ভারতের একাধিক প্রদেশের পক্ষে কতকটা কৃত্রিম ভাষারই কাজ করিবে। এইরূপ ভাষা সর্বপ্রদেশ-সাধারণ শব্দ যত অধিক থাকিবে, ততই উহা অধিক লোকের বোধ্য হইবে। সংস্কৃত ভাষা বাংলার জননী কি অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী—সে তর্ক তুলিয়াও এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, ইংরেজী অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা বাংলার অনেক বেশি আপন। সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অস্বীকার করিয়া যিনি যতই আত্মাপহার করুন এ প্রত্যক্ষ তথ্যটি না মানিয়া উপায় নাই। ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাববিনিময়ের কাজে তৎসম ও তদ্ভব শব্দই এখন শ্রেষ্ঠ বাহন রহিয়া গিয়াছে। ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে সার্বপ্রদেশিক পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতের উপযোগিতা অস্বীকার করিব কেন? প্রাচী ভাষার আশ্রয় লইলেই নূতন প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এরূপ মনোভাব দূর করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের মর্যাদায় সংস্কৃতের আদর নাই কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে না নিলে

মধ্যপ্রদেশে প্রকাশিত হিন্দী পরিভাষা সংস্কৃতমূলক হইয়াছে, সে কথ

বেই বলিয়াছি। পরিষৎপাল গুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত গ্রহণের পক্ষে এরূপ যুক্তি য়াছেন—

"We have decided in favour of Sanskrit roots and the reasons are obvious. ne important reason is that their words are common to most of the provinces the Dominion of India. Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali are all of nskrit origin and even in the South, the Dravidian languages, particularly lugu, Canarese and Malayalam are highly nurtured by Sanskrit."—reword, p ii.

অন্য এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে সংস্কৃতের এক বড় গুণ এই যে, এই ধায় একই ধাতুর সহিত বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করিয়া সমগোষ্ঠীর নানারূপ র্থ প্রকাশ করা যায়। একটি উদাহরণ দিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে এবং ন্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের পার্থক্য ধরা পড়িবে।

কোন আইনের পাণ্ডুলেখের ইংরেজী নাম bill। ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতি াভ করিলে এই Bill-টি Law বা বিধিরূপে পরিণত হয়। ইংরেজী bill ব্দটির অর্থগত কোন বৈশিষ্ট্য নাই, law-এর সঙ্গে শব্দগত সম্পর্কও কিছু াই। Bill যে law এর পূর্বরূপ তাহা বাচ্যার্থ দ্বারা মোটেই সূচিত হয় না। ই সকল কারণে বহুপ্রচলিত bill শব্দটি মধ্যপ্রদেশের পরিভাষায় পরিত্যক্ত ইয়াছে (Foreword iii দ্রষ্টব্য)। Bill-এর হিন্দী প্রতিরূপ করা হইয়াছে ধেয়ক। বিধেয় শব্দের অর্থ বিধানযোগ্য। সম্ভবত শব্দটির পারিভাষিক প সূচনার জন্য স্বার্থে ক প্রত্যয় যোগ করা হইয়াছে। বিধেয়ক পদটি সুন্দর। াজ যাহা বিধেয়ক আছে, ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতি লাভ করিলে ভবিষ্যতে াহা বিধিরূপে পরিণত হইতে পারে। সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই এইরূপ অর্থগত ক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ সম্ভবপর হয়। অথচ বিধেয়ক বা বিধি কোনটিই দুর্বোধ া শ্রুতিকটু নয়। পরিভাষা-সংসদও বহু বিদেশী শব্দ পরিভাষায় গ্রহণ রিয়াছেন।

সেকালের ভাষা বলিয়া সংস্কৃতকে পরিভাষার কার্যে অগ্রাহ্য করা যেমন নিন্দনীয়, অসংস্কৃত বলিয়া কোন বহুপ্রচলিত শব্দকে ভাষা হইতে নির্বাসন রাও তেমনই অবিধেয়। কিন্তু অনেক সময়ে শব্দ-সম্বন্ধে আরও নানা দিক বিবেচনা করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বন্দর-শব্দটি ধরা যাইতে পারে। বাংলায় Port অর্থে বন্দর শব্দ চলিয়া গিয়াছে। Port Commissioner-কে

অনায়াসেই বন্দরপাল বা বন্দরমহাধ্যক্ষ বলা চলিতে পারে। Port Officer বন্দরাধিকারিক হইতে পারেন। কিন্তু বন্দরপাল বলিলে হিন্দীভাষী জন বানরপাল বুঝিবেন। অপর প্রদেশের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা আবশ্যক। এইরূপ চিন্তার ফলেই বন্দরের সঙ্গে সংস্কৃত পত্তন পদটির মনে আসে।

প্রাচীনকালে পত্তন শব্দ সাধারণ নগর অর্থেও ব্যবহৃত হইত, আ নৌকাগম্য পুর অর্থেও প্রযুক্ত হইত। অর্থশাস্ত্রে (২।২৮) কৌটিল্য পোতা সম্পর্কে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

পত্তনাধ্যক্ষনিবদ্ধং পণ্যপত্তনচারিত্রং নাবধ্যক্ষঃ পালয়েৎ ॥

অর্থাৎ বন্দরের অধ্যক্ষ (পত্তনাধ্যক্ষ) যেরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন এবং বাণি স্থানে যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে, নৌকাধ্যক্ষ তাহা মানিয়া লইবে ডক্টর শ্যামশাস্ত্রী পত্তনের অনুবাদ করিয়াছেন Port town। মঃ মঃ গণ শাস্ত্রী শ্রীমূলাটীকায় পট্টনের আভিধানিক অর্থ লিখিয়াছেন—

পট্টনং শকটৈর্গম্যং ঘোটকৈর্নৌভিরেব চ।

গাড়ি, ঘোড়া, নৌকা সবই যেখানে যাইতে পারে, এরূপ স্থানের নাম অর্থাৎ বন্দর। আজও ভিজগাপটম, মসলিপটম প্রভৃতি বন্দর এই পত্তন পট্টন নাম বহন করিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

নায়াধম্মকহা নামক জৈনগ্রন্থে গম্ভীর-পোয়পট্টনের উল্লেখ আছে। গ পোতপত্তন অবশ্যই deep harbour-কে বুঝাইত। এই পত্তন শব্দটি P অর্থে গ্রহণ করিলে উহা ভারতের সকল প্রদেশে গ্রাহ্য হইতে পারিবে পত্তনশাল, পত্তনমহাধ্যক্ষ, পত্তনাধিকারিক প্রভৃতি পদও বেশ চলিবে। ব শব্দ সার্বপ্রদেশিক প্রয়োগের বাহিরে বাংলায় নিবদ্ধ থাকিলে আপা কারণ নাই।

আর একটি বহুপ্রচলিত ইংরেজী শব্দ আছে Police। বাং Police Department-এর নামকরণ সহজ নয়। কেহ যদি বলেন যে, পু বাংলায় চলিয়া গিয়াছে, সকলেই উহার অর্থ বোঝে, সুতরাং পরি অনাবশ্যক, তবে আর কোন কর্তব্য থাকে না।

কোন কোন অঞ্চলের তাম্রশাসনে দাণ্ডপাশিক, চোরোদ্ধরণিক প্র ভারী ভারী নাম পাওয়া যায়। এই সকল নামের সহিত সংশ্লিষ্ট মুদ্রা

ধর রক্ষী পুরুষের প্রতিকৃতিও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, চীনকালে কোন কোন দেশে দাণ্ডপাশিক প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা ছিলেন লিসের বড়কর্তা।

দাক্ষিণাত্যের পল্লবরাজত্বের প্রাচীন লিপিতে পুলিসের কর্ম বুঝাইবার জন্য রক্ষা-পদের উল্লেখ আছে। শিবস্কন্দবর্মার তাম্রশাসনে (Epigraphia dica, vol. i) প্রাকৃত ভাষায় 'আরখাধিকত' কথাটি পাওয়া যায়। সংস্কৃত রক্ষাধিকৃত অর্থ Police officer। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত কাব্য, টক ও কথাসাহিত্যে আরক্ষ, আরক্ষক, আরক্ষী প্রভৃতি শব্দ Police man র্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। দণ্ডপাশ অপেক্ষা আরক্ষা পদ পুলিসের অর্থ প্রকাশে গ্যতর শব্দ, অথচ স্বল্পাক্ষর ও সহজবোধ্য। সুতরাং আরক্ষাবিভাগ lice Department-এর সংজ্ঞারূপে চলিবে। আরক্ষাধ্যক্ষ, আরক্ষাধি-রিক, আরক্ষাপরিদর্শক প্রভৃতি শব্দ গঠনে কষ্ট হইবে না।

ভারতীয় মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভাষা সংকলন চলিতেছে। এই ব যোগ্য ব্যক্তিগণের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। প্রস্তাবিত নূতন সংজ্ঞা ল হয় নাই, এমন কথা অনেকে বলিবেন। কিরূপ প্রতিশব্দ ভাল হইবে, া জ্ঞাতব্য। পরিভাষা পুস্তিকার "মুখবন্ধে" পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কর্মসচিব শয় লিখিয়াছেন, "সহায়তামূলক প্রস্তাব ও গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে সাগ্রহে বিবেচিত হইবে।" এ সম্বন্ধে নাগরী-প্রচারিণী-সভার *ndi Scientific Glossary*-র ভূমিকায় (p. 8) প্রকাশিত মন্তব্যটি ণযোগ্য :—

A newly coined word is bound to appear strange and nothing is easier than ay that it is no good. What i really wanted is that better alternative ds be suggested.

নূতন পরিভাষা নির্মাণের গুরুত্ব অনেক। রাষ্ট্র ও জাতির দূরবিসারী াণের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। সুতরাং ক্ষিপ্রতা ত্যাগ করিয়া এ পথে হিত পদে অগ্রসর হইতে হইবে।

—

যন্ত্রেরে করিয়া তন্ত্র মন্ত্রণা যাদের,
কোনদিন মিটিবে না যন্ত্রণা তাদের।

ছেলে। আজ কি হচ্ছে মা ?

মা। কবি এবারে গান গাইবেন খোকন, তুমি স্থির হয়ে ব'স।

কবি। ঠিক বলেছ, মহাপুরুষ-বন্দনা স্থির চিত্তেই শুনতে হয়। পৃথিবীতে শ্রদ্ধার বড় অভাব হয়েছে মা।

মা। আপনি গান বাবা

কবি। (গান) পীড়িত পতিত ভীত মানুষের জন্ত
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ।

মা। (ঐ-সঙ্গে) তোমারে প্রণাম কবি এ যুগের ভীষ্ম,
প্রণমি নূতন-যুগ-দ্রষ্ট,
মহাভারতের যীশু নমো নমঃ গান্ধী,
ত্যাগ-হোমানল পরিশুদ্ধ।

নমঃ কর বাবা।

ছেলে। কাকে নমঃ করব মা ?

মা। গান্ধীজীকে।

ছেলে। গান্ধীজী কি ঠাকুর যে, নমঃ করব ?

মা। ঠাকুর নন বাবা, তিনি মহামানব, তিনি মহাত্মা। তাঁকে ভক্তি ক'লে পুণ্য হয়।

ছেলে। ভক্তি তো করছি মা, কিন্তু আমি যে তাঁর কথা কিছু জানি না। আমাকে গান্ধীজীর কথা বল মা।

মা। এই পৃথিবীতে হিংসা আর স্বার্থ বড় প্রবল বাবা, যাদের হাতে ক্ষমতা প্রায়ই নিরীহ দুঃখী সাধারণ মানুষের উপর বিনা কারণে অত্যাচার পীড়ন করে। ধর্ম দেশ জাতি, এমন-কি গায়ের রঙের পার্থক্য নিয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটায়। কাছের মানুষকে ঘৃণা ক'রে দূরে ঠেলে দেয়। সেই মহাপাপের ফলে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে আমরা এত হীন, এমন পরাধীন হয়ে পড়েছিলাম, বাবা। মহাত্মা গান্ধী এই পীড়িত পতিত ভীত সাধারণ মানুষের মনে বল দেবার জন্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মানুষে মানুষে ভেদ দূর করবার জন্তে তিনি সর্বপ্রথম কাজে নেমেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেখানকার সাদা-চামড়ার লোকরা ভারতবর্ষের কালো-চামড়া লোকদের মানুষ ব'লেই গণ্য করত না, যত রকমে পারত, অত্যাচার করত সে অনেক দিনের কথা খোকন, তুমি তখন জন্মাও নি।

ছেলে। ওই দেখ মা, দাদু আসছেন। "দাদু অত হাসছেন কেন মা?

দাদু। হাসছি তোর মায়ের পাকা পাকা কথা শুনে। তখন ও-ও কি জন্মেছিল নাকি? উনিশ শ সাত-আট সালের কথা। কবির নিশ্চয়ই সব মনে আছে।

কবি। মনে আছে বইকি। সে কথা কি ভোলবার?

দাদু। আমরা তখন কার্জনের বঙ্গবিভাগ রদ করবার জন্যে বয়কট আন্দোলন শুরু করেছি। কি সে উৎসাহ, আর কি সে উত্তেজনা! অত্যাচারী ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে বোমাবন্দুক ছুঁড়তে শিখলাম, কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে খুললাম স্বদেশীর আখড়া। জল বেঁধে পথে পথে মায়ের বন্দনা-গান গাই, ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করি, বলিতি সুন ছড়াই পথে পথে, লাক্কাশায়ারের কাপড় ঘটা ক'রে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলি—আর গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে ছুরি ছোরা পিস্তল বোমা লাঠি বন্দুক অভ্যেস করি। ব্রিটিশের তাঁবেদার সি. আই. ডি. পুলিসের দল, ঘরভেদী বিভীষণের দল—নিমকের খাতিরে দেশদ্রোহিতা ক'রে আমাদের পেছনে তাড়া করে। এরই মধ্যে মজঃফরপুরে সাহেব মাজিস্ট্রেটকে মারতে গিয়ে ধরা প'ড়ে প্রফুল্ল চাকী করল আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের হ'ল ফাঁসি, মানিকতলার বাগান-বাড়িতে বারীন ঘোষের বোমার দল পড়ল ধরা। দেশের শত্রু এবং ঘরের শত্রুদের শাস্তি দেবার জন্যে আমরা কজন অন্ধকারে দুর্গম দুরূহ পথে ঘুরে বেড়াই।

এই যখন আমাদের অবস্থা, হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার সুদূর দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভেসে এল এক শীর্ণ খর্ব কৃশকায় মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—"না না, এ হিংসার পথ মানুষের পথ নয়, আমাদের পথ তো নয়ই। আমরা অসহায়, আমরা অস্ত্রহীন, আমরা দুর্বল। আমাদের পথ একতার পথ, সত্যের পথ, সত্যাগ্রহের পথ। ক্রূর কুটিল খল নৃশংস হিংসাকে, প্রবল দাম্ভিক হিংসাকে আমরা আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে, শান্ত সংহত বীর্যবান অহিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করব, জয় করব। সেই কঠোর সাধনা এখানে শুরু করেছি আমরা। হে ভারতবাসী, তোমরা যে যেখানে আছ, সত্যে আগ্রহান্বিত হও, অহিংস সত্যাগ্রহ কর। এই আমাদের পথ।"

চমকে উঠলাম আমরা, রাগ হ'ল আমাদের। মদমত্ত শক্তি-সুরাপায়ী অসুরের সঙ্গে খালি হাতে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে নামবে কোন্ উন্মাদ! সন্দেহ হ'ল, লোকটা ব্রিটিশের ঘুষখোর চর; এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মুখে

অহিংসা প্রচার ক'রে সন্তজাগ্রত দেশকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবে, নিস্ক ক'রে দেবে জীবন্ত মানুষকে, পণ্ড করবে আমাদের স্বদেশী-আন্দোলনকে আমরা রুদ্ধ করলাম কান।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে আবার সাগর পার থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কণ্ঠস্বর—এবার ক্ষীণ নয়, সাফল্য-গৌরব দৃপ্তগম্ভীর। শুনলাম—"ভারতবাসী শোনো, নিষ্ঠাবান জনসেবক সৈনিকে সত্যাগ্রহ কখনও নিষ্ফল হয় না, আমরা এখানে তা প্রমাণ করেছি ১৮৯৩ সালে যখন এসেছিলাম এই দক্ষিণ-আফ্রিকায়, দেখেছিলাম ভারতবর্ষে কাল-আদমিকে মানুষের মর্যাদা দেয় না এখানকার শ্বেতাঙ্গের দল, ভারতীয়ে সবাই কুলি, পশুর অধম। ১৯০৬ সালে আবার, জারি হ'ল কালা-কানুন। মর্মান্তিক অপমান থেকে আমরা আত্মরক্ষা করেছি অবিরত সত্যাগ্রহ ক'রে, পুনঃ পুনঃ দৈহিক আঘাত সহ্য ক'রে, বারংবার কারাবরণ ক'রে। আজ ১৯১৪ সা দীর্ঘ বাইশ বছর পরে অহিংস সত্যাগ্রহের সাহায্যে আমরা ফিরে পেয়ে আত্মমর্যাদা। ব্রিটিশের কঠোর শাসন থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির এই প তোমরা কান পেতে শোন এখানকার সত্যাগ্রহীদের মর্মবাণী, পথের নির্দেশ ক কর। মাতৃভূমির সেবার কাজে আমিও তোমাদের সহযোগিতা করতে আসছি

শুনতে পেলাম বিজয়ী সত্যাগ্রহীদের গান—

(কোরাস) মিথ্যাশাসন-বিদ্রোহী মোরা, মোরা সত্যাগ্রহী,
শত লাঞ্ছনা শত কারাগার অকাতরে চলি সহি।
সত্যে রাখিয়া অচল মতি,
মুক্তির পথে মোদের গতি—
অন্যায় যদি রাঙায় চক্ষু মোরা শঙ্কিত নহি।
সত্যের পথসন্ধানী মোরা মোরা সত্যাগ্রহী॥
মোরা অহিংস, মোরা নির্ভয়, বিধির বিধান মানি,
আত্মার নাই মৃত্যু কখনো—জেনেছি পরম বাণী।
অন্তরবলে আমরা বলী
হাসিমুখে দিই আত্মবলি
মিথ্যারে হানি মোরা সত্যের বিজয়-পতাকা বহি।
সত্যের পথে যাত্রী আমরা, মোরা সত্যাগ্রহী॥

১৯১৫ সাল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এলেন স্বদেশকে পরাধীনতার গ্লানি আর অস্পৃশ্যতার মহাপাপ থেকে মুক্ত করতে, ভারতবর্ষে তাঁর আবির্ভাবকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখলাম। হঠাৎ শুনলাম, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঋষিদৃষ্টি দিয়ে বরণ করলেন তাঁকে মহাত্মা ব'লে। আমরা থমকে গেলাম।

তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগলাম শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার শাপমুক্তি; ধীরে ধীরে জাগতে লাগল ভারতের জড়তাগ্রস্ত জনগণ। কুমার্গের বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মার অভিযান আরম্ভ হ'ল; ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সহসা অনুভব করলে তাদের ত্রাণ করতে দেবতা এসেছেন মানুষের ছদ্মবেশে। বিহারের চম্পারণে দুঃখী নীলের চাষীরা তাঁকে দেখল চাষীর সাজে, গুজরাটে আমেদাবাদের কলের মজুররা পেল তাঁকে মজুররূপে—তিনি তাদের অভাব-অভিযোগ দূর ক'রে আশার সঞ্চার করলেন। তাদের ত্রস্ত ভয়গ্রস্ত মনে, নবজাগরণের শিহরণ লাগল বস্তিতে বস্তিতে পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে। আতঙ্কিত ইংরেজ রাউলাট-আইনের নাগপাশে আবার বাঁধতে চাইলেন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। জালিওয়ানওয়ালাবাগের রক্তস্রোতে ভেসে ছিঁড়ে ভেসে গেল সে বন্ধন। দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষে দেখা দিল অহিংস অসহযোগরূপে, এই নতুন বিস্ময়কর যুদ্ধের নায়ক হলেন গান্ধীজী, সমস্ত ভারতবর্ষের অন্তর মথিত ক'রে উঠল গান—

(কোরাস) পুণ্য হইল ভারতধাম, ধন্য হইল গান্ধী নাম,
অসহযোগী যোগী নমঃ, সত্যাগ্রহী লও প্রণাম।

কারাগার! কারাগার! কারাগার! সমস্ত ভারতবর্ষ জেলখানা হয়ে গেল দাদু। আগুন দেখলে পতঙ্গ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, সারা দেশ তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল অহিংস-যুদ্ধে। ১৯২১।১৯২৮।১৯৩০। মহাত্মা গান্ধীর জয়! সৈনিক গান্ধীর জয়! সব্যসাচী মহাবীর এক হাতে সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশের সঙ্গে, অন্য হাতে দেশী ছুঁৎমার্গ আর বিলাতী বিলাসিতার সঙ্গে প্রবল তাপে যুঝতে লাগলেন। হরিজন আর খদ্দর—এই হ'ল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ১৯২৯-এর ২৬ জানুয়ারি—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হ'ল, নতুন পতাকা উড়ল স্বদেশপ্রেমিকদের গৃহ-চূড়ায়। এল ১৯৩০-এর ১২ মার্চ বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান। ওই দেখ দাদু, লবণ-সত্যাগ্রহীরা চলেছে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম ক'রে—আমেদাবাদ থেকে সমুদ্র-উপকূল ডাণ্ডির পথে মহাবীরের নেতৃত্বে। শীর্ণদেহ পুরুষ চলেছেন দৃঢ়হাতে তাঁর লাঠিটি ধ'রে, পিছনে

সত্যাগ্রহী স্ত্রী-পুরুষ। পুলিসের লাঠি পড়ছে মাথায়, ভ্রূক্ষেপ নাই, একে পড়ছে অন্যে এসে অধিকার করছে তার স্থান। ওই শোন তোমরা, গান্ধীমন্ত্রে দীক্ষিত অভিযাত্রীদের গান—ত্যাগ-অভিযানের গান—

(কোরাস) দুর্গম-পথযাত্রীরা চলো, মুক্তিসাগর দিয়েছে ডাক,
গৃহ-বন্ধন সংসার-মায়া আজিকে পিছনে পড়িয়া থাক্।
গান্ধীজী ওই চলেন আগে
রাঙা হ'ল পথ রক্তরাগে—
মোদের শোণিতে ভারত আবার হৃতস্বাধীনতা ফিরিয়া পাক।
দুর্গম-পথযাত্রীরা চলো মুক্তিসাগর দিয়েছে ডাক।

সাগর-বেলায় জীবন-লবণ, অধিকার তার পেতেই হবে,
এসো নির্ভীক অভিযাত্রীরা, যোগ দাও এই মহোৎসবে।
গান্ধীজী ওই চলেন আগে
রাঙা হ'ল পথ রক্তরাগে—
বন্যার বেগে ধেয়ে এসো, ডাকে নব-ভগীরথ বাজায়ে শাঁখ।
দুর্গম-পথযাত্রীরা চলো, মুক্তিসাগর দিয়েছে ডাক।

আবার সদম্ভে খুলে গেল কারাগারের দ্বার, ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষের গান্ধীজীর সঙ্গে বন্দী হলেন ব্রিটিশের কয়েদখানায়। উদ্যত অথচ স্তম্ভিত হয়ে উঠল সকল দেশ।

জেল থেকে ফিরে গান্ধীজী এবার ভারতবাসীর অন্তরশুদ্ধি আর বহিঃশুদ্ধির কাজে লাগলেন। স্পষ্টভাষায় বললেন, "অস্পৃশ্যতা দূর কর, দুঃখমার্গ পরিহার কর, জাতিভেদ তুলে দাও, স্বহস্তে বোনা খদ্দরে নিজের লজ্জা নিবারণ কর পরনির্ভরী আর পরমুখাপেক্ষী কখনও স্বাধীন হতে পারে না। হে ভারতবাসী, মুক্তি দিয়ে মুক্ত হও তোমরা।"

হরিজন-সেবায় স্বয়ং আত্মনিয়োগ করলেন মহাত্মা, বরণ ক'রে নিলেন বস্তিবাস, এই মহাপ্রেমের সাধনা ভারতের বুকে ফুটে উঠল পদ্মের মত, রূপ পরিগ্রহ করল গানে—

(কোরাস) আপন জনে পর ক'রে হায়, হয় না রে কেউ শুভ্রশুচি।
ভাইয়ে ভাইয়ে এক হয়ে ভাই মা'র আঁখিজল দে না মুছি
মানুষ হয়ে সবাই দাঁড়া
কারাগারের দুয়ার নাড়া—
কাজের ভেদে ভাগ হয়েছি বামুন বেনে মেথর মুচি।
আপন জনে পর ক'রে হায়, হয় না রে কেউ শুভ্রশুচি।

আপনি অচল ব'লেই তোরা জলচলাচল করিস বিচার,
সত্যেরে দুই পায়ে ঠেলে পূজা করিস কেবল মিছার।
পরের অধীন যাদের জীবন,
সবাই তারা হীন হরিজন—
এক হয়ে আজ দাঁড়া সবাই, সব হীনতা যাবে ঘুচি।
আপন জনে পর ক'রে হায়, হয় না রে কেউ শুভশুচি॥

দাদু, তারপর দেখতে দেখতে এসে গেল বিয়াল্লিশ সালের ৮ই আগস্ট। গান্ধীজী তাঁর শেষ অস্ত্র—পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় গৃহীত হ'ল তাঁর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সমস্ত ভারতবর্ষ সমবেতকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল—

(কোরাস) আমাদের ঘুম ভেঙেছে, ও বিদেশী ফিরে যা রে—
তোদের বাঁধন কাটব ঠিকই যাই তো যাব ছারেখারে॥

সেই ছারেখারে যেতেই হ'ল দাদু, স্বাধীনতা আমরা পেলাম, কিন্তু কি যে মূল্য দিয়ে পেলাম! কূটকৌশলীদের চক্রান্তে ছেচল্লিশের আগস্টে ব্যাপকভাবে বেধে গেল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। আমার মত কত হতভাগ্য পিতা যে স্নেহহীন হ'ল, তোমার মত কত নিরপরাধ শিশু হ'ল পিতৃহীন! মা আর বিধবা স্ত্রীর চোখের জলে আর হাহাকারে কালো হয়ে গেল ভারতবর্ষের আকাশ। ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গেল, সম্পত্তি গেল, মানুষ গেল—দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল আমাদের এই সোনার ভারতবর্ষ। দুঃখের নিশীথ রাত্রির শেষেই আমরা পেলাম স্বাধীনতা। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭—দক্ষিণ-আফ্রিকার ও ভারতবর্ষেও গান্ধীজীর বাইশ বছরের জীবনপণ সাধনা জয়যুক্ত হ'ল আমাদের সেই দুঃখার্জিত স্বাধীনতালাভের মধ্যে। যজ্ঞ পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী আত্মকলহের হোমানলে আত্মাহুতি দিলেন। সেই বেদনাময় ইতিহাস তুমিও জান।

এস দাদু, আমরা ভগবানের পুণ্য নাম নিয়ে গান্ধী কথা শেষ করি, কারণ, তিনিই আমাদের শেষ, তিনিই আমাদের চরম নির্ভর, পরম আশ্রয়। গাও কবি, পার তো তুমিও গাও মা।

কবি। (গান) এই হ'ল ভাল হে ভগবান।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীচরিত

সত্য

১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইহার পর কয়েক বৎসর গেল, তিনি ওয়ার্ধায় শ্রীযমুনালাল বাজাজের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও সেবাগ্রামে আশ্রম স্থাপিত হয় নাই। গান্ধীজী সাময়িকভাবে ওয়ার্ধা শহরের পূর্বপ্রান্তে মহিলাশ্রমে উপরতলায় একটি ঘরে থাকিতেন। ১৯৩৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে তিনি সভ্যপদ হইতে ইস্তাফা দিয়া তখন সবে ওয়ার্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন সময়ে আমি এবং আমার এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হই।

খান আবদুল গফর খানের পুত্র খান আবদুল গনি খান পূর্বেই সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন; আমরা তাঁহাদেরই নিকট যমুনালালজীর অতিথিশালায় একটি ঘরে থাকিবার স্থান পাই। আবদুল গনি খান অত্যন্ত রসিক লোক, বিলাতে ও আমেরিকার চিনির কারখানায় কাজ করিয়া রাসায়নিকের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আসল প্রতিভা শিল্প এবং সাহিত্যের দিকে। গনি পোস্ত ভাষায় খুব ভাল লিখিতে পারেন, ভাল ছবি এবং কাঠ-খোদাইয়ের কাজ করিতে পারেন; এবং এই জন্যই বিদেশ হইতে ফিরিয়া কিছুদিন শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা দুই বন্ধু ওয়ার্ধায় পৌঁছিলে গনির সঙ্গে আশ্রমের সম্বন্ধে ঘরোয়া গল্প লইয়া আড্ডা দিতে বসিলাম। শুধু ওয়ার্ধা আশ্রম নয়, প্রায় সকল আশ্রমেই কেমন একটা থম্‌থমে ভাব থাকে। যেন সকলে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব লইয়া সর্বক্ষণ মগ্ন আছেন, কঠোর নিয়মানুসারের মধ্য দিয়া নিজেকে পরিচালিত করিতেছেন, বাজে কথা বলিবার বা ভাবিবার সময়মাত্র নাই। গনি মিঞা জনৈক আশ্রমবাসীর সম্বন্ধে বলিতে বলিতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, They try to imitate Gandhiji in everything, but they cannot imitate his laughter. সত্যই তো, গান্ধীজীর মত সরসতাকে কে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? অসীম-কঠোর তপশ্চর্যার মধ্যেও তিনি মনের রাস কোন্‌খানে কখন আলগা দিতে হয় তাহা জানেন, এবং জানেন বলিয়াই

অনাবিল হাস্তরসের বায়ুতে মনের মধ্যে ঘন
দিয়া শরীরের এবং মনের সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখি

৯ই নভেম্বর তারিখে বিকালে গান্ধীজী
আমাদের ডাক পড়িল। যখন মহিলাশ্রমে
গান্ধীজীর খাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে।
পড়িল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের ন
খান, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার খান সাহেব
কৃপালানি, পিয়ারেলালজী এবং গান্ধীজী স্বয়ং
ও যমুনালালজীর কন্যা ও পরিবারের কেহ
করিতেছিলেন। গান্ধীজীই কথা পাড়িলেন
সাহেবকে বলিলেন, গনি তো উপস্থিত রহি
যাক।

খান সাহেব গনির উপরে সে সময়ে খু
কিছু নহে। তিনি কিছুদিন হইতে পাঠানদে
পোস্ত ভাষায় পত্রিকা বাহির করিতেছিলেন
পত্রিকায় প্রচারের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করে,
পত্রিকা চালাইবার জন্য যোগ্য লোকও সহজে
ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে
আশা পুত্রের সম্বন্ধে তিনি পোষণ করেন না।
রহিয়াছে, তখন অন্তত কিছু তো দেশ-সে
পারে।

গান্ধীজী ধীরভাবে খান সাহেবের সব ক
শেষ হইলে শান্তিনিকেতন হইতে আগত
করিলেন, শিল্পবিদ্যায় গনির দক্ষতা কেমন এ
মত পোষণ করেন। কৃপালানি বলিলেন,
প্রতিভা আছে, কিন্তু তাহার ধৈর্য বা অধ
আরও বলিলেন, Ghani flirts with his
বলিলেন, See, that he does not flirt
পুত্রের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করিয়া ঘরের মধ্যে

তাহা যেন এই রসিকতার বায়ুতে হালকা হইয়া গেল। যাহাই হউক কৃপালানি আরও বলিতে লাগিলেন, গনির সম্পর্কে নন্দলালবাবু আরও বলিয়াছেন যে তাহার বিশেষ প্রতিভা মূর্তিগড়া বা তক্ষণ-শিল্পের দিকে, কিন্তু নন্দবাবু নিজে তক্ষণ-বিদ্যা আদৌ জানেন না, অতএব তাঁহার কাছে গনির শিখিবার কিছু নাই। গান্ধীজী কিন্তু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, No, Nandalal knows the poetry of sculpture, অতএব তাঁহার নিকট থাকিয়া গনিকে শিল্পের মূলরস সংগ্রহ করিতে হইবে।

কৃপালানির কথা শেষ হইলে গান্ধীজী এবার গনির বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। গনি মিঞা সরাসরি দেশের কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন তিনি বলিলেন, ও পথ আমার ভাল লাগে না; আমি শিল্প লইয়াই থাকিতে চাই। কিন্তু উপস্থিত আমি কোন একটি চাকরি চাই, যেন আমাকে আর কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে না হয়। গান্ধীজী হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তোমার শিল্পচর্চার তাহা হইলে কি হইবে? গনি উত্তর করিলেন, চিনির কারখানায় সারা বৎসর তো কাজ হয় না, কয়েক মাস কাজ বন্ধ থাকে। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, সে সময়ে নন্দলালবাবুর কাছে থাকিবে এবং অধ্যবসায়-সহকারে কাজ করিবে, তোমার অভ্যস্ত খেয়ালী মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে আমি কোনও কারখানায় তোমার কাজের জন্য চেষ্টা করিতে পারি। আবদুল গনি তৎক্ষণাৎ সে শর্ত স্বীকার করিয়া লইলেন।

গান্ধীজী তখন খান আবদুল গফার খানের দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, গনিকে যখন খোদা শিল্পে প্রতিভা দিয়াছেন, তখন তাহার উপর আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমাদের কর্তব্য হইল, তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে সহায়তা করা। যদি কোনও দিন তাহার মনে হয় দেশের সেবা করিবে, নিজের প্রতিভা ওই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবে, তবে তাহার দুয়ার তো সর্বদাই খোলা রহিয়াছে। তুমি উপস্থিত উহাকে পাইতেছ না বলিয়া দুঃখ করিও না। আবদুল গফার খান বাধ্য সৈনিকের মত সেনাপতির নির্দেশ মানিয়া লইলেন; তাঁহার মুখে কোনও প্রতিবাদ অথবা সন্তোষ কি অসন্তোষ, কিছুরই ভাব লক্ষ্য করিলাম না।

আমি এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, গান্ধীজীর মত ব্যক্তি, যিনি সমগ্র

দেশের মানুষকে ১৯২১ সালে সমরাঙ্গণে নামিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি মানুষের প্রতি কি গভীর প্রেমের বশেই আজ অপরের ধর্ম-পালনের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিয়া দিতেছেন।

সোদপুর ও নোয়াখালি

১৯৪৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর* তারিখে গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া যাহা লিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পূর্বে লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেদিন প্রথম আসিয়া সোদপুরে পৌছান, সেদিন অর্থাৎ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৫, আমাকে ডাকিয়া একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দাদাভাই নওরোজীর পৌত্রী খুরসেদ বেন ওরোজীর সহিত ঘটনাচক্রে আমার বন্ধুত্ব হয়। তিনি ফরাসী দেশ হইতে ফিরিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা করিতেন; কিন্তু নানা কারণে শিল্পে জীবনের র্ণ রসোপলব্ধি না হওয়ায় তিনি গান্ধীজীর নিকটে আসিয়া সমাজসেবার ব্রতে াত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজী ওয়ার্ধায় থাকাকালীন খুরসেদ বেন আমার রিচয় তাঁহার নিকটে দেন। এবং সোদপুরে পৌছিবার অল্পক্ষণ পরে তিনি ামাকে ডাকিয়া প্রস্তাব করেন যেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া তাঁহার াঙ্গে সেবাগ্রামে চলিয়া আসি। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেখানে কি াজ দিবেন? তিনি হাসিয়া উত্তর দেন, সব রকম কাজ: পায়খানা পরিষ্কার রা, ঝাড়ু দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সব। আমি কিন্তু তাঁহাকে বলি, ামার কাজ লেখাপড়া লইয়া। দেশের জন্য যৎসামান্য করিয়া থাকি, তাহা াপদ্ধর্ম বিবেচনায় পালন করি। ওয়ার্ধায় যাঁহারা সদা-সর্বদা সুতা কাটেন, াঁহারা হয়তো ভাবিবেন আমি কিছুই করি না, এরূপ অবস্থায় দূরে থাকিয়া নিজের পথেই চলা ভাল। যাহাই হউক, আমি সেইদিনই তাঁহাকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়া পিয়ারেলালজীর মারফত পাঠাই।—

apuji,

I am grateful you have asked me to be with you and to be one of ou. Khursed Ben has grown fond of me, and perhaps placed my case i better light than it should.

* ভ্রম-সংশোধন:—বৈশাখ মাসের "গান্ধীচরিত" প্রবন্ধে গান্ধীজীর কলিকাতায় আগমনের ারিখ নভেম্বর ৩, ১৯৪৫ এবং আমার কথোপকথনের তারিখ ৪ঠা নভেম্বর দেওয়া হইয়াছে। ভয় ক্ষেত্রেই ডিসেম্বর মাস ধরিতে হইবে।

Let me therefore place my own case before you. By profession an inclination, I am a scientist ; and many years of my life have been spe in abstruse scientific research. That is my first love.

But beyond that, I recognise my social debts and social obligation There, it is your writings which have opened up a new life for m Ever since 1921, I have tried to do what little I can in the way c national service. But since 1932, I have specially taken up the task c reading all your writings very carefully, and explaining your teachin through books and articles in English and Benga li. This in itself is fairly heavy task ; and I devote all possible time to it, for it gives m happiness and joy;

But for this work, I require a kind of detachment which would no be possible in the midst of the heavy round of activities as at Wardha.

I would also pray that you will let me be, for the present, in Calcutta so that the revised manuscript of *Studies in Gandhism* and *Selection from Gandhi* may be got ready by the time you leave Bengal.

* * * *

With pronams

Yours affectionately

সেই রাত্রেই গান্ধীজী ইহার নিম্নলিখিত উত্তর লিখিয়া দেন এবং তাহারই একটি প্রতিলিপি খুরসেদ বেন নওরোজীর নিকট ডাকে প্রেরণ করেন।

Sodepur
3-12-1945

Dear Nirmal Babu,

Your sweet letter. You will do exactly as you please.

In order to interpret my writings, you should be for sometime in Wardha when it is fairly cool.

* * * *

Yours
Bapu.

গান্ধীজী আমার কথা শুনিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিবার অনুমতি দিয়াছিলেন ; কেবল তাঁহার সঙ্গে কথা হইয়া রহিল যে, তিনি প্রয়োজন হইলেই আমাকে ডাকিয়া লইবেন, অন্য সময়ে আমি নিজের পথে চলিব।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীজী যখন নোয়াখালিতে একা পরিভ্রমণ করিবার সংকল্প করেন, তখনকার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা হইতে আমি আরও

ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তিনি স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কি গাবে অপরের মতকে স্বীকার করিয়া লইতেন। নোয়াখালিতে পরিক্রমা শুরু ইবার অব্যবহিত পূর্বে ১৮ই নভেম্বর ১৯৪৬ তারিখে তিনি মৌনদিবসে এক ণ্ড কাগজে আমাকে লিখিয়া দেন :

I want you, if you can and will, to be with me wherever I go and tay while I am in Bengal. The idea is that I should be alone only with ou as my companion and interpreter.

This you should do only if you can sever your connection with the Jniversity and would care to risk death, starvation etc. Satis Babu nows all about my design. You will know from him.

* * * *

আমি ভাবিবার জন্য কিছু সময় লইয়াছিলাম। তখনকার মত কেবল বলিয়া আসিলাম : The University releases me for your service as long as you are in Bengal. As for the rest, all I can say s that I shall try to fulfil your conditions ; more than that I can hardly say. ২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ প্রাতঃকালে, আমার মনের সংকোচ কাটাইয়া তাঁহাকে যাহা জানানো আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম, তাহা নিখে দিতেছি।

Kazirkhil
20-11-1946,

Bapu,

Now that you have asked me to be with you, it is necessary that I should place my limitations before you so that I may not cause you any disappointment in future.

Personally, I have never prayed ; but in my private life I frequently ry to relate my day's little work to the things I hold dear in life. f anything comes in the way, I try to weed it out by conscious effort but that is hardly prayer on any account.

So when I try to join in the early morning and evening prayers, I njoy the two minute's silence and keep silent for the rest of the while. The community prayer has not so far touched my emotion ; but I sometimes like keeping company with my friends when they pray and feel great things in the depth of their soul. That companionship may be physical, but I like it all the same.

If I am therefore alone with you at Srirampur, some arrangement has to be made for the community prayer, for I would be useless in that function. This I should place before you for full consideration.

Yours obediently,

পড়িয়া গান্ধীজী বলিলেন, ইহার মধ্যে বাধার কিছুই নাই। তোমার মত মানুষ পূর্বেও আমার সহিত থাকিয়াছেন। সমবেত প্রার্থনার মধ্যে ঐরূপ বিশ্বাসের লোক তো কিছু থাকিবেই। পরে অবসর পাইলে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হইবে। এখন তো ঠিকই আছে।

শ্রীরামপুর পৌঁছাইবার পরই গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস করি না? আমি বলিতে বাধ্য হইলাম যে, ঈশ্বর আছেন অথবা নাই, এ প্রশ্ন আমার মনে কখনও সত্যসত্যই অনুভব করি নাই। আমি বিজ্ঞানসেবী। সমাজবিজ্ঞানের বেলাতেও যাহা সত্য, তাহা নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা ধরিবার চেষ্টা করি; ইহার অতিরিক্ত অগ্রসর হই না। গান্ধীজী সে উত্তরে খুশি হইলেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে নোয়াখালির পরেও পাটনা পর্যন্ত যতদিন ছিলাম, কোনও দিনও আর ধর্ম-সংক্রান্ত কোনও কথা আমাকে বুঝাইবার চেষ্টাও করেন নাই, প্রার্থনায় যোগ দিতেও বলেন নাই।

সত্যের ব্যাপ্তি

অথচ প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি আমরা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব না, সত্যকে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিব না? ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—

'আপনি যে সকল মতামত দিলেন, সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত মত। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আপনি এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা যেমন সীমাবদ্ধ, জ্ঞানও তেমনই। অপর সকলের মত আপনার সত্যের দৃষ্টিও আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। এ ক্ষেত্রে আমরা নিজের লব্ধ সত্যটুকু অসম্পূর্ণ জানিয়া যদি নিজের কাছেই রাখি, প্রচার না করি, তাহা হইলে কি ভাল হয় না?'

উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—

'সত্যের প্রচার নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা পারিবে না।

আমাদের জীবন যদি অন্তরের সত্যের শাসনে চালিত হয়, তবে তাহার দ্বারাই সত্যের প্রচার হইতে থাকিবে। সত্য স্বভাবত ব্যাপ্তিশীল। সূর্য যেমন নিজের আলো লুকাইয়া রাখিতে পারে না, সত্যের আলোও তেমনই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।'

গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, স্বীয় আচরণের দ্বারা তিনি যে শিক্ষা দিতে পারিবেন, মুখের কথায় তাহা কখনও দেওয়া যায় না। আমাদের আচরণ যদি সত্যের সুরে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ এবং তপশ্চর্যার রসে পুষ্ট হইয়া সত্যের বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে আপনিই অপরে প্রভাবান্বিত হইবে। আমাদের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত, আমরা কি করিয়া সত্য হইতে সত্যতর হইব।

যাহাদিগকে গান্ধীজী ভালবাসিতেন, তাহাদের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিলে তাঁহার দুঃখ এবং আত্মগ্লানির অবধি থাকিত না। ১৯৩৮ সালে এমনই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিষয় বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। সে বৎসর গান্ধী-সেবা-সংঘের বাৎসরিক অধিবেশন পুরী শহরের আঠারো মাইল উত্তরে ডেলাং নামক এক গ্রামে হইয়াছিল।

ঘটনাটির বিষয়ে ৺মহাদেব দেশাই ৯ই এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখের ইংরেজী 'হরিজনে' লিখিয়াছিলেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই।—

১৯৩৮ সালের ২৪এ মার্চ ডেলাং পৌঁছিয়া গান্ধীজী প্রথম দিন জনসভায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদিও পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে জাতিবিচার করা হয় না বলিয়া প্রকাশ, তবুও ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে আজ সেখানে হরিজনেরা প্রবেশ করিতে পারে না। যতদিন সেই অধিকার তাহাদের না হয়, ততদিন তিনি জগন্নাথকে জগতের নাথ বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্তত করিবেন। হিন্দুত্বের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে অস্পৃশ্যতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন, এবং এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ঘটনাচক্রে ২৯এ মার্চ তারিখে কস্তুরবা গান্ধী, মহাদেব দেশাইয়ের পত্নী ও আরও কয়েকজন ডেলাং হইতে পুরী বেড়াইতে যান। গান্ধীজী রাত্রে সংবাদ পাইলেন যে, কস্তুরবা এবং মহাদেবের স্ত্রী উভয়েই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি এত মর্মাহত বা উত্তেজিত হন যে, সে রাত্রে তাঁহার রক্তের চাপ অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায় এবং চিকিৎসকগণ রীতিমত

শঙ্কিত হইয়া পড়েন। গান্ধীজীর দুঃখের কারণ ছিল এই যে, সারাজীবন তি হরিজনদের সঙ্গে এক হইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; যে অধিকা হরিজনগণ বঞ্চিত সে অধিকার তিনি সর্বদা পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। অ যাহারা তাঁহার নিকটতম এবং অন্তরতম, তাহাদিগকেই তিনি যে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর হইতে পারে?

অপরের পথচ্যুতির জন্য তিনি নিজেকেই সমধিক দায়ী বিবেচনা করিতে এবং তাঁহার মনে হইত তাঁহার নিজেরই সত্যচর্যার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ত্র থাকিয়া গিয়াছে। স্বীয় তপস্যাকেই তিনি শুদ্ধতর করিবার জন্য আরও চেষ্টি হইতেন; কারণ তাঁহার মৌলিক বিশ্বাস ছিল—তপস্যা অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত দুঃ ব্রতের দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং পরিব্যাপ্ত হইতে পারে, অপর কোনও নাই। অপরের সত্যকে অস্বীকার বা অবমাননা করিয়া, তাহাকে শারীরি বা মানসিক আঘাতের দ্বারা, কখনও সত্যের ব্যাপ্তিসাধন ঘটিতে পারে না।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

শরৎ চন্দ্রের দুইখানি পত্র

'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী' পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর শরৎ চন্দ্রের আর কতকগুলি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহার দুইখানি মুদ্রিত হইল এগুলি ভূতপূর্ব 'কালি কলম'-সম্পাদক শ্রীমুরলীধর বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত এখনও অনেকের নিকট শরৎ চন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী রহিয়াছে। তাঁহা সেগুলি প্রকাশ করিলে, অথবা সেগুলির প্রতিলিপি দিয়া আমাকে সাহা করিলে, অদূর ভবিষ্যতে 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী' পুস্তকের ২য় খণ্ড প্রকাশে প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

54, 36th Street, Rangoon
1-2-16

সবিনয় নিবেদন,

পরিচয়ের সৌভাগ্য না থাকা সত্ত্বেও মহাশয়ের আশীর্বাদ ও প্রশংসা লা করিয়া আমি নিজেকে বারম্বার ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আপনি নিজেকে বৃ

য়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও ত প্রায় তাহাই। আমারও বয়স (৩৯) াচল্লিশ হইয়াছে। তথাপি যদি বয়সে কিছু ছোট হই ত আমার প্রণাম ণ করিবেন।

পত্রে আপনি নিজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে া যায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন য়াই আপনার জন্মভূমির প্রতি মমতা ত যায়ই নাই বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত য়াছে। কিম্বা এ কথাও হয়ত ঠিক নয় কারণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরেই জন্মভূমি পল্লী-জননীর প্রতি স্নেহ জন্মে তাহাও নয়। আমি কলিকাতা-াসী অনেক বড় লোকের জন্মস্থানগুলি চোখে দেখিয়া আসিয়াছি—কিন্তু হাদের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহাদের যাহা সাধ্য তাহার শতাংশের াংশও যদি সেদিকে দান করেন, বোধ করি দুঃখী গ্রামগুলির সৌভাগ্যের র অন্ত থাকে না।

আমার নিজের ত সময় এবং সাধ্য দুইই এত সামান্য যে তাহা সম্পূর্ণরূপে নার বাহিরে ফেলিয়া দিলেও কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না তথাপি আমি এই চেষ্টাই করি যদি একটা লোকেরও তাহার পল্লীর উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জন্যই অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ক্লেশকর হইলেও পল্লী সম্বন্ধে সত্য কথাগুলিই বার চেষ্টা করি। সহরের লোকেরা কল্পনা করিয়া পল্লীগ্রামের যে সকল াতি প্রচার করেন অনেক সময়েই যে তাহা যথার্থ নয়, বরঞ্চ পল্লীগ্রাম শঃ অধঃপথেই যাইতেছে এই সত্য কথাটা এই পল্লী-সমাজ বইটাতে বার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করায় এবং সফলতায় যাহা প্রভেদ আর লেখাতেও বোধ করি ততটুকু মাত্রই হইয়াছে।

আপনি এটাকে নাটক আকারে প্রকাশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ত, করিলে ভালই হয় কিন্তু আমার নিজের ত সে ক্ষমতা নাই। অন্ততঃ ছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া ত কখনো দেখি নাই। যদি আর কেহ করিয়া করেন (যাঁহার ক্ষমতা আছে) বোধ করি ভাল হইলেও হইতে র। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ত শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। এবং কোন য়টারই তাহাদের সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যয় করিয়া তাহাকে stage তে চাহিবে না। তবে, আপনার উপদেশটিও মনে রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি ু করিতে পারি চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে, গ্রাম সম্পর্কীয় আমার 'পণ্ডিত মশাই'

বইটাকেও কেহ কেহ 'নাটক' করিবার কথা তুলিয়াছিলেন কিন্তু হয় নাই সেটা বোধ করি আরও ভাল হইলেও হইতে পারিত।

যাই হোক আপনার এই উপদেশটিকে আমি বিস্মৃত হইব না এবং সেজন্য আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

নিঃ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত]

54, 36th Street, Rangoo
7.4.16

পরম কল্যাণবরেষু—

বহু দিন পরে আপনার পত্রের জবাব দিতে বসিয়াছি। বিলম্ব এত বে হইয়াছে যে আপনি নিশ্চয়ই এ আশা অনেক দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি অত্যন্ত কুড়ে মানুষ। আমার পক্ষে এ রকম অপরাধ প্র স্বাভাবিক। তবে, এ ক্ষেত্রে একটা কৈফিয়ৎ এই আছে যে বড় পীড়িত হই পড়িয়াছিলাম। তাহা এতই বেশি যে এখানে থাকা আর চলিল না—ব পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইতেছে। এ পত্র যখন আপনার হা পড়িবে তখন আমি আর এ ঠিকানায় থাকিব না। যদি দয়া করিয়া কখ এ পত্রের জবাব দেন, তবে, যেমন করিয়া আমার বর্ত্তমান ঠিকান অবগ হইয়াছিলেন তেমনি করিয়াই জানিতে পারিবেন। যদিচ, বুঝিতেছি আবশ্যক আর হয়ত আপনার হইবে না।

কিন্তু সে কথা থাক্। আমার লেখা পড়িয়া আপনার ভাল লাগিয়াছে এই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার। আপনি যে এই কথা জানাইয়া আমা সুখী করিয়াছেন সেজন্য আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি—আশীর্ব্ব করিতেছি আপনিও এম্‌নি সুখী হোন।

ভগবানের কাছে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্ব্বাদক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যা

কুমার কহিলা হাসি, মোর ছয় মুখ,
ধারা ঝরাবার লাগি সদা উৎসুক।

"চণ্ডরূপ"

মুসাফিরের ডায়েরি

ভয়

জীবনে নানা আবর্ত, নানা পরীক্ষামূলক বিপদ ও দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে র হয়ে যারা কঠিন জমিতে এসে দাঁড়ায়, আমি সে দলের নই। হাস্তুতরল স্নেহপুষ্ট সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শ্যামলতটে বিহার করেছি শৈশব থেকে, ফলে একটু পরোয়া এবং একরোখা হয়েই গ'ড়ে উঠেছি। নিজে এবং সহকর্মীরা জানে, মার প্রচণ্ড সাহস কিছুতে মুষড়ে পড়ে না, ইত্যাদি। এমনই ধোকাবাজির বরণে দিন কাটছে। হঠাৎ শহর থেকে জ্বরকাতর দেহ নিয়ে গ্রামে ফিরলাম গা। সবার ইচ্ছা, সুস্থতর হয়ে ম্যালেরিয়ার দেশে পা দিই; কিন্তু আত্মীয়দের নুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে জেদ বজায় রেখে রওনা হলাম।

ট্রেনে অসহ্য গরম, কালবৈশাখীর উদ্দাম ঋতু চলছে। কেমন যেন ঘোলাটে কাশ ও দমকা বাতাস। নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছবার মাইল ত্রিশেক আগে ণ ঝড় দেখা দিল; ধুলোবালি, গাড়ির কয়লা, পাতা, কুটিকাঠি উড়িয়ে এক শয়কর তাণ্ডব। সমস্ত জানলা বন্ধ ক'রেও নিস্তার নেই। ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি, ল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী; ছাদ ফুঁড়ে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ সুমঙ্গল ায় সব ভেসে যেতে লাগল। একটা কথা আছে 'খোদা যব দেতা ছপ্পর াড়কে দেতা', তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম।

গাড়িটা হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের মত ঝাঁকানি দিয়ে থরথর ক'রে ন'ড়ে ঠ থেমে গেল। খানিকক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবে থাকার পর জানা গেল, গাছ প'ড়ে পীয়মান অচল হয়েছে—natural sabotage।

অষথাকালে আধাভিজে মালসহ অবতরণ করলাম। স্টেশন থেকে ন মাইল ৮ আন্তানা,—হয় শ্রীচরণ, নয়, গোযানে যেতে হবে। প্রথমবার গোযানের ঝভাঙা ও থামখেয়ালী চলার স্বাদ পেয়ে আর কখনও সে চেষ্টা করি নি, টেই যাই।

আকাশে ঘনঘটা এবং ঘনঘন বিদ্যুতের ঝিলিক, সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস। স্মায় পড়লাম, কেমন ক'রে যাই! অসুস্থ শরীর কি এতটা যাবে নিজের পায়ে দিয়ে? গাড়োয়ানকে ডাকতেই সাফ জবাব দিল, আজ্ঞে, আমরা চলতে রি না, আর এই অবোলা জীব গরু কি এই দুর্যোগে আঁধারে চলতে পারে? জ গাড়ি যাবে না। সুসংবাদ—স্টেশনে থাকার মত বিছানাপত্র সঙ্গে নেই।

কারণ এখানে রাত্রিবাসের কোনও পূর্বাভাস পাই নি। একজন দুঃসাহসী কর্ম সঙ্গী আমাকে নিতে এসেছিলেন।

গবেষণার পর ঠিক হ'ল যে, হেঁটেই যাবে। রাত বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব। আমার সাজানো সাহসটির প্রতি দৃষ্টি পড়ল। সাহস থাক্ বা না থাক্—এরা মনে করছে, বীররমণী তার অমর্যাদা করি কেমন ক'রে? শুরু হ' অভিযান।

টুকরো মালগুলো সঙ্গীটির বাইকের সামনের ডাণ্ডায় ঝুলিয়ে দিলাম, মা পাদুকাযুগল পর্যন্ত, কারণ কাদাপথে জুতো অচল। বলা বাহুল্য বাইকের বাতি নেই—বন্ধুর হাতে একটি টর্চ আছে। মাইল দেড়েক চলার পর বুঝলাম হাঁটতে পারছি না—শামুকের গতি হয়ে এসেছে। সঙ্গীটি বললেন, এক কাজ করা যাক। গাড়ির পিছনে মালবাহী তক্তে আপনি উঠুন। যথা আজ্ঞা পালনে তৎপর হলাম। এক বেয়াড়া শর্ত এই যে, পিছন থেকে বন্ধুর সঙ্কীর্ণ পথে ওঠানামা দেখাতে হবে টর্চের সাহায্যে আর মাধ্যাকর্ষণের বেগে পতন যদি ঘটে, মূর্ছা যেন না হয়। দুটোই কঠিন দাবি। যা হোক, কিছুদূর আঁকাবাঁকা গতিতে প্রতিমুহূর্তে ধরাশায়ী হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ গাড়ি কাত হ'ল। খুব ওস্তাদী ভঙ্গীতে নেমে ছড়ানো জিনিস গুছিয়ে তুলে নিলাম আবার কয়েক কদম গিয়ে ওই ঘটনার পুনরাবর্তন। অমন পিচ্ছিল ভিজে মাটি পথে ঘন আঁধারে এ জাতীয় যাত্রা কেমন ক'রে সম্ভব? ভাবছি, আবার হাঁটা আরম্ভ হবে না কি? হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, জুতো-জোড়া এ অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ সত্যাগ্রহ ক'রে কখন ভূমিশয্যা নিয়েছে।

আমার সকরুণ অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে সঙ্গীটি জুতোর তল্লাসে চললেন ও আমি পুটুলিসমেত বাইক ধ'রে রইলাম। আর সঙ্গে রইল মোটা অঙ্কের টাকা। টর্চটাও দিতে হ'ল। টর্চের আলো ক্রমশ দূর হতে আরও দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। একবার চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, জুতো চুলোয় যাক, আপনি ফিরুন। কে বা কার শোনে কথা!

মিনিট পঁচিশ দাঁড়িয়ে থাকার পর বুঝলাম যে, ভয়ের চক্রে জড়িয়ে গেছি। যতই আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলতে চাই ততই ভয় চেপে ধরে, তবু তো ভূতের ভয়ের বালাই নেই। বিচার ও সম্ভাব্য যুক্তির লড়াই আরম্ভ হ'ল। মনে যে ভয় ঢুকেছে, এটা নিজের কাছেও স্বীকার করতে পারছিলাম না।

প্রথমে নিছক শরীরবাদ। মনে হ'ল, বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে, গায়ে বিঁধছে, গতি থাকলে এক কথা। এ দাঁড়িয়ে শীতল বায়ুসেবন, নেহাৎ র ডেকে আনা, বড় শীত-শীত করছে, সর্দি বেড়ে যাবে, গলাটা যেন বুজে সছে। স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানায় এমন কুণ্ঠাবোধ করতে কেউ আমাকে খে নি। এই প্রথম। তার ওপর ক্লান্ত শরীরে এমন একভাবে ভারি গাড়ির রে দাঁড়িয়ে থাকাও তো অনুচিত; দুর্বলতা বাড়বে। পিঠটা, বিশেষ রদাঁড়াটা যেন শিরশির করছে। ঢকঢক ক'রে বোতলের সব জল পান ক'রে র পেলাম, ম্যালেরিয়া জ্বরে ঘন ঘন তৃষ্ণা পাওয়া স্বাভাবিক লক্ষণ। অপর ক লক্ষণ কাঁপুনি যে দেখা দেয় নি, এই ভাগ্য।

তারও পরে ভাবলাম, এই যে উল্টো দিক থেকে গরুর গাড়ি আসছে, এরা কমন ক'রে জানবে যে, আমার মত বিশিষ্টা মহিলা বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝপথে? যদি হুড়মুড় ক'রে এসে ধাক্কা লাগায় তো কি হবে? এমন শক্তি ই যে, গাড়িটা সরিয়ে নিই পথ থেকে। বাতিও তো নেই। সমূহ বিপদ।

আর যে সাপের দেশ, যদি কিছু হয়! নাঃ, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি, দি ম'রেই যাই তবে জুতো পরবে কে? কিন্তু আমার সঙ্গী ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা নিয়ে তোর সন্ধানে অগ্রসর হয়েই চলেছেন।

ক্রমশ আমি যে নারী এই অনুভূতি জাগল। কাছেই মুসলমান গ্রাম, দি কেউ আক্রমণ বা অপমান করে, হাত দুটো তো জোড়া, কি করব? পকেটে ত টাকা, যদি মেরে কেটে নেয়? ভুলে গেলাম যে, টাকাগুলো জোনাকির মত লছে না। তখনও মনকে বোঝাচ্ছি যে, ভয় তো নিজের নয়, টাকা হারালে ভিভাবক ও পরিচিতজনে গোঁয়ারতুমির জন্য বকবে যে।

ধীরে ধীরে সময় চলেছে। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে, কাঁদো-কাঁদো বস্থা। একটু স্নেহের ছোঁওয়া পেলেই ভেঙে পড়ব বুঝতে পারছি; কিন্তু তখনও াইরে বীরাঙ্গনা সেজে থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে পথচারী চাষীরা জিজ্ঞেস রছে, কে ও, কে দাঁড়িয়ে গো? চুপ ক'রে থাকলে মুক্তি, না, সাড়া দিলে ক্তি, জানি না। খুব ভারী মোটা স্বরের অনুকরণে ব'লে উঠলাম, মানুষ গা, কংগ্রেসে যাব।

ও, এ সেই মেয়েটা। তা একা এমন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কেন, এমন র্যোগের নিঝুম রাত সামনে?

দরকার আছে।

ও, এর সঙ্গের মানুষটা কি যেন তালাস করতে করতে এগিয়ে গেল নয়? মনে হচ্ছে, আমি আর পারি না, গাড়িটা কাত ক'রে একটু শুয়ে পা সর্বাঙ্গ যেন অবসাদে ভেঙে পড়ছে, আসলে ভীষণ ভয়ে হিম হয়ে এসেছি কেবল ভাবছি পুরুষরা কি নির্মম হতে পারে, এমন ক'রে আমাকে অসহ অবস্থায় ফেলে কেমন ক'রে গেল?

অনেকক্ষণ পরে সেই সঙ্গের ভদ্রলোকটি ফিরলেন, অমনই বিদ্রোহ কর সাহস পেয়ে জানিয়ে দিলাম, আমি ভয়ে ভাবনায় বড় কাতর হয়েছি, আর য না। স্টেশনে ফিরে ওখানে রাত কাটিয়ে ভোরে যা হোক ব্যবস্থা হবে আপনাকেও সঙ্গে থাকতে হবে। এ কথার আর নড়চড় হবে না।

এঃ, আপনি এত ভীতু তা জানতুম না। আমার ধারণা ছিল, আপন সাহস আছে। পথে বেরিয়ে ফেরা আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি যত সব মেয়ে কাণ্ড, এজন্যেই বলে—পথি নারী বিবর্জিতা।

আমি ভাবতে লাগলাম, সত্যি, আমিও তো জানতুম না, আমি এত ভীরু নিজের সম্বন্ধে গর্বান্ধ মিথ্যে অহমিকার দেওয়াল ধ'সে গেল। তার জন্য লজ্জ পেলাম, না, স্বস্তি পেলাম, কে জানে?

"মুসাফির"

ডানা

৮

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অমরবাবু। সত্যি সত্যি পাখির গা রেকর্ড করা যাবে তা হ'লে এইবার।...বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিস্টা নিকল্‌সন, মিস্টার কক আর তিনি। শহর থেকে অনেক দূরে, সমস্ত কোলাহলে বাইরে। সঙ্গে আছে পার্লোফোন কোম্পানির সাউণ্ড-ভ্যানটা, তার ভিতরে আছে গান রেকর্ড করবার সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম। খুব ভাল মাইক্রোফো আছে, মাইক্রোফোনের সঙ্গে লাগাবার তারও আছে প্রচুর। ভ্যানের ভিতরে ব'সে সুইচ লাগিয়ে দিলেই লাউড-স্পীকার বেজে উঠবে। বনের ভিতর মাইক্রোফোনের সামনে যত রকম শব্দ হচ্ছে, শোনা যাবে সব। পাখির গানও অনায়াসেই রেকর্ড করা যাবে। অনেকগুলো অ্যাকুমুলেটারে (Accumulator)

লকট্রিসিটি পুরো চার্জ ক'রে আনা হয়েছে। মোমের তৈরি রেকর্ডও আছে চুর। রেকর্ড অনেক আনতে হয়েছে, নষ্ট হবে অনেকগুলো। পাখি কখন ইবে ঠিক নেই, রেকর্ড কিন্তু ঘুরিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত। বসন্ত-বউরির নটাই আগে তুলতে হবে। দোয়েলের তুললেই ভাল হ'ত, কিন্তু দোয়েল াজকাল ডাকছে না বেশি। বসন্ত-বউরির ডাকটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। পাকিলও অবশ্য আছে। যে রেডস্টার্টগুলো ধ'রে রেখেছেন, তাদের গান তুললে মন হয়? ও জায়গাটা কিন্তু বড় অসমতল। কক সাহেব বলেছেন, সাউণ্ড-ানটাকে সমতল জায়গায় দাঁড় করাতে হবে। শহরের বাইরের মাঠটাতেই ক হবে। বসন্ত-বউরি পাওয়াও যাবে সেখানে প্রচুর।

...মাঠ। ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের উঁচু ডালে অনেক বসন্ত-বউরি এসে াটে ভোরবেলায়। গাড়িটাকে একটু দূরে সমতল জায়গায় দাঁড় করিয়ে ইক্রোফোনটাকে ফিট ক'রে খা হয়েছে, পাখিটা যাতে হঠাৎ মাইক্রোফোন দেখে ভড়কে না যায়। না, য় নি। রোজ যেমন ডাকে, ঠিক ডাকছে।

...ভোরবেলা। রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কই, বসন্ত-বউরি আজ ল না তো গাছটায়! অথচ রোজ আসে। আজ কাক ডাকছে কতগুলো। টা কিসের শব্দ? পাখির হতে পারে না। কুকুরের। ছি, ছি!

...কক্ সাহেব হেসে বলছেন, ব্যস্ত হ'লে চলবে না। আমরা একটা ব্ল্যাক র্ডের গান রেকর্ড করবার জন্যে চেষ্টা করেছি দিনের পর দিন রোজ রাত টো থেকে উঠে। অপেক্ষা করতে হবে।

...ওই এসেছে। ওটা কি হ'ল? শর্ট সার্কিট (Short circuit) হয়ে ল। মাটি ভিজে যে।

...আবার ঠিকঠাক ক'রে বসা হ'ল। রেকর্ডের পর রেকর্ড ঘুরে চলেছে।

...মোটর চ'লে গেল একটা দূরের রাস্তা দিয়ে। বাতাস উঠল জোরে। ালপালার হুড়মুড় শব্দে পাখির গান চাপা প'ড়ে যাচ্ছে।

...এইবার হয়েছে। বাঃ, ঠিক হয়ে গেছে—

শুনছ, ওগো, ওঠ ওঠ।

চোখ খুলে বৈজ্ঞানিক দেখলেন রত্নপ্রভা সামনে দাঁড়িয়ে, কক সাহেব নয়।

স্বপ্ন দেখছিলে নাকি ?

বৈজ্ঞানিকের বুকের উপর একখানা বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, স্বপ্নই। অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন একটা।

রূপচাঁদবাবু এসেছেন বাইরে।

ও।

উঠে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

চা খেয়ে বেরুবে, না, বাইরেই পাঠিয়ে দেব দুজনের একসঙ্গে ?

তাই দাও।

রত্নপ্রভা চ'লে গেলেন। বৈজ্ঞানিক বইটার দিকে চেয়ে দেখলেন আর একবার। Songs of Wild Birds। ওদের দেশে পাখির গান সত্যিই রেকর্ড করেছে ওরা। আমাদের দেশে এসব এখন সুদূরপরাহত। স্বপ্নই। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এ দেশের অধিকাংশ লোক দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না।...বেরিয়ে এলেন।

বৈঠকখানায় যাওয়ামাত্রই রূপচাঁদ বললেন, দু-একটা বাড়তি ফার্নিচার আছে তোমার—চেয়ার, বেঞ্চি, ছোট টেবিল, এক-আধটা আলনা ?

কেন, কি হবে ?

ওই মেয়েটির দরকার। আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, একেবারে কপর্দকহীন—দরকার তো সব জিনিসই।

গুদোমে আছে বোধ হয়। রত্না জানে ঠিক।

এখানেই যদি পেয়ে যাই, তা হ'লে বেশি ঘুরতে হয় না আর।

আছে আমার।

বাঁচা গেল তা হ'লে।

রূপচাঁদের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কল্পনায় ডানার কৃতজ্ঞতা-স্নিগ্ধ প্রচ্ছবিটা ফুটে উঠল একবার।

আনন্দবাবুর খবর কি ?

সেখান থেকেই তো আসছি। সে, দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড সবুজ বই নিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছে। তুমিই দিয়েছ বোধ হয় বইটা।

ওয়াইল্ড্ কোরাস(Wild Chorus)খানা দেখছেন বোধ হয়। আপনি দেখলেন বইটা?

একটু উঁকি মেরে দেখেছি। হাঁসের ছবি।

হ্যাঁ। অদ্ভুত বই।

চা এসে পড়াতে বইয়ের কথা চাপা প'ড়ে গেল।

কবি তন্ময় হয়ে নিজের তেতলার ঘরটায় চৌকির উপর চিত হয়ে শুয়ে Wild Chorus বইখানা দেখছিলেন। শুধু বইখানাই দেখছিলেন না, তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখছিলেন হংস-রসিক পিটার স্কটকে, আর চেষ্টা করছিলেন তাঁর মানসলোকে ঢুকে তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার, আনন্দ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেতে। ভদ্রলোক শুধু বৈজ্ঞানিক নন—কবিও। অদ্ভুত চিত্রকর। কি চমৎকার ছবিই না এঁকেছেন! থাকেন সমুদ্রের ধারে। হাঁসের সন্ধানেই শহর ছেড়ে গেছেন সেখানে। নদী যেখানে এসে মিশেছে সমুদ্রে, সেই মোহানার কাছেই এক একান্ত 'লাইট হাউসে' (Light House) আস্তানা ওঁর। শীতকালে অজস্র হাঁস আসে সেখানে। অনেক বুনো হাঁস ধ'রে পুষেওছেন নিজে। বাড়ির তিন দিকে নোনা বালির চড়া, তারপর খানিকটা জল, খানিকটা কাদা, তারপর সমুদ্র-সৈকত। জোয়ারের সময় সবটা সমুদ্রের জলে ভ'রে যায়, বাড়িটা শুধু জেগে থাকে। চোখ বুজে কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন কবি। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সাগরের ঢেউ। তারপর আকাশ। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কখনও নীল, কখনও ধূসর, কখনও কালো। আবীর ছড়িয়ে পড়ছে কখনও, কখনও স্বর্ণরেণু। কখনও অরুণ, কখনও গৈরিক। কত অজস্র রঙের লীলা চলেছে। আর তার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে থাম-খেয়ালী মেঘের দল ভেসে ভেসে আসছে আর চ'লে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে আসছে হাঁসের দল তুষারের দেশ থেকে। হাঁস দেখবার জন্যে কত রকম আয়োজন করেছেন ভদ্রলোক। কত দেশে ঘুরেছেন। অষ্ট্রিয়া-হাংগেরি-রুমানিয়ার কৃষ্ণসাগরের উপকূলে, দানিয়ুব নদীর তীরে, ক্যাস্পিয়ন সাগরের সৈকতে। কবিতা জাগল মনে। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে গেলেন। লিখে না ফেললে থাকে না। চ'লে যায়, পালিয়ে যায়।

পাখা মেলে উড়ে চলে হাঁসেদের সারি
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।
রোদ-ঝড়-আলো-ছায়া-চন্দ্র-তপন
শূন্যবিহারী
অন্ধকারের বুকে তারা অগণন
সারি সারি সারি :
মায়া বিস্তারি'
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে রঙিন স্বপন
সন্ধ্যা-উষার মেঘে আলোকের অলকরণ ;
দিগন্তে ধরার নেত্রে কজ্জলিত স্বপ্ন মনোহারী :
অকস্মাৎ তার মাঝে উড়ে আসে কল-কণ্ঠ হাঁসেদের সারি
সচকিয়া সমুদ্র-গিরি-মরু-বন
সাদা-মাথা, লাল-বুক, গোলাপী-চরণ,
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।

লিখে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে। বইখানা আবার ওলটাতে লাগলেন। হঠাৎ এই পর্যন্ত লিখে কবির মনে হ'ল, এ ভদ্রলোক হাঁস দেখতে বেরোন নি, হাঁস ধরতে বেরিয়েছেন। হাতে আছে জাল—clap net। হাঁস ধ'রে তার পাখা ছেঁটে বা বেঁধে তাকে বন্দী ক'রে রাখবেন ব'লে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুষ্ট মন যে। উপভোগের অন্তরালে তাই উঁকি মারছে ভবিষ্যতের ভাবনা, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। প্রকৃতির আনন্দলীলা যে অফুরন্ত, অজস্র ঐশ্বর্য যে অবারিত রয়েছে সহস্র দিকে—এ বোধ, বোধ হয়, জাগে নি এখনও ভদ্রলোকের। সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন তাই প্রাণপণে। ভাবছেন, ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে তুমি, ওরা থাকবে।

মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন এসে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড।

ওগো, শুনছ, বিনয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চিঠি পেলাম এখুনি, এই দেখ।

বিনয় মন্দাকিনীর ছোট ভাই। কবি বইটা মুড়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর কাব্যলোক অন্তর্হিত হ'ল এবং পরমুহূর্তেই তাঁকে পানসে-কালি-

ধয়ে-লেখা বানান-ভুলে-পরিপূর্ণ অর্থমলিন পোস্টকার্ডটিতে মনোনিবেশ করতে ল। 'শ্রীচরণেষু'তে 'শ' এই প্রথম দেখলেন।

মন্দাকিনী ব'লে চলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ওইখানেই হল, দেখলে তো। কত রকটই তুলেছিল। যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে—। হ'লই বা আই. সি. স.। তার হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকলে তার সঙ্গেই বিয়ে হ'ত। কিন্তু ও মেয়ে য়েছে আমার ভাইয়ের হাঁড়িতে চাল, হবে কি ক'রে অন্য জায়গায় বিয়ে? ারিখের কথা কিছু লেখে নি। অথচ বাজে কথা লিখেছে একটি গাদা। রেন সিজির বিধবা বোনের কালাজ্বর হয়েছে, মানিক চাকরি পায় নি, বিপিন-ধবুদের গাই বিইয়েছে। কাজের কথা শেষ ক'রে জায়গা থাকলে লিখতিস সব। তা নয় রাজ্যের বাজে কথা লিখে ভ'রে দিয়েছে পোস্টকার্ডটা—

বিয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয় নি হয়তো।—সন্তর্পণে কবি বললেন।

দেনা-পাওনাও কি ঠিক হয় নি এখনও? সেইটেই তো আসল। বিনয়ের ছন্দ হয়েছে মেয়েকে খুব তা মানি, কিন্তু তা ব'লে একেবারে ফাঁকি দেবে াকি? আমাদের নমস্কারী-টমস্কারীগুলো তো নিশ্চয়ই দেবে। আই. সি. স. না হতে পারে, কিন্তু বিনয়ও আমাদের ফেলনা ছেলে নয়। কি রূপ, কি ণ। ওভারসিয়ারি ক'রে মাসে চার-পাঁচশো টাকা রোজকার করে। অসময়ে াবা মারা গেলেন তাই, তা না হ'লে ও ছেলেও আই. সি. এস. হ'ত।...

বকবক ক'রে ক্রমাগত ব'লে যেতে লাগলেন মন্দাকিনী। কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে শুনে যেতে লাগলেন। বিনয়ের কথা থেকে এল াসীমার কথা, তারপর যোগেনের বিয়ের কথা, তারপর বরযাত্রীর কথা, ারপর আজকালকার অগ্নি-মূল্য জিনিসপত্রের কথা, মাছ-তরকারির কথা, াপার কথা, সুন্দরী গরুর কথা...

কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে সব শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে ল, এও একরকম হাঁস। নারী-বেশিনী হাঁস। মন্দাকিনীর অজস্র কথার াঝখানে তিনি যেন শুনতে পেলেন, আংগাংক্, আংগাংক্, আংগাংক্...সেই চরন্তন ডাক চিরপথিক হংসযাত্রীর—যে

স্থির-লক্ষ্য চলিয়াছে বেগবান নিজ পক্ষ-রথে
ঝড়ে জলে অন্ধকারে অরণ্যে পর্বতে।

৯

ডানা চুপ ক'রে ব'সে ছিল বারান্দায়। কিছুক্ষণ আগেই চেয়ার টেবি আলনা আলমারি পৌঁছে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদবাবু। অনেক আশ্বাসও দি গেছেন। কিন্তু ঠিক যে ধরনের আশ্বাসকে মানুষ নির্ভরযোগ্য মনে করে, আশ্বাস পায় নি এখনও ডানা। বাইরের কোনও লোক সে আশ্বাস দিতে পা না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তা উৎসারিত হয়। তার মনে হচ্ছিল যে, তা চারদিকে পুঞ্জীভূত হয়েছে যে কুয়াশা, তা খানিকক্ষণ পরে অপসারিত হ হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—তবু কিন্তু অনিশ্চয়তা থাকবে। কোন বাইরের লোকের বাচনিক আশ্বাসে তা ঘোচবার নয়। নিজের চো বাচাই ক'রে নির্ভয় হতে হবে। কুয়াশার ভিতর যেটাকে দৈত্য মনে হচ্ছে সেটা আসলে যে মানুষ তা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক করছিল। তার মনের মধ্যে আর একটা সত্তা যেন গোপনে গোপনে কামনাও করছিল—আহা, ওটা সত্যি যদি দৈত্য হয়। হ'লে যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তা ভে শিহরণ জাগছিল তার সর্বাঙ্গে। কৌতূহলে উন্মুখ এবং ভয়ে কণ্টকিত হ ব'সে ছিল সে চুপ ক'রে। অতীতের দিনগুলোও কেমন যেন ঝাপসা অস্প দেখাচ্ছিল। নিজের মায়ের কথা মনে নেই তার। বিমাতার সঙ্গে কলহ হ নি, ভাবও হয় নি। তার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা ক'রে এসেছে সে এতকাল হঠাৎ সব শেষ হয়ে যাওয়াতে যেন আরামই বোধ করছে। পায়ের টাই জুতোটা খুলে গেল যেন চিরদিনের মত, আর পরতে হবে না। বিমাতা সঙ্গে ভাব না থাকলেও ছোট বৈমাত্র ভাইটিকে ভালবাসত খুব। টুলটুকে মুখখানি। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে থাকত। যখন হাসত, তখনও ঐইটেই ছিল যেন তার জীবনের ভঙ্গী। পৃথিবীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চে যেন সে বলত, যা দেখছি তা সত্যিই ভাল না কি! চ'লে গেল কোথা চিরদিনের মত। বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার। মনে পড়ে— এইটে ভাবতেই অবাক লাগে। বাবা যে থাকবেন না, তাঁকে যে মাঝে মাঝে মনে পড়বে, এই বিস্ময়কর সত্যটার বিস্ময় কিছুতেই যেন আর কাটছে না। ট্রেনের সহযাত্রীর মত বাবাও এক জায়গায় নেবে গেলেন হঠাৎ নাম-না জানা একটা স্টেশনে। দেখা হবে না আর কখনও। সে অথচ চলেছে। প্রতি

মুহূর্তে অতিক্রম করছে নিত্য নূতন পথ। অপ্রত্যাশিতভাবে পারিপার্শ্বিক বদলাচ্ছে। নূতন দৃশ্য আসছে আর চ'লে যাচ্ছে। ট্রেনটা থেমেছে মনে হচ্ছে একটা নূতন স্টেশনে। অনেকক্ষণ থেমে আছে। নূতন যাত্রীরা উঠেছে তার কামরায়। জিনিসপত্র নাবাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। কুয়াশা চারিদিকে, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মানুষ ওরা? এতকাল যে ধরনের মানুষ সে দেখে এসেছে, তাদেরই মত, না, নূতন রকম কিছু? বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৌতূহল-ভয়, লাভ-আত্মসম্মান, পরস্পরবিরোধী আলোছায়ার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে একটা। দূরে কোথায় যেন কাঁসরঘণ্টা বাজছে, তার অতীত জীবনটাই যেন উৎসব শুরু করেছে আর কোথাও। সে কেবল স'রে এসেছে সেখান থেকে। ওরা কেউ কোথাও যায় নি, সে-ই কেবল স'রে এসেছে। কথাটা মনে হতেই একটু অদ্ভুত ধরনের ঠেকল। সে-ই কি একলা কেবল স'রে আসতে পারে? একটা জটিল জিজ্ঞাসা-চিহ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল মনের ভিতর। এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবসর কিন্তু সে আর পেলে না। ঘাড় ফিরিয়েই দেখলে, বৈজ্ঞানিক আর কবি নদীর ধার থেকে এগিয়ে আসছেন তার দিকেই। একটু এসেই বৈজ্ঞানিক ব'সে পড়লেন ভাঙা সিঁড়িটার উপর তার দিকে পিছন ফিরে, তারপর দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, পাখিটিকে আগে দেখে নিন ভাল ক'রে।

কবি দেখতে লাগলেন।

দেখতে পেয়েছেন?

পেয়েছি। ওই পাখিটাই ডাকছিল অমন ক'রে? উকু কুক্ উকু কুক্ উকু কুক্—এই ধরনের ডাকটা, নয়?

'ক'য়ের স্থানে 'প'ও দিতে পারেন। হুপো, হুপোপো—এ বললেও অন্যায় হয় না। ইংরেজী নাম ওর হুপো, হিন্দীতে বলে হুদহুদ। Upupa Epops ফ্রেঞ্চ কেতাবী নাম।

ওর বাংলা নাম মোহনচূড়া দেওয়া যাক—মাথায় অমন চূড়া আছে যখন। হঠাৎ মনে হয়, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান যেন পাখির বেশ ধরেছে। নয়? ফুর্ ক'রে মাথার চূড়াটা আবার খুলে যাচ্ছে জাপানী পাখার মত। চমৎকার তো!

ডানা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ইচ্ছে হ'ল, একটু আলাপ করে

গিয়ে, কিন্তু সঙ্কোচ হতে লাগল। তার মনের কথা টের পেয়েই কবি যেন ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন তার দিকে।

নমস্কার। আসুন। পাখি দেখতে বেরিয়েছি আমরা। কি চমৎকার একটা পাখি দেখুন।

কি নাম ওর?

ইংরেজী নাম হুপো, আমি নামকরণ করলাম মোহনচূড়া। বাংলা নাম আছে হয়তো কোনও, জানি না।

তিনটে রয়েছে দেখছি।—ডানা বললে।

আরও বেশি থাকে।—বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, ওরা একটু নির্জন জায়গায় চরতে ভালবাসে, অনেকটা ঘুঘুর মতন স্বভাব। ঠোঁটটা দেখুন ভাল ক'রে, মাটি খুঁড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তাই অনেকটা পিক-অ্যাক্সের (Pickaxe) মত। ওদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের বাসা। গাছের গুঁড়িতে বা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গর্তে ওরা ডিম পাড়ে সাধারণত। ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-পাখিটা গর্ত থেকে কদাচিৎ বেরোয়। পুরুষ-পাখি তখন খাওয়ায় স্ত্রীকে। এ বিষয়ে ধনেশ পাখির সঙ্গে মিল আছে খানিকটা। ধনেশের ঠোঁটের সঙ্গেও এর ঠোঁটের মিল আছে একটু। স্ত্রী-পাখিটা বাসা ছেড়ে বেরোয় না ব'লে বাসার ভিতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সাদা ডিমগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়। অদ্ভুত স্বভাব, নয়? এই পাখিদেরই মধ্যে আবার কোকিল দেখুন ডিম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের বাসায় ডিম পেড়ে চ'লে আসছে।

এই পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, ডানা তাঁর কথা শুনছে না।

চমৎকার দেখতে, নয়?—বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত ক'রে আবার শুরু করলেন, ওর বুকে যে রঙটা রয়েছে, সেটা ঠিক বাদামী নয়, ফন (fawn)—অনেকটা হরিণশিশুর গায়ের রঙের মত। আবার পিঠের ডোরা ডোরা দেখলে মনে হয় জেব্রার গায়ের রঙ—

তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কিছু বলছেন না যে?

আমিও মিল খুঁজছি।—হেসে উত্তর দিলেন কবি। তারপর বললেন, আমার বক্তব্য এখনই বলা যাবে না। লিখতে হবে।

পাখিগুলো উড়ে গেল।—ডানা বললে।

চলুন, আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। লিখে ফেলি কবিতাটা।

সকলে প'ড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হলেন।

কবি গিয়েই চেয়ারটা টেনে ব'সে পড়লেন টেবিলের পাশে। পকেট থেকে বেরুল ফাউন্টেন পেন আর খাতা। শুরু ক'রে দিলেন লিখতে।

বৈজ্ঞানিকও একটা চেয়ার টেনে বসেছিলেন, কিন্তু "কির্‌র্‌ কির্‌র্‌"-গোছের একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে উঠে পড়লেন টপ ক'রে এবং ছুটে নেবে গেলেন মাঠে, তারপর উর্ধ্বমুখ হয়ে চোখে লাগালেন দূরবীন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। দুই বিপরীতমুখী স্রোতের কোনটাতে গা ভাসিয়ে দিতে পারছিল না সে। ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারছিল না। তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। কোথায় কোন্ একটা অদৃশ্য নোঙর যেন আটকে রাখছিল তাকে।

শুনুন।

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন হঠাৎ।

ডানা নেবে গেল।

নতুন ধরনের একটা পাখি দেখুন। ওই যে।

ডানা দেখলে, পায়রার মত একটা পাখিকে কয়েকটা কাক তাড়া করেছে।

বাজ ওটা একটা। লাল-মাথা বাজ—Redheaded Merlin। এদের স্ত্রী-পাখিটাকে তুরমতী বলে অনেক জায়গায়। পাখি ধরার জন্যে পোষে অনেকে। কুনকী হাতীরা যেমন বুনো হাতী ধরে, এরা তেমনই নীলকণ্ঠ, হুপো, তিতির প্রভৃতি পাখি ধরে। ধরাটা যদিও এক-জাতীয় না। কুনকী ভুলিয়ে আনে, এরা ছোঁ মেরে ধরে। চেহারাটা সুন্দর। মাথাটা লাল, পিঠটা নীলচে, বুকে-পিঠে সাদার উপর ছিটছিট। দেখুন।

দূরবীনটা ডানার হাতে দিলেন।

ওই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে নিন নিজের চোখের সঙ্গে।

ডানা দেখতে লাগল।

সহসা বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, মেয়েটিকে বাজপাখির সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বোধ হয়।

বাজের ঠোঁট আর পায়ের নখ লক্ষ্য করবার জিনিস। ওদের চেনবার

আর একটা উপায় হচ্ছে লেজের পালকের তলায় বেশ চওড়া চওড়া ডোরা Barred—দেখতে পেয়েছেন ?

ডানা ঘাড় নেড়ে জানালে, পেয়েছে।

ঠিক এই রকম সাইজের আর এক রকম বাজ আছে। তাকে কেস্‌ (Kestrel) বলে। তার মাথাটা কিন্তু নীলচে,- পিঠটা লাল। এর উল্টো।

ডানা দূরবীনটা বৈজ্ঞানিকের হাতে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন : বসল একটা, একটু চা খাবেন ?

বেশ তো।—ব'লেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে মে কৌতূহল ঠিক উদ্রিক্ত করতে পারলেন না তিনি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপ্রিয় ডানার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। গোড়ালির উপর শাড়ির পাড়টা যে পড়ল। মনে হ'ল, ঠিক যেন শিকরা পাখির লেজের তলার মত। ভ্রূ আ কুঞ্চিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অনুসরণ করলেন।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, কই, কি লিখলেন, পড়ুন।

ডানার দিকে কবি চাইলেন। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন উৎসুক।

পড়ব ? আশ্রমপীড়া হবে না তো ?

না না। কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। আপনি পড়ুন। কি লিখলেন ?

যে পাখিটা দেখলাম এখুনি —মোহনচূড়া—

ও, পড়ুন।

কবি পড়তে লাগলেন।

কি করিয়া মিল হ'ল ঘুঘু আর ধনেশে
জেব্রা ও হরিণে
সে কথা ভাবিয়া আমি মরি নে।
আমি শুধু বার বার ডেকে বলি নিজেকে
কেবা কালো কেবা সাদা কেবা উঁচু নীচে কে
সত্য কে মিছে কে

তাহার হিসাব নিক যাহারা বৈজ্ঞানিক
তুই শুধু অঞ্জলি ভরি নে।

তুই শুধু দেখ্ রে পেখম মেলেছে মন
ও মোহন চূড়াতে
পরবী সখীর হিয়া জুড়াতে, না পুড়াতে!
চঞ্চল ও চলন শুধু চলাটুকু কি
উকু কুক্ উকু কুক্ শুধু উক্ কুকু কি
ওর সুখ দুখু কি
পেয়েছে-কোথাও বাণী? কোন্‌খানে? কতখানি?
ছন্দেতে পারিস কি কুড়াতে?

সুন্দর!—অস্ফুট কণ্ঠে বললে ভানা।
বাঃ!—সোল্লাসে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

১০

শীত শেষ হ'ল। বসন্ত এসেছে। ঝ'রে পড়ছে অনেক গাছের পাতা। ত না ঝরতেই দেখা দিচ্ছে নব মুকুলের আভাস, পাওয়া যাচ্ছে কিশলয়দের ।। বাতাসে শীতের আমেজটুকু আছে, তীক্ষ্ণতা নেই। ভোরের দিকের শায় নিবিড়তা নেই, স্বচ্ছতা এসেছে। মসলিনের টুকরোর মত ভেসে াচ্ছে দূরে দূরে। তিসির ফুল, যবের শীষ, গমের শীষ, মটরফুল, অড়র-ছেয়ে ফেলেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ঘেঁটুফুল ফুটেছে চারিদিকে। লের কুঁড়ি ধরেছে। সজনেফুলের শ্বেতগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে দু-এক গায়। শিয়ালকাঁটার বনেও ফুল ফোটবার সাড়া পড়েছে, সোনালী স দুলছে গাছে গাছে। বটগাছে ফল ধরেছে অজস্র। আক কাটা হচ্ছে। ারা পেকেছে। টুনটুনি পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে। পুরুষ টুনটুনি ছে চকচকে কালো রেশমের বর-বেশ। উচ্চ রোল তুলে নীলকণ্ঠ প্রণয় বদন করছে প্রেয়সীকে। বাঁশপাতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে মাটিতে। ঠোকরার ক্রেংকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেনেবউ ডাকছে । স্বরে। টিউ—কৃষ্ণ গোকুলে—ও বউ হলুদ তোল—নানা রকম কথা

বলছে সে। বুলবুলিরাও টুরু টুরু শুরু করছে ঝোপে ঝাড়ে। বসন্ত-বউরি আনন্দ-সঙ্গীত উৎসের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। টংক্ টং টংক্—ডেকে চলেছে ভগীরথ। চন্দুল আর ভরতের গানে লেগেছে নূতন সুর খঞ্জনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে গরুদের কাছে কাছে। শকুনি, বা মুনিয়াদের বাচ্চা হয়েছে, তাই নিয়ে ব্যস্ত তারা।

…অমরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিরাট একটা পার্সেল নিয়ে। মালয় থে তাঁর একজন বন্ধু স্টাফ্ড্ (Stuffed) পাখি পাঠিয়েছিলেন কয়েক রকম তাঁ জন্মদিনের উপহার-স্বরূপ যুদ্ধের আগে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পার্সেল পৌঁছেছে এতদিন পরে। সর্প-ঈগলটা (Serpent-eagle) অতি অদ্ভুত রক সুন্দর। ভীষণ অথচ সুন্দর, মাথায় পালক-গোঁজা সম্রাট যেন। কি দৃপ্ত ভঙ্গ এর, সঙ্গে এ দেশী সর্প-ঈগলের মিল-অমিল কোন্‌খানে কতটুকু আছে তা তি বুঝিয়ে চলেছেন রত্নপ্রভাকে। রত্নপ্রভা গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছেন। অনে কিছুই বুঝছেন না, কিন্তু তাতে রস-ভঙ্গ হচ্ছে না। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি এ নীরব গাম্ভীর্য জমিয়ে রেখেছে প্রসঙ্গটাকে। সাদা-কলার-ওলা চমৎকার মা রাঙাটাও মন দিয়ে শুনছে যেন অমরবাবুর বক্তৃতা। ওটা যে মরাপাখি মনেই হচ্ছে না। বহুবর্ণবিশিষ্ট পিট্টা (Pitta) প'ড়ে আছে কাত হ এক ধারে। পিঠে-চুল হলদে-বুক বুলবুলিটার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে লাল-ঘাড় নীল-পিঠ টিয়া ব'সে আছে গ্রীবাভঙ্গী ক'রে। মৃত্যুও তার গ অপহরণ করতে পারে নি যেন। ক্রমাগত ব'কে চলেছেন অমরবাবু। যে পক্ষী নিবাস তিনি তৈরি করতে চান, তার কল্পনায় মেতে উঠেছে তাঁর মন রত্নপ্রভারও।

…চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন মন্দাকিনী। চৈত্র মাস এসে গেল, অথচ চা কেনা হ'ল না এখনও। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। মাঘের মধ্যে সারা বছরের মতন চাল কিনে ফেলেন তিনি। এবারও ফেলতেন, কি রূপচাঁদবাবু দাও মাফিক কিনে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব'লে অপেক্ষ করছেন। রূপচাঁদবাবুর কিন্তু পাত্তা নেই। একটি বিষয়ে কিন্তু মন খুশি আছে তাঁর। মনের মত ক'রে ছুটি লেপ করাতে পেরেছেন এবার। চমৎকা ছিটটি। ধুনকর তাকিয়ে সামনে ব'সে বার বার ক'রে ধুনিয়ে, চক্রাকার সেলা

য়ে মনোমত ক'রে করেছেন লেপ দুটি। রূপচাঁদবাবুর দৌলতেই হয়েছে। াই আশা করছেন যে, চালের ব্যবস্থাটাও ক'রে দেবেন উনি।

...উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বকুলবালা দিন গুনছেন, কবে পাখি-ওলা হলদে পাখি ানেবউ এনে দেবে তাঁকে। পাখি-ওলাটা রোজই বলে, এখনও পায় নি। থচ সামনের আমগাছে প্রায়ই দেখা যায় পাখিটাকে। কি সুন্দর রঙ, সোনা করে পড়ছে যেন গা থেকে। ওই রঙের শাড়ি আছে একখানা তাঁর। াখিটা যখন আসবে, তখন তিনি যে কি করবেন, তারই কল্পনায় তন্ময় হয়ে াছেন তিনি। বেনেবউ এলে মদনলাল সোহাগী হিংসেয় ফেটে পড়বে নিশ্চয়। । পড়ুক, ওরা হিংসুটে ব'লে নতুন পাখি পুষবেন না তিনি বুঝি! আচ্ছা াবদার তো! হলদে পাখির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছেন বকুলবালা।

...সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটার কাছে যে নদীটা আছে, বর্ষার সময় তার ল ছাপিয়ে যায়, আশপাশের ডোবাগুলোতে জল ঢোকে এসে। মাছও াকে। এইরকম একটা ডোবার ধারে ছিপ ফেলে ব'সে আছেন রূপচাঁদ। কও ব'সে আছে কয়েকটি। মাথার উপর দিয়ে টিয়া উড়ে গেল এক ঝাঁক। লিগ্রাফ-পোস্টের উপর ব'সে একটা ফিঙে পাখি ঝনৎকার দিয়ে ধমকাচ্ছে ন কাকে। তীরের একটা গাছের পাতায় আত্মগোপন ক'রে হাঁড়ি-চাঁচা ঝে মাঝে 'ককরিং' 'ককরিং' শব্দ ক'রে প্রিয়াকে ডাকছে। রূপচাঁদের কিন্তু ক্ষ্য নেই এসব দিকে। ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ব'সে আছেন তিনি।

...ডানা ব'সে আছে চুপ ক'রে বারান্দার উপর। আসন্ন বসন্তের ছোঁয়া গেছে তার মনেও, কিন্তু সজ্ঞানে সে অনুভব করছে না কিছুই। উতলা য়ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। অতীতের তীরভূমির দিকে চেয়ে আছে সে, র স'রে যাচ্ছে সেটা ক্রমশ। বর্তমানের নানা চিত্র ঘিরে ধরেছে তাকে। াদের স্বীকার করতে বাধছে, অস্বীকার করতেও পারছে না। অদৃশ্য ভবিষ্যতের গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কোন্ অদৃশ্য কবি। অস্পষ্ট সুরটা শোনা যাচ্ছে বল, তাও নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তার সঙ্গে মিশছে এসে কোকিলের কুহু, পিয়ার 'পিউ কাঁহা', বায়সের চীৎকার, বসন্তের সুরোচ্ছ্বাস। অনিবার্য মানের অকুণ্ঠিত অসংখ্য দাবি।

...নিজের তেতলার ঘরটিতে ব'সে কবি কবিতা লিখছিলেন।

আজ বিকেলে হঠাৎ যেন
দেখতে পেলাম পাঞ্চালীকে
ইচ্ছামতীর উচ্চ পাড়ে
খুঁজছে বাসা গাংশালিকে।

কঠিন গাছে কোমল গুটি
রঙিন হয়ে উঠছে ফুটি
ব্যাসের মুখে ফুটছে ভাষা
কোথায় তুমি অম্বালিকে।

জাগছে জীবন ভুবন-ভরা
সকল দ্বিধা শঙ্কা ঘোচে
শবের বোঝা সরিয়ে নে' যায়
মৃত্যু যেন সসঙ্কোচে

জীবন-বাগের আগুন ফুঁড়ে
কৃষ্ণা জাগে বিশ্ব জুড়ে
স্বয়ম্বরের বিরাট সভায়
গান ধরেছে চৈতালিকে।

কৃষ্ণা আজও পার্থে মাগে
বহ্নি জ্বলে তন্বী-চোখে
শিকরে বাজের পুলক জাগে
সমুদ্যত চঞ্চু-নখে

সবুজ-লালে স্বর্ণ-পীতে
আগুন-মাখা বর্ণ-গীতে
কোন শবরী অর্ঘ্য সাজায়
বসন্তের এ বৈকালিকে।

ঝনাৎ ক'রে কপাট ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্দাকিনী। কবিতার খাতাটা তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেললেন কবি।

মন্দাকিনী খাতাটার দিকে এক নজর
জে কাজে সময় নষ্ট করছ তুমি সারাদিন ব
পচাঁদবাবুর তো পাত্তাই নেই।

অপ্রতিভ মুখে চেয়ে রইলেন কবি।
রমুহূর্তেই চমকে উঠলেন। অঘটন ঘ'টে
লিঙ্গ তুবড়ির মত আকাশে উঠে ছড়ি
নতে পেলেন এ বছরের প্রথম পাপিয়ার ডা
ল, চোখ গেল—। চোখের অপ্রতিভ
ড়ে গেল আকাশে, গুনগুনিয়ে উঠল কবিত

চোখ গেলে কি গা
অমন ধারা তা
চোখ যায় নি মন গি
বল্ না সেটা

মন্দাকিনী বিরক্ত মুখে চেয়ে ছিলেন স্বা
তনি নিজের আকাশে উড়তে পারছিলেন ন
ানা মেলে উড়তে চায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরণং গচ্ছ

দেহ হতে দেহান্তরে কা
ব্যগ্র-ত্রস্ত পায়ে পায়ে
কি পরম সত্য লাগি ?
মিথ্যা মরীচিকা
নামাল সত্যের মুখে কা
ঐশ্বর্যের ভরা ভাণ্ড করি
লুব্ধ অজানার লাগি দে
নখরে করিয়া দীর্ণ খুঁ

সাগরে ডুবুরী সম।
অন্বেষণ মম
তবু দেহ-রত্নাকর দেয় নি কখনো।
এ জীবন-বালুতটে আজো ঢেউ গনি'
কাটাই তমসাচ্ছন্ন বিরহ-রজনী।

হে মোহিনী সুধা-পাত্র আবরিত হাতে
এসেছ, এসেছ তুমি কোজাগরী রাতে।
হে যৌবন. পূর্ণিমার অতন্দ্র প্রহরে
আমার সাগরে শোন, জোয়ার-কল্লোল;
প্রেমের রাখীর বন্ধে এখনও হৃদয়
ধরা দিতে বার বার হয় যে চঞ্চল!
হে যৌবন, স্বর্ণপাত্র-ঝলিত সুরায়
বার বার দেহমন সিক্ত মদিরায়।
ধরার বাঞ্ছিতা তুমি;
আকাশের পারে
তারকা-সনাথ রাত্রি কম্পিত যেথায়,
যেথা চির দক্ষিণের অশান্ত সমীর
নীল মেঘে ঝুলনের দোলা দিয়ে যায়,—
শত বিরহীর আঁখি সেই অলকায়
প্রাণের প্রতিমা খুঁজি উন্মনা ব্যাকুল;
স্বপনের ভাঙা-ভাঙা পরীর পাখায়
যেথানে মনের আশা চির প্রেমাকুল;
সেই কল্পলোক পারে, মোহিনী যৌবন,
ব'সে আছ, আধহাসি বিবশ-অধরে।
শত অলক্ষিত সূত্রে তুমি ক্ষণে ক্ষণে,
হে যৌবন, স্পর্শ কর ধরণীর মনে।
তাই তো নীরস যত দর্শনের পাতা
প্রবল দক্ষিণা বায়ে ছিঁড়িয়া উড়াই।

নিরাশা তো পরিণাম,
তবু ফিরে যাই
দেহ হতে দেহান্তরে অন্ধ বাসনায়।

এ যৌবন মৃত আজি দূর-অস্তাচলে,
প্রভাতী তারার মত মাগিছে বিদায়।
তারি মত ক্ষীণজ্যোতি মুমূর্ষু ব্যথায়,
উদয়-আকাশে চাহি নয়নের জলে।
আসন্ন বিদায়ক্ষণ;
হরকোপানল
আমার স্মরেরে ভস্ম করেছে সময়ে।
আজি কৈলাসের শিরে আনন্দ কেবল,
রক্ত সুরাপাত্রে দেখি শুভ্র গঙ্গাজল।
তবু কেন, তবু কেন কোদণ্ড-টঙ্কার?
অশোক পলাশ গাত্রে হ'ল নিষ্পেষণ?
পড়িল অলকে বুঝি কুরুবক-দল?
শিহরে ভুবন আজো মন্মথ-স্মরণে?

হে যোগী, নয়ন মেল;
হৃদয়ে আমার
আবার, আবার দহ প্রমত্ত মদন;
ক্রোধ, প্রভু, ক'রো না তো আর সংবরণ;
নিমেষে ঘুচাও মম প্রণয়-বিকার।
ধীর-শান্ত বনস্থলী;
ধীরে বয় বায়ু;
দেহ হতে দেহান্তরে ব্যাকুল ভ্রমণ—
এই তো অর্পণ করি পায়েতে তোমার
হে বিরাগী, বৈরাগ্যেতে নিলাম আশ্রয়।

শ্রীমতী বাণী রায়

[১]

নূতন ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কার

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ যে মুঘল রাজপ্রতিনিধি রাজা মানসিংহ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া দিল্লী লইয়া যান, পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। (Westland's *Jessore*, 2nd. ed., p. 24)

মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত ওই পদে থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পর তাঁহাকে (১৪ অক্টোবর ১৬০৫) ওই কর্মে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে রাজলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে) তাঁহাকে সরাইয়া নূরজাহানকে হস্তগত করিবার জন্য কুতবুদ্দীন খাঁকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন। (ইকবলনামা, ২ ও ১৯ পৃঃ)। সুতরাং মানসিংহ প্রতাপকে বিনাশ করিলে তাহা ১৬০৬এর মধ্যেই ঘটিত। একখানা "অদ্বিতীয়" পুরাতন ফার্সী হস্তলিপি হইতে গত ১৩২৬ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি যে এই প্রচলিত কথা সত্য নহে, এবং প্রতাপাদিত্য সশরীরে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রিল বাঙ্গলার নূতন সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েক দিন পরে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পান।

তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের শেষ পরাভব ও মৃত্যু কোন্ বৎসরে এবং কোন্ সুবাদারের হাতে ঘটে? তিনি মানসিংহ হইতে পারেন না। তবে কে?

সুখের বিষয়, এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যায়। বিলাতে একখান ফার্সী হস্তলিপি আছে, যাহার দ্বিতীয় পুঁথী পৃথিবীর অন্য কোথায়ও নাই। ইহার নাম বহারি-স্তান-ই-ঘাইবী; রচয়িতার নাম আলাউদ্দীন ইস্‌ফাহানী শিতাব খাঁ (ছদ্মনাম ঘাইবী, ডাকনাম মির্জা নথন)। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫৬; প্রতি পৃষ্ঠায় ২০ লাইন। ইহার একমাত্র বিষয় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬২৪ পর্যন্ত বাঙ্গলার অতি বিস্তৃত ইতিহাস। ইতিহাস বলিতে অবশ্য বুঝায় শুধু সুবাদারের দরবারের ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, ওমরাগণের কার্যকলাপ, এবং

শাহের সভার সংবাদ। দেশের কথা, প্রজার অবস্থা, ইচ্ছা করিয়া বর্ণিত নাই; তবে স্থানে-স্থানে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

এই পুঁথীখানি গ্রন্থকারের স্বহস্তে অথবা জবানীতে লিখিত, কারণ দুই পাশে আলোচনা ও টিপ্পনী আছে, এবং মোহরগুলি হইতে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অধিকারীগণের নাম পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম যাঁহাকে গ্রন্থকার পুঁথীখানি উপহার দেন তাঁহার নামও আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের পক্ষে ইহা অমূল্য। আমি তার ফটো আনিয়াছি। (গৌহাটী হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ, অধ্যাপক Sarkar কৃত, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, দুই খণ্ডে।)

এই ফার্সী গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারদের সহিত মুঘলরাজের সংঘর্ষের এবং আমাদের "বঙ্গাধিপ পরাজয়ের" বিস্তৃত সঠিক ও প্রাচীনতম সাময়িক বিবরণ আছে—অবশ্য বিজেতার পক্ষ হইতে লেখা। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে নূতন সংবাদ পাওয়া যায় তাহা নীচে ফারসী হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

[২]

প্রতাপাদিত্যের সহিত বিবাদ

এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর নাই। তাহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশহাজার পাইক এবং ১৫ কোটি টাকা আয়ের রাজ্য আছে। (আবদুল লতীফের ভ্রমণ)।

প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী ঐ রাজার কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে বন্দী করিয়া আনিয়া [রাজমহলে] নবাব ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে)। কিছুদিন পরে বালককে বাড়িতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

যখন ইস্‌লাম খাঁ নৌযানে চড়িয়া রাজমহল হইতে গোয়াশ এবং গোয়াশ হইতে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শাহ্‌পুর থানার সামনে আত্রেয়ী নদীর পারে পৌঁছিলেন, তখন শেখ বদীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। [এই সাক্ষাতের স্থান বজ্রপুর; নাটোর শহর হইতে ১৫ মাইল দূরে।] প্রতাপ ৬টা হাতী, নানা মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৬০৯। (আবদুল লতীফের ভ্রমণ)।

ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবার্তা করিতে থাকিলেন। তাহার পর এই শর্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে দেশে ফিরিয়া তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন, এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটী প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদশাহী সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষা শেষে স্বয়ং আরও এক শত নৌকা (একুনে পাঁচ শত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দলখাঁ নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন ; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অতএব ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপের পূর্ব সম্পত্তি বহাল রাখিয়া তাঁহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর ইনাম দান করিলেন। (এ দুটি পরগণা তখনও জয় করা হয় নাই। প্রতাপ এবং বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার ইহা একটি মহা সুযোগ ; divide and rule।) সুবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে খেলাৎ, রত্ন-খচিত ছোরা, তিনটি হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদশাহের পক্ষ হইতে নকাড়া উপহার দিলেন।

তাহার পর ভাটীর মুসা খাঁ ও বারো ভুঁইয়ারা বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল ; উস্‌মান পরাস্ত হইয়া বকাইনগর দুর্গ ছাড়িয়া শ্রীহট্টের জঙ্গলে পলাইয়া গেল। ভুষণার রাজা শত্রুজিৎ তো আগেই মুঘল পক্ষে আসিয়া জুটিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই, এই সব যুদ্ধে সুবাদারকে সাহায্য করেন নাই। [তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে বারো ভুঁইয়া ও উস্‌মানকে জয় করিবার পর মুঘল সৈন্য তাঁহার উপর পড়িবে, সুতরাং উহাদের ধ্বংসে সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা হইবে।] ইস্‌লাম খাঁর এই-সব বিজয়ের পর প্রতাপের চৈতন্য হইল। তিনি পূর্ব অপকর্মের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে ৮০খানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন। ইস্‌লাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর ইমারত (গৃহনির্মাণের অধ্যক্ষ) ওই ৮০খানা নৌকায় কাঠ, খড়, ইট, পাথর বহিয়া বহিয়া ওইগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলুক। তাহার পর ইনায়ৎ খাঁর অধীনে এক

কাণ্ড সৈন্যদল, অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক-আন্দাজ, ৩০০ পণোত এবং অনেকগুলি তোপ দিয়া তাঁহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিতে ঠাইলেন। মুসা খাঁ ও অন্যান্য রাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্য ই বাদ্‌শাহী অভিযানে যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে অপর একদল বাদ্‌শাহী পুত্র রগ্‌লার জমিদার (কন্দর্পের পুত্র) রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ কীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০০ বর্ক-আন্দাজ ও ৪০০ নৌকা নেকগুলি ওম্‌রা সহ উস্‌মান খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য "বার সিন্দুর" ামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান। সলাম খাঁ স্বয়ং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা গেলেন।

[৩]

যশোহর অভিযান

প্রথমে ইনাএৎ খাঁ কুচ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে র্জা নথন্ [অর্থাৎ এই ফারসী গ্রন্থের লেখক] তোপ লইয়া পিছু পিছু রওন ইলেন। মির্জা ভাতুড়িয়া-বাজু পরগনার চীলা-জোয়ার নামক স্থানে পৌঁছিয়া কছুদিন বিশ্রাম করিতে চাহিলেন। উক্ত জোয়ারের জমিদার পীতাম্বরও নন্ত বিদ্রোহী হইয়া মুঘল শিক্‌দারগণকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। খন বাদ্‌শাহী সৈন্য নিকটে আসায় তাহারা ভয়ে পলাইয়া আলাইপুরের মিদার বর্‌খুর্দারের পুত্র আলাবখ্‌শের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। মির্জা খন্ তখন সৈন্য লইয়া গিয়া আলাবখ্‌শের দুর্গগুলি দখল করিলেন।

এদিকে ইনাএৎ খাঁ মহদপুর বাঘোয়ান্* পৌঁছিয়া দেরি করিতে বাধ্য ইলেন, কারণ তখনও তাঁহার অধীনস্থ কয়েকজন ওম্‌রা আসিয়া যোগদান রেন নাই। তাঁহার প্রেরিত একদল সৈন্য—১৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ াতিক—গিয়া বাঘাণ গ্রাম লুট করিয়া পুড়াইয়া দিল এবং তথায় দুর্গ নির্মাণ রিয়া থানা স্থাপন করিল। এখানে ৪০০ অশ্বারোহী রহিল। বিজয়ী মুঘল নাপতি এই স্থান হইতে অনেকগুলি সুন্দরী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া দীতে পরিণত করিল।

* বর্তমান কৃষ্ণনগর শহরের ২০ মাইল উত্তরে, ভৈরব নদীর তীরে বাঘোয়ান বলিয়া একটি ন আছে। মহদপুর কৃষ্ণনগরের ৬ মাইল উত্তরে Mohatpur। (রেনেল ১ নং ম্যাপ।)

† বাঘা একটি সিদ্ধ সমৃদ্ধ মুসলমান কেন্দ্র ছিল। (১৩২৬ আশ্বিনের 'প্রবাসী' দেখুন।)

মহদপুর বাঘোয়ানে মির্জা নথন্ তোপ ও নৌকা সহ আসিয়া ইনাএৎ খাঁ সহিত যোগ দিলেন। তাহার পর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দিকে সকলে অগ্রসর হইলেন। আর পথে শিকার চলিতে লাগিল। মুঘলেরা ভৈরব হইতে ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া ক্রমাগত দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে যাইতে লাগিল।

মুঘল সৈন্য যশোহর-রাজের সীমানায় পৌঁছিয়া দেখিল যে প্রতাপাদিত্য সালকা* নামক স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়-আদিত্যকে খোজা কমলের অধীনে ৫০০ রণপোত এবং কৎলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁর অধীনে এক হাজার অশ্বারোহী ও ৪০টা হাতী দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে উদয় একটি উঁচু দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে জল দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল;—এক পাশে নদী, অপর পাশে একটি নালা, আর দুই পাশে গভীর পরিখা কাটিয়া তাহা ওই নদী ও খালের সঙ্গে যোগ করিয়া জলে পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রতাপের সৈন্য দুর্গে ও নৌকাগুলি নদীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

[৪]

প্রথম যুদ্ধ

এইরূপ স্থির হইল যে মুঘল সৈন্য নদীর দুই পাড় দিয়া কুচ করিয়া শত্রুদুর্গের দিকে অগ্রসর হইবে, মধ্যে নদী বহিয়া নওয়ারা চলিবে, এবং তীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহায্য পাইবে। প্রথম দল এই পাড়ে প্রধান সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর অধীনে রহিল। দ্বিতীয় দল মির্জা নথনের অধীনে রাতারাতি অপর পাড়ে (অর্থাৎ দুর্গের দিকে) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের সহিত—অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তী পাড় ঘেঁষিয়া—নওয়ারার এক এক অংশও চলিতে থাকিবে।

পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। কিন্তু উদয়-আদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন না। মুঘল সেনাপতিদ্বয় প্রত্যেকে দশখানা নৌকা পাহারার জন্য অগ্রে রাখিয়া, অপর নৌকাগুলির মাল্লাদিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহারা নামিয়া শত্রুদুর্গের পাশে দুটি দুর্গ নির্মাণ করুক।

এই কাজ অর্ধেক হইয়াছে এমন সময় উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়া

* বাঘোয়ানের ১৭ মাইল পূর্বে সোলোপা নামক একটি স্থান আছে। কার্সী পুথীর এক স্থানে নামটা "সোলকপা" পড়া যাইতে পারে; কিন্তু বিখ্যাত "শোলকুপা" এই স্থান হওয়া সম্ভব নহে। যশোহর জেলার মধ্যভাগে "সালকিয়া" আছে, কিন্তু তাহা মুঘলদের পথের অনেকটা পূর্বদিকে পড়ে।

াহির হইয়া আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোজা কমল তাঁহার অগ্রবর্তী বিভাগের সেনাপতি, এবং ওই খোজার সঙ্গে অনেক কেপারি, কোসা, ভলিয়া. াল, ঘুরাব (floating battery, gun-boat), মাচোয়া, পশ্‌তা ও জলিয়া galliot) জাতীয় নৌকা ছিল। অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমাল খাঁ পদাতিক ও হাতী লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে থাকিল। মহাশব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপর মুঘল নৌকাগুলি সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত শত্রু-আক্রমণের চাপ ওই বিশখানি বাদশাহী নৌকার উপর পড়িল, কিন্তু তাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না।

খোজা কমলের ঘুরাব্‌গুলি এবং ২খানা "পিয়ারা" নৌকা মিলিয়া দশখানা বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনাএৎ খাঁর দিকে যে দুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল তাহার পাড়ের নীচে তাড়াইয়া লইয়া গেল। তীরস্থ মুঘল সৈন্য ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে দুর্বল করিয়া একখানা ঘুরাব্ ও একখানা "পিয়ারা" কাড়িয়া লইল।

যুবরাজের সৈন্য ও মাল্লাগণ নিজ ঘুরাব্‌গুলি নজর করিয়াছিল; এজন্য তাহাদের লইয়া পলাইতে পারিল না। এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল। (অর্থাৎ এই জলযুদ্ধ স্থলসৈন্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হইল।)

নদীর অপর পাশে মির্জা নথনের দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শত্রুরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু তীর হইতে মির্জা, লস্কী রাজপুত, শাহ বেগ এবং অপর নেতারা নিজ নিজ অনুচর সহ তীর চালাইয়া শত্রু মাল্লাদিগকে বাধা দিতে এবং পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অগ্রসর হইয়া মির্জা নথন্ এরূপ স্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন যে, খোজা কমলের নৌ-বল তাঁহার পিছনে এবং উদয়াদিত্যের নৌ-বল তাঁহার অগ্রে এবং পাশে রহিল; সুতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ারা বিশৃঙ্খল এবং মাল্লাগণ হতভম্ব হইয়া পড়িল।

[অর্থাৎ সালামিসের যুদ্ধে পারসীক নৌ-বলের মত যশোহরের নৌবাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা এবং পরাজয়ের কারণ হইল। দ্বিতীয়ত, এই ছোট নদীর মধ্যে নৌকাগুলির লোক তীরবর্তী সবল দ্রুতগামী ও স্থলযুদ্ধে পরিপক্ক মুঘল সৈন্যের তীর ও বন্দুকের আক্রমণ নানা দিক হইতে পাইয়া

একেবারে অসহায় ভাবে হতাহত হইতে লাগিল। তীরভূমি উঁচু, সে হইতে দু পাশ দিয়া যে তীর ও গুলি আসিতে লাগিল, তাহা হইতে যশোহর মাল্লা ও সৈন্যগণের না ছিল রক্ষার স্থান, না ছিল পলাইবার পথ। স্থলসৈন্য জলসৈন্যকে পরাজিত করিল। মির্জা নথন্ তীর বহিয়া দ্রুত অগ্র হওয়ায় নদীস্থ যশোহরের নৌকার লম্বা শ্রেণী মাঝে কাটা পড়িল; পশ্চা বন্ধ; শুধু সর্ব-সম্মুখের কয়েকখানি নৌকার পলাইবার পথ খোলা রহিল। অ সব নৌকা এত ভিড় করিল যে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল, এবং হইতে মুঘল সৈন্যগণ তাহাদের উপর অব্যর্থ সন্ধান করিতে লাগিল।]

যখন উদয়াদিত্যের নৌবাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শত্রুকে আক্রমণ করি এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের গুলিতে খে মারা গেল। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস কাহারও রহিল না। জমাল তীর হইতে নিকটবর্তী মুঘলদের উপর তীর ও কামান চালাইতে লাগিল কিন্তু উদয় পলাইল।

[৫]

উদয়াদিত্যের পলায়ন

শত্রু-নৌবলের পরাজয়ের পর সমস্ত বাদ্‌শাহী এবং বাধ্য জমিদার নওয়ারা যশোহর নওয়ারা লুট করিতে লাগিয়া গেল। আর কোনদিকে নাই; সেনাপতির কথা কেহ শুনে না।

শুধু চারিখানি কোসা ও দুখানি অপর জাতীয় নৌকা উদয়ের পিছনে ত করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন এক "পিয়ারা" নৌকা, চারিখানা ঘুরাব্ এবং ফিরিঙ্গী-পূর্ণ একখানা মাচোয়া, ছয়খানি নৌকা প্রভুভক্তি দেখাইয়া নজর ফেলিল এবং বাদ্‌শাহী নৌকার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে কিছু সময় পাওয়া গেল। পরে যখন দিয়া মির্জা নথন্ ও অন্যান্য সৈন্য নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং এই শ নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, তখন বাদ্‌শাহী পশ্চাদ্ধাবনক নৌকার মধ্যে চারিখানি উহাদের লুট করিতে ব্যস্ত হইল। দুইখানি কোসা—(মির্জা নথনের নিজস্ব নৌকা, তাহার একখানিতে মহম্মদ খাঁ প অপরখানিতে মির মুহম্মদ লোদী মির-বহর নেতা)—মির্জাকে দেখিয়া লড় খাড়িরে উদয়ের নৌকার পিছু পিছু চলিতে লাগিল। নদীকূল দিয়া মির্জ

াহার অশ্বারোহী সৈন্য উদয়কে ধরিবার আশায় দৌড়াইতে লাগিলেন। শত্রু-
ৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে চালাইতে পলাইতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা নদীর এক অতি সংকীর্ণ অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল।
মনে নৌকার ভিড়ে পথ বন্ধ। মুঘল কোসা দুখানি উদয়াদিত্য যে
হলগিরি"* শ্রেণীর নৌকায় চড়িয়াছিলেন, তাহার দুপাশে আসিয়া পৌঁছিল।
ীরে মির্জা আসিলেই উদয় বন্দী হন আর কি।

এ মহাবিপদে উদয়ের অগ্রবর্তী দ্রুত পলায়মান কোসার মাল্লারা পলায়ন
ক্ষ করিয়া দাঁড় ছাড়িয়া বৈঠা হাতে লইয়া কোসাকে দ্রুত পিছাইয়া আনিয়া
হার পশ্চাৎভাগ উদয়ের মহলগিরির সামনের গলুইএর সঙ্গে ভিড়াইয়া দিল।
সময় মির্জার কোসা দুটির মাথা উদয়ের মহলগিরির হাল ছুঁইয়াছিল এবং
লেরা ওই মহলগিরিতে চড়িতে চেষ্টা করিতেছিল এবং উহার মাল্লা ও
ন্যগণ কেহ তীরে কেহ জলে লাফাইয়া পড়িল। মহা সঙ্কট। এইবার
য়াদিত্যের রক্ষা নাই।

কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে উদয় দুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিরি হইতে নিজ
গাসার উপর লাফাইয়া পড়িলেন, আর তৎক্ষণাৎ প্রভুভক্ত কোসার মাল্লাগণ
ণপণে দাঁড় টানিয়া এই নৌকাকে অপর সমস্ত পলাতক নৌকার আগে
ছাইয়া দিয়া বায়ুবেগে চলিতে লাগিল। যুবরাজের সম্পত্তি-ভরা "মহল-
রি" লুট করিবার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারিল না; মুঘল কোসা
খানেই থামিয়া গেল। উদয় বাঁচিলেন।

মির্জা নখন্ দুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে-চাপড়াইতে পাড় বহিয়া আরও
ছু দূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাঁহার কোসা নাই, কোনই ফল হইল না।

যশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২খানি নৌকামাত্র পলাইয়া গেল, অপর
গুলি (তোপ সহ) ধরা পড়িল।

উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমাল খাঁ হাতীগুলি সঙ্গে লইয়া দুর্গ হইতে
াহির হইয়া গেল। মির্জা নখন পরিখা পার হইয়া দুর্গে ঢুকিয়া বিজয়ের ভেরী
াজাইলেন। মুঘলগণ সেখানেই রাত কাটাইল।

---

* যে নৌকায় 'মহল' অর্থাৎ রাণীরা চড়েন। আবৃত বড় নৌকা।

[৬]

মুঘলদের কার্যকলাপ

যুদ্ধের পরদিন ইনাএৎ খাঁ কুচ করিয়া বুঢ়ন্* দুর্গে পৌঁছিয়া থামিলেন। মির্জা নথন্ রণশ্রমের জন্য নৌকায়ই শুইয়া রহিলেন। এই অবসরে তাঁহার স্থলসৈন্যগণ বুঢ়নে গিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি হাজার কৃষক-স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দাসী করিল।

মির্জা সেখানে পৌঁছিয়া এ কথা জানিতে পারিয়া এই হতভাগিনীদিগকে নিজ সেনানিবাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মুক্তি দিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রের সাহায্য করিয়া নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে সৈয়দ হকিম কন্দর্পপুত্র রামচন্দ্রণ রাজার দেশ বগলা আক্রমণ করিয়াছিল। তাঁহার সীমান্তের দুর্গ মুঘলেরা জয় করিয়া যখন দেশমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা পুত্রকে বলিলেন, "যদি তুই সন্ধি না করিস, আমি বিষ খাইয়া মরিব। তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর সহিত দেখা করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ এই জয়সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়া গিয়া নজরবন্দ করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ হকিমকে হুকুম দিলেন যে, দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনাএৎ খাঁর সাহায্য করুক। শত্রুজিৎ‡ রামচন্দ্রকে ঢাকা পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া যশোহর-অভিযানে যোগ দিলেন।

---

* ইহা 'বুঢ়ান' হইবে। "এখনও সাতক্ষীরা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে যমুনা ইচ্ছামতী হইতে কপোতাক্ষী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বুঢ়ান পরগণা।" (সতীশ মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ।) এই দুর্গ সাতক্ষীরা সব ডিভিসনের পশ্চিম প্রান্তে ইচ্ছামতী নদীর তীরে ছিল। রেমেল ১ নং ম্যাপে Burronhutty আছে, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের ৩৮ মাইল পূর্বে স্থিত। ইহার পূর্ব দিক দিয়া ইচ্ছামতী প্রবাহিত, নিকটে মোজাফরপুর, টাকী প্রভৃতি স্থান। এই বুঢ়ন হাটির একটু দক্ষিণে ইচ্ছামতী তিন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং এটা যুদ্ধের পক্ষে কাজের স্থান (strategic point)।

† ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা, রাজধানী মাধবপাশায়। (সতীশ মিত্রের ইতিহাস, ১ খণ্ড, ৪২১ পৃঃ।)

‡ এই শত্রুজিৎ কি যশোহরের শত্রুজিৎ-নগরের প্রতিষ্ঠাতা? (Westland, map.)

[৭]

দ্বিতীয় যুদ্ধ

জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরাজয়ে এবং দুই দিক হইতে দুই মুঘল সৈন্য কর্তৃক নিজদেশ আক্রমণের সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্য মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার নৌ-বল অর্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। তিনি ঠিক করিলেন যে মুঘল সেনানীকে মিথ্যা সন্ধির কথাবার্তায় ভুলাইয়া কিছু সময় লাভ করিয়া যশোহর হইতে দূরে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে আশ্রয় লইবেন। যশোহরের নদী হইতে একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া তিনি বুঢ়নে পৌঁছিলেন এবং মির্জা নথনের কাছে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন, "আপনার পিতা (ইহ্‌তমাম্ খাঁ) আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আপনি আমার ভাই। অতএব আমার মধ্যস্থ হইয়া আমাকে ইনাএৎ খাঁর নিকট লইয়া যান।" এই সংবাদ পাইয়া ইনাএৎ খাঁ নিজ দূত পাঠাইয়া উত্তর দিলেন, "যদি তোমার সত্য সত্যই এইরূপ মনের ইচ্ছা হয়, তবে কল্যই আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা কর। নচেৎ পরশু দিন আমি কুচ আরম্ভ করিয়া যশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি হইব। সেখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

পরদিন খাঁর দূত ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, প্রতাপের কথা মিথ্যা ও তাঁহার অভিসন্ধি কপটতা মাত্র। অতএব তৃতীয় দিবসে মুঘল সৈন্য অগ্রসর হইল এবং তাহার তিন দিন পরে খরাওন্‌ঘাট পৌঁছিল।

প্রতাপের দুর্গের এক পাশ দিয়া কাগরঘাটা* খাল এবং অপর পাশ দিয়া ভাগীরথী নদী বহিতেছিল। নদীতে তাঁহার অসংখ্য নৌকা; দুর্গমধ্যে হাতী, পদাতিক সৈন্য ও বড় বড় তোপ। এই সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইয়া তিনি শত্রুর অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ইনাএৎ খাঁ নদীর বাম পাড়ে রহিলেন, আর মির্জা নথন্ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপতন অগ্রাহ্য করিয়া নদী পার হইয়া দক্ষিণ কূলে পৌঁছিলেন। পরদিন প্রাতে দুই দল শত্রু দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল, মধ্যে বাদ্‌শাহী নওয়ারা চলিতে

---

* রেনেলের ১ নং ম্যাপে Cogregot এবং ২০ নং ম্যাপে Cogreeghat; যশোহর জেলার মির্জানগর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে। ইহার নিকটে নদী তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; একটি দিয়া উত্তর-পূর্বে প্রতাপাদিত্যের ও গড়কমলপুর যাওয়া যায়, অপরটি দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপের রাজধানী "প্রাচীন দুর্গ" ও ধুমঘাট অতি নিকট। আর, মধ্যে কদমতলীর প্রবাহ।

লাগিল। ভাগীরথীর যে শাখা যশোহরের পাশ দিয়া যায় তাহার মো প্রতাপের নৌ-বল খাড়া ছিল, তাহারা বাদ্‌শাহী নওয়ারা এবং ডাঙ্গার সৈন্য গোলগুলি সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। বাদ্ নওয়ারা মোহানা পর্যন্ত পৌঁছিয়া আর আগাইতে পারিল না, কারণ দুর্গ হ অজস্র অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। বাম দিকে, নদী সম্মুখে পড়ায় ইনাএৎ খাঁ অগ্রসর হইতে পারিলেন না; কিন্তু মির্জা নথন্, লস্কর রাজপুত এবং অ সেনানী দক্ষিণ পাড় বহিয়া কাগরঘাটার খালের ধার পর্যন্ত পৌঁছিয়া ঘোর করিতে লাগিলেন। সঙ্গে শুধু ৪০জন অশ্বারোহী এবং দশটি হাতী। দুর্গ হ গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মির্জা নথন্ জ অতি সাহসী ও ভক্ত অনুচর সহ হাতীকে খালের মধ্যে নামাইয়া দি দুর্গরক্ষকগণ তাঁহার দিকে কামান ফিরাইল, আর সেই অবসরে, মির্জা স পূর্ব আদেশ মত, বাদ্‌শাহী নওয়ারাও অবাধে বা অল্প বাধায় জোর ব মোহানা পার হইয়া নদীতে ঢুকিল এবং দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শত্র দুই দিকে মন দিতে পারিল না। প্রতাপের নওয়ারাও বাদ্‌শাহী নে গুলির কাছে পরাস্ত হইল, এবং মির্জা নথন্‌ও খাল পার হইয়া শত্রু জা পৌঁছিয়া হাতী ছুটাইয়া দুর্গদ্বারের দিকে গেলেন। বাদ্‌শাহী নৌ-ব মধ্যভাগও সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। মহাযুদ্ধ চলিল; হতাহতে স্তূপ হইতে লাগিল।

অবশেষে প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। মির্জা নথন্ দুর্গ জয় ক নাকাড়া ও ভেরী বাজাইলেন।

[৮]

প্রতাপাদিত্যের শেষ দশা

যশোহরে পৌঁছিয়া পরাজিত পিতাপুত্র মিলিত হইলেন। দুঃসময় বু জমাল খাঁ প্রতাপকে ছাড়িয়া কাগরঘাটায় মুঘলদলে যোগ দিলেন; এ বগলা হইতে অপর মুঘল সৈন্যদলও কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্র আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন, নচেৎ বৃথা সৈন্যবধ হইবে এবং সমস্ত র লুট হত্যা এবং অত্যাচারে ছারখার হইবে।

যেদিন বাদ্‌শাহী সৈন্য কাগরঘাটায় প্রথম শিবির করিল, প্রতাপ একখানি কোসায় চড়িয়া তথায় পৌঁছিলেন, সঙ্গে দুই জন মন্ত্রী।

নীতভাবে ইনাএৎ খাঁর তাম্বুর বাহিরে দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে মান্য করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা রিলেন।

স্থির হইল যে, বাদ্‌শাহী সৈন্য কাগরঘাটায় থাকিবে, এবং ইনাএৎ প্রতাপকে কায় সুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন, পরে তাঁহার যেরূপ আজ্ঞা তাহাই করা ইবে। চতুর্থ দিবসে ৪০খানা নৌকা লইয়া ইনাএৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওনা লেন। মুঘল সেনাপতিগণ কাগরঘাটায় সুন্দর সুন্দর কাঁচা ঘর (বাঙ্গলা) ধাণ করিয়া কয়েক মাস বাস করিতে লাগিল। এক-একখানার খরচ দেড় হার টাকা। বাক্‌ড়া* গ্রামে প্রতাপের ব্রাহ্মণ কটকী (দূত) বা মন্ত্রগুরুর ত মনোরম বাঙ্গলা ছিল।

ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং যশোহর প্রদেশ শোহী রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইনাএৎ খাঁ ইহার প্রথম শাসনকর্তা লেন, এবং বাদ্‌শাহী দেওয়ান পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা হইল যে, প্রজাদের না দিয়া যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় করা যাইতে পারে।

[প্রতাপকে কি লোহার খাঁচায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল? অসম্ভব নয়, রণ ঠিক এই সময় ঢাকা দুর্গের দুইজন বন্দী পাঠান জমিদার রক্ষীকে ধুতুরা-প্রত রুটি ও হালুয়া খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া, কারাদ্বার খুলিয়া রাত্রে বাহির া, নদীতে প্রস্তুত নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া যায়। তাহার পর ইসলাম খাঁ চয়ই কারাগারের বন্ধন কঠিনতর করেন।]

এইসব ঘটনার চারি বৎসর পরে ইস্‌লাম খাঁর পুত্র হুশঙ্গ পরাজিত আফ্‌গান স্‌মান খাঁ), বঙ্গীয় জমিদারগণ ও মগরাজা হইতে গৃহীত মূল্যবান লুটের গ্রী হাতী এবং কয়েকজন মগ সঙ্গে লইয়া আগ্রা গিয়া (১৬১৩ মার্চ মাসে) তার এইসব বিজয় উপঢৌকন বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে স্থাপন করেন। াপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না। (ইকবলনামা, ৬৯ পৃঃ) সুতরাং তিনি

* "কালীগঞ্জের নিকট, কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে, বাঁকড়া নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে লিঙ্গ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বাঁকড়ার পূর্বপারে ডামরেলীর বিখ্যাত নবরত্ন র দণ্ডায়মান আছে।" (সতীশ মিত্র, ইতিহাস, ৭০ ও ৭১ পৃঃ।)

নির্জানগরের ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে, কপোতাক্ষীর পশ্চিম পারে স্থিত বাঁকড়া গ্রাম (Rennell, ১) এ স্থান নহে।

আগ্রার পথে বন্দী দশায় কাশীতে পৌঁছিয়া যে মারা যান, এ প্রবাদ সত্য হইতে পারে। বাঙ্গলায় তাঁহার স্থান ছিল না।]*

[৯]

প্রতাপাদিত্য কি হত্যাকারী ?

জেসুইট্ পাদ্রীগণের বিবরণ অবলম্বনে লিখিত দ্যু জারিকের ইতিহাসে লেখা আছে যে ফিরিঙ্গী নৌ সেনাপতি ডোমিঙ্গো কার্ভালোকে চণ্ডিকানে রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। বেভ্‌রিজ সাহেব তাঁহার বাখরগঞ্জ গ্রন্থে বলেন যে এই রাজা প্রতাপাদিত্য। কিন্তু বহারিস্তানের পুঁথীর ১৬৮ পৃষ্ঠা স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে, এই অপবাদ মিথ্যা। ওই স্থলে লেখা আছে যে, ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাসিম খাঁ সুবাদারির প্রায় শেষাংশে মুঘলেরা যখন চাটগাঁয়ের মগরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভালুয়া হইতে অগ্রসর হয়, তখন ওই মগরাজা সমস্ত ফিরিঙ্গীদিগকে বন্দী ও হত করিতে চেষ্টা করেন, এবং কাপ্তান ডোর-ম-শ কার্ভালোর অধীনে ফিরিঙ্গীগণ মগপক্ষ ত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শব্দকেও ডো-আমোশ পড়া যাইতে পারে, ইহা কি ডোমিঙ্গো (Portuguese *Domingos*) শব্দের ফার্সী অপভ্রংশ ?

[১০]

উদয়াদিত্যের কথা

যখন ইনাএৎ খাঁ পরাজিত প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা চলিলেন এবং মুঘল সৈন্য বাগরঘাটায় ছাউনী করিয়া রহিল, সেই সময় উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্য মির্জা নথনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মির্জা নথন্ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মির্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং বস্ত্র ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঁঠালের ডালি দিয়াও পুছ না! আমি কি কেহ নই ? তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে। সেই দিনই দুপুর রাতে মির্জা সহন্ নিজ সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে এরূপ লুট ও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিলেন

* Baharistan, 5a, 9a and b, 49a—57b, 61b.

† আমার এখন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মনে হইতেছে যে ডোরমশ শব্দটা Rodrigues শব্দের ভুল।

শোহর আক্রমণের প্রথম হইতে এ পর্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই।
ারিস্তান, ৫৭ ক।)

সম্ভবতঃ এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে উদয়াদিত্য নিজের ও প্রজাদিগের
ও মান বাঁচাইবার জন্য আবার অস্ত্র-ধরিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিতেছেন, "তৃতীয় দিবসে ইনাএৎ কুচ আরম্ভ
ন। পথে তাঁহাকে কুশলীক্ষেত্রের মধ্যে দিয়া যাইতে হয়। [প্রতাপের
ধানী-দুর্গ হইতে ৮।১০ মাইল উত্তরে এবং যমুনা নদীর পূর্ব দিকে কুশলী-
য়।] এ দেশে প্রবাদ আছে যে এই কুশলীক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যের সহিত
াপ-পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের কয়েকদিবসব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই
উদয়াদিত্য কুশলীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রাজবংশীয় কেহ কেহ উক্ত
ীক্ষেত্রে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করিবার জন্য একান্ত
ক আছেন।"

এই প্রবন্ধে "যশোহর খুলনার ইতিহাস"-রচয়িতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত টীকা
াগ করিয়া দিয়াছেন :—

(১) রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১ খৃঃ প্রকাশিত) অনেক স্থলে
রিস্তানের বৃত্তান্তের অনুগামী; যথা,

"কতক কাল পরে [মান] সিংহ রাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে—আপনে ওজির
াম খাঁ চিশ্‌তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গলায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্থানের তিন হিস্‌সা
জ সাতে লইয়া থানা বথানা মারিপিট করিয়া সর-বসর আসিয়া সালিখার থানায় পৌঁছিলে
ার (অর্থাৎ প্রতাপের) প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত
হারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর
ছিয়াছে, ইহাতে রাজা ব্যাস্ত ছিলেন।* * *"

"এককালিন সসৈন্য বাইয়া ওজির (অর্থাৎ ইস্‌লাম খাঁর) সহিত দেখা করিলে ওজির
াকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি তোমার কর্ত্তব্য, লড়াই কি করেদ?' রাজা
লেন, 'না আমারা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি করেদ
।' এই মত তাহাকে পিঞ্জিরায় করেদ করিয়া" ইত্যাদি।

(২) ইনাএৎপুর—বর্তমান যশোহর শহর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে এই নামের একটি ক্ষুদ্র
আছে। উহা নদীর নিকট নহে এবং তথায় মুঘল সৈন্যের যাইবার কোন কারণ পাওয়া যায়
। সুতরাং উহা সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর নামানুসারে হইতে পারে না। কাকশিয়ালী খালের
ক্ষণে এবং প্রতাপের দুর্গের ৯ মাইল উত্তরে অপর এক ইনাএৎপুর আছে।

(৩) পীতাম্বর—পুঁটিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ভাতুড়িয়ার অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত
।।

(৪) বাঘাগ্রাম—এই বাঘাগ্রাম বাঘোয়ানের সন্নিকটে নহে। হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর অপর পারে যমুনার মোহানায় একটি দ্বীপ ছিল, উহা এক্ষণে একটি গ্রাম হইয়াছে, এই গ্রামকে বাঘার গ্রাম বা বাঘের গ্রাম বলে। "নদীয়া-কাহিনী" ৩৫১ পৃঃ দেখুন। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানই যশোহরের সীমান্ত, এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গঙ্গা হইতে তাহার পথও এই বাঘার পার্শ্ব দিয়া। সুতরাং ইনাএৎ খাঁর সৈন্যদল যে এইরূপ স্থলে পথের মুখে থানা স্থাপন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

[কিন্তু আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনীতে যে বাঘার বর্ণনা আছে তাহা এই হুগলী জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী বাঘের গ্রাম হইতে পারে না।—যদুনাথ সরকার।]

(৫) সালকা—সালকার স্থান নির্দেশ করা কঠিন। প্রতাপাদিত্যের অধস্তন রাজবংশীয়দিগের বংশগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালখিয়া নামক স্থানে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। রাজা বতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, কলিকাতার অপর পারে হাওড়ার যে সালখিয়া আছে, সেখানেই প্রতাপের দুর্গ ছিল। অর্থাৎ শত্রু যমুনার মোহানা হইতে দক্ষিণ দিকে আসিলে, প্রথমে জগদ্দল দুর্গ, পরে সালখিয়া দুর্গে তাহাদিগকে বাধা দিত। প্রাচীন ম্যাপে সালখিয়া (Salica বা Salkhia) খুব বড় করিয়া লেখা আছে। কিন্তু মোগল সৈন্য উক্ত সালখিয়ার দিকে গিয়াছিল কি না সন্দেহ হয়।

ইচ্ছামতী-কালিন্দীর মোহানায় দমদমার নিকট শালিখা দুর্গ ছিল, ইহাই আমার নিকট বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের বর্ণনা হইতেও তাহাই অনুমিত হয়।

(৬) খরাওন ঘাট—যশোহর দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে ইচ্ছামতীর কূলে কোন তাৎকালিক ঘাটের নাম "খরাওন ঘাট" হইতে পারে; এখন তাহার কোন চিহ্ন বা সে নামে কোন গ্রাম নাই।

(৭) কাগরঘাটা—পুরাতন যশোহর নগরীর পূর্ব দিকে ইছামতী নদীর পরপারে খাগড়াঘাট বলিয়া একটি স্থান আছে। সম্ভবতঃ ঐখানে আসিয়া মোগল সৈন্য নদী পার হইয়া পূর্ব দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। এই খাগড়াঘাটিকেই রেনেল সাহেব Cogregot করিয়াছেন। পুরাতন যশোহর দুর্গের পশ্চিমদিকে যমুনাকূলে কুকড়াঘাটা আছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এটি যুদ্ধের স্থান নহে।

(৮) ভাগীরথী—এখানে যশোহর দুর্গের পশ্চিমবাহিনী যমুনা নদীকেই ভাগীরথী বলা হইয়াছে, কারণ উহা ভাগীরথীরই একাংশ। যশোহরের সন্নিকটে যমুনাও তীর্থনদীর মত ব্যবহৃত হয়।

(৯) বাকুড়া বা বাঁকড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। উহা অনেক দূরে অর্থাৎ কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার উত্তরে বাঙ্গালপাড়া নামক একটি স্থান আছে, সেখানে অনেক বাঙ্গলা গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হয়তঃ মোগল সৈন্য সেইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বহুদিন বাস করিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য কটক হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিয়া যমুনাকূলে গোপালপুরের মন্দিরে স্থাপিত করেন। ওই বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি কটকী ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। তাঁহারা

লীর উত্তরাংশে রায়পুরে বাস করিতেছেন। উঁহাদের নিকট চাঁদরায়ের প্রদত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দের টি সনন্দ আছে।

জয়পুর রাজ্যের আম্বের দুর্গে মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে যে দেবামূর্তি লইয়া গিয়া স্থাপন করেন হার নাম "শিলাদেবী"—এটি "যশোরেশ্বরী কালী" নহে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

বায়ুপুরাণ-দা

কালবেলা। হারিসন রোড আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের একটা দোকান হইতে এক চাঙারি খাবার কিনিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিতেছিলাম। সকাল নয়টায় মেয়ে দেখিতে আসিবার কথা, গৃহিণী সাতটা না বাজিতে খাবার নিতে পাঠাইয়াছেন, এক কাপ চা খাইয়া লইবার সময় দেন নাই। দ্রলোকদের মেয়ে পছন্দ হইলে কত টাকা হাঁকিবেন ভাবিতে ভাবিতে াসিতেছিলাম। হঠাৎ হাত হইতে সজোরে ছিটকাইয়া চাঙারি রাস্তায় ড়িয়া গেল। চিলে ছোঁ মারিয়াছে। বেচারার পণ্ডশ্রম হইল। বুদ্ধিমতী হিণী খাবার আনিতে যাইবার সময় একখানি কাড়ন দিয়াছিলেন চাঙারি ধিয়া আনিবার জন্য। আমি মাত্র আদেশ পালন করিয়াছিলাম, কার্য-কারণ নুসন্ধান করি নাই। এই বিপদপাতে তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া মৎকৃত হইলাম। ব্যর্থমনোরথ চিলটা ভূপতিত চাঙারির উপর ছোঁ মারিবার তলবে নীচু দিয়া উড়িতে লাগিল, তৎক্ষণে সেটি তুলিয়া লইলাম। চিলের কৃতকার্যতায় মনে মনে হাসিতেছি, হঠাৎ অনেক দিনের আগের ঠিক এই কমের একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর একটা অব্যক্ত বিষাদে মথিত হইতে লাগিল।

বোধ হয় বছর পঁচিশ আগের কথা। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট হইতে বাহির ইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক এই রকম সকালবেলায় ঠিক এই মোড়ের মাথায় াসিয়াছি, এমন সময় একটা হৈ-চৈ আরম্ভ হইল, চারিদিক হইতে লোক দৌড়াইতে লাগিল। আমিও দৌড়াইলাম। ভিড় ঠেলিয়া একজন লম্বা গৌরবর্ণ অতি সুশ্রী চেহারার যুবক বাম বগলে একটি চিলকে চাপিয়া হাতের ঠোঁয় চিলের গলা ধরিয়া আসিতেছিলেন। চিলের এই অবস্থা দেখিয়া রাস্তার লোক নানা মন্তব্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে। তাহাদের মুখেই শুনিলাম, বাবুটি এক ঠোঙা খাবার লইয়া আসিতেছিলেন, চিল সেই ঠোঙায়

ছোঁ মারিয়াছিল। ঠোঙাটা পড়িয়া গিয়াছে মাটিতে, কিন্তু চিল আটক হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। অসম সাহসী কাণ্ড! তাজ্জব ব্যাপার! তামাশা দেখিতে তখন লোক ছুটিতেছে।

যুবকটিকে দেখামাত্র চিনিলাম বায়ুপুরাণ-দা। ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি একমুখ হাসিলেন। সম্মুখের উপরের সারির ভাঙা দাঁতটা নজরে পড়িল। রিভলবারের বাঁটের আঘাতে ভাঙিয়া ছিল। পুলিসের এক বড় সাহেবের পৌরুষের স্মৃতিচিহ্ন। এমনতর কাজ বায়ুপুরাণ-দার পক্ষেই সম্ভব।

অতি বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে চিনি। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ রায়। বায়ুপুরাণ উপাধি পাইবার তথ্য কি জানি না, ঐ নামেই আমরা তাঁহাকে ডাকিতাম।

স্টীমার-ঘাট হইতে আধ মাইল খানেক ভাটিতে পদ্মা একটা বড় বাঁক ঘুরিয়াছে। খাড়া পাড়, পাড়ের নীচে পদ্মার ফেনিল আবর্ত ও খরস্রোত একটু বাতাস উঠিলেই অশান্ত পদ্মা গর্জন করিয়া পাড়ের গায়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুঁড়িয়া মারে, হিস্‌স্‌ শব্দ করিয়া পাড়ের মাটি ভাঙিয়া গড়াইয়া নীচে নামে। পাড়ের উপর নারিকেল ও সুপারি গাছ বাবরীচুলওয়ালা আধপাগলা মানুষের মত মাথা নাড়িতে থাকে। আম-জাম-কাঁটালের বাগানে সর্‌সর্‌ শব্দে কানাকানি পড়িয়া যায়।

বাগান পার হইয়া পদ্মার ডাক ছোট বাড়িটার লোকের কানে পৌঁছায় না। লাল সিমেন্টের পাকা মেঝে, ভিতরে বাহিরে চুনকাম করা সাদা দেওয়ালের উপর টিনের চালের কয়েকখানা ঘর। গৃহস্থের বাড়ি, পরিষ্কার ছিমছাম, বাহুল্যবর্জিত। ধানের গোটা দুই মরাই, গোয়ালে দুই-তিনটা গরু, বাগানে কৃষ্ণকলি টগর মালতী জবা বেল স্থলপদ্মের গাছ, বাহিরের ঘরের সিঁড়ির দুই পাশে জুঁইফুলের গাছের বড় বড় ঝাড়। কাছেই কুয়া, চরকির দড়িতে ছোট বালতি বাঁধা। কুয়ার চারপাশে বাঁধানো। এক পাশে একখানা জলচৌকি, জলচৌকির কাছে ঝকঝকে মাজা পিতলের গাড়ু ও বড় ঘটি।

বাড়ির পিছনে কলা ও পেঁপের বাগান। এই বাগানের মধ্যে খানিকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার। এক পাশে মাটি কোপাইয়া ঝুরঝুরে করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে কুস্তির আখড়া, অন্য পাশে প্যারালালবারের পোস্ট। এইখানে সাকরেদদের সঙ্গে বায়ুপুরাণ-দার কুস্তি, মুগুর বারবেল লইয়া ব্যায়াম ইত্যাদি

লে। আখড়াটি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিলেও উহার অস্তিত্বের কথা লোকে বং পুলিসে জানে। সুন্দর স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি যে যুগে সরকারীচমুদের ন্দেহ ও ভয়ের উদ্রেক করিত, ইহা প্রায় সেই যুগের কথা।

ভিতরে দুইখানা রান্নাঘর। নিরামিষ রান্নার ঘরখানা ছিল একটা আশ্চর্য ংগ্রহের ভাণ্ডার। দেওয়ালের সঙ্গে তক্তা দিয়া র‍্যাক মত করা। র‍্যাকের উপর গুনতি কালো মাটির হাঁড়ি ও বড় টিনের কৌটা। অন্ত পাশে দড়ির শিকা ুলিতেছে, একটার পর একটা। এই শিকাগুলির উপর মাটির হাঁড়ি বসানো। ল আমলের পল্লীগ্রামের লোভী বালকের কল্পনায় পৃথিবীতে যতপ্রকার রসনা-্তিকর ও রসনা-উত্তেজক বস্তু থাকা সম্ভব, অর্থাৎ, মোয়া নাড়ু আচার, মারব্বা আমসত্ত্ব জাতীয় বস্তু, তাহাদের আশ্চর্য সংগ্রহ ছিল এই ঘরে।

যতদিন বায়ুপুরাণ-দার বিধবা বৃদ্ধা মা জীবিত ছিলেন, আমাদের মত ায়ুপুরাণ-দার বালখিল্য ভক্তদিগের তীর্থস্থান ছিল এই ঘরের অপ্রশস্ত দাওয়া। য়ুপুরাণ-দার আশ্চর্য সুন্দর হাসি ও তাঁহার মায়ের হাতের তৈয়ারি কুলের াচার ও আমসত্ত্ব, এই বালখিল্য দলের ইহার অতিরিক্ত আর কোন কাম্য স্তু ছিল না।

তাঁহার শক্তি ও সাহসের কথা কি বলিব জানি না। দুরন্ত পদ্মার খরস্রোত াটিয়া দুই মাইল দূরে সোজা সিমুলিয়ার চরে একা পাড়ি দিবার গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলছড়ি নদীতে ও হুরা সাগরে জল-ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদের ঘায়েল করা, সোনামুখীর জঙ্গলে লাঠির আঘাতে চিতাবাঘ ারা, লেজ ধরিয়া আছড়াইয়া গোখরা সাপ বধ ইত্যাদি অনেক গল্প জানা আছে। তাঁহার সাহস ও শক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার আজগুবি গল্পও আমাদের াছে অবিশ্বাস্ত ছিল না এবং এখনও অবিশ্বাস্ত নহে।

বাড়ি পলাইয়া তাঁহার সঙ্গে জ্যোৎস্নারাতে পদ্মায় নৌকায় বেড়াইবার কথা ধনে পড়ে। স্রোতের টানে ডিঙি ছাড়িয়া দিয়া বৈঠা হাতে তিনি গলা ছাড়িয়া গান ধরিতেন। গানগুলি কাহার রচনা জানি না, মনে আছে অনেকগুলির সুর খুব উদাসভাবের। গান বন্ধ করিয়া বাঁশি বাজাইতেন। তেমনই উদাস বাঁশীর সুর। মেঘশূন্য আকাশে বসিয়া চাঁদ রূপালী আলো ছড়াইতেছে, পদ্মার বিস্তীর্ণ বুকে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া সেই আলোতে মনে হইতেছে যেন দিগন্তবিস্তৃত ষা ক্ষেতের উপর দিয়া আমরা চলিয়াছি। দূরে বালির চর; কেহ যেন

একখানা সাদা কাপড় মাঠের উপর বিছাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে নৌকার কাছে শুশুক উঠায় নৌকা টলমল করিতেছে। আত্মবিস্মৃতভাবে সমস্ত সময়টা কাটাইয়া দিতাম।

ইহার কিছুদিন পরে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া আসিলাম, বায়ুপুরাণ-দার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল। ছাড়াছাড়ি হইল, কিন্তু আমরা কেহ কাহাকেও ছাড়ি নাই।

খবর পাইলাম, বায়ুপুরাণ-দা বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন আমাদের পরিচিত ওই গ্রামের এক দরিদ্র বিধবার মেয়ে সরসীকে। এই সংবাদে খুশি হইতে পারি নাই। বায়ুপুরাণ-দার পাশে সরসীকে দাঁড় করাইতে মন সঙ্কুচিত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রূপের কথা নাই ধরিলাম, বায়ুপুরাণ-দার পাশে দাঁড়াইতে পারে এমন রূপের মেয়ে কয়টি বা দেখিয়াছি? সরসীর স্বভাব ছিল হালকা রকমের, স্বভাব ও রুচিতে সে তাঁহার পাশে একেবারে বেমানান। শুনিলাম সরসীর মা আসিয়া বায়ুপুরাণ-দার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন মেয়েকে দুষ্ট লোকের হাত হইতে রক্ষা করিবার অসামর্থ্য জানাইয়া। ফলে তিনি সরসীকে একেবারে বিবাহ করিয়া বসিলেন।

এই অবিবেচকের মত কাজের ফল ভাল হয় নাই। তবে আমাদের মাপকাঠিতে তাঁহার কাজের বিচার করা চলে না, এ কথা বলা আবশ্যক। এই সহায়হীনা, দুর্বল, হালকা প্রকৃতির মেয়েটির সবল আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, অন্যের স্কন্ধে এই আশ্রয় দিবার ভার তুলিয়া না দিয়া তিনি নিজের স্কন্ধে তাহা তুলিয়া লইলেন।

এই সময়ে নবজাগরণের বন্যা পূর্বভারতের নিম্নভূমি হইতে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চভূমির দিকে প্রসারিত হইতেছে, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের গ্র্যানাইট প্রতিরোধ অতিক্রম করিয়া প্লাবন সাতপুরা ও সহ্যাদ্রি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্লাবনে ভূপৃষ্ঠ আর্দ্র ও পঙ্কিল, থাকিয়া থাকিয়া আলেয়ার আবির্ভাব ও বিলয় ঘটিতেছে। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখায়, বারুদের ধূমে নগর, গ্রাম ও মনুষ্যদেহ দগ্ধ হইবার বীভৎস গন্ধে ইউরোপের আকাশ ও বাতাস আচ্ছন্ন।

পৃথিবীব্যাপী উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় অতিস্থবির, গলিতঅঙ্গ, শিথিল উদ্যম ভারতবর্ষের হৃদপিণ্ডে নব সঞ্চালন দেখা দিয়াছে, পঙ্গু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অপ্রত্যাশিত আক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে।

একদিন কাগজে খবর বাহির হইল, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায়ী এক সাহেব কাম্পানির গাড়ি-বোঝাই মাল ঠিকমত ঘরে পৌঁছায় নাই, পথে কি বিভ্রাট ঘটিয়া কতক মাল অন্তর্হিত হইয়াছে।

উদ্বেগে, আশঙ্কায় বহু গৃহস্থের মুখ শুকাইয়া গেল।

আমহার্স্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের ব্যাপার ইহার কয়েকদিন আগের ঘটনা। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা বায়ুপুরাণ-দা আমাদের বাড়িতে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বেঞ্চিতে বসিয়া অনেক কথা তিনি বলিলেন।

যাহার অস্পষ্ট আভাস মাত্র একদিন জানা ছিল, তাহার অনেকখানি যেন পরিষ্কার হইল। ন্যায়-অন্যায়, সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিবার বয়স হয় নাই, যাহা তিনি বলিলেন তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করাও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইটুকু বুঝিলাম যে, বায়ুপুরাণ-দার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল, আর দেখা হইবে কি না সন্দেহ। এইটুকু জানিয়াই চোখ কাটিয়া জল আসিতেছিল, গাল বাহিয়া তাহা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি একটা সান্ত্বনার কথা বলিলেন না, কথা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সমস্ত পার্কটি অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে। গ্যাসের আলো ও দোকানের উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোর রেখা অন্ধকার পার্কের সীমান্তরেখা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

অবশেষে আমার পিঠে হাত দিয়া তিনি বলিলেন, ওঠ, বাড়ি যাও। বায়ুপুরাণ-দার জন্যে কাঁদবার কারণ নেই, তার মত হাজার হাজার লোককে হারাতে হবে। যত পুরুষে পাপ সঞ্চয় হয়েছে তত পুরুষ লাগবে সে পাপ ক্ষয় করতে। যা শুনলে মনে রেখো, যা দেখবে মনে রেখো, দরকারের সময়ে তাকে সাড়া দেবার জন্য আপনাকে তৈরি করবে।

পার্কের ফটক দিয়া বাহির হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, কোনমতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, সত্যি কি আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে?

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, জানি না ভাই, হতেও পারে, তবে আশা রেখো না।

তিনি অন্যপথ ধরিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ মনে হইল, গ্যাসপোস্টের আড়ালে দাঁড়াইয়া একজন লোক আমাকে লক্ষ্য

করিতেছে। আমি মির্জাপুর ষ্ট্রীট দিয়া গোলদীঘির দিকে দ্রুত পা চালাইলাম। আমার অনুমান ঠিক। লোকটা দূরে থাকিয়া আমাকে অনুসরণ করিতে লাগিল স্পষ্ট লক্ষ্য করিলাম। কাছেই একটা পানের দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় হইয়াছিল, অনেকগুলি লোক মিলিয়া কিসের গোলমাল করিতেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া একটু পরেই চট করিয়া রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনে ঢুকিয়া অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে সাহেব কোম্পানির অস্ত্রভর্তি বাক্স চুরির খবর কাগজে বাহির হইল। এই অসমসাহসিক চুরির কিনারা করিবার জন্য পুলিস উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ইহার কারণও ছিল। অস্ত্র চুরির পরেই প্রকাশ্য রাজপথে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটিল।

দেশের খবরে জানিলাম, বায়ুপুরাণ-দার বাড়ি তল্লাস হইয়াছে, তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

বোধ হয় মাস দুই পরে খবরের কাগজের এক কোণে খবর বাহির হইল বাঙালী বিপ্লবী বিশ্বাসরাম রায় পঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে ধরা পড়িয়াছিল হাজতে লইয়া যাইবার পথে সে পুলিসের হাত হইতে আশ্চর্যজনক উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়।

ইহার পর দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিক মিলিয়া জার্মেনিকে কোণ-ঠাস করিয়া আনিয়াছে। রুশিয়ায় বিপ্লবের ভূমিকম্পে রোমানফ বংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তুর্কীতে কামালপাশার তাড়া খাইয়া মধ্য-এশিয়ায় তাঁহার রোমাঞ্চকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য এনভার পাশা রুশিয়ার মধ্য দিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সরকারী তৎপরতায় ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্যম সাময়িকভাবে ভগ্ন হইয়াছে মনে হইল।

বায়ুপুরাণ-দা বলিয়াছিলেন, তাঁহার মত হাজার হাজার লোককে হারাইতে হইবে। তাঁহার মত কি না বলিতে পারি না, যাঁহাদের হারাইতে হইল তাঁহাদের সংখ্যা ঠিক কত হইবে জানি না।

বায়ুপুরাণ-দাকে বোধ হয় হারাইয়াছি। তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইব এ আশা নাই। তিনি যে বাঁচিয়া আছেন এ আশাও করিতে পারিতেছি না।

কয়েকদিন হইতে ভাবিতেছিলাম, একবার দেশে যাইব। গ্রামে একটা

পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তল্লাসীর ফলে সেটা তছনছ হইয়া গিয়াছে খবর পাইলাম। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের ছবি, রামকৃষ্ণকথামৃত, বিবেকানন্দের রাজযোগ, অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ, আনন্দমঠ ও নীলদর্পণ, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট ও গীতা, বঙ্গবাসী আপিস হইতে প্রকাশিত কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণ, সবগুলি সমান আপত্তিকর বিবেচিত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

যাইব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে যাওয়ায় বাধা পড়িতেছিল।

উত্তর-ভারতের এক বড় শহরে দেশী সৈন্যদলের ছাউনিতে প্রবেশ করিয়া বিপ্লব প্রচার করিবার চেষ্টা করিবার সময় একজন সন্ন্যাসবাদীর সহিত পুলিসের লড়াইয়ের সংবাদ বড় বড় হেডিং দিয়া কাগজে বাহির হইল। বিবরণ হইতে জানা গেল, আহত সন্ন্যাসবাদীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস পাহারার হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাড়ি একটা পুলের উপর দিয়া যাইবার সময়ে রিভলবারধারী রক্ষীর চোখের সম্মুখে সে চলন্ত গাড়ি হইতে নামিয়া পুল হইতে লাফাইয়া নদীতে পড়ে। তাহাকে আর ধরিতে পারা যায় নাই, তাহার মৃতদেহও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহার আঘাত যে প্রকারের তাহাতে বাঁচিবার কথা নহে। ইহার অল্প কয়েক দিন পরে অন্য একটি শহরে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের বিবরণ বাহির হইল।

সেদিন বোধ হয় শুক্রবার, কলেজে যাইবার জন্য ট্রাম-স্টপের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক একটা কাগজের স্লিপ সম্মুখে ধরিয়া জানিতে চাহিল, এই রাস্তা ও বাড়ি কোন্ দিকে পড়িবে। লেখাটা নাগরী অক্ষরে, কিন্তু পড়িতে পারিলাম না। তাহাকে সেটা পড়িতে বলিলাম। কি আশ্চর্য, আমাদের বাড়ির ঠিকানা! স্ত্রীলোকটি বোধ হয় কোন কাপড়ওয়ালী বা চুড়িওয়ালী।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ঠিকানায় কাহাকে চাই। সে কাগজে লিখিত প্রথম লাইনে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, অবনবাবু, অবনবাবু বিশোয়াস।

কৌতূহল বাড়িল। আমার কাছে ও কি চায়?

আমার মুখ দেখিয়া বোধ হয় সে বুঝিতে পারিল যে, হদিস মিলিয়াছে। বলিল, বহ আপকা নাম হ্যায়?

আমি উত্তর না দিয়া তাহার মুখের দিকে চাইলাম। সে মুখ কাপড়েওয়ালা বা চুড়িওয়ালীর মুখ নয়। প্রায় বীভৎস মুখ। কোন হিংস্র বন্য জন্তু আঁচড়াইয়া দেবীপ্রতিমার মত একখানা মুখকে বিকৃত, বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে। শুধু পদ্মদলের মত চোখ দুইটি, ঘন কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, রক্তাভ ওষ্ঠ দুইটি লুপ্ত সৌন্দর্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বয়স বেশি হয় নাই মনে হইল।

আমার দৃষ্টিপাতে তাহার পদ্মদলের মত সেই চোখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। একটু ম্লান হাসিয়া সে আমাকে বলিল, তুমি কেতাব নিয়ে পড়ছে বাচ্ছ? আজ যেও না, বড় জরুরী কাজ আছে। আমার সঙ্গে আসতে পারবে? কালীমায়ীর মন্দিরের ওদিকে যেতে হবে, সেখানে আমি বাসা নিয়েছি।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে কে, কে তাহার সঙ্গে যাইব—না জানিয়া কি উত্তর দিই?

সে একটু থামিয়া বলিল, তোমার ভাইয়ার একটা খত আছে তোমার নামে। একটা কেতাবও আছে। কেতাবটা সে লিখেছে ভওয়ানে ব'সে ভওয়ান জান? কোট কাঙড়ার ভওয়ান, যেখানে বরজেশ্বরী মায়ীর মন্দির আছে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, বইগুলি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল।

বই কুড়াইয়া লইলাম। একজন হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে আমার এতক্ষণ আলাপ রাস্তার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

বাড়ি পৌঁছিয়া তাহাকে আমার ঘরে বসাইয়া ভিতরে গেলাম। আমাদের আলাপের কাহিনী বর্ণনা করিয়া আমার মাকে লইয়া সে ঘরে আসিলাম। মাকে বলিলাম, মেয়েটি বাবুপুরাণ-দার কাছ হইতে আসিতেছে বুঝিয়াছি, তাঁহার কোন খবর রাস্তায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

মা আসিতে মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মা কিছুক্ষণ দেখিলেন, মেয়েটির মুখে একটু মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশু—বিশুনাথ কোথায়? সে বেঁচে আছে?

নেহিজী, বাবুজী বরজেশ্বরী মায়ীর কাছে চ'লে গেছেন।

তাহার চোখের জল টলটল করিতেছিল। মা কয়েক পা আগাইয়া গিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, নিজের পাশে তাহাকে বসাইলেন।

মাকে বলিলেন, তুই বাইরে যা এখন। মেয়েটা একটু ঠাণ্ডা হোক, আমি র কাছে সব জেনে নিচ্ছি।

আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বায়ুপুরাণ-দাকে মাও কম ভালবাসিতেন !

দুপুর গড়াইয়া গেল। শুনিলাম, মা তাহাকে স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া াইতে পাঠাইয়াছেন। বিকালে দাদা কোর্ট হইতে ফিরিলে গাড়িতে দাদার ঙ তাহাকে কালীঘাটে পাঠাইলেন, তাহার কি জিনিসপত্র আছে আনিবার ন্য।

তাহারা চলিয়া গেলে মা আমাকে ডাকিলেন।

মার কাছ হইতে মেয়েটির ইতিহাস শুনিলাম। পরে তাহার কাছে আরও থা শুনিয়াছিলাম, তাহা মিলাইয়া কাহিনী এইরূপ দাঁড়ায়।—

তাহার নাম পদম বা পদ্ম। জাতিতে সে গাদ্দি, ছত্রী। গাদ্দিরা পাহাড়ী ত, ভেড়া ছাগল মহিষ পালে। চম্বায় ধওলা ধরের ওপারে লাহাউল, াহাল, সেওরাজ বা কুলুতে তাহারা পশুপাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। শীতের গে চম্বা হইতে বোয়ার ও কালেন পাস হইয়া ধওলা ধর পার হইয়া কাঙড়া হাড়ে অনেকে নামিয়া আসে। যাহারা লাহাউলে থাকে তাহারা কুকটি পাস য়া চলে। গরমের সময়ে আবার সকলে ধওলা ধরের তুষাররেখা পার হইয়া য়া যায়। কোট কাঙড়া হইতে, ধরমশালা হইতে এই তুষাররেখা সারা সর দেখা যায়। গাদ্দিদের কোন কোন দল ব্যবসা করে। কাঙড়া ও কুলু তে লাডাকের বড় শহর লেহ্, ও চীনা তুর্কীস্তানের ইয়ারকন্দে যাইবার পথ ছে। রোহটাঙ পাসের বড় রাস্তা কাটিয়া এই পথ কুকটি পাসের মধ্য দিয়া য়া গিয়াছে। লাহাউল ও শিটি হইতে সিল্কাল, বড় লাচা ও তাকলিংলা া দিয়া ঘোড়া ও ইয়াকের পিঠে মাল লইয়া লাডাকে পৌঁছানো যায়। গাদ্দি বসায়ীরা এই পথে চলাচল করে।

পদ্মের বাপ মা নাই, ভাইদের কাছে থাকে। তাহার বিবাহের কথাবার্তা ছে, অনেক খরচ বলিয়া দেরি হইতেছে। তাহাদের তখন কাঙড়া তে ফিরিবার সময়। কথা হইল ফিরিবার আগে একদিন বরজেশ্বরী মায়ীকে ন করিতে যাওয়া হইবে। জ্বালামুখী তীর্থে একবার তাহারা মেলার সময় াছিল। কাঙড়া হইতে হামিরপুরের নাদাউন যাইবার পথে দেবীর মন্দির ।

ভারি তাজ্জব ব্যাপার! মন্দিরে দেবীর মূর্তি নাই, আগুনের শিখা লকলক করিতেছে। ভোজকী পাণ্ডারা সেই শিখায় ঘি ছিটাইতেছে আর টাকা আদায় করিতেছে। এবার কথা হইল, ভওয়ানে দেবী বরজেশ্বরী মায়ীর মন্দিরে যাওয়া হইবে। তাহারা কয়েকজন কোট কাঙড়ায় রওনা হইবে ঠিক হইল। কাঙড় বড় ভিজা জায়গা, তাহার দুইবার জ্বর হইয়াছিল। সে মনে করিল, একবার ডণ্ডি চৈরণ দেওতাকে পূজা দিয়া আসিবে, দেওতা জ্বর ভাল করিয়া দেন বড় রাস্তার একটু দূরে এক তেজবল গাছের নীচে দেওতার থান। পথে যাইতে একটা কাহু গাছ হইতে কয়েকটা শুকনা ডাল ভাঙিয়া লইল। ডাল ভাঙিয়া ছোট ছোট কাঠি করিয়া আটি বাঁধিয়া দেওতার পায়ে দিতে হইবে। এ দেওতার পূজায় ফুল লাগে না।

পূজা সারিয়া ফিরিয়া দেখিল, ভারি গোলমাল লাগিয়াছে। কি খবর আসিয়াছে, দলের লোক সারী পাস্ হইয়া সেওরাজ রওনা হইবার জন্য তৈয়ারি বরজেশ্বরীর মায়ীকে আর দর্শন করা হইল না। সেওরাজের কোঠি মণালী পৌঁছিয়া রোহটাঙ পাস দিয়া দল লাহউল মুখে চলিতে লাগিল। এই রোহটাঙ পাহাড় হইতে বিপাশ নদী বাহির হইয়াছে।

লাহাউলের কোকসারে যে দিন তাহারা পৌঁছিল, সে দিনের কথা বেশ মনে আছে।

বড় বড় কুকুরের পাহারাদারিতে ভেড়া ও ছাগলের পাল ছাড়িয়া দিয়া দলের মরদরা সন্ধ্যাবেলা সরাইখানার সম্মুখে বুড়া চেনার গাছের নীচে জড়ো হইল মদ খাইয়া স্ফূর্তি করিবার জন্য। স্পিটি ও কুলুর কয়েকজন ব্যাপারীও সেখানে আসিয়াছিল টাট্টুর পিঠে বোঝা চাপাইয়া। লাডাকের রুপশু হইতে বড় লাচা পাস হইয়া কয়েকজন ভোট ও অর্ঘুন ব্যাপারী আসিয়াছিল ইয়াকের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া। অর্ঘুনরা দো-আঁশলা জাত, ডোগরা, কাশ্মিরী বা তুর্কী বাপ আর ভোট মা। লোকগুলা দেখিতে শয়তানের মত, ব্যবহারেও শয়তান। গাদ্দি, গুজর ও লাহুলী মরদদের হাতে মধ্যে মধ্যে আচ্ছা মার খায়।

মরদরা মদ খাইয়া গান করিতেছে। মেয়েরা দূরে এক জায়গায় বসিয়া রুটি পাকাইতেছে, নিজেদের মধ্যে হাসি তামাশা গান করিতেছে। সরাইখানার দিকে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠিল। মশাল জলিতেছে, খানিকটা জায়গা বেশ আলো হইয়াছে। একজন দাড়িওয়ালা, ছেঁড়া ময়লা চলু ও কুর্তিপরা বিদেশী

াকের পিঠে একটা মাতাল অর্ঘুন মরদ উঠিয়াছে। পিছন হইতে দুই হাতে াহার গলা ধরিয়া পিঠে ঝুলিতেছে। আরও দুইটা মাতাল অর্ঘুন মরদ দুই াশ হইতে লোকটাকে ঠেলিতেছে, মারিতেছে, থুথু দিতেছে তাহার গায়ে। াকটা টলিতে টলিতে আগাইতেছিল। বোধ হয় খুব মদ খাইয়াছে।

পদ্ম ও আর কয়েকজন মেয়ে সরাইয়ের দিকে গেল। লোকটা তো ন্দুস্থানী, কোন্ মুলুকের কে জানে? পোশাকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, না- াইতে পাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। লোকটা আসিল কোথায় হইতে?

তিন-তিনটা জোয়ান অর্ঘুন শয়তান দুর্বল বিদেশী লোকটাকে মারিতেছে। াবড়া-নাক ভোটগুলা মদ খাইয়া হাসিতেছে আর তামাশা দেখিতেছে। াদ্দি মরদগুলার কি হইল? লোকটাকে যে মারিয়া ফেলিবে।

পদ্মর অসহ্য মনে হইল। আগাইয়া গিয়া সে একটা অর্ঘুন শয়তানকে াথি মারিল। গাদ্দি মেয়ের লাথি খাইয়া মাতালটা ছিটকাইয়া পড়িল। খনই উঠিয়া মুখখানাকে বিকট করিয়া পদ্মর দিকে চাহিতে লাগিল। াগাইতে সাহস পাইল না—গাদ্দি মরদদের ভয়ে।

ইহার মধ্যে একটা খেল হইয়া গেল। বিদেশী দাড়িওয়ালা লোকটা ডান াত বাড়াইয়া পিঠের অর্ঘুন শয়তানটার ঘাড় ধরিল, বাঁ হাতে গলা ছাড়াইয়া ইয়া লোকটাকে শূন্যে তুলিয়া জোরে মাটিতে ফেলিয়া দিল। লোকটা য়েকবার গোঁ-গোঁ করিয়া চুপ হইয়া গেল। অন্য অর্ঘুনটাকে ধরিতে যাইতে স দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। রোগা লোকটা আশ্চর্য কায়দায় তাহার ায়ে এমন লাথি মারিল যে সে হুমড়ি খাইয়া পাথরের উপর পড়িয়া গেল।

বিদেশী লোকটা পদ্মর দিকে কয়েক পা সরিয়া আসিল। একমুখ হাসিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইল। তারপর পেটে একবার হাত দিয়া তাহার দিকে াত পাতিল।

গাদ্দি মরদরা এতক্ষণে আগাইয়া আসিল। তাহাকে ঘিরিয়া নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। লোকটা কথা বলিতে পারিতেছে না, সেইখানে বসিয়া পড়িল। পদ্মরা কয়েকজন দৌড়াইয়া গিয়া খানিকটা দুধ আনিয়া তাহাকে খাওয়াইল। রাত্রে পদ্মরা তাহাকে ভাল করিয়া খাইতে দিল। দুই দিনের মধ্যে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

তাহার কাছে শোনা গেল, সে বড়লাচার পথে লাডাকের রুপসু যাইতেছিল।

সঙ্গের খাবার ফুরাইয়া যাওয়াতে না খাইয়া আর চলিতে পারিতেছিল না। পথে ভোট ও অঘুর্ন ব্যাপারীদের সঙ্গে দেখা। তাহাদের পিছনে পিছনে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা দুই-চার দিন কিছু খাইতে দিয়াছে, তারপর আর বড় দিতে চাহে নাই। তবু পেটের দায়ে কুকুরের মত সে তাহাদের পিছু পিছু আসিয়াছে।

একা সে লাহাউলে কি করিয়া আসিল, একা বড় লাচার পথে কি করিয়া যাইতে সাহস পাইল, হিন্দুস্থানের লোক হইয়া এ মুলুকে কি কাজে আসিয়াছে এ সব কথার কোন জবাব তাহার কাছে মিলিল না।

মাসখানেকের মধ্যে সে পাকা গাদ্দি রাখাল বনিয়া গেল। ভারি কাজের লোক। দলের সঙ্গে চলে, কাজ করে। কোন তলব নাই, শুধু খোরাকি। পদ্মর ভাইরা, দলের লোক তাহাকে ভালবাসে, তাহার কথা শোনে। দিন কয়েকের মধ্যে সে গাদ্দিদের গান শিখিয়া ফেলিল। তাহার মত বাঁশী কোন গাদ্দি ছোকরা বাজাইতে পারে না। লাহাউল হইতে দক্ষিণে ধওলাধর। ধওলাধর পার হইয়া পূর্বে চম্বা। অবসর সময়ে সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দেওদার গাছের নীচে বসিয়া হালকা নিগল বাঁশের নিজ হাতে তৈয়ারি বাঁশি বাজায়। গাদ্দি ছেলে গাদ্দি মেয়েরা আসিয়া বসিয়া বসিয়া বাঁশি শোনে। গাদ্দিরা নাচগান বড় ভালবাসে। তাহাদের মন বড় নরম। বাঁশি শুনিয়া কেহ কেহ কাঁদে, কি উদাস সুর সে বাঁশীর! গাদ্দিদের হালকা গানও সে উদাস সুরে গায়।

পদ্মর মনে হয়, উহার মনে কিসের দুঃখ আছে। হয়তো জীবনে দাগা পাইয়াছে। নহিলে দেশ ঘর ছাড়িয়া ধওলাধরের ওপারে গাদ্দেরানে, গাদ্দিদের মুলুকে আসিবে কেন? গাদ্দিদের ঘর নাই, তাহারা সারা জীবন এ-পাহাড় ও-পাহাড় করিয়া বেড়ায়। উহার তো ঘর আছে, ও হিন্দুস্থানের লোক কিসের জন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে? পদ্মকে কি উহার মনের কথা বলিবে না?

বছর ঘুরিয়া আসিল। আবার তাহারা কাঙড়া নামিতেছে।

পদ্ম উহার সব কথা এতদিনে জানিতে পারিয়াছে। উহার নাম হইয়াছে—করমচাঁদ; কিন্তু পদ্ম জানে উহার নাম বিশ্বনাথ, হিন্দুস্থানের পূর্বে বঙ্গাল মুলুকের লোক সে। কিসের দুঃখ করমচাঁদের তাহাও সে শুনিয়াছে। ভারতমাতার বন্ধন ঘুচাইবার জন্য সে জান কবুল করিয়াছে; এই কাজ ছাড়া আর কোন দিকে

হার চোখ নাই, মন নাই। কেন সে গাব্দি-মুলুকে পালাইয়া আসিয়াছে, হাও শুনিয়াছে। পদ্মকে এত কথা বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছে, কিন্তু তাহার ল একটুও নরম হয় নাই। পদ্ম তাহার পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিয়াছে, সেই য়; যাহার দিকে রাহী লোক বার বার চাহিয়া দেখে, যাহাকে সাদী করিবার স্ত গাব্দি নওজোয়ান দল পাগল। পদ্ম কাঁদে, করমচাঁদ একটু হাসিয়া তাহার ঠে ও মাথায় হাত বুলায়। মানুষটা বাঙ্গাহালের একখানা পাথর, না, দেওতা, ম্ম বুঝিতে পারে না।

না বুঝিতে পারুক, পদ্ম উহাকে ছাড়িতেছে না। সব সময়ে উহাকে চোখে াখে রাখিবে যাহাতে না পলাইতে পারে। যেখানে যাও, পদ্মকে সঙ্গে ইতে হইবে। গাব্দিমেয়ে পদ্মকে সে চিনে নাই। এ পদ্ম পাথরের পদ্ম।

কাণ্ডড়ায় নামিতে নামিতে করমচাঁদ উশখুশ করিতে লাগিল। পদ্ম বুঝিতে ারিল, লক্ষণ মন্দ। সত্যই একদিন সে পলাইল। সে কথা ভাবিয়া এখনও াহার হাসি পায়। সে চলিয়া গেলে দলের লোকেরা কি আর করিবে! সে লাইল পদ্মের ভয়ে, পদ্ম জোর করিবে ভয়ে।

মানুষটা একেবারে অন্ধ। দুই দিন দুই রাত চলিয়া কোট কাণ্ডড়ায় ীছিল। পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল না, একটা মোট মাথায় করিয়া পদ্ম ের থাকিয়া সঙ্গে আসিতেছে। কেল্লার নীচে বনগঙ্গার ধারে আসিয়া সে ধরাইতে বসিল। পদ্ম একটু দূরে মোট নামাইয়া বসিল। তারপর মোট হইতে কতকগুলি সেব, আখরোট, জুলদারু, আখি ও আরু ফল আঁচলে করিয়া ীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া বসিল। বসিয়া ফলগুলি তাহার কোলের উপর ামাইয়া দিল।

ভারি চমকিয়া উঠিল করমচাঁদ। আর একটু হইলে বনগঙ্গার খাড়া পাড় ইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইত। বলিল, পদ্ম তুমি?

তাহার ভাব দেখিয়া পদ্মর বড় হাসি পাইল। হাসিয়া সে বলিল, জী াবুসাহেব, ম্যয় পদ্মম হুঁ। পদ্মম বঙ্গাল মুলুককো জাতী থী, ভগোয়ান নে াপকে সাথ ভেট করা দিয়া। আপ কঁহা জাতে হৈঁ?

ভারি রাগ করিল করমচাঁদ।

এ তুমি কি কাজ করলে পদ্ম?

পদ্ম আবার হাসিয়া বলিল, বহুৎ আচ্ছা কাম কিয়া পদ্মম। ইস্‌সে আচ্ছা

কাম কোই গাদ্ধি লড়কী নেহি কর সকৃতি। কাহে ঘাবড়াতে বাবুজী? দেখি তো পদম কি তরফ বহ কৈসী আচ্ছী লড়কী হ্যায়।

রাগ করিয়া করমচাঁদ মুখ ফিরাইল বনগঙ্গার ওপারে। পদ্ম একটু হাসি বলিল, বাবুজী, রাগ ক'রো না। পদ্মর আর কোন উপায় আছে বলতে পার তুমি যদি না চাও পদ্মকে, মুখের একটা বাত খসাও, পদ্ম বনগঙ্গায় লাফ দি ম'রে যাক।

এক বছর তাহারা ভওয়ানে বাস করিল। পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে কাঙ শহর, উত্তর দিকের ঢালে ভওয়ান। এইখানে বরজেশ্বরী মায়ীর মন্দির পাহাড় বনগঙ্গার উপরে খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের মাথায় নগরকোটে রাজপুত রাজাদের কেল্লা। বাবুজী এই কেল্লার অনেক কথা পদ্মকে বলিয়াছেন আগে ইহার নাম ছিল ভীম কেল্লা।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলে গোরখা লোক কাঙড়া আক্রমণ করে পুরা এক বছর তাহারা কেল্লা অবরোধ করিয়া রাখিল, দখল করিতে পারিল না রণজিৎ সিংহের ফৌজ আসিয়া গোরখাদের হঠাইয়া দিল, কিন্তু তাহারা কে দখল করিতে পারিল না। কাঙড়া রাজার সঙ্গে শিখদের সন্ধি হইল, তখ তাহারা কেল্লা হাতে পাইল। শিখলোক অন্য জায়গায় লড়াইতে হারিয়া গে আংরেজ কেল্লা হাতে পাইল বিনা লড়াইতে। হাজার বছর আগে গজনী মাহমুদ এই কেল্লা দখল করিয়াছিল। কেল্লার ফৌজ গিয়াছিল লড়াই করিতে দূরে। চোরাপথে মাহমুদ কেল্লার সম্মুখে হাজির হইল। কেল্লায় তখন ভোজকী পাণ্ডারা ছিল। তাহারা বাধা দিল। তিন দিনের দিন মাহম কেল্লায় ঢুকিল। ভওয়ানের মন্দির ও কেল্লা লুট করিয়া মাহমুদ পঞ্চাশ ম সোনা-রূপার থালা বাটি, পাঁচ মণ সোনার তাল, পঞ্চাশ মণ রূপার তাল, আ মণ হীরা মুক্তা ও সাত লক্ষ মোহর গজনীতে লইয়া গেল। শহরের বাহিরে এ খোলা মাঠে হিন্দুস্থানের লুটের মাল সাজাইয়া প্রজাদের ডাকিয়া দেখাইল বাবুজী এই কেল্লার আরও অনেক কথা বলিয়াছিল, সব মনে নাই।

ভওয়ানে বরজেশ্বরী মায়ীর কৃপায় তাহারা সুখে ছিল। সেখানে অনে শিখলোক আছে। বাবুজী তাহাদের কাছে কাজ করিত, টাকা পাইত তাহাদের জন কয়েকের সঙ্গে দোস্তি হইয়াছিল। পদ্ম বাবুজীর খেদমৎ করিত, তবিয়ত খারাপ হইলে যত্ন করিত, ইহাতেই তাহার সুখ। সে তে

বুজীর কাছে ধন দৌলত, লড়কা লড়কী চাহে নাই, চাহিয়াছিল তাহার কাছে কিতে, তাহাকে দেখিতে। বাবুজীর ঘরে তো বহু ছিল, বহু লইয়া ঘর রিবার মানুষ সে নহে। ভওয়ানে থাকিতে কাজ কাম সারিয়া বাবুজী তে একটা কেতাব লিখিত। কেতাবে কি লিখিতেছে মাঝে মাঝে পদ্মকে নাইত। বাবুজীর কাছে ভগোয়ান ছিল ভারতমাতা, দুসরা ভগোয়ান সে নিত না।

এক বছর বাদে কি খবর আসিল পদ্ম জানে না। চার জন শিখ দোস্তকে ে লইয়া বাবুজী কাণ্ডড়া ছাড়িলেন।

কাণ্ডড়া ছাড়িয়া সবাই বানারস আসিল। বাবুজী বলিলেন, পদ্ম তোমার ঠিক করিয়া দিলাম, তুমি এইখানে থাক। আমরা অনেক জায়গায় ঘুরিব, নেক ঝামেলা হইবে। দুই-চার রোজ বাদ বাদ আমি তোমার কাছে াসিব। আমার দোস্তরা কেহ আসিলে থাকিবে।

বাবুজী চলিয়া গেল, পদ্ম একা রহিল। ছোট গলির মধ্যে একজন পাঞ্জাবীর ড়িতে ঘর লইয়া পদ্ম সংসার পাতিল। বাবুজী আসে, একদিন দুইদিন কে, আবার চলিয়া যায়। খুব ব্যস্ত, একটা বড় রকমের কোন ব্যবস্থা তেছে বুঝা যায়। কোন দিন আসিয়া পদ্মকে একবার দেখিয়া তখনই চলিয়া য়। পদ্ম কিছু খাবার করিয়া দিবার সময় পায় না। এত দুঃখ হয় পদ্মের।

কয়েক দিন বাবুজী আসে না। এদিকে দুশমন লোক পদ্মের পিছনে গিয়াছে। সে একা থাকে দেখিয়া তাহাদের সাহস বাড়িয়াছে। এ তো দ্দেরান নয়। হিন্দুস্থানের লোকের মুখ দেখিয়া বুঝা যায় না, কে শয়তান আর সাধু। এখানে শয়তানরা সাধুর মত চলে। বিপদ তাহাতে বাড়িয়াছে। গ করিয়া সে একখানা সরু ধারালো মুখের কাঠের চিরুনি কিনিয়া আনিল। বুজী তো চোখ তুলিয়া দেখে না পদ্মের মুখ, কি হইবে সুন্দর মুখ লইয়া? াঠের শক্ত চিরুনি দিয়া রাতে সে দুই গাল আর কপাল আঁচড়াইতে লাগিল। মড়া ছিঁড়িয়া গেল, মাংস কাটিয়া গেল, রক্তে কাপড়, ঘরের মেঝে ভাসিয়া ল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল।

শেষ রাত। ঘোর তখনও কাটে নাই। ঘরের দরজা কে ঠেলিতেছে নে হইল। উঠিবার শক্তি নাই। কোন মতে উঠিয়া পদ্ম ভিজা কাপড় য়া মুখ মুছিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া একটা ভোজালি হাতে দরজার পাশে

দাঁড়াইল। দুইজন শিখ দোস্ত বাবুজীকে ধরিয়া ঘরে আনিয়া কম্বলের উপ শোয়াইয়া ছিল। তাহারা বলিল, কোন শব্দ করিও না, বাবুজীর শেষ সময় আমরা গাড়ি আনিতেছি, বাবুজীকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। দুশমন লো যেন কিছু জানিতে না পারে।

তাহারা চলিয়া গেল।

পদ্ম বাবুজীর গায়ের জামা খুলিয়া দিল। পিঠে বড় একটা ফুটা হইয় গিয়াছে। নিশ্বাস পড়িতেছে কি না, পদ্ম বুঝিতে পারিল না। মুখ হাত প সাদা, ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

কানের কাছে মুখ নামাইয়া পদ্ম বলিল, বাবুজী, তোমার কাজ তো শে হয়েছে, এইবার পদ্মকে একটু আদর কর। বাবুজী, ও বাবুজী—

বানারস শহর হইতে একটু দূরে গঙ্গার বুকের কাছে মাটির মধ্যে বাবুজী তাহার শিখ দোস্তরা শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কাছে বরুণার ঘাট। গঙ্গা পাড়ে একটা চাঁপা গাছ, সে দিকে মুখ ফিরাইয়া হেলিয়া আছে। পদ্ম সে ঘাটে প্রদীপ জ্বালাইয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেয় বাবুজীর আত্মার মঙ্গলকামনায়।

* * *

কালীঘাট হইতে ফিরিতে পদ্মর একটু রাত হইল। বায়ুপুরাণ-দার চিঠি বই সে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আমার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল ভাইয়া, আমার তো কিছু রহিল না,—তার কোন জিনিস আমার কাছে রহিল না।

বায়ুপুরাণ-দার বইয়ের কথা সময় হইলে পরে বলিব। চিঠিতে অন্য কথা পরে লিখিয়াছেন, পদ্মকে একটু দেখিও।

মা অনেক চেষ্টা করিলেন পদ্মকে তাঁহার কাছে রখিতে, সে রাজী হইল না বানারস ছাড়িয়া সে আর কোথাও থাকিতে পারে না। বরুণাঘাট ছাড়িয় সে কোথায় যাইবে? বলিল, যদি বাঁচিয়া থাকি মাঝে মাঝে আসিব তোমাদের দেখিয়া যাইব।

মা তখন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন তাঁহার দাদার বাড়ি আছে গোধুলিয়ায় সেইখানে পদ্ম থাকিবে। সে রাজী হইল।

আমি তাহাকে রাখিয়া আসিতে চলিলাম। সেই ঘর আর বরুণার ঘা

রখিয়া আসিলাম পদ্মের সঙ্গে। বরুণার ঘাটে তাহার প্রদীপ ভাসানো রখিলাম।

আসিবার আগে তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি আমার বড় ান। এমন করিয়া তোমাকে ফেলিয়া যাইতে মন চাঁহিতেছে না। তাই ামার একটা আদরের জিনিস তোমাকে দিলাম।

পকেট হইতে একখানা বড় খাম বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। খাম লিয়া সে বাহির করিল একখানা ফোটো—বায়ুপুরণ-দা হাসিতেছে, সম্মুখে কটা দাঁত ভাঙা। একখানা হাত আমার কাঁধে।

ফোটো পাইয়া পদ্মের সে দৃষ্টি কোন দিন ভুলিব না। জীবনে আর কোন াজ করিয়া এত কৃতার্থ বোধ করি নাই।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পদচিহ্ন

গৌরীকান্ত দরজা খুলে দিল। কাশীর বউ তাকে প্রশ্ন করলেন, কার সঙ্গে থা বলছিলি গৌরী?

গৌরীকান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, এখানে একজন ইণ্টার্নি এসেছেন ।, তিনি এসেছেন।

চমকে উঠলেন কাশীর বউ। ভারত-রক্ষা-আইনে সন্দেহভাজন যুবকদের ামে গ্রামে অন্তরীণ ক'রে রাখা হচ্ছে সে তিনি জানেন; গোয়ালপাড়ায় কজন ইণ্টার্নি আসবে এ কথাও কে যেন বলছিল। গোয়ালপাড়া থেকে ই রাত্রে সে গৌরকান্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে!

গৌরীকান্ত বললে, নলিনীদাদের দলের লোক। নলিনীদা নেই মা। তিনি ারা গেছেন।

মারা গেছে নলিনী?

হ্যাঁ মা। ঢাকায় পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে গুলি খেয়ে মারা গেছেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কাশীর বউ। ওদিকে মৃদু জুতার শব্দ ধ্বনিত হয়ে ঠল। গৌরীকান্ত বললে, এখানে নয় মা, বাড়ির ভিতরে এস। উনি চ'লে াবেন এইবার।

বাইশ-তেইশ বছরের সবলদেহ উজ্জ্বলদৃষ্টি প্রদীপ্তমুখ একটি তরুণ। গৌর তাকে বললে, আমার মা।

ছেলেটি হেসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে, চলি মা। রাত্রি শেষ হয়ে এল।

গৌরীকান্ত বললে, ওঁকে গলিপথে বাউরীপাড়াটা পার ক'রে দিই মা। বাউরীপাড়ার মোড়ে বটতলায় রসরাজ ব'সে আছে। সে-ই ওঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে।

কাশীর বউ মৃদুস্বরে বললেন, যাও।

ওরা চ'লে গেলে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গৌরীকান্ত কি করছে? এ কোন্ পথে চলেছে সে? সমস্ত নবগ্রাম ঘুমে ঢ'লে পড়েছে গৌরীকান্তের চোখে ঘুম নাই। সে বিপ্লবীদের সঙ্গে ব'সে রচনা করছে রক্তাক্ত ভবিষ্যতের কল্পনা। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কাটার মতই অন্ধকার রাত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত বর্তমানের তলদেশে ভবিষ্যতের পথ রচনা করছে। কিন্তু এর জন্যে তো দায়ী তিনি নিজে। তাঁর অঞ্চল অবলম্বন ক'রেই তো এসেছিল এই ভাব বস্তু। তাঁর সম্বন্ধ ধ'রেই এ গ্রামে এসেছিল তাঁর ভাই রবি। রবিকে পুলিস ধরেছিল এখানেই। রবির জন্য বাড়িতে খানাতল্লাসী হয়েছিল, তাঁকে পুলিসের কাছে জবানবন্দী দিতে হয়েছিল। তিনিই গল্পচ্ছলে এ ভাববাদের ভিত্তি পত্তন করেছেন গৌরীকান্তের মনে। তার উপরে এসে লেগেছে সমগ্র দেশের অন্তরে ভাবরম্ভার উচ্ছ্বাস। এখানকার সকলের অন্তরেই হয়তো সে বন্যা খানিকটা নতুন মাটির প্রলেপ রেখে গেছে; নূতন পৃথিবী পত্তন হয়তো সব অন্তরে শুরু হয়েছে, কিন্তু তাঁরই জন্য গৌরীর অন্তরে সে মাটি জমা হয়ে গ'ড়ে উঠেছে নূতন দ্বীপ।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ হাত ধুয়ে ফেললেন। তারপর কাপড় ছেড়ে বারান্দার উপর ইষ্টস্মরণে বসলেন। আজ সন্ধ্যায় ইষ্টস্মরণের পর আর তাঁকে স্মরণের অবসর হয় নি। অমূল্যের স্ত্রীর কি ভয়াবহ আত্মহত্যার চেষ্টা শিউরে উঠলেন তিনি। এর জন্যেও শৈল আজ তাঁকে দায়ী করেছে। দায়ী কি তিনি? হে ভগবান, হে নারায়ণ, এ তুমি কোথায় এনে ফেলছ আমাকে মা!

চোখ মেলে তিনি তাকালেন। গৌরী ফিরে এসেছে। বললেন, দরজাটা
ন্ধ ক'রে গিয়ে শুয়ে পড়্ বাবা।

আবার তিনি চোখ বন্ধ ক'রে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ক'রে বীজমন্ত্র জপের কর-
ণনা আরম্ভ করলেন।

জপ ঠিক শেষ হ'ল না। কোন মতে সারা হ'ল। মনের মধ্যে ইষ্টমূর্তির
দলে বার বার জেগে উঠল নলিনীর ছবি আর অমূল্যের স্ত্রীর ছবি। এক-
একবার মনে হ'ল, অন্ধকার কোণে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে বিশু। সঙ্গে সঙ্গে চোখ
লে প্রতিটি কোণের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

জপ সেরে উপরে এসে দেখলেন, গৌরীকান্ত তখনও ব'সে রয়েছে। তিনি
ললেন, এখনও শুস নি গৌরী? শুয়ে পড়্।

ঘুম আসছে না মা।

কাশীর বউ কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন,
লিনীর কথা ভাবছিস? বলতে বলতেই তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল জলের
ারা।

গৌরী তাঁর কথার জবাব দিলে না। নীরবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে
চয়ে রইল। কাশীর বউয়ের চোখের জল সশব্দে ঝ'রে পড়তে লাগল একখানা
খোলা খাতার উপর। সেই শব্দে কাশীর বউ তাকালেন খাতাখানার দিকে,
চোখের জলে লেখার কালি মুছে যাবে। খাতাখানার দিকে তাকিয়ে তিনি
বিস্মিত হয়ে গেলেন। এ কি! এ যে তাঁর স্বামীর ডায়েরি। বাপের
ায়েরি পড়ছিল, না, প'ড়ে শোনাচ্ছিল ওই ছেলেটিকে? খাতাখানা তুলে
'রে দেখলেন, লেখার একটা জায়গার পাশে কেউ দাগ দিয়েছে। বললেন,
গৌরী!

মা!

এ দাগ তুই দিয়েছিস?

হ্যাঁ মা। ও জায়গাটা তিনি আমাকেই লিখে গেছেন। তাই দাগ
লাম।

তুই কি ওকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলি নাকি?

না। আমি পড়ছিলাম নিজেই। উনি এলেন প্রায় বারোটার সময়; নিয়ে

এসেছিল রসরাজ—ষোড়শীর ভাই। ওই গ্রামেই ওঁকে ইণ্টার্ন ক'রে রেখেছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। মায়ের দিকে ফিরে তাকালে। বললে, এরা সব দোষ তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে মা?

চমকে উঠলেন কাশীর বউ।—কারা?

গৌরী বললে, কজনের নাম করব মা? সন্ধ্যের সময় পড়তে বসছি, এমন সময় চণ্ডীমণ্ডপে মাথা ঠুকে কে প্রার্থনা করলে, যেন তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় কিংবা সর্পাঘাত হয়। আলো জ্বালতে পারলাম না, পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর জানলায় এসে ভাল ক'রে দেখলাম, কে এমন ভাবে তোমায় অভিসম্পাত দিচ্ছে! দেখলাম, অমূল্যের দিদি—শৈল-ঠাকরুণ গালাগাল দিচ্ছে। তাদের বউ গলায় বঁটি লাগিয়েছে, তার জন্যে দায়ী নাকি তুমি!

হাসলেন কাশীর বউ। বললেন, বলুক। ওদের বাড়িতে বিপদ ঘটেছে, ওর কি মাথার ঠিক আছে? তা ছাড়া ওর স্বভাবই তো ওই রকম।

গৌরীকান্ত তিক্ত হেসে বললে, ওখানেই শেষ নয় মা। তার কিছুক্ষণ পর এলেন গ্রামের প্রজাপতিরা।

প্রজাপতিরা?

প্রজাদের যাঁরা অধীশ্বর, এখানকার মানুষদের যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তাঁরা। সরকারপাড়ার রাজেনবাবু, এ পাড়ার পবিত্রবাবু, মণিবাবু, তাঁদের সঙ্গে ওঁদের পার্শ্বচরেরা—মঙ্গল-উরুর দল। রাজেনবাবু চীৎকার ক'রে ঠিক ওই শৈল-ঠাকরুণের কথাগুলোই ব'লে গেলেন। শাপ দিলেন না। মণিবাবু তাঁর প্রতি কথাটিতে সায় দিলেন। বললেন, এর প্রতিকার না হ'লে নবগ্রামের সর্বনাশ হয়ে যাবে। পবিত্রবাবু চুপ ক'রেই ছিলেন। শেষে বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপারটা ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু করবেই বা কি? উরু বললে, বল না কেন, ঢাক বাজিয়ে দূর ক'রে দিই গাঁ থেকে।

কাশীর বউ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন।

গৌরী তাঁকে ধ'রে ফেলে ডাকলে, মা! মা!

ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ ক'রে কাশীর বউ বললেন, ছাড়, মাথাটা আমার কেমন ঘুরে উঠেছিল। তারপর হেসে বললেন, তাড়িয়ে দেয়, চ'লে যাব মা-বেটায়। তুই বড় হবি, আবার ফিরবি, নবগ্রামকে জয় ক'রে ফিরবি।

গৌরী এবার ম্লান হেসে ক্লান্ত স্বরে বললে, ক্ষোভে দুঃখে ঘুম এল না। তাই বাবার ডায়েরিখানা ব'সে পড়ছিলাম।

মা ছেলের হাত ধ'রে আকর্ষণ ক'রে বললেন, আয়, শুবি আয়, আমি তোর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

গৌরী শুয়েও কিন্তু ঘুমাল না। সে বললে, এক জায়গায় পড়লাম—। সে টেনে নিলে ডায়েরিখানা।—যেদিন লড়িয়া পুকুরে গোপীবাবু বাসুদেবমূর্তি পেয়েছিলেন, সেইদিন লিখেছিলেন। আমাকেই লিখেছিলেন, "বাবা গৌরীকান্ত, আমার অভিলাষ তুমি পূর্ণ করিও। প্রাণপণে বিদ্যার্জন কর। ধনী হইবার চেষ্টা করিও না, ধনী হইলে হয়তো নবগ্রামে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে পারিবে, কিন্তু তাহার গণ্ডির বাহিরে তুমি নগণ্য হইয়াই থাকিবে; কিন্তু বিদ্বান পণ্ডিত কর্মী হইলে সমগ্র দেশ তোমাকে গুণী বলিয়া গণ্য করিবে; আমার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হইবেন, আমি তৃপ্ত হইব; তোমার জন্মভূমি নবগ্রাম তৃপ্ত হইবেন। যে নবগ্রাম আজ ধনীর পূজায় তৃপ্ত হইয়াছেন, দুই নয়নে প্রসন্ন হাসি হাসিয়া স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন গোপীচন্দ্রের সাধনায়, সে নবগ্রাম-জননীকে তুমি নন্দীর মত কুবেরের আভরণ খুলিয়া জবাবিল্বদলে সাজাইয়া স্বর্ণসিংহাসনের পরিবর্তে মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে বসাইবার তপস্যা করিও। দুই নয়নের সঙ্গে তৃতীয় নয়নকে উন্মীলিত করিও তোমার পূজায়। মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করিও। করিতে পারিবে?"

কাশীর বউয়ের চোখ জলে ভ'রে গেল। তিনি নীরবে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েই চললেন, কোন কথা বললেন না।

পরের দিন সন্ধ্যায় তিনি অভ্যাসমত মহাভারত নিয়ে বসেছেন, চারু, চারুর মা, আরও কয়েকজন চারিপাশে বসেছে, এমন সময় এলেন রজনী-ঠাকরুণ।

বউ রয়েছ?

আসুন।

এলাম ভাই।—রজনী-ঠাকরুণ এসে তাঁর পাশেই বসলেন। বললেন, শান্তি নাই। তবু দেহ মানে না, সারারাত্রি জেগে সমস্ত দুপুরটাই ঘুমিয়েছি। নইলে দুপুরেই আসতাম। কি পড়ছ?

অভ্যাসমত হেসেই কাশীর বউ বললেন, মহাভারত।

কোন্ জায়গা পড়ছ ?

ভীষ্মপর্ব। ভীষ্ম শরশয্যায় রথ থেকে পড়েছেন।

চারু বললে, স্বর্গে দেবতারা, মর্ত্যে রাজারা হাহাকার ক'রে উঠেছে।

রজনী দেবী বললেন, পড়।

কাশীর বউ প'ড়ে গেলেন, ওই সময় অন্তরীক্ষ হইতে এই দিব্যবাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইল যে, নিখিল ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন ? ভীষ্ম এই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া 'আমি জীবিত আছি' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন।

হঠাৎ জন দুই-তিন ভীতু-স্বভাবের মেয়ে ভয়ে আর্তনাদ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল। কাশীর বউ পড়া বন্ধ করলেন।

কি হ'ল ?

ঢেলা। ঢেলা পড়ছে। আমার গায়ে পড়েছে।

ঢেলা ? ঢেলা কোত্থেকে পড়বে ?

কি জানি ? ওই, ওই দেখ।

সত্যই টুপ ক'রে এসে উঠানে একটা ঢেলা পড়ল। আবার একটা। আবার একটা। হঠাৎ সশব্দে এসে পড়ল বড় একটা ঢেলা।

কাশীর বউ বারান্দার কিনারায় দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছিলেন ঢেলাগুলি আসছে কোন্ দিক থেকে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রজনী-ঠাকরুণ আর চারুর মা। বাকি মেয়েরা ভয়ে জড়সড় হয়ে এক কোণে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। রজনী-ঠাকরুণ বললেন, এমনই কিছু একটা হবে, আমি ভয় করেছিলাম ভাই বউ। সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।

আমি জানি ঠাকুরঝি।

তুমি জান ?

শুনেছি, কারও কারও ইচ্ছে—গ্রাম থেকে ঢাক বাজিয়ে আমাকে তাড়ানো হয়।—তিক্ত ধারালো হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল।

ঢেলা প'ড়েই চলেছে। মধ্যে মধ্যে থামছে; আবার পড়ছে। গৌরীকান্ত সেই বিকেলে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। মনে মনে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত

হয়ে উঠলেন তার উপর। সে থাকলে অন্তত এই মেয়েগুলিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতেন।

কাশীর বউ বললেন চারুর মাকে, বউমা, তুমি মা মেয়েদের নিয়ে যাও, আপন আপন বাড়ি পৌঁছে দাও। ঠাকুরঝি, আপনিও আসুন ভাই। এর মধ্যে—

হাসলেন রজনী-ঠাকরুণ।—এর মধ্যে কি তোমায় একা রেখে আমি যেতে পারি?

আর আপত্তি করলেন না কাশীর বউ। দুজনেই এসে বারান্দার ভিতরে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

ঢেলা মধ্যে মধ্যে পড়ছেই।

এর পরই চারুর গলা শোনা গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চারুর সাহস হয়েছে, সে মর্মান্তিক আক্রোশে অভিসম্পাত দিচ্ছে এই অজ্ঞাত লোষ্ট্র-নিক্ষেপকারীকে। কাশীর বউ হাসলেন। রজনী-ঠাকরুণও হাসলেন। এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে চারুর সাহস হয়েছে।

হঠাৎ হ্যারিকেন উসকে দিয়ে আলোটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কাশীর বউ। রজনী দেবী চকিত হয়ে বললেন, কি বউ?

দেখুন উঠোনের দিকে চেয়ে।

শিউরে উঠলেন রজনী-ঠাকরুণ। বললেন, সাক্ষাৎ কাল!

কালকের সেই সাপটা কখন ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়েছে, উঠানের উপর পাশে ঢেলা পড়তেই ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে; স্থির হয়ে দুলছে।

ওদিকে রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে একটা আলোর ছটা এসে পড়ছে উঠানের উপর, পরিচিত পায়ের জুতোর শব্দ হচ্ছে গলিতে দরজার মুখে। কাশীর বউ চীৎকার ক'রে উঠলেন, গৌরী! গৌরীকান্ত! গৌরী!

গৌরীকান্ত নয়, আমি। আমি মঙ্গল।

মঙ্গল? বাড়ির উঠোনে প্রকাণ্ড সাপ, তুমি সাবধানে বাড়ি ঢুকো ভাই। বরং ঘুরে এ দরজা দিয়ে এস।

সাপ?

হ্যাঁ।

মঙ্গল তখন রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল, রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে সাপটাকে দেখে শিউরে উঠল। বললে, লোক ডাকি, মেরে ফেলুক।

কাশীর বউ বললেন, মেরে ফেলবে। কি দরকার? ও চ'লে যাবে এক্ষুনি মধ্যে মধ্যে ও আসে ইঁদুর খেতে, আবার চ'লে যায়। ওই দেখ আমাদের গোলমালের সাড়া পেয়ে চ'লে যেতে শুরু করেছে।

সাপটা ফণা নামিয়ে সত্যই চলতে শুরু করলে, প্রাচীন সরীসৃপ মন্থর গতিতে ভাঁড়ারঘরের পাশের জল-নিকাশের নালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মঙ্গল শঙ্কিত নির্বাক কৌতূহলে আলো হাতে তার অনুসরণ করলে নালাটা খানিকটা দূর পর্যন্ত।

রজনী-ঠাকরুণ কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, বাস্তু নয়, বাস্তু খুব ছোট হয়। তবে এও খুব প্রাচীন। তোমাদের বাড়িতেই থাকে?

বাড়িতে ঠিক থাকে না। আমাদের বাড়ির আশপাশ নিয়েই থাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। শুনেছি, আমার শ্বশুরের আমল থেকেই আছে উনি বলতেন। কাল রাত্রে যখন ফিরলাম ওখান থেকে, তখন দেখলা ঢুকছে।

রাঙাদি, একটা ব্যাপার ঘ'টে গেছে, আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম।

কি?—দৃঢ় কণ্ঠস্বরে উত্তর দিলেন কাশীর বউ। ব্যাপারটা যে এই চেলাপড় নিয়ে তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না।

রজনী-ঠাকরুণ প্রশ্নই ক'রে বসলেন, সন্ধ্যেবেলা থেকে কাশীর বউয়ে বাড়িতে ঢেলা-যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ব্যাপার কি বল তো?

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মঙ্গল বললে, ঢেলা? ঢেলা-যুদ্ধ শুরু হয়েছে? মানে বাড়িতে ঢেলা পড়ছে?

হ্যাঁ গো। উঠোনটার দিকে চেয়ে দেখ না!

মঙ্গল কিছু বলবার পূর্বেই বাড়ির এ দরজা থেকে ডাকলে রজনী দেবী ভাই বাগাল, দিদি! দিদি!—উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকছে বাগাল।

কি বাগাল!

বাড়ি এস। বাড়িতে ঢেলা পড়ছে।

ঢেলা পড়ছে?

হ্যাঁ। সন্ধ্যেবেলা থেকে ঢেলা পড়তে শুরু হয়েছে। বাড়ি এস।

রজনী-ঠাকরুণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কাশীর বউয়ের দিকে। কাশীর ব বললেন, যান ঠাকুরঝি। ঠাকুরপো ব্যস্ত হয়েছেন।

কিন্তু—কিন্তু তোমার ছেলে ফিরল না কেন? একা থাকবে?

ঝি রয়েছে। দরকার হয় বাড়ির মাহিন্দারটাকে ডাকিয়ে নেব। আর ওপরে তো একজন আছেনই।—হাসলেন তিনি।

রজনী-ঠাকরুণ চ'লে গেলেন। তিনি চ'লে যেতেই মঙ্গল তাঁকে বললে, বিপদ হয়ে গেছে রাঙাদি, গৌরীকান্তকে খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে পুলিস ডেকে নিয়ে গেছে থানায়।

থানায়!—চমকে উঠলেন কাশীর বউ।

হ্যাঁ।

কেন? কারণ কিছু শুনেছ?

না। তবে স্বদেশীর ব্যাপার ব'লে মনে হয়।

কাশীর বউ চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইলেন। এ তাঁর স্বখাত সলিল। যে ধারাকে তিনি খনন ক'রে নিয়ে এলেন নবগ্রামের জীবনে, সে ধারায় প্রবাহে থমকেই ভেসে যাবে গৌরীকান্ত—এই তো প্রকৃতির নিয়ম। অবরুদ্ধ জলধারাকে মুক্তি দিতে যে যায় তার আবদ্ধ বন্ধনীকে কাটতে, মুক্ত জলস্রোত তাকে মাথায় নিয়েই তো ছোটে সাগরসঙ্গমের অভিমুখে।

মঙ্গল বললে, পবিত্রবাবু মণিবাবু আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। সদর থেকে সি.আই.ডি.-ইনস্‌পেক্টর কামদাবাবু এসেছেন তো। তাঁর হাতেই তো কেস। কামদাবাবুর সঙ্গে এঁদের আলাপও খুব। ওঁরা বললে, চেপে ধরলে—

কাশীর বউ বাধা দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে থানায় নিয়ে যেতে পার?

আপনি থানায় যাবেন?

যাব না কেন? থানা তো সরকারী আপিস।

মঙ্গল বললে, সেটা—

কি সেটা?

দেখুন, সকলকে জিজ্ঞাসা না ক'রে সেটা আমি পারব না।

কাশীর বউ চুপ ক'রে কিছু যেন ভাবতে শুরু করলেন।

মঙ্গল বললে, আমি বরং এঁদের ডেকে আনি, আপনি ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। ওঁরা যা বলেন, তাই শুনুন।

কাশীর বউ লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ঝিকে ডাকলেন। বললেন, আমি আসছি।

একলা বাড়িতে থাকতে যদি ভয় করে, তবে তুই চারুর মায়ের ওখানে দরজাগুলোয় ভালা বন্ধ ক'রে বাস যেন।

মঙ্গল প্রশ্ন করলে, কোথায় যাবেন আপনি?

থানায়।

আলনা থেকে একখানা চাদর টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে তিনি বেরি পড়লেন।

থানার কাছাকাছি তখন বেশ কয়েকটি ভিড় জ'মে উঠেছে। এ পাড় রাস্তা যেখানে গিয়ে সদর-রাস্তায় পড়েছে, সেখানে বণিকপাড়ার বৃদ্ধ কালাচন্দের দোকানের উঠানে প্রবীণেরা এই কথা নিয়েই জটলা করছে। কিছু আগে মণি দত্তকে ঘিরে বেশ একটি বড় জটলা। মণির পাশে দাঁড়িয়ে আ গোয়ালপাড়ার নবীন এবং তার নতুন এম. এ., বি. এল. পাস-করা ভাইটি কোন্ আইনের কত ধারায় গৌরীকান্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা আলোচনা চলছে।

থানার ওপাশে মুসলমান দর্জি তিনু মিয়ার দোকানের সামনে ব'সে আ হাজিদের বড় ভাই এবারত হাজি।

এবারত হাজি তামাক খেতে খেতে বললে, তাজ্জবের কাণ্ড! এইটুকু ছাওয়াল, আমারে দেখলে বলত হে, সেইটা বুলো তো চাচা! আমি বলত হে, তোমরা হিঁদু—এতটুকুন, আর আমরা—মুসল-মা-ন—এ-ত ব-ড়! অ খিলখিল ক'রে হাসত! সেই ছাওয়াল! হায় খোদা!

থানার উপরে বারান্দায় চেয়ারে ব'সে আছেন পবিত্র এবং মণিভূষণ আরও একজন ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তিনি নবাগত সার্কেল ডেপুটি।

হ্যারিকেনটি হাতে নিয়ে কাশীর বউ থানার বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে সদর থেকে পুলিস-কর্মচারী যিনি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই

অকুণ্ঠিত জিহ্বায় স্পষ্ট কথা কয়টি সকলের কানেই প্রবেশ করেছিল পবিত্র মণিভূষণ চমকে উঠে দাঁড়ালে চেয়ার থেকে। সার্কেল ডেপুটিবাবু হাতের সিগারেটটি হাত থেকে প'ড়ে গেল। সি. আই. ডি. ইন্‌স্‌পেক্ট কামদাবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কে?

কাশীর বউ বললেন, আমি গৌরীকান্তের মা।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরে নয় কাছে এস

নিরুত্তর পাথরের বুকে খুঁজি রূপের পরিখা—
দিন রাত্রি অবসন্ন বেদনায় উদ্বেলিত বুক ;
আমার উত্তাপ শ্রান্ত জলে নিকো সে প্রদীপ্ত শিখা,
বিস্মৃতির অন্ধকারে ভাঙে যদি সকলি ভাঙুক।

কেবল হিসাব করা ভাল মন্দ যত ক্ষতি ক্ষয়,
আগে পিছে চেয়ে চেয়ে সন্তর্পণে শুধু পথ চলা ;
আমার অস্তিত্ব বন্ধু, করে নিকো তোমারে নির্ভর,
আতপ্ত বৈশাখী সন্ধ্যা মনে হয় হয়েছে নিষ্ফলা।

প্রমত্ত জীবনস্বপ্ন সকল বন্ধনডোর ছিঁড়ে,—
পথের ধূলায় নামে ধূসরিত লাবণ্যের জাল ;
নিভৃত সান্নিধ্য চেয়ে তুমি শুধু খুঁজে ফেরো নীড়ে,
হিসাবের অঙ্ক এসে আমারে যে করিছে আড়াল।

প্রথম প্রভাতে জেগে মনে কর শুধু কোন নামে—
তোমারে গিয়েছি ডাকি বাতায়নতল দিয়ে প্রিয়া ;
সে নামে আবর্ত নেই অপ্রশস্ত ছন্দের বিরামে,
সে নাম নদীর নাম ব'হে যায় প্রহর গনিয়া।

হাজারো যুগেরে গেঁথে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন গতি,
তোমার বুকেতে আছে সে নদীর অশ্রান্ত কল্লোল ;
তবে আজ দ্বন্দ্ব কেন—মাঝে মাঝে কেন এ বিরতি—
ভয়ের ভাবনা এসে সারাক্ষণ দিয়ে যায় দোল !

তারায় তারায় জাগে সে দোলায় মধুর কাঁপন,
অরণ্যশীর্ষেতে তার ঢেউগুলি ওঠে আর পড়ে ;—
চৈতালী নিশ্বাস নয়—অবরুদ্ধ এ কি এ স্পন্দন,
মেঘেরাও মুড়ে পাখা পর্বতের শিখরে শিখরে !

এখানে ক'রো না ভয়—এ দেশেতে কোন প্রশ্ন নেই,
অনেক প্রশ্নের মাঝে অবসন্ন সকল উত্তর ;

মহানগরীর পথ পরিতৃপ্ত নিজেতে নিজেই,
খোঁজাখুঁজি করে নাকো তীক্ষ্ণমুখ শাণিত নখর।

জ্বলেছে অসংখ্য আলো—এর মাঝে তব দুটি আঁখি—
যদিও বিলায় আলো—জেনে রেখো সে শুধু আমারি ;
একটি জিজ্ঞাসা আজ একমাত্র র'য়ে গেছে বাকি,—
'প্রেমের ঐশ্বর্য নিয়ে কতদিন আর কাড়াকাড়ি !'

তাই তো নির্ভয় বুকে বিষণ্ণ ছায়ারা করে ভিড়,
কোমল উত্তাপ জাগা সেই দিন কোথা নিরুদ্দেশ ?
রিক্ত শূন্য স্বপ্ন কাঁদে : জীবনেতে জমে নাকো মীড়,
গানের কলিরা শ্রান্ত—কিছু বুঝি নেই অবশেষ !

সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে আত্মতৃপ্ত অকারণ চলা,—
বন্ধু মোর (!)—হ'ল ক্লান্ত : দাঁড়ালাম তোমার ইঙ্গিতে ;
ভাষা দাও আশা দাও—এ জীবন ক'রো না নিষ্ফলা,
যে বাণীরে দিলে সুর তারে তুমি পার না ভাঙিতে।

অগণিত তারকার দীপালীতে সাজালে আকাশ,
অবারিত গুঞ্জনের মোহজালে ভ'রে দিলে বুক ;
আমার উন্মুক্ত পথ করিবে কি মোরে পরিহাস—
ব'লো নাকো অনায়াসে খেলাঘর ভাঙিলে ভাঙুক।

তোমার রক্তের তাপে উদ্বেলিত আমার অন্তর,
বৈশাখী সন্ধ্যার স্মৃতি কোনদিন হবে না নিঃশেষ ;
পরাভূত করে সে যে মায়াবিনী মৃত্যুর প্রহর,
ভয়ের ভাবনা তবু আজ কেন কাঁপায় সে দেশ !

তোমারে পাবার মূল্য তুলে দিই ক্ষত ও ক্ষতিতে,
আমার এ ভালবাসা—জানে নাকি করিতে প্রত্যাশা ?
তুমি নদী ক্ষীণকায়া ক্ষিপ্রগতি : দাঁড়ায়েছি নিতে—
অঞ্জলি ভরিয়া জল—মরুপথে মিটাতে পিপাসা।

এ জীবন ছায়াশূন্য : দেখি না কোথাও শ্যামলিমা,
রৌদ্রতাপ দগ্ধ করে—শুষ্ক করে আকণ্ঠ পিপাসা ;
ইঙ্গিতে বোঝালে কেন তব বুকে এ মরুর সীমা,
তোমার প্রবাহ দিয়ে মুছে দেবে সমস্ত নিরাশা !

নিজেকে লুকাতে চেয়ে ছলনার নিও না আশ্রয়,
সজীব মুহূর্তগুলি বেদনায় হয়ে ওঠে নীল ;
তোমার বুকেতে মোর জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়,
দূরে নয় কাছে এস—দুজনায় গড়িব মঞ্জিল ।

শ্রীসমর সোম

পয়ার-প্রশস্তি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন, স্কর্ন নট দি সনেট। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কাজেই তাঁর কথার দাম আছে। আধুনিক বাংলা কবিদের প্রতি আমারও সনির্বন্ধ অনুরোধ—স্কর্ন নট দি পয়ার। কবিতাও লিখতে পারি—

করিও না অবহেলা পয়ারে আমার,
ভেঙো না চরণ তার মৌন অবজ্ঞার
নিষ্ঠুর আঘাতে।

কন্তু এ বয়সে আখর গুনে মিল যুগিয়ে কবিতা লিখতে ধৈর্য থাকে না। তাঁরই ক্ষ তা সম্ভব হয়েছিল, যিনি বার্ধক্যেও রামধনু দেখে নাচতে চেয়েছিলেন, থা 'নিশ্চয় মরিব'—অর্ লেট মি ডাই। আমি নাচতেও চাই না, মরতে ন নয়ই। বড় জোর আর এক-আধ লাইন—

কাশীরাম কৃত্তিবাস
এই ছন্দে কাব্য লিখি গেলা স্বর্গবাস।

ইও তাঁরা এবং আর সব প্রাচীন কবি শুধু পয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, ারও সব ছন্দ ছিল ; তথাপি—

কাব্যক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে পয়ার-ঘোটক,
প্রণমি পয়ারে সর্ব ছন্দের জনক !

কর গাড়ি যেমন সকল গাড়ির পূর্বপুরুষ, পয়ারও তেমনই সকল ছন্দের দাতা—যানবাহন ও বাংলা ভাষার ইতিহাস না প'ড়েও তা বুঝতে দেরি

হয় না। পয়ারের পা ভেঙেই ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দ সৃষ্টি—

রাতি পোহাইল—সকাল ফুটিল,
কাননে কুসুমকলি,
পাখী যত সব করে নানা রব
গাছে ব'সে গলাগলি।

পয়ারের পায়াগুলি বেমালুম এর ভিতরে প্রবেশ করেছে, কেবল ত্রি-পয়ারের চেয়ে লম্বা ব'লে মাঝে মাঝে 'তারে-নারে' গাইতে হয়েছে। আর সহজে চৌপদীকে পয়ারে পরিণত করা যায়—

চিরসুখী জন, বল, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন আহা বুঝিবারে পারে?
কি যাতনা বিষে, কিসে বুঝিবে সেজন
কভু আশীবিষে হায় দংশে নাই যারে?

শুধু দু-এক জায়গায় 'তারে-নারে' 'তাইরে-নাইরে' হয়ে গেছে।

সুবিধা এই যে, পয়ারের দুটো পায়ে এক জোড়া উরু, হাঁটুর নীচে এক জোড়া ঠ্যাং, তার নীচে এক জোড়া পায়ের পাতা আর ছোট-বড় সব আঙুল। এই সব ছেঁটে কেটে জোড়া দিয়ে টেবিল চেয়ার খাট পালঙ্ক সব-কিছু তৈরি করা যায়।

এত কহ মহাবীর কার্তবীর্যার্জুন
বাছা বাছা বাণ লয়ে ভরিলেক তূণ;
নোয়ায়ে বিশাল ধনু অবলীলাক্রমে
ধীরে শির নত করি গুরুপদে নমে।

কার্তবীর্যার্জুনের বিশাল উরু, হাঁটু গেড়ে ব'সে দক্ষিণ পদের জানু নিম্নে দুমড়িয়ে অবলীলাক্রমে বাঁ পায়ের পাতায় বিশাল ধনু চেপে ধরেছেন—চিত্ত উপভোগ্য! আসলে কিন্তু 'কার্তবীর্যার্জুন' পয়ারেরই স্থূল উরু, অবলীলাক্রমে তার সরল বলিষ্ঠ জানুনিম্নভাগ, আর বিশাল ধনু তার পায়ের পাতা। এ সব তার ছোট বড় মাঝারি আঙুল। এর মধ্যে কড়ে-আঙুল নেই। কড়ে আঙুলের দৃষ্টান্ত, যথা—

আরে আরে অপবিত্র দূর হয়ে যা রে!

ই পায়ে দুটো কড়ে-আঙুল মনুষ্যদেহে যেমানানসই হ'লেও ছন্দশাস্ত্রে কায় না। নীচের দৃষ্টান্তে জঙ্ঘামূলের, জানুর ও গুল্‌ফের উঁচুনীচু অসমান গুলো পায়ের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কেমন খাপ খেয়ে গেছে—

তীক্ষ্ণদন্তে শুষ্ক অস্থি চর্বণ বাসনা,
রুধিরের তরে লোল তৃষিত রসনা।
* * *
ভীরুতা মমতা দোঁহে নিকট-সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্রচেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।

পয়ারের এক লাইনে একাক্ষর থেকে আরম্ভ ক'রে সমাসের কৃপায় চোদ্দ রের একটি শব্দ পর্যন্ত স্থান পেতে পারে। পয়ারেরই অন্তর্ভুক্ত নানা কারের ও ওজনের শব্দ-সমষ্টি নিয়ে ছন্দোবৈচিত্র্যের অনন্ত লীলা চলেছে। মা চাকরকে তার অপকীর্তির জন্য তিরস্কার ক'রে বললাম—

"ছি!"

অপ্রস্তুত হয়ে সবিনয়ে বললে—

"জী!"

াক্ষরিক কবিতা হয়ে গেল। তেমনই দুই আখরের—

রাম,
শ্যাম,
যদু,
মধু
আসে,
হাটে
মাঠে,
যথা
তথা
হাসে।

ন, চারজনাই আমোদপ্রিয়। পয়ারের লাইন হতে নানান সাইজের শব্দ শব্দসমষ্টি তুলে নিয়ে অজস্রপ্রকমের কারিগরি চলেছে—

ঘুম!
নিঝুম্!

চোখে দেয় চুম,
পরানে মাখায়ে যায় স্বপন-কুঙ্কুম।

পয়ারের দশ অক্ষরে চমৎকার বুদ্ধমূর্তি গড়েছেন—

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

আবার এলোমেলো সাজিয়ে চাতুর্যের চরম করেছেন—

জীবনে। যত পূজা। হ'ল না সারা।
জানি গো। জানি তাহা। হয় নি হারা।
যে ফুল। না ফুটিতে। ঝরিল। ধরণীতে।
যে নদী। মরুপথে। হারালো ধারা।

যেন একখানা ঈজি-চেয়ার। পয়ারে ঢেলে সাজলে আরাম-কেদারা ব্যারাম-কেদারা হয়ে যাবে—

এ জীবনে যত পূজা হইল না সারা,
জানি আমি জানি তাহা হয় নিক হারা;
যেই ফুল না ফুটিতে
ঝ'রে গেল ধরণীতে
যেই নদী মরুপথে হারাইল ধারা।

বলা বাহুল্য, ভগ্নপয়ার পয়ার হতে ভিন্ন কিছু নয়।

পয়ার কি লিরিক? 'লিরিক' মানে যদি হয় 'গীতি-কবিতা', গীতি-কবিতা মানে যদি হয় গীতাঙ্গ কবিতা অর্থাৎ যে কবিতা সুর ক'রে পড়া যায় কিংবা গাওয়া যায়, তা হ'লে, শুধু পয়ার কেন, খাঁটি বাংলা সব কবিতাই লিরিক। লিরিকের অন্য যা-কিছু লক্ষণ, তা ছন্দশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। এইজন্য গান বলতে বাংলা ভাষায় গান ও কবিতা দুই-ই বুঝায়। দৃষ্টান্ত—গাহি সাম্যের গান। যেমন সুর সংযোগে পাঠ করা যায়—

রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা,
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা।
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা,
বনের বানর বন্ধী, জলে ভাসে শিলা॥

এমনই এই পয়ার ছন্দেই সুর-প্রয়োগের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন আছে—

না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥

দ্বারসম্ভূত ত্রিপদীতেও—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

দীর্ঘ-ত্রিপদীও বাদ পড়ে নাই—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

অমিত্রাক্ষরেও সুর দেওয়া হয়েছে—

অঙ্গ পোড়ায়ো না।
শ্যাম এই অঙ্গে বিলাস করেছেন।
কৃষ্ণ-বিলসিত অঙ্গ।
তমাল বড় ভালবাসি।
কৃষ্ণ কালো তমাল কালো।

প্রাচীন বাংলায় কবিতা ও গানের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন ছিল, গানে ছিল কবিতার ছন্দ, কবিতায় ছিল গানের সুর, কোথাও মুখ্যভাবে, কোথাও গৌণ। রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের রচিত গানগুলিতে ছন্দ ও সুরের কৃতিত্ব সমভাবে বিদ্যমান।

অমিত্রাক্ষর মাইকেলী ও গৈরিশ ছন্দ, পর্যায়সম পয়ার (যাতে ১ম ও ৩য় এবং ২য় ও ৪র্থ চরণে মিল থাকে), ভগ্নপয়ার ও সনেট এই কটি নূতন আমদানি পদ্যে সুর দেওয়া যায় না।

তারপর আসে ছড়ার কথা। মনে হয়, বাংলা ছন্দ বাংলা দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত তথা প্রাকৃত হতে জন্ম নিয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু ছন্দের দিক থেকে ঋণ তার একটুও নেই কারও কাছে। দুই মায়ে ঝগড়া বেধে আসল মা-ই জায়গা জুড়ে বসলেন—

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে ভোলা কুকুর সঙ্গে যাবে সে।

কিংবা—

খোকার বৌ-এর গুণের কথা শুনে মরবে হেসে।
সোনার খোকা ভাত রাঁধে রে হাল বইয়ে এসে॥

এর সঙ্গে বাল্মীকির কাছে কবিতা শিখে শিশু লব-কুশ রামের সভায় দাঁড়ি সদম্ভে যে বলেছিল—

সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে

ছন্দের দিক থেকে তার কোন সম্বন্ধ নেই। ছড়াকেই ঝেড়ে মুছে কাব্যে চালাতে গিয়ে তরজা, পাঁচালী ও পরে পয়ার প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি হয়ে ছড়ার ভিতরকার হ্রস্ব অক্ষরগুলিকে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দি চোদ্দ আখরের পয়ারে দাঁড়ায়—

খোকাবাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কেই,
বাড়িত্যাছে ভোলা কুকুর্সঙ্গে যাবে সেই।

সেইরূপ—

খোকাবৌএশ্বশুরবাড়ির্কথা শুনে মর্বে হেসে।
সোনাখোকা ভাত্রাঁধে রে হাল্বইয়ে এসে॥

আশা করি, দৃষ্টান্তের খাতিরে, উপরের অদ্ভুত বানানপদ্ধতি বৈয়াকরণরা ক্ষমা করবেন।

পয়ারে যেমন, ছড়াতেও তেমনই বড় বড় লাইনের নানা আকারের টুক জোড়া দিয়ে কত অজ্ঞাত ছড়া-রচয়িত্রী ছড়ার ফুলঝুরি সারা বাংলায় ছড়ি দিয়েছেন।

ছড়াকে পালিশ ক'রে পয়ার হয়েছে, আবার পয়ারের মধ্যেও দমকা হাসি কোমরের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গিয়ে ছড়া ঢুকে গিয়েছে—

কোন্ বাপ তোর জন্ম হইল জামদগ্ন্যের তেজে,
মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধে ছিল লেজে?
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা—
এ সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা?

প্রকৃতপক্ষে কৃত্তিবাসী ছন্দ ছড়া ও পয়ারের বিচিত্র সংমিশ্রণ। ছড়া ও প জাতিতে এক না হ'লে কখনও এতটা মিশ খেত না। অবশ্য, এই দুই পাঠরীতিতে পার্থক্য কিছু আছেই, আর তা আছে ব'লেই, কৃত্তিবাসী রা

ক'রে পড়তে সূক্ষ্মতর ছন্দোজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কাশীরাম কিন্তু বরাবর
দ্ধ আখরের বাঁধন মেনে চলেছেন, পাঠরীতিও সোজা।

চোদ্দ-আখরের বাঁধনে পয়ার বৈচিত্র্যহীন—এই ধারণা ভুল। একই পয়ার
া বৈচিত্র্যে কোথাও দ্রুত, কোথাও বিলম্বিত, কোথাও নৃত্যশীল, কখনও বা
ড়াশীল, কোথাও চোদ্দ-আখরের ঠাসা-বুনানি, কোথাও দীর্ঘচ্ছন্দে অসংযত
রসমাবেশে স্খলগতি। কোথাও যুক্তাক্ষরবহুল, কোথাও তদ্‌বর্জিত, কখনও
ীর, কখনও মধুর, কখনও চটুল, সকল রসের অবতারণার সুযোগ দেয়। লঘু,
, হ্রস্ব, দীর্ঘ—সব ওজনের ও সব আকারের অক্ষর এতে সমান স্থান পায়।
সব কারণে পয়ার এত জনপ্রিয়-ছন্দ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পয়ারের অঙ্গীভূত বহুবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করতে হ'লে একটি মৌলিক
ন্ধ ও গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। সে পথ আমার নয়। বর্তমান রচনা
র ইঙ্গিতমাত্র।

কড়ে-আঙুলকে খাটো করলে কিংবা ছেঁটে ফেললে পদ্যের চরণ খোঁড়া হয়
বরং নৃত্যভঙ্গিতে চমৎকারিত্ব আনে—

রাম যা পারে করুক এসে, তোর সনে মোর কি।
সূর্পণখার নাক কাটে, বৃথা আমি জী।

ধরের ভগ্নাংশেও এ কথা খাটে—

শুন গো রাজার ঝি
তোমায় কহিতে আসিয়াছি।

ং ত্রিপদীতেও—

পীরিতি বলিয়া তিনটি আখর
ভুবনে আনিল কে।

বার ছয়-আঙুলে পা যদি কোথাও দেখতে পান, লজ্জায় ঢেকে রাখবার কারণ
ই, ছন্দের লীলাখেলা ব'লেই মনে করতে হবে—

১। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।
২। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

* * *

একদা ছিলেন সুপ্ত।

চে কড়ে-আঙুলের আগের আঙুলটি নেই—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরসা।

এইসব খুঁটিনাটি হেরফের পৃথক ছন্দের অধিকার পেতে পারে না। আবিষ্কারকে নকল ক'রে তার উপরে ছোট বড় যতই কেন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হ যাক না, তারা বৈচিত্র্যই, নূতন আবিষ্কার ব'লে গণ্য হতে পারে না। এই বৈচিত্র্যের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা বৈচিত্র্যের তারতম্য হিসাবে উচ্চাসি আসন পে পারেন, মৌলিক আবিষ্কারের সমধর্মী ও সহকর্মী হ'লেও সমকক্ষ নন—কা আমরা সবাই লজিকের দাস।

কিন্তু নীতি ও লজিকের অন্ধ দাসত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে অচল। আ অমিদারকে ভয়ে ভক্তিতে বলি রাজা; কোন্ সুদূরভবিষ্যতে পোস্ট-মাস্টার হে ভেবে অসময়ে কাজ আদায় করতে ডাকঘরের কেরানীকে খাতির ক'রে ডা মাস্টার মশায়; দায়ে ঠেকে কম্পাউণ্ডারকে ডাক্তারিতে প্রমোশন দিতে কৃপণ করি না। শুধু কবিদের বেলায় আইন খাটাতে গেলে তাঁরা তা মানে কেন?

যুক্তাক্ষরযোগে এবং ঐ ও এই দুই স্বরবর্ণসংযোগে অক্ষর-সংকোচ এ-যুগে বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ অবদান, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছাড়া। এই অক্ষ সংকোচের প্রক্রিয়ায় বাংলা কবিতাকে লিরিকের দিকে আরও বেশি অগ্র ক'রে দেওয়া হয়েছে। এর পূর্ণ কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের—

তব গৌরবে সকল গর্ব
* * *
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
* * *
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।

প্রভৃতি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-কাব্যে যত্রতত্র পাওয়া যাবে। অবশ্য—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, কিংবা—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
ধৈরয ধর চিতে মিলিবে মুরারি

মধ্যে অক্ষর-সংকোচের দৃষ্টান্ত থাকলেও সমগ্র পদাবলী ঘেঁটে দেখলে বোঝা , এসব তাঁরা সজ্ঞানে করেন নাই, নিয়মিতভাবেও না, মাঝে মাঝে ঝোঁকের ধায় এসে পড়েছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসায় অত্যুৎসাহী সমালোচক পয়ারকে লোকচক্ষে টা করলেও মাইকেল তা করেন নি। ডিড মাইকেল? ইফ সো, দি স মাইকেল হি। তিনি জানতেন, পয়ারের কাছে তাঁর কতখানি ঋণ। র যত রাগ ছিল মিত্রাক্ষরের উপর—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ-নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।

গটা নিশ্চয় বেশিদিন ছিল না, প্রমাণ—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। তবে দরদটা ছিল াবর, ভাষামাতৃকার পায়ে নিগড় না পরিয়ে, পরিয়েছেন হাল্‌কা-মিঠে ানার নূপুর। বাংলা লিরিকের অগ্রগতিতে ব্রজাঙ্গনার দান অস্বীকার করা য় না। যদিও যুক্তাক্ষরস্থলে অক্ষর ছাঁটাই করেন নাই, তবু এমন সব ক্তাক্ষর যোজনা করেছেন, যাতে উক্ত কবিতাগুলি রবীন্দ্র-লিরিকের কাছাকাছি য়ে পৌঁছেছে—

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে ধায়
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে।

বনি' শব্দের যুক্তাক্ষর উচ্চারণে ধর্তব্য নয়। কদম্ব, বঞ্চিয়া, আলিঙ্গন, সিন্দুর, ন্দের নন্দন—এই ধরনের যুক্তাক্ষর শুধু। ঊর্ধ্ব, স্তব্ধ, মুগ্ধ—একটিও নেই। াবার অনেক স্থলে যুক্তাক্ষর এড়িয়ে চলেছেন—

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী
তারার মালা?

আর কি যতনে কুসুমরতনে
ব্রজের বালা ?
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার
বনশোভিনী।
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?

আত্মভোলা মানুষ। যার উপরে যত রাগ, শেষে সে-ই হয় বেশি করুণার প —তাই তো এত মিলের ছড়াছড়ি।

অক্ষর-সংকোচেরও দৃষ্টান্ত আছে—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে,
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল

ইত্যাদি। তবু রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার না করলে, পূর্ববর্তীর কাছে পরবর্ত সাধারণ ঋণের কথা বাদ দিয়ে, কোন্ প্রমাণে, কোন্ সাহসে বলব যে, ভি রবীন্দ্র-লিরিকের জন্য মাইকেলের কাছে ঋণী ?

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-লিরিকে সুর বসিয়ে স্বরচিত গানে সুরকর্তার আ পেয়েছেন।—

বঙ্গ আমার, জননি আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ ;
* * *
কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।

রবীন্দ্র-লিরিককে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে—

নন্দকুলচন্দ্র বিনে বৃন্দাবন অন্ধকার (কালিদাস রায়)

কিন্তু সে ক্ষণস্ফূর্তি মাত্র।

ছন্দের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কোনও নূতন দান নেই, আসলে তি মস্ত বড় আলংকারিক।

পালিশ-করা এই সোনার হারটি সবারই চোখ ঝলসে দেবে—

সাঁঝে আজ কিসের আলো
ভুলালো মন ভুলালো
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো—
* * *

ওগো ও, স্বর্গনদী
এতদূর এলে যদি
থেকো না ঐ অবধি…

কিন্তু ছড়া-রচয়িত্রী এই সোনার মেয়েটি যখন অনর্গল ব'কে যাবে—

হাদে লো কলমীলতা,
এতদিন ছিলি কোথা,
আমাদের কচুবনে
কচুশাক খাস নে কেনে ?

ন তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে রাখি কোন্ প্রাণে ?

ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ পয়ারের কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী, ধুনিক সমস্ত ছন্দই আবার ওই সব ছন্দ থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বড় বেশি ক নয়, যদিও তাদের বৈচিত্র্যসম্ভারে বাংলা কবিতার ভাণ্ডার আজ রিপূর্ণ।

এই তুলনায় ছড়ার কথা তুলতে চাই না—মাতৃঋণ অপরিশোধ্য। ছড়াই লা ছন্দের মূল উৎস। যদি নূতন ছন্দ আবিষ্কার করতে চান, পয়ারের য়ে ধ'রে ছড়ার মণিকোঠায় প্রবেশ করুন। মনে রাখবেন, মহাকবির দোক্তি—'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' ইত্যাদি। ছড়াকে যিনি ারে পরিণত করেছিলেন, পয়ারের চরণ ভেঙে যিনি বা যাঁরা ত্রিপদী প্রভৃতি ন্দ সৃষ্টি করেছিলেন, মিত্রাক্ষর পয়ারকে যিনি অমিত্রাক্ষর রূপ দান করেছিলেন বং যুক্তাক্ষর ও-ঐ-ঔ-সংযোগে যিনি সুনিয়মিত অক্ষর-সংকোচ করেছিলেন— ই কজনকে অন্তত আবিষ্কারকের আসন দিতেই হবে। এইটুকু রুষ্ট স্বীকার া করলে বলতে হয় যে, চায়ের কেট্‌লিতে গরম জলের বাষ্পীয় কার্যকলাপ াবিষ্কারের পর, আজ পর্যন্ত আর কোন নূতন আবিষ্কার হয় নি।

এইবার কায়ক্লেশে 'পয়ার-প্রশস্তি' কবিতাটির বাকিটুকু শেষ না করলে র্ধকথনের দোষ থেকে যাবে—

মেপে জুখে ছেঁটে কেটে পয়ারের পা,
যত ছন্দ রচি সব পয়ারেরই ছা।
যে কারণে ভক্তি করি আপন পিতায়—
সব কবিতা নতি করে পয়ারের পায়।

পয়ার-পদারবিন্দ যেই পূজা করে,
দুস্তর কবিতাসিন্ধু সেই জন তরে।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কে না জানে সে অমৃত পয়ারের দান?

শ্রীভোলা সেন

সংবাদ-সাহিত্য

ভারতবর্ষে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল, একমাত্র জাতীয়-সঙ্গীতরূপে প্রচ
"বন্দে মাতরম্" গানকে সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া "মধ্যবর্তী কা
জন্য "জনগণমন-অধিনায়ক" গানের ঠেকা দিয়া দিল্লী-দরবারের রাজা
স্বদেশী রাজন্যবর্গ মরা বাংলার উপর খাঁড়ার ঘা দিলেন। সত্য বটে, বাঙা
অপরাধের সীমা নাই। ইংরেজী শিক্ষা ক্রত রপ্ত করিয়া ইংরেজ প্রভু
দোভাষী ও দালালরূপে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর সে অতীতে
পরিমাণ অবাঞ্ছিত প্রভুত্ব করিয়াছে, বিনিময়ে সে দিয়াছেও অনেক। কিন্ত
হিসাব করিবার মত প্রাদেশিক সংকীর্ণ মনোবৃত্তির সমর্থন আমরা করি
সংকোচের সঙ্গে এইটুকু মাত্র নিবেদন করিতে পারি যে, নব্য শিক্ষার উ
জোর দিয়া বাঙালীর অর্থনৈতিক যত দুর্গতিই হউক, সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে বি
সাহিত্যে রাজনীতিতে সমাজ ও ধর্মসংস্কারে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি অগ্র
হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করি
ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাথা ও মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারায় তা
শ্রেষ্ঠতাবোধ-ব্যাধি জন্মিয়াছিল এবং তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্যান্য প্রদেশ
বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী প্রদেশেরও হীনতাবোধ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হই
বিলম্ব হয় নাই। আজ রাষ্ট্রনৈতিক কারণে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে শা
সামঞ্জস্য ঘটাতে সেই সুপ্ত পুরাতন ব্যাধি আসামে উড়িষ্যায় ও বিহারে বিশ
ভাবে প্রকট হইতেছে। সমবেত প্রতিরোধের ফলে বাঙালীর পূর্ব প্রতিপ
বিনষ্টপ্রায় হইলেও সাহিত্যে ও শিল্পে সে ইতিমধ্যে যে উচ্চ স্থান অধি
করিয়াছে, অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্য দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ তজ্জন্য তাহা
সম্মান দিয়া আসিতেছে। কারণ, একমাত্র বাঙালীই বাংলা ভাষার সাহা

তবর্ষের আত্মাকে বাণীমূর্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই জন্য বাংলা দেশ াংলা সাহিত্য হইতেই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরমে"র র্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বাঙালী কবির নঃসৃত এই স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃবন্দনা-গানকে গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের নিতা-যুদ্ধে শুধু বাঙালী সৈনিকের নয়, সারা ভারতের দেশপ্রাণ বীরেদের রক্তপাত ও আত্মবলিদানের সহিত যুক্ত হইয়া এই গান মন্ত্র-মর্যাদা লাভ য়াছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহাকে "মহামন্ত্রে"র মর্যাদা দিয়া— ন। যথা—

"কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই, যাহা সত্য, যাহা কষ্টকল্পনা নহে, তাহার ক অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে কাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই ণ জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম, নি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বচনা করি, বাংলা ভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে র-সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।"

কিন্তু "স্বদেশীর হৃদয়-দরবার" যাহাই বলুক, স্বদেশী দিল্লীর দরবার কোঁ লে টা দিয়া কাঁটা তুলিবার মতলব ফাঁদিয়াছেন; আপাতত "জনগণমনে"র াক দিয়া "বন্দে মাতরম্-মহামন্ত্র"কে সমূলে উচ্ছেদ করিতে চাহিতেছেন। দেবের গানের এই অপ্রত্যাশিত সম্মান দৃষ্টে যে ভ্রান্ত হতভাগ্য সম্প্রদায় হঠাৎ াসে নৃত্য করিতে করিতে "বন্দে মাতরমে"র প্রতি অসম্মান দেখাইতেছেন, হারা চিন্তা করিতেও পারিতেছেন না যে, "সারা জাঁহাসে আচ্ছা" অথবা ওই তীয় খোদ-রচয়িতা-কর্তৃক-বাতিলীকৃত কোনও গান দরজার অন্তরালেই স্থান করিতেছে—সমাদরে বরণ করিবার জন্য ভারতীয় চিত্ত ও সংস্কৃতি ক্ষে অধুনা সম্পূর্ণ উদাসীন কাশ্মীরী পণ্ডিত ও আরবী মৌলানারা সোল্লাসে ক্ষা করিতেছেন।

এইরূপ বিরূপ ও কঠোর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইতেছি এই কারণে যে, প্রতি-ভারত-ভাগ্যবিধাতা পণ্ডিত জওহরলাল "বন্দে মাতরম্"কে বাতিল করি- র অন্যতম অজুহাত দেখাইয়াছেন—"বন্দে মাতরম্" গানের সুর সমবেতভাবে

সামরিক ভঙ্গিতে গাহিবার উপযুক্ত নয়। "বন্দে মাতরম্" কি এতকাল সমবেত ভাবে গাওয়া হয় নাই? ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত "Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them" না হইয়া "God save the King" হইল কেন? রাজা-বন্দনা অপেক্ষা দেশ-মাতৃকা বন্দনা কি অধিকতর সমর্থনযোগ্য নয়? আর মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্যের দল জাতীয় সঙ্গীতে সামরিক ভঙ্গী পরিহার করিতেও তো পারিতেন। সৈন্যদের অভিযানে সামরিক সঙ্গীতের অভাব হইত না। মাথামুণ্ড সুর বা অর্থ যাহা হউক, আসলে উর্দ চাই। দীর্ঘকালের সংস্কার ও শ্রদ্ধার উপর "বন্দে মাতরম" পাকা আসন গাড়িয়া বসিয়া আছে, "জনগণমন" দিয়া সেটিকে যদি স্থানচ্যুত করা যায় "জনগণমন"কে সরাইতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না, কারণ "জনগণমন" দিয়া কোনও স্লোগান হয় না—এই অজুহাত তো থাকিয়াই গেল।

আর একটি কথা, সুরের যুক্তি দিয়া সুরসেবী কর্তারা সমগ্র ভারতবর্ষে সুর-স্রষ্টাদের অপমান করিয়াছেন। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের যে কোনও পাতা যাঁহারা ইচ্ছা করিলে মালকোষ বা ইমন কল্যাণের ছাঁচে ফেলিতে পারেন তাঁহারা সহজেই ড্রাম ব্রাসব্যাণ্ডের উপযোগী করিয়া "বন্দে মাতরমে"র সুরে ঢালিয়া সাজিতে পারিতেন। রাষ্ট্রগতভাবে সে চেষ্টা ইহারা করেন নাই, কারণ "বন্দে মাতরম্"কে রাখা ইহাদের লক্ষ্য নয়, ইহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, "বন্দে মাতরম্"কে অপসারণ। যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শত শত তরুণ প্রাণবলি দিয়া ছুটিয়াছে, সে মন্ত্রকে—মহামন্ত্রকে অপসারণ করিতে গেলে যে হাজার হাজার তরুণ জীবনপণ প্রতিরোধ করিতে ছুটিয়া আসিবে, এই কথাটা কেবল কর্তারা খেয়াল করিতে পারেন নাই।

পারেন নাই, কারণ ইহারা, কি কারণে জানি না, ভারতবর্ষের প্রতি হৃদয়হীন হইয়াছেন। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের দূরবীন অথবা আরব-পারস্যের অণুবীক্ষণ দিয়া সহজেই উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু এ মহাদেশের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকা চাই। যে মহামন্ত্রকে ইহারা আজ অকারণে ক্ষুণ্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রকে তরুণেরা কি মর্যাদা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতেও ইহারা কি দিতে পারিবেন ঋষি-কবির উক্তির মধ্যে তাহারও ইঙ্গিত আছে। জনগণমনকে সম্ভ্রম না করিয়াই যাঁহারা ভারত-

ভাগ্যবিধাতা হইয়া আছেন, রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি তাঁহারা একবার স্মরণ করিবেন—

"তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া দিয়াছে। রাজচক্রের দ্বারা অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপে ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে, যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দে মাতরম্।...

"হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন, আমি নিশ্চয় জানি—তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কাল-ভুজঙ্গের বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না।...

"দেশের হৃদয়-নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রিগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করি। বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দে মাতরম্।"

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কথাও ভারতভাগ্যবিধাতাদের স্মরণ করিতে বলি, কারণ জীবিতকালে তিনি ইঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে ১৯৪৭, ২২ আগস্ট তারিখে কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—

Vande Mataram. That was no religious cry. It was a purely political cry. The Congress had to examine it. A reference was made to Gurudev about it. And both the Hindu and the Muslim members of the Congress Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection, it should be sung together by all on due occasion. It should never be a chant to insult or offend the Muslims. It

was to be remembered that it was the cry that had fired political Ben Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry their lips. He felt strongly about *Vande Mataram* as an Ode to Mo India,...*Vande Mataram*, the national song and the national cry of Ber which sustained her when the rest of India was almost asleep and which as far as he was aware, acclaimed by both the Hindus and the Muslim Bengal.

২৯-৮-৪৭ তারিখে কলিকাতায় অন্যত্র তিনি বলেন—

There should be one universal notation for *Vande Mataram*, if it wa stir millions, it must be sung by millions in one tune and one mode.

গান্ধীজীর উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে যে, "বন্দে মাতরমে"র বিরু সাম্প্রদায়িকতার অপরাধ টেকে না, এবং ভারত সরকার চেষ্টা করিলেই ই এক সুরে একভাবে সর্বত্র গীত হইতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার সে চে না করিয়া হঠাৎ মধ্যবর্তীকালের জন্য "বন্দে মাতরম্"কে সরাইয়া "জনগণমন" আসনে বসানোতেই আমাদের সন্দেহ হইতেছে, ইহারা কাঁটা দিয়া কাঁ সরাইবার মতলবে আছেন। যদি গণপরিষদের বিচারে ভারতের জা সঙ্গীত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত "বন্দে মাতরম্"ই চালু থাকিত, তাহা হই এই সন্দেহের অবকাশ থাকিত না; আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতে না যে, সামান্য কয়েক মাসের জন্য কণ্টকমুকুট-শোভিত এই "বন্দে মাতরম্" গদিচ্যুত করার মধ্যে কর্তৃপক্ষের যুক্তি কোথায়? যুক্তির অভাবই সন্দে উদ্রেক করে। শ্রদ্ধেয়কে সন্দেহ করার দুঃখ বড় কম নয়!

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু-অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্য মহাশয়ের সদ্য প্রকাশিত (এপ্রিল, ১৯৪৮) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধা দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িয়া অবগত হইলাম, বাংলা-কথাসাহিত্যে 'স্বর্ণলতা'-প্রণে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কঙ্কাবতী' ও 'ডমরু-চরিত' প্রভৃতি প্রণে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বেনের মেয়ে'-প্রণেতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'ধর্মপা 'করুণা' 'অসীম' প্রভৃতির লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ('মহাস্থবির' মণীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্য ও সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি লেখকদের উদ্ভব হয় নাই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ে

য় এই যে, আধুনিক কথা-সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল, 'বনফুল'ও দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞানের রাজত্বে জন্মলাভ করেন নাই। পুস্তকটি ধবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য। তিনি যে তাহাদের কাছে গন্ধমাদন তের সম্পূর্ণ বোঝা উপস্থিত না করিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিমত বিশল্যকরণী-সঞ্জীবনী প্রভৃতির ভার হালকা করিয়া আনিয়াছেন, ইহাতেই তাহারা কৃতজ্ঞতা বোধ করিবে।

—

বানরের হাতে শাণিত তরবারি দিলে যে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইতে রে, হিতোপদেশ-কার তাহা দেখাইয়াছেন। বুদ্ধদেব বসু শাণিত ইংরেজীর হায়ো অনুরূপ বিপর্যয় বাধাইয়া বসিয়াছেন। বিদেশী প্রকাশক প্রকাশিত *n Acre of Green Grass* গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের দাড়ি, শরৎচন্দ্রের থা, তারাশঙ্করের চুল, বনফুলের পিঠ এবং সুবোধ ঘোষের কান চাঁছিয়া, টিয়া, ছিঁড়িয়া, খোঁচাইয়া এবং মলিয়া একটা রক্তারক্তি এবং লণ্ডভণ্ড ব্যাপার রিয়া বসিয়াছেন। আদর করিয়াছেন শুধু প্রতিভা বসুকে। বাংলা সাহিত্যের ক একর পরিমাণ শ্যামল তৃণক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করিয়া কাঁটা চিবাইয়া রিতৃপ্ত হইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, পরিতৃপ্তির ডাক শুনাইয়াছেন দেশীদের। কাঁটার সঙ্গে 'চাট্টি' ঘাসও যদি খাইতেন, আমরা খুশি হইতাম।

—

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সংসদের রচিত পরিভাষা অংশত মুদ্রিত প্রকাশিত হওয়ার পর পক্ষে ও বিপক্ষে বিবিধ আলোচনা হইতেছে। কবি ীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাদের মারফৎ কয়েকটি সুপরামর্শ সংসদকে ঠাইয়াছেন। এই সুযোগে আমরা তাঁহার পরামর্শ-পত্রটি এখানেই প্রকাশ রিতেছি।

"পরিভাষা-সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষার প্রথম বক বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। প্রধান সচিব সুকুমার সেন এ সম্পর্কে ভদ্রমহোদয়গণের নিকট সহায়তামূলক প্রস্তাব ও ঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করিয়াছেন। অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুগ পরিভাষা চিত হইয়াছে বলিয়া যে সুলভ সমালোচনা চারিদিকে চলিতেছে, তাহা মীচীন মনে হয় না। গঠনমূলক কিছু করিতে গেলেই দেখা যাইবে, ইহা ছাড়া

গত্যন্তর নাই। সকল দিক বজায় রাখিয়া এই পরিভাষা রচনা যে কত ক তাহা যাঁহারা বুঝেন ও জানেন তাঁহারা সংসদের কার্যের প্রশংসা করিবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু এ কথা সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। বিশেষ বিশেষ স্থলে যে ই সংশোধন প্রয়োজন, সে কথা সংসদের সদস্যগণ জানেন। আমি অন্য বিভাগের কোন আলোচনা না করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় পরিভাষা সম্প কিছু আলোচনা করিতে চাই। আশা করি, ইহা সুযোগ্য সভাপতি সদস্যবৃন্দের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্পর্কে যে কয়টি পারিভাষিক শব্দ প্রথম স্তবকে ন পাইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করি।

১।	Engineer	(Civil, Irrigation)	বাস্তুকার।
২।	Engineer	(Mechanical)	যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ।
৩।	Engineer	(Electrical)	তাড়িত-যান্ত্রিক।
৪।	Engineer	(Agricultural)	কৃষি-বাস্তুকার।
৫।	Engineer	(Industrial)	শিল্পযান্ত্রিক।
৬।	Engineer	(Sanitary, Public Health)	স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য বাস্তুকা
৭।	Engineering Service	(Roads Buildings, Irrigation)	বাস্তুকৃত্যক।
৮।	Chief Engineer		মুখ্যবাস্তুকার।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলায় এমন কোন একটি শব্দ পাওয়া গে না যাহা সাধারণ Engineer শব্দের পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ইংরেজী Engine-এর সহিত অধিকাংশ Engineer-এর যেমন সংস্রব না বাংলা 'বাস্তু'র সহিতও অনেক 'বাস্তুকারে'র তেমনই কোন সম্পর্ক রহিল না, যেমন 'কৃষি-বাস্তুকার', 'সেচন-বাস্তুকার'। অর্থাৎ ইংরেজী Engine শব্দটির যে দোষ ছিল, তাহা বাংলাতেও গৃহীত হইল। কিন্তু ইংরে Engineer বলিতে ওই কর্মের সকল বিভাগীয় কর্মীকে বুঝায়; বাংলায় সুবিধাটুকু ঘুচিয়া গেল। Mechanical Engineerকে যন্ত্র-বাস্তুকা Electric Engineerকে 'তাড়িত-বাস্তুকারক' বলা চলিবে না; যান্ত্রিক

বিৎ শব্দের প্রয়োজন অনুভূত হইল। আবার Civil Engineerকে স্থযন্ত্রবিৎ বলা গেল না। অর্থাৎ ভাষার ক্ষেত্রে Engineer-এর জাতি ও বিভাগ বিভক্ত হইয়া গেল। ভারতবিভাগ বা বঙ্গবিভাগের ন্যায় এ বিভাগ ক্রম ও দুঃখজনক, ইহা পরিহার করিতে পারিলেই ভাল হয়। এমন একটি র নির্বাচন করিতে হইবে যাহাতে ইঞ্জিনিয়ারের গোত্রটা ঠিক থাকে।

অস্মদ্ দেশের আদি ও অনাদি Engineer হইতেছেন বিশ্বকর্মা। এখনও ক্তিশিল্পগণ বিশ্বকর্মার পূজা করিয়া থাকেন। এই বিশ্বকর্মা শব্দের অন্তস্থ র্ম' শব্দটির ভিতর Engineering বিভাগের প্রাণ লুক্কায়িত। অপরাপর ীষীগণ কেহ জ্ঞান লইয়া, কেহ ধ্যান লইয়া, কেহ বা কল্পনা পঠন পাঠন, হ বা মনন ভাষণ প্রভৃতি নানাবিষয়িণী শক্তির স্ফুরণকল্পে জীবন যাপন রেন। ইঞ্জিনিয়ার-গোত্রীয় মানব মুখ্যত 'কর্ম' লইয়া চিরজীবন ব্যস্ত াকেন। Practical অর্থাৎ 'করিৎকর্মা'র দোষ ও গুণ উভয়ই তাঁহাদের ধ্য বিদ্যমান। বিশ্বকর্মার ন্যায় তাঁহারা সকলেই 'কর্মা'; কেহ বা 'বাস্তুকর্মা', কেহ বা 'সেচন-কর্মা', কেহ বা 'তাড়িত-কর্মা', কেহ 'যন্ত্রকর্মা', কেহ 'স্বাস্থ্যকর্মা', হ 'পূর্তকর্মা' (Water Works Engineer)। অকর্মাও অবশ্য অনেক ছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের কথা বাদ দেওয়া যায়। Engineering ervice সাধারণভাবে 'কর্ম-কৃত্যক'। 'কর্মা' শব্দটি যদি লঘু বিবেচিত হয় বে 'কর্মবিৎ' শব্দটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'যন্ত্রবিৎ' যখন গ্রহণীয় মনে ইতেছে, তখন 'কর্মবিৎ'-এ আপত্তির কারণ নাই। তাহা হইলে পরিভাষা ইরূপ দাঁড়ায়।

Building Engineer	বাস্তু-কর্মা বা বাস্তুকর্মবিৎ।
Irrigation Engineer	সেচকর্মা বা সেচকর্মবিৎ।
Civil Engineer	পৌরকর্মা বা পৌরকর্মবিৎ।
Mechanical Engineer	যন্ত্রকর্মা, যন্ত্রকর্মবিৎ।
Electrical Engineer	তাড়িতকর্মা, তাড়িতকর্মবিৎ।
Sanitary Engineer	স্বাস্থ্যকর্মা, স্বাস্থ্যকর্মবিৎ।
Water-Works Engineer	পূর্তকর্মা, পূর্ত-কর্মবিৎ।
Industrial Engineer	শিল্পকর্মা, শিল্পকর্মবিৎ।
Agricultural Engineer	কৃষিকর্মা, কৃষিকর্মবিৎ।

Naval Engineer নৌকর্মা, নৌকর্মবিৎ।
Aeronautical Engineer বিমানকর্মা, বিমানকর্মবিৎ।
Chief Engineer মুখ্যকর্মা, মুখ্যকর্মবিৎ।
Science of Engineering কর্মবিজ্ঞান।
College of Engineering কর্মবিদ্যায়তন।
Engineering Service কর্মকৃত্যক। ইত্যাদি।

বিশ্বকর্মার বিদ্যার শাখা এ যুগে ক্রমবর্ধনশীল। 'কর্মা' বা 'কর্মবিৎ' Engineer-এর পরিভাষারূপে গৃহীত হইলে নূতন নূতন শাখার নামকরণে খুবই সুবিধা হইবে। সে শাখা বাস্তুপ্রধান কি যন্ত্রপ্রধান তাহা লইয়া দুর্ভাবন করিতে হইবে না।

এইবার অধস্তন কর্মচারীদের সম্পর্কে কিছু বলি। পরিভাষায় দেখিতেছি :—
Overseer বাস্তুকর্ম উপদর্শক; Sub-Overseer অবর-উপদর্শক; Work Sircar—বাস্তুকামিক; Estmator—প্রাক্-কলনিক; Surveyor —পরিমাপক।

এই বিভাগের Chief Engineer হইতে Sub-Overseer পর্যন্ত সকলেই inspect বা oversee—অর্থাৎ পরিদর্শন বা উপদর্শন করিয়া থাকেন। সকলেই যদি ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গসহ দর্শন করিয়াই কর্তব্য সমাধা করেন, তবে কাজগুলি করাইয়া লইবার ভার যে কাহার উপর, ভাষার মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। Overseer এবং Sub-Overseerদের প্রধান কর্তব্য এই কাজ করাইয়া লওয়া। সুতরাং ইংরেজী শব্দের পদাঙ্ক অনুসরণে বাংলা পরিভাষা না করিয়া এ ক্ষেত্রে যদি কার্যোপযোগী নামকরণ করা যায়, তবে মন্দ হয় না। আমি প্রস্তাব করি—Overseer-এর পরিভাষা 'কারয়ক' হইতে পারে। তাহা হইলে Sub-Overseer—'উপ-কারয়ক' ('অবর' শব্দটি যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল মনে হয়)। Work Sircar—'কর্মিক' থাকিবে। Estimators—প্রাক্-কলনিক, বেশ পার্থক্য মনে হয়। অবশ্য ইংরেজী শব্দের পরিভাষা হিসাবে, Overseer—উপদর্শক, ভালই হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে, যেমন ডাকবিভাগে, Overseerকে উপদর্শকই বলিতে হইবে।

এ বিভাগের Surveyকে জরীপ বলার এবং Surveyorকে 'পরিমাপক' না বলিয়া আমিন বা জরীপকার বলার সুবিধা বেশি। Director of

surveyকে জরীপ-অধিকর্তা বলিলে নিতান্ত শ্রুতিকটু হয় না; 'অবেক্ষাধীন লেফ' তো বলিতে হইতেছে।"

পরিভাষা সংসদের সদস্য শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় "বাস্তু"-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া কর্তব্য সমাধা করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"বাস্তু শব্দে কেবল বাসভূমিই বুঝায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাস্তুকর্ম নাম দিয়া (৩৮-১০) তিনটি অধ্যায় আছে। তাহাতে দেখা যায় গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যান, সেতু, তড়াগ আধার—এ সকল বাস্তু। জলনির্গমপথ, মল-মূত্রের স্থান, পথের সংক্রম প্রভৃতিও উক্ত তিন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বাস্তুবিদ্যার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মানসার' (৩য় অধ্যায়) অনুসারে ভূমি, প্রাসাদ, মণ্ডপ, সভা, শালা, প্রপা, রঙ্গ, শিবিকা, রথ, মঞ্চ, আসন প্রভৃতি বাস্তুর মধ্যে পড়ে।

মঃমঃ ডাঃ শ্রীযুত প্রসন্নকুমার আচার্য তাঁহার Dictonary of Hindu Architecture গ্রন্থে (৫৪৮ পৃ.) বাস্তুকর্ম শব্দের বিবরণ দিয়াছেন এইরূপ—

"Vastukarman—The Building works; the actual work of constructing temples, palaces, houses, villages, towns, forts, tanks, canals, roads, bridges, gates, drains, moats, sewers, thrones, conches, bedsteads, conveyances, ornaments and dresses, images of Gods and sages".

এই বিবরণ অনুসারে বাস্তুকর্মই হইবে প্রকৃত public works পূর্তকর্ম নয়। Engineering বিদ্যাকে বাস্তুবিদ্যা বলা চলিবে। অর্থশাস্ত্রের টীকায় (১০।১০:৬৯ পৃ.) মাধবযজ্বা বাস্তুক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বাস্তুবিদ্যাবিদ্। তাহা হইলে আমরা Civil Engineer-এর নাম করিতে পারি বাস্তুক, বাস্তুবিৎ বা বাস্তুকার।"

প্রতাপাদিত্য-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নানা দিকে তাঁহার সম্বন্ধে নানা সম্ভব অসম্ভব কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। দীর্ঘকাল পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ইতিহাসাচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রামাণিক উপকরণ হইতে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হওয়াও প্রয়োজন বোধ করিয়া আমরা সার্ যদুনাথকে দিয়া সংশোধন করাইয়া সেগুলি প্রকাশ করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেখিলাম। তাঁহারা জানাইলেন যে, পল্লীর সুনাম রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাত্রে পাহারা দিবেন। এবং যদি কেহ রাত্রে আক্রমণ করিতে আসে, তবে তাঁহারা স্টেন গান (Sten Gun) ব্যবহার করিতেও ইতস্তত করিবেন না। কেবল তাঁহাদের এইটুকু অনুরোধ, রাত্রে পুলিস যদি কাহারও নিকট লাইসেন্স-বিহীন অস্ত্রশস্ত্র পায়, তাহা হইলে যেন ধরপাকড় না করে। এ বিষয়ে তাঁহারা গান্ধীজীর কাছে আশ্বাস চান।

এই অত্যন্ত দুরূহ প্রার্থনার দৌত্য লইয়া আমি গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন তিনি ঘরের বাহিরে, বাগানের মধ্যে রাস্তার উপরে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছেন। আমি সব-কথা খুলিয়া তাঁহাকে বলিলাম। শুনিবার পরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম এই।—সে সময়ে বাংলা দেশে লীগ-মন্ত্রিত্বের স্থলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদল শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। গান্ধীজী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, মন্ত্রীগণ যদি এই দরিদ্র মুসলমানদের প্রাণ রক্ষা করিতে না পারেন এবং যুবকেরা যদি সেজন্য চেষ্টা করেন, তবে অবশ্যই সমর্থনের যোগ্য হইবে।

যে দৃঢ়তার সহিত গান্ধীজী কথা বলিলেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইলাম। অবশ্য গান্ধীজীর কথা যুবকগণের নিকট সেদিন আমি বলি নাই। বরং পুলিস কর্তৃপক্ষ যাহাতে বন্দুকধারী সৈনিক দিয়া বস্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহারই আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল, জনৈক ঊর্ধ্বতন পুলিস-কর্মচারীর নিকট বলিয়া রাখিয়াছিলাম, সে রাত্রে আততায়ী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট অস্ত্র পাওয়া গেলে যেন গ্রেপ্তার করা না হয়। ঘটনাচক্রে অবশ্য সেইরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই।

বেলেঘাটায় সদ্যোমৃত মানবদেহের পাশে দাঁড়াইয়া গান্ধীজীর যে পাষাণ-মূর্তি দেখিয়াছি, অন্যত্র তাহা অবলোকন করিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে; সে কথা পরে বলিব। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বিষয়ে একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যেদিন আমরা প্রথম বেলেঘাটায় আসি, তাহার অব্যবহিত পরে কয়েকজন উৎসাহী যুবক গান্ধীজীর ঘরের জানালার কাচ ঢিল মারিয়া ভাঙিয়া দেয়। ৩১এ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখেও একটি বৃহৎ জনতা ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার, টেবিল, ছবি এবং গৃহস্বামীর কাচের অনেক বাসনপত্র চুরমার করিয়া ফেলে, গান্ধীজী শব্দ শুনিয়া নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন, এবং হাত জোড় করিয়া জনতাকে শান্ত

ইবার জন্য ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তাহা
য়েকজন পুলিস-কর্মচারী এবং সহকর্মীদে

পরের দিন সকালে গান্ধীজীর সহিত
রিবার সময়ে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিে
তি সংযত ব্যবহারই করিয়াছে। কার
াহারা স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে আঘাত করিতে
রীরিক বিপদকে লঘুভাবে গ্রহণ করার
নতা যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন,
তস্তত করিতেন না। চীৎকারের মাত্রা
য়া চাপিয়া ধরিতেন। একদিন বলিে
স্তু "সকলের চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়,
াঙুলের সাহায্যে।

জনতার বিষয়েও যেমন, অন্যান্য বিষ
মাটির প্রতি একটি নিবিড় প্রেম বর্তমা
ষ্টরোগীকে নানা কাজের মধ্যেও স্বহে
য় তাঁহার যেমন তিরোহিত হইয়াছিল,
প্রমও তাঁহার তেমনই গাঢ় ছিল।
ওয়ার প্রয়োজন হয়। ট্রেনে গেলে প
ত্রে হয়তো চীৎকারের চোটে ঘুমাই
রোপ্লেনে দিল্লীযাত্রার বিষয় প্রস্তাব করি
াছের মত বস্তুর পেটের মধ্যে ঢুকিে
ারও মূল্যবান কথা বলিলেন যে, তিনি
ালবাসেন না।

বস্তুত মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি
ল না। ইহার চরম প্রকাশ নোয়াখালি
শেষভাবে দেখা গিয়াছিল।

নোয়াখালিতে শত-করা প্রায় ৯
াকিস্তানের দাবি করিয়াও গান্ধীজীকে ই
৯৪৪ সালে রাজাগোপালাচারি গান্ধীজীর

নিকটে যে প্রস্তাব করেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। গান্ধীজীও যে পাকিস্তানে দাবির চরমতম শত্রু, মুসলিম-জগতে এরূপ প্রচার অবিরত চলিতে থাকে। রাজাজীর প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর লীগ অনুভব করিলেন যে, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রা ভিন্ন ভারত-বিভাগের ব্যাপারে কংগ্রেসকে রাজী করানো যাইবে না। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সাল কলিকাতায়, এবং ওই বৎসরেই ১০ই অক্টোবর তারি নোয়াখালিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রূপগ্রহণ করে। নোয়াখালিতে হিন্দু ধর্মান্তরিত করিয়া মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সমস্যার এক অভিনব সমাধানের চে করিলেন। অবশ্য ইহার সহিত লুঠতরাজ, গৃহদাহ, নরহত্যা, নারীধর্ষণ সব ঘটিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, ধর্মান্তরকরণকেই তি বাধা দিবেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাকেই তিনি মৌলিক সমস্যা বলিয়া বিবেচ করিতেছেন।

যে মুহূর্তে তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল, সেই মুহূর্তে তিনি আর কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা দিল্লী হইতে কলিকাতার পথে রওনা হইলেন। কলিকাতায় পৌঁছানোর পরই তিনি তদানীন্তন গভর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী শহী সুহরাবর্দি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে নোয়াখালি ব্যাপারে অনেক গাফিলতির ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল। গান্ধীজী কি গভর্মেণ্টের সংশোধনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া নোয়াখালির গ্রামের অভিমুখে স্বী কর্তব্যের সন্ধানে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

প্রথম বারো-চৌদ্দ দিন তিনি হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দ, জেলার কর্তৃপক্ষ সকলের সহিত মিশিয়া প্রকৃত তথ্য আহরণের চেষ্টা করিলেন। তখন পর্য তাঁহার সম্মুখের পথ অন্ধকার হইয়া আছে। গভর্মেণ্টের দিক দিয়া কি কর যায়, তাহা তাঁহার বিবেচনার বিষয় নহে। শাসনের দ্বারা যতটুকু শান্তি দেশে ফিরাইয়া আনা যায়, তাহা কাম্য বা প্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও গান্ধীজী নিকট শ্রেয় বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। তিনি শ্রেয়ের সন্ধানে অগ্রস হইয়া চলিলেন। কিন্তু বারংবার তাঁহাকে এ কথা বলিতে হইল যে, আমি চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার দেখিতেছি। ভোরের আলো ফুটিবার আগে রাত্রি অন্ধকার যেমন গাঢ়তম হয়, এ অন্ধকারও হয়তো তেমনই। তবু তিনি অন্ধকারকে অতি গাঢ় বলিয়াই অনুভব করিতেছিলেন, কোন্ পথে যে প্রথ আলোর রেখা উদিত হইবে, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একদি

প্রার্থনা-সভায় বলিলেন, আমি কেবল হৃদয়ে আশার অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।

শরীরের ব্যাপারে গান্ধীজীর যে উপেক্ষার ভাব দেখিয়াছি, মনের রাজ্যেও বিপদ ও পরাজয়ের সম্ভাবনার প্রতি তাঁহার ঠিক সেই উপেক্ষাই নিরীক্ষণ করিয়াছি।

নোয়াখালিতে তিনি যে আলোর আশায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন, তাহা এই :—গান্ধীজীর ধারণা ছিল যে, সমাজ মাত্রে অনুসন্ধান করিলে আমরা এক দিকে যেমন স্বার্থবুদ্ধি, সংকীর্ণতা বা নিষ্ঠুরতার সন্ধান পাই, তেমনই প্রেমেরও সন্ধান পাইয়া থাকি। হিংসা এবং অহিংসা উভয়েই সকল সমাজে, সকল মানুষের হৃদয়ে শাসনাধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু সু এবং কু-এর মধ্যে সচরাচর সু পরিমাণে অধিক হইলেও দুর্বল মূর্তিতে থাকে; কু পরিমাণে কম হইলেও প্রবল আকার ধারণ করে। সু এবং কু-এর মধ্যে সু যদি পরিমাণে বেশি না হইত, তবে সমাজের দেহ দাঁড়াইয়া থাকিত না, জীর্ণ অট্টালিকার মত চূর্ণ হইয়া যাইত। কু পরিমাণে অল্প হইয়াও শুধু প্রাবল্যের দ্বারা সু'কে ক্লান্ত করে। অতএব সমাজে প্রবল কু'কে পরাজিত করিবার একমাত্র উপায় দুর্বল সু'কে সক্রিয় করা, প্রবল করা।

সমস্যা হইল, নোয়াখালিতে কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? নোয়াখালিতে প্রথম কয়েক দিন গান্ধীজী হিন্দুর মনে সৎসাহস এবং মুসলমানের মনে ঔদার্য আনিবার জন্য যথোচিত উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কুপ্রচারের ফলেই বোধ হয় গান্ধীজীকে মুসলিম-সম্প্রদায় পাকিস্তানের শত্রু বিবেচনা করিয়া প্রার্থনা-সভায় আসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন। গান্ধীজী চিন্তায় পড়িলেন। তিনি স্বল্পসংখ্যক মুসলমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করুক অথবা না করুক, অন্তত তাঁহার কথা যেন ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করে। কিন্তু ফল বিশেষ হইল না। মুসলমান-জনতা আসা অছিলায় প্রার্থনা-সভা হইতে দূরে থাকিত।

তখন গান্ধীজী প্রেমের পথে, অহিংসার পথে, অর্থাৎ বিশ্বাসের পথে নূতন এক পা বাড়াইয়া দিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, একান্ত নিরালম্ব হইয়া একা পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, মুসলমান-গৃহস্থের বাড়িতেই অতিথি

হইয়া তিনি থাকিবেন। অর্থাৎ অবিশ্বাসের বদ্ধ দুয়ারকে তিনি বিশ্বা আঘাতে খুলিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুইটি গান তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠি প্রথম, 'একলা চল রে' এবং দ্বিতীয়, 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে'। দুইটিতে তাঁহার অন্তরের আকুলতা এবং নিঃসঙ্গতার বোধ যেন মূর্তি গ্র করিয়াছিল।

গান্ধীজী নোয়াখালি-পরিক্রমায় একক যাত্রা করিলেন। ইহাই তাঁহ অহিংসার সাধনা। হিংসার পথে, শক্তির সহায়তায়, দণ্ডের দ্বারা অব সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে ব্যভিচার ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে শু করা যাইত। কিন্তু হিংসার ফল কখনও স্থায়ী হয় না; ব্যক্তির চরিত্রগত নিষ্ক্রিয়তার ভমোমূলের উপরে রাষ্ট্রের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে কো দিনই প্রশ্রয় দিতে তিনি চান নাই। শাসন বা আইন অবলম্বন করিয়া ক্ষ কার্যসিদ্ধি করার বিপক্ষে ছিলেন তিনি। তিনি চিরদিনই সাধারণ মানুষে নিষ্ক্রিয়তাকে কল্যাণের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন। এবং সেইজন্যই কি হইলেও অহিংসার পথ আশ্রয় করিয়া চলিতেন। গান্ধীজীর বিশ্বাস ছি বীর্যবান অহিংসার অগ্নিশিখায় প্রতিপক্ষের অন্তরে সু প্রজ্বলিত হইয়া উঠি তাহার উপরে নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তার যে আবরণ ঘেরিয়া থাকে, তাহা ভস্মীভূ হইয়া সু'কে কু অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং শক্তিময় করিয়া তুলিবে। অহিংসা-বহ্নি স্পর্শলাভ করিয়া ব্যক্তি যখন শুদ্ধ হইয়া উঠিবে, তখনই সক্রিয় বীর্যব ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে কল্যাণকর সমাজ-সংগঠন সম্ভবপর হইবে। সর্বজনে কল্যাণের অপর কোনও উপায় আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন ন অহিংসাকেই সর্বোত্তম পাবক বা শোধক বলিয়া স্বীকার করিতেন। এবং নিজে মধ্যে সেই শক্তি কতখানি অর্জিত হইয়াছে, ইহারই অগ্নিপরীক্ষা দিবার জ তিনি নোয়াখালির পথে অনিকেতনব্রত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সাধনার ফলে নোয়াখালির মুসলমান-সমাজের উপরে কি প্রভ পড়িয়াছিল বলিতে পারি না, হয়তো তাহা যাচাই করিবার সময় আজ হয় নাই।

কিন্তু তাঁহার বীর্যময়ী অহিংসার প্রভাবে অন্যত্র যে মানুষের মন টলিয়া সু সক্রিয় হইয়া কু'কে পরাভূত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আমরা কলিকাত

ম্বর (১৯৪৭) মাসের দাঙ্গার পরে স্পষ্টত দেখিয়াছিলাম। সে ময়ে গান্ধীজীর অনশনের ফলে ক্রোধোন্মত্ত হিন্দু-জনতা অস্ত্রকে সংবরণ রিয়াছিল। গান্ধীজী বারংবার বুঝাইতেছিলেন, ১৫ই আগস্টের পরে মরা ভারতবর্ষে প্রত্যেক নাগরিককে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সমান আদর করিব, বেই পাকিস্তানের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিকেও প্রেমের দ্বারা জয় করিয়া সুগত ভারতসন্তানে পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইব। গান্ধীজীর প্রেমমূলক, স্ত মৃত্যুপথগামী অনশনব্রতের আঘাতে কলিকাতার হিন্দু অন্তত স্তব্ধ হইয়া বিতে লাগিল, এবং পূর্বতন ইতিহাসকে হয়তো বা সাময়িকভাবেও বিস্মৃত য়া হিংসার অস্ত্র গান্ধীজীরই নিকট সমর্পণ করিয়া গেল। ইহা প্রেমের দ্বারাই ত সহজে সম্ভব হইয়াছিল, অন্য উপায়ে হইত না।

অথচ গান্ধীজী নিজের অহিংসাকে কত অসম্পূর্ণ, কত নিম্নকোটির বস্তু য়া বিবেচনা করিতেন, তাহা একটি ঘটনা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে রি।

নোয়াখালিতে আগে হইতে ষড়যন্ত্র এবং যথোচিত আয়োজন করার ফলে লমান-জনতা হিন্দুদের নিকট কোথাও বাধা পায় নাই বলা চলে। যতটুকু ধা পাইয়াছিল, তাহার শক্তি জনতার ধ্বংসশক্তির নিকট তুলনায় পুষ্করিণীস্থ শে গোষ্পদের অপেক্ষা বেশি হইবে না। ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে, লার প্রাচীন বিপ্লবীদলের কর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ সংকল্প করেন, অস্ত্রশস্ত্র ং গোপন আক্রমণের দ্বারা মুসলমান-সমাজকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতে বে। এই সময়ে প্রবীণ বিপ্লবীপন্থী কয়েকজন কর্মী, গান্ধীজীর পথে বাধা সৃষ্টি রিতে অনিচ্ছুক হইয়া, একদিন তাঁহার নিকট পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন।

গান্ধীজী তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিয়াছিলেন। তিনিই একটি প্রশ্ন য়যুগের কর্মীবৃন্দের নিকট উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি পনাদের ইতিহাস শুনিয়াছি। আপনারা মৃত্যুর ভয়কে সম্পূর্ণ অতিক্রম রিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের সাহসের মূলে প্রথমাবস্থায় অস্ত্রের প্রয়োজন ল; আজ আপনাদের হাতে অস্ত্র না থাকিলেও আপনারা হেলায় মৃত্যুকে ণ করিতে পারেন। দেশের সাধারণ লোককে কিন্তু অস্ত্র দেওয়া তো ম্ভিত সম্ভব হইতেছে না, অন্তত বর্তমান গভর্মেণ্ট তো সে ক্ষেত্রে আপনাদের হকাচরণ করিবে। এরূপ অবস্থায় আপনাদের নিকট প্রশ্ন করি, যাহারা

হাতে অস্ত্র ধরে নাই, এমন কয়জন ব্যক্তি আপনাদের বীরত্বের স্পর্শে মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করিতে শিখিয়াছে? বন্ধুগণ উত্তর দিলেন, সেরূপ সা অস্ত্রহীন জন মুহূর্তের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই।

গান্ধীজী তখন নিজের সম্পর্কে বলিলেন যে, তিনি গীতায় উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞে অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার অহিংসা অসম্পূর্ণ সামগ্রী। উহাকে তিনি 'টুটীফু অহিংসা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, অর্থাৎ 'ভাঙাচোরা' অহিংসা। কিন্তু অহিংসার স্পর্শে ভারতবর্ষের মধ্যে কত অগণিত স্থানে, নিতান্ত সাধারণ মানু কি পরম ভয়শূন্যতার পরিচয়ই না স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে দিয়াছে! ত সাধারণের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সাত্ত্বিক শক্তিকে জাগ্রত করা শুধু অহিংসার দ্বার সম্ভব বলিয়া গান্ধীজী মনে করিতেন। আর ইহা সম্ভব হয় এই কারণে যে, স মানুষের অন্তরেই এই পরম সাহসিকতার বীজ সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে তাই গান্ধীজীর মতে তিনি নিজে অহিংসায় সিদ্ধিলাভ না করা সত্ত্বেও অপ অহিংসা তাঁহার স্পর্শেই প্রজ্বলিত হইয়া চরম আলো এবং প্রাণপ্রদ উত্ত বিকিরণ করিতে পারিত। গান্ধীজীর সম্পর্কে, মনে পড়ে, গোখলে এক স লিখিয়াছিলেন:—

He has in him the marvellous spiritual power to turn ordinary m around him into heroes and martyrs.

অথচ গান্ধীজীর আচরণ আমাদের দৃষ্টিতে ভয়লেশশূন্য হওয়া সত্ত্বেও তি কেন নিজেকে অহিংসায় সিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, তাহার এ কারণ তাঁহারই ভাষায় প্রকাশ করিব।—

I have deliberately made a supreme attempt to cast out from my heart fear whatsoever including the fear of death. Still I remember occasions my life when I have not rejoiced at the thought of approaching death as might rejoice at the prospect of meeting a long lost friend. Thus man o remains weak notwithstanding all his efforts to be strong, and knowle which stops at the head and does not penetrate into the heart is of but li use in the critical times of living experience.—*Satyagraha in South Afr* p. 286.

মৃত্যুকে পরম সুহৃদের মত সকল অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়াই তিনি মনে করিতেন যে, রাগ এবং দ্বেষের দ্বৈত শৃঙ্খল হইতে তাঁ

ক্ত হয় নাই ; অর্থাৎ সূক্ষ্ম লোকে জীবনের প্রতি অনুরাগ এবং মৃত্যুর প্রতি ষ তাঁহার থাকিয়া গিয়াছে।

এই ভয় হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষার তাঁহার অবধি ছিল না। ৃত্যুর সুযোগ পাইলেই যেন তিনি সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেন ; মৃত্যুর ভয়কে পূর্ণ বর্জন করিতে পারিয়াছেন—এই আশ্বাস অন্তরে লাভ করিবার জন্যই যেন হার মধ্যে একটা উন্মাদনা আসিয়া যাইত। প্রেম নাই, সেখানে প্রেমকে তিষ্ঠিত করিতে হইবে ; পথে মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়া অবতরণ করিতে পাবে ।.দেখিবামাত্র নিজের দেহকে, মনের অবশিষ্ট রাগদ্বেষকে আহুতি দিবার জন্য ন তিনি দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলিতেন।

প্রেম এবং আত্মাহুতি, অহিংসা এবং তপশ্চর্যা তাঁহার নিকট সমানার্থ-ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বস্তুত, ইহা তাঁহার দেহ এবং মনের সর্বোত্তম ডা বা লীলার স্থান অধিকার করিয়াছিল।

রাজকোট সত্যাগ্রহের সময়ে প্রতিপক্ষ শ্রীবীরাওয়ালার সম্পর্কে গান্ধীজী াগ্রহীগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন :

I told them that if they accepted my explanation of ahimsa they would e to set their heart not on getting rid of Darbar Shri Virawala, but on verting him. This they could do only if they would set about finding his i points and working at them. They must develop infinite faith in the acity of ahimsa to neutralise every person of himsa. *True ahimsa lay in ning into the mouth of himsa.*

...They must, therefore, shed their fear of Darbar Shri Virawalla and their elief in the power of ahimsa to achieve the seemingly impossible.—*Harijan*, 89, 104.

শ্রীনির্মলকুমার বসু

বৃথা

প্রণাম ক'রে ঘুরে রাখি, তাতেই তো হয় ভুল,
ভালবেসে টানতে যে হয় কাছে—
সেই ডালে কি ফুল ধরে গো ছিঁড়ল যাহার মূল,
করলে পূজা মরা ডাল কি বাঁচে ?

ডানা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

নদীর ধারের প্রকাণ্ড শিমুলগাছটার পাতা নেই। অসংখ্য লাল ফু
ভ'রে উঠেছে সেটা, আর তাকে কেন্দ্র ক'রে সাড়া প'ড়ে গেছে পাখিদের মহলে
দোয়ারি, হাঁড়িচাচা, টুনটুনি, শালিক, গো-শালিক, টিয়, ছাতারে, কা
বুলবুল—একটা হাট ব'সে গেছে যেন। কাকলী-কলরবে নদীতীর পরিপূ
আকাশটাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন কৌতূহলভরে। নদীর স্বচ্ছ
ধারাতেও লেগেছে আনন্দের ছোঁয়াচ, অসংখ্য ঊর্মির শিহরণ জেগেছে যেন ত
স্রোতোধারায়। নদীর ওপারে শুভ্র সৈকত। তার ওপারে মাঠ, গম
বটর ছোলার ক্ষেত। গ্রামকান্তি নেই আর তাতে। শিশুপ্রাণের সব
অমুর উচ্ছলতা আর দেখা যাচ্ছে না, যৌবনের বর্ণাঢ্যতা ফুটে উঠেছে চারিদিকে
ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে সকল সৌন্দর্য্যের সার্থক মহিমা। লুটিয়ে পড়েছে

···বৃদ্ধনেত্রে দেখছিলেন আগন্তুক পথিক। পদ্মাসনে ঋজু-মেরুদণ্ড
ব'সে ছিলেন তিনি সেই স'ড়ো ঘরটির সামনের চাতালে। দেখতে দেখ
প্রায় পনরো দিনে কেটে গেছে। আরও কাটবে বোধ হয় কিছু কাল। এ
যতদিন না আপত্তি করেন, থাকবেন তিনি এখানে। থাকবার যে বিশেষ এক
আগ্রহ আছে, তা নয়। আগ্রহের সঙ্গত কারণ যদিও আছে একটা, কি
সেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। থাকবেন, কারণ কোথ
তো থাকতে হবে। এ আরগাটা ভাল লাগছে। নদীতীর বেশ নির্জ্জন।
মেয়েটি ওই বাড়িটাতে থাকে, আশঙ্কা ছিল, সে হয়তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে
সে কিন্তু বিশেষ কিছুই করে না, ও-বাড়িতে কোন লোক আছে ব'লেই
হয় না। সামনের বারান্দায় ক্যাম্প-চেয়ারে ব'সে থাকে চুপ ক'রে সামনে
দিকে চেয়ে। কখনও পড়ে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতেও দেখা যা
মাঝে মাঝে তাঁর কাছেও আসে, খোঁজখবর নেয়। প্রশ্নও করে দু-এক
এমন বিষয়ে, যাতে মনে হয়, মেয়েটি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। আগ
হাসেন মনে মনে। ভাবেন, সবাই হাতড়াচ্ছে, কেউ সেটা বোঝে, কে
বোঝে না।···ভাল লাগে মেয়েটিকে। হয়তো পিপাসা জেগেছে। মনে প
যায় পুণার মুসলমানী সন্ন্যাসিনী হজরৎ বাবাজানের কথা। মুখময় বলি-রে
মাথায় শুভ্র-কেশভার। চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু শিশুসুলভ কৌতূহল যেন প

লে উড়তে চাইছে অজানার উদ্দেশে
থম প্রথম।' এখন আর ভয় নেই
ামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে
ক্ষ্য করেন নি তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে
াছে তা সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে যখন
ার চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে, ত
খতে পান নি তিনি একদিনও।
ক্ষ্য করেছেন মাঝে মাঝে।

...পুষ্পিত শিমুলগাছটার দিকে চে
চিত্রবর্ণ অসংখ্য পাখি, অসংখ্য রকম
নি নিজেও। অনন্তমুখী অনন্ত লীল
হ এবং দেহাতীত একসঙ্গে।'

এই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ

রূপচাঁদ যখন ডানার কাছে এ
াস্তের রক্তিমাভা যদিও লেগে রয়েছে
চাঁদ আপিস-ফেরত প্রায়ই আসেন
াব হয় না। শুধু তাই নয়, অজুহা
য়ে। নানা প্রয়োজনে প্রত্যহ আসে
ম্মত হয়।

সেদিন এসেই রূপচাঁদ যে প্রসঙ্গটি
থেকেই কথাটা বলছেন তিনি।
নও। রূপচাঁদ এসে গলার পাকা
ও তেমনই রাখতে যাচ্ছিলেন কপা
ডানা বললে, আলনা থাকতে ওখা
রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এবং
লন তার দিকে, যার অর্থ আপাতদৃষ্টি
া চাদরটা তোমার হাতে দেওয়া
র্থ রূপচাঁদের মনের অন্তরালে ছিল,

ইচ্ছে—তাই নাকি? আমার চাদরের সম্বন্ধে মমত্ব-বোধ জেগেছে না তোমার? এইটেই তো প্রত্যাশা করছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে চাদরটা তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর চেয়ারে ব পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার ক'রে সন্তর্পণে ঠুকতে লাগলেন সিগারেট-কেসের উপরে।

ডানাই আবার প্রশ্ন করলে, দেশলাই আছে তো?

আছে।

পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে সিগারেটটি ধরালেন, তারপর এক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? আমি আজ ইন্‌স্‌পেক্‌ অব স্কুল্‌সের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন—হয়ে যাবে। দরখাস্তটা ক'রে দাও।

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেসের পদটি খালি হয়েছে। রূপচাঁ ইচ্ছা, ডানা সেটির জন্য দরখাস্ত করুক। ডানার কিন্তু ইচ্ছা নয় তেমন। অ আর্থিক পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠছে ক্রমশ যে, অর্থাগমের কোনও একটা ব্য অবিলম্বে করতে হবে। সেটা যে কি ক'রে সম্ভব হবে তা তার জানা নেই রূপচাঁদবাবুর এই প্রস্তাবে তার অবিলম্বে রাজী হয়ে যাওয়া উচিত; কিছুতেই সে মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারছিল না। সে বিদ্যা অর্জন করে মানসিক সংস্কৃতির জন্যে, চাকরি করবার জন্যে নয়। তাকে যে কোনও চাকরি করতে হবে—এ সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করে নি কখনও সে।

রূপচাঁদ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, মুদীর দোকান থেকে চাল ডাল তেল দিয়ে গেছে সব?

হ্যাঁ, গেছে।

আনন্দ তোমাকে যে চাকরটা এনে দিয়েছে, সেটা কাজ করছে তো ভ ক'রে? না হ'লে বল, আমার হাতে একটা ভাল চাকর এসেছে, রাঁধতেও পা না, এ বেশ কাজ করছে।

মাইনে কত ঠিক হয়েছে?

আমি কিছু ঠিক করি নি। আনন্দবাবু কিছু বলেন নি আমাকে।

আগে থাকতে ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল। পরে গোলমাল হয় না। আ কি এসেছিল এর মধ্যে?

কাল এসেছিলেন।

ও।

চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ। ডানাও চুপ ক'রে রইল। একটা অদৃশ্য য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল দুজনকে ঘিরে। সিগারেটে টান দিয়ে রূপচাঁদ ৎ ব'লে উঠলেন, দু-চার দিনের মধ্যে জনমজুর এসে পড়বে। কালই পত, আজকাল যা পায়া-ভারী ব্যাটাদের। কনস্টেবল পাঠিয়ে তবে ঠিক তে হয়েছে। আসবে ঠিক।

জনমজুর কেন?

সামনেই বর্ষা। এই প্রকাণ্ড খোলার বাড়ি, না সারিয়ে দিলে থাকাই ব না।

কিন্তু সারাতে গেলে অনেক খরচ প'ড়ে যাবে যে?

তা পড়বে বইকি। বাঁশ দড়ি খাপরা সবই অগ্নিমূল্য আজকাল। লাগে ণ দেবে গৌরী সেন। অমরেশের টাকার অভাব নেই।

রূপচাঁদের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তার বাড়ি সেই সারাবে। আমি শুধু ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, মানে—ঝঞ্ঝাটটা য়াচ্ছি।

এই শেষ উক্তিটি ক'রে রূপচাঁদ ডানার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার —তোমার জন্যেই পোয়াচ্ছি।

ডানা লজ্জিত হয়ে পড়ল। শুধু লজ্জিত নয়, শঙ্কিতও হ'ল। তার মনে ; লাগল, একটা বেড়াজাল ক্রমশ যেন এগিয়ে আসছে তার চারদিক ঘিরে। টি মাত্র ফাঁক আছে—স্কুলের চাকরি নেওয়া। পরের দাক্ষিণ্যের উপর দিন থাকবে সে এমন ক'রে? দাক্ষিণ্যের কি প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে ?

আচ্ছা, স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের কি কোয়ার্টার্স আছে?

না। যতদিন কোয়ার্টার্স না হচ্ছে, ততদিন তারা মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে া দেবে। এই বাড়িটাই নিতে পার তুমি, সেইটে নেওয়াই সুবিধে, কারণ রেশকে যে ভাড়া আমি বলব তাতেই রাজী হয়ে যাবে সে। পঁচিশ টাকা শহরের মধ্যে এত বড় বাড়ি তুমি পাবে না। খালি বাড়িই নেই। মার জন্যে খুঁজতে কসুর করি নি তো।

এই কথায় ডানা আবার মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সহসা আ একটা কথাও মনে পড়ল তার। রূপচাঁদবাবু কেমন সহজে 'আপনি' থে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন। যদিও এতে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কি নেই, আমাদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠকে তুমিই ব'লে থা সাধারণত; তবু কিন্তু প্রথম যেদিন শুনেছিল, সেদিন কেমন একটু খটক লেগেছিল। অমরেশবাবু, আনন্দবাবু—এঁরাও তো আসেন, কিন্তু এঁ কখনও 'তুমি' বলেন না তো। অবান্তরভাবে হঠাৎ সে ঠিক করলে, ওঁদের আর সে আপনি বলতে দেবে না। ওঁদেরও অনুরোধ করবে 'তুমি' বলবা জন্যে। রূপচাঁদবাবু একাই ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার দাবি করবেন কেন?—কি তখনই আবার মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবু দাবি করতে পারেন বইকি। এক এই বিদেশে রূপচাঁদবাবু না থাকলে কি করত সে? রূপচাঁদবাবুই তো তাকে আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন এবং এখনও প্রতিদিন কিসে তার সুবিধা হয় তার চেষ্টা করছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারে এমন কিছুই সে লক্ষ করে নি, যা সন্দেহজনক।...সে অন্য দিকে চেয়ে ভাবছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে রূপচাঁদবাবু নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছেন এবং সে চাহনি থেকে যা ক্ষরিং হচ্ছে তা আতঙ্কজনক নয়, অথচ ঠিক আশ্বাসজনকও নয়।

খানিকক্ষণ নির্নিমেষে ডানার দিকে চেয়ে থেকে রূপচাঁদ বললেন, তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও আজই। কারণ পরশু দরখাস্ত দেবার শেষ দিন।

ভাবছি—

রূপচাঁদ ভাবনাটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন মনে মনে। কি ওই একটি কথা ব'লেই ডানা থেমে গেল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলে, তা মনের নিগূঢ় কথাটা কি তা সে নিজেই জানে না ভাল ক'রে।

কি ভাবছ?

ভাবছি, এই অচেনা জায়গায় নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলাটা কি ঠিক হবে?

অচেনা জায়গা চেনা হতে কদিন লাগে?

আমার বেশ একটু দেরি লাগে।

রেঙ্গুন ছাড়া আর কোনও চেনা জায়গা আছে কি তোমার?

না, তাও নেই।

তবে ?

এই ধরনের 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত, সহসা কিছু বলা যায় না। ডানা চুপ ক'রে রইল। তারপর হঠাৎ সমস্ত চোখ মুখ জ্বালা ক'রে মুখটা লাল হয়ে উঠল ধর, দুঃসহ একটা বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, বে এটা ঠিক যে, এখান থেকে যাবার আগে সকলকার প্রাপ্য আমি কিয়ে দিয়ে.তবে যাব। আমার দু-একখানা গয়না আছে এখনও—

একটা স্নিগ্ধ হাস্যে রূপচাঁদের মুখভাবের তীক্ষ্ণতাটা কোমল হয়ে এল। দেশিনী বিদুষী এই তরুণীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে দেখে একটু আশ্বস্ত লন তিনি যেন। ধরবার ছোঁবার মত কিছু যেন পেলেন একটা। এতদিন ন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। কেতাদুরস্ত মৌখিক ভদ্র আলাপের মুখোশ ভ্রান্ত ব্যাহত করছিল তাঁকে এতদিন। আজ তার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর নিত হওয়াতে আনন্দিত হলেন তিনি।

হেসে বললেন, দেখ, সস্তা কবিত্ব করবার ভারি সুন্দর একটা সুযোগ য়েছ তুমি। এখনই তুমি যা বললে, তার উত্তরে আনায়াসেই বলতে রতাম, গয়না-বিক্রি-করা টাকা দিয়ে সব রকম প্রাপ্য শোধ করা যায় না, এবং টা মিথ্যা কথাও হ'ত না। কিন্তু আমি ওসব বলব না। আমি বরং বলব— , নিশ্চয়, সকলের ন্যায্য প্রাপ্য শোধ করতে হবে বইকি। তা না করলে াত্মসম্মান বজায় থাকে না। আর তোমার মত মেয়ের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ ছে—এর চেয়ে শোচনীয় ছবি আমি কল্পনাও করতে পারি না। গয়না বিক্রি ক'রেও যাতে সেটা হয়, সেই চেষ্টাই করছি আমি তাই গোড়া থেকে। একটা কথাও তোমার মত মেয়ের বোঝা উচিত যে, গয়না বিক্রি ক'রে ন শোধ করাটাও এক হিসাবে আত্মসম্মানহানিকর। উপহারের মর্যাদাকে য়োজনের তাগিদে বিসর্জন দেওয়াটা কি ভাল ?

একটানা এতগুলা কথা ডানাকে তিনি বলেন নি ইতিপূর্বে। তাঁর নিজের নেই কথাগুলোর অতি-নাটকীয়তার ঢঙটা বিশ্রী ঠেকল। মনে হ'ল, রাশটা ধ হয় বেশি আলগা ক'রে ফেলেছেন। অপ্রতিভ হলেন নিজের অক্ষমতায় ং পরমুহূর্তেই এমন ভাবে সংযত করলেন নিজেকে যে, মুখের চেহারা বদলে ল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে টান দিলেন আর একটা, এবং নাক মুখ দিয়ে ধূম উদ্গিরণ করলেন তা দেখে ডানার হঠাৎ মনে হ'ল, ও সিগারেটের

ধোঁয়া নয়—আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বলতে আত্মসম্মানের চুল-চেরা বিচারই যদি করতে হয়, তা হ'লে আর একটা কথা ভাবা উচিত।

ডানার মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, কি সেটা?

ঠকানোটা কি আত্মসম্মানজনক?

তার মানে?

যা আমি জানি না, তা করবার ভান ক'রে বেতন নেওয়াটা কি ঠকানো নয়? ইতিপূর্বে কখনও আমি মাষ্টারি করি নি। আমার বিশ্বাস, ও-বিষয়ে আমার তেমন কোনও যোগ্যতাও নেই; একটা ডিগ্রী থাকলেই যোগ্যতা হয় না—

সত্যি সত্যি তোমার যাতে যোগ্যতা আছে ব'লে আমি মনে করি তদনুসারে চলতেও তোমার বিবেকে বাধবে।—ব'লেই রূপচাঁদ থেমে গেলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবার বললেন, সেটা কি, তা বলতে আমার বাধবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই বিচিত্র এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদ এতই প্রবল যে, যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবার সুযোগ আমরা প্রায়ই পাই না। জীবনে সকলকেই আপোস ক'রে চলতে হয় সব দিক বাঁচিয়ে। আমি এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ছিলাম, কেমিস্ট্রিতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সারা জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে পুলিস-সায়েবের কেরানীগিরি ক'রে। কেরানী হবার যোগ্যতা আমার ছিল না—।...হঠাৎ আবার থেমে গেলেন রূপচাঁদ। মনে হ'ল, সহৃদয়াবেগের আবর্তে যেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি আচম্বিতে এসে অবাক ক'রে দিলে তাঁকে। মনে হ'ল, এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে গেলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে তাঁর। নিষ্ঠুর বেদনার উৎসমুখে যে কঠিন পাথরটা চাপা দেওয়া ছিল, সেটা ন'ড়ে উঠল সহসা যেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতার শ্মশানভূমি থেকে একটা হিমশীতল হাওয়া হাহাকার ক'রে চ'লে গেল যেন তাঁর অন্তরতম সত্তার ভিতর দিয়ে। মনের এই অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলেন তিনি। রাগও হ'ল। এমনভাবে বিচলিত হওয়ার মানে কি? সিগারেটটার দিকে এক নজর চেয়ে টান দিলে তাতে দু-একটা, তারপর ফেলে দিলেন সেটা।

ডানা হেসে জবাব দিলে, আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। কিন্তু অযোগ্য কেরানী দেশের তত অনিষ্ট করে না, যত করে অযোগ্য মাস্টার বা অযোগ্য ডাক্তার। এদের হাতে দেশের প্রাণশক্তির ভার আছে। অত বড় ভার নেবার সাহস আমার নেই।

কি করবে তা হ'লে ঠিক করেছ?

আমি ভাবছি, চ'লে যাব এখান থেকে। কলকাতা কিংবা বম্বে—

রূপচাঁদের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

তাতে লাভটা কি হবে?

সেখানে নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব একটা। ধরুন, টেলিফোনে কাজ পেয়ে যেতে পারি, কেরানীগিরিও পেতে পারি কোথাও, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানা আছে আমার। তা ছাড়া গানবাজনা শিখেছিলাম ভাল ক'রে—তাও শেখাতে পারি। বড় বড় শহরে অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়। এসব জায়গায় মাস্টারি ছাড়া অন্য গতি নেই।

তা ঠিক।

যুক্তিযুক্ত কথার প্রতিবাদ করা রূপচাঁদের স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখে আশঙ্কার ছায়ার সঙ্গে তিক্ত বিদ্রূপের এমন একটা সম্মিলিত রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠল, যা প্রতিবাদের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, তুমি যদি আমার নিজের লোক হতে, তা হ'লে তোমাকে এর আর একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই।

শশব্যস্ত হয়ে ডানা ব'লে উঠল, না না, ও কথা বলছেন কেন? পৃথিবীতে আপনারাই এখন আমার একমাত্র আত্মীয়। আপনাদের সাহায্য না পেলে আমার যে কি হ'ত, তা জানি না। আপনাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করব না। আমি ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে অন্যভাবে উপার্জনের পথ একটা পেতাম হয়তো। মাস্টারি আমি করতে পারব না।

ঘাড়টা একটু নীচু ক'রে নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে ছিলেন রূপচাঁদ অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে। মনে হচ্ছিল, ডানার কথাগুলো উপভোগ করবেন কি না প্রণিধান করছেন। শুনে নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, সত্যিই যদি তুমি আমাকে নিজের আত্মীয় ব'লে মনে কর, তা হ'লে

বলছি, শোন— তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক।

এমন ভাবে থাকা যায় নাকি?

কেমন ভাবে থাকতে চাও বল, তারই ব্যবস্থা করছি।

ব্যবস্থা তো করেছেন, কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছে।

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়ে ব'লে উঠলেন রূপচাঁদ তোমার এ অস্বস্তি কেন জান?

কেন বলুন?

তুমি সত্যি আমাকে আত্মীয় ব'লে ভাবতে পারছ না। পারলে তোমার এ অস্বস্তি হ'ত না। তুমি মুখে আমাকে আত্মীয় বলছ, অথচ তোমার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি তোমার জন্যে সাঙ্ঘাতিক যা করেছি তার বদলে তুমি কি করবে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ মনে মনে, অথচ তের পাচ্ছ না কি ক'রে সেটা করবে।

অত্যন্ত সপ্রতিভ হাসি হেসে ডানা জবাব দিলে, ঠিকই ধরেছেন আপনি আপনাদের আত্মীয় ব'লে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যবহারে সেটাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কেমন যেন বাধো-বাধো লাগছে।

কেন?

আবার একটু হেসে ডানা জবাব দিলে, কি জানি!

রূপচাঁদও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, জটিল মনস্তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করলে দিশাহারা হয়ে পড়বে। ঋণ-পরিশোধ যা করতে চাও ক'রো। কিন্তু তার জন্যে এখনই ব্যস্ত হবার দরকার নেই প্রতীক্ষা করবার মত ধৈর্য আমার আছে···

ধৈর্যভরে কেউ ঋণ-শোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে—এ চিত্রটা আরও অস্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ল ডানার। কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

দরখাস্ত তা হ'লে করবে না, এই ঠিক হ'ল তো?

হ্যাঁ। ওসব থাক্ এখন।

আচ্ছা, তা হ'লে চাদরটা দাও, এবার উঠি।

এখনই যাবেন? চা করতে বলেছি।

তা হ'লে চা-টা খেয়েই যাই।

[ক্রমশ] "বনফুল"

কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'কবিকলাপ'

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল বাঙালী মনীষী অক্লান্ত সাধনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি যদি প্রতিভার লক্ষণ, তবে হরিশ্চন্দ্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার কবি-খ্যাতি 'নির্বাসিতা সীতা' নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার প্রতিভা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন কাব্যকার কবি, নাট্যকার, প্রহসন-রচয়িতা, ছোটগল্প-লেখক ও সমালোচক। তদুপরি, বাংলার সাময়িক-পত্রের ইতিহাসেও তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহার রচনাবলী অধুনা দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তাঁহার দানের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র চব্বিশ সংখ্যক পুস্তিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকা হইতে তাঁহার প্রতিভার বৈচিত্র্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার প্রতিভার একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীতে 'কবিকলাপ' নামে একখানি পুস্তকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে আমরা সমালোচক হরিশ্চন্দ্রের পরিচয় পাই। যখন হরিশ্চন্দ্র এই গ্রন্থখানি রচনা করেন, (১২৭৩ বঙ্গাব্দ) তখন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের নিতান্ত শৈশবকাল, বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসও তখন রচিত হয় নাই। তথাপি, হরিশ্চন্দ্র এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের লেখকের পক্ষে প্রশংসনীয়।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লেখক কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম দাস ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনী ও কবি-প্রতিভার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবির রচনাবলী হইতে উৎকৃষ্ট অংশ চয়ন করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—'গ্রাহক মণ্ডলীকর্তৃক যথোচিত উৎসাহ প্রদত্ত হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং ৺রাধামোহন সেন প্রভৃতি আধুনিক কবিগণের জীবন-চরিত

সংগ্রহে যত্নশীল হইব।' 'কবিকলাপ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর কবি প্রায় ছয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, সুতরাং সম্ভবত পাঠকগণের নিকট উপযুক্ত উৎসাহ না পাওয়াতেই তিনি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

'কবিকলাপ' গ্রন্থের ভূমিকায় কবির বাঙালী-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, বাংলা ভাষায় বাঙালীর জীবন-চরিত অল্প রচিত হইয়াছে,—অতীত কবিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও বাঙালী বিমুখ। হরিশ্চন্দ্রের ভাষা একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কবিকুলের প্রতি প্রকৃতরূপে অনুরাগ প্রদর্শন না করিলে কবিদিগের প্রতি অসম্মাননা হয়; এমত নহে, তাহাতে দেশীয় লোকদিগের অসারতা এবং গুণ বিমূঢ়তা প্রকাশ পায়। মহার্হ মণিদাম আবর্জনায় নিক্ষেপ করিয়া রখিলে মণির মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয় না, তাহাতে কেবল ক্ষেপকেরই অজ্ঞতা প্রকাশ পায় মাত্র। তবে কি না মণির যে সেই অবস্থায় জ্যোতির্দ্বারা পূর্ণ প্রতিভাসিত হয় না, ইহা ক্ষোভের কারণ।"

'কবিকলাপ' গ্রন্থের প্রারম্ভে "কবিতার প্রতি" নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা আছে। এই কবিতায় কবি অরসিকগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন,—যাঁহারা তার্কিক, বৈয়াকরণিক বা আলঙ্কারিক বলিয়া খ্যাত তাঁহারা যখন কাব্যজগতে অনধিকার প্রবেশ করেন, কবিতা-লক্ষ্মী তখন নিতান্ত বিপন্না হন। কবি প্রার্থনা করিতেছেন, বিধাতা যেন 'বঙ্গারণ্যবিহারিণী কবিতাকুরঙ্গিণীকে' এই সব হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।—

"হে কবিতা-কুরঙ্গিণি! বঙ্গারণ্য বিহারিণি!
বিষম বিপদ আজি ঘটিল যে ঘটিল।
সম্মুখে কেশরীপ্রায় তার্কিকেরা গরজায়
অই দেখ, বোধ হয়, যেন তোমা গ্রাসিল।
চেয়ে দেখ পিছুপানে, বধিতে তোমার প্রাণে,
বৈয়াকরণিক-ব্যাধ, সসন্ধানে রয়েছে।
বামেতে শার্দূল-ন্যায় আলঙ্কারিকেরা চায়,
স্থিরনেত্রে, খায় খায়, হেন বোধ হতেছে।

দোষগ্রাহি-সম্প্রদায়,
দক্ষিণে ডাকিছে।—
বিভু তোমা এই বার,
ভঙ্গ অঙ্গ কেহ যেন ন

বাস্তবিক, কাব্য জিনিসটা রসিক
লে কোন মানুষ কাব্যরসের আস্ব
কবিতাটি পড়িয়া আমাদের দেশের কো

"ইতরতাপশতানি
বিতর, তানি সহে
"অরসিকে রসস্য নি
শিরসি মা লিখ ম

'কবিকলাপে'র ভূমিকাস্বরূপ আ
কবিতেশ্বরীর প্রতি নিবেদন", (২
৩). "কবিতার প্রতি প্রশ্ন"। প্রথম
রিতেছেন। কবি বলিতেছেন,—ক
ই, যদি তিনি বাগ্দেবীর কৃপাকণা লাভ
চ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন।—

"অয়ি মাতঃ বাগীশ্বরি!
জন্মে জন্মে যেন তব
নাহি চাই রাজ্যধন,
বাহন শকটে মম প্র

* * *

কি কব দুঃখের কথা!
দেয় রটে মর্মে ব্যথা,
ধনীর অসুখ সব
উপশম হয়ে যায় দা

জিজ্ঞাসা করি, এ যুগের কয়জন
রিতে পারেন, আর কয়জনই বা সাহি
ান করিয়া ডুবাইয়া দিতে পারেন!

"মৃত কবিদিগের নিমিত্ত আক্ষেপ" কবিতায় কবি এক দিকে পূর্বসূরিগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন, অপর দিকে যাঁহারা শক্তিহীন হইয়াও কবিযশঃপ্রার্থী, তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন—

"স্বভাব-সুকবি যাঁরা বাগ্দেবীর পুত্র তাঁরা
বর্ষি কাব্যামৃতধারা ভুবন ভাসায়,
কবিতা-পঙ্কজ-রবি কে আছে স্বভাব-কবি
চিত্রিবে প্রকৃতচ্ছবি (?) বাক্য-বর্তিকায় ?
ভুবন প্রমোদকর, ঋতুকুল-অধীশ্বর,
মধু সহ সহচর অকালে লুকায়।
আর সেই সুধাকরে, তেমন না সুধা ক্ষরে,
তেমন না পিকবরে মধুস্বরে গায়।
আর সে উদ্যানমাঝে, সাজিয়া কুসুমসাজে,
বনদেবী না বিরাজে মধু-মমতায়।
আইল প্রাবৃটকাল, নাদিছে মণ্ডুক কাল,
গগনে নীরদজাল শুধু গরজায়।
লুপ্ত দেখি মহাকরে, গুপ্ত দেখি সুধাকরে,
খদ্যোতেরা মানভরে প্রতিভা দেখায়।
বৈমুখ্য সে চতুর্মুখ, কোথা আর রাখি দুঃখ,
হায় পরিতাপে বুক বিদারিয়া যায়।
দেখিতেছি কত জন, দিয়ে ক'টি শব্দ পণ,
অমূল্য কবিত্বধন কিনিবারে ধায়!
কবিত্ব কি গাছে ফলে ? না বেচে বণিগ্দলে,
যার ভাগ্যফলে, সেই দৈববলে পায়।"

আমরা বলিয়াছি, 'কবিকলাপে' হরিশ্চন্দ্র শুধু কবিগণের জীবনীই সংকলন করেন নাই, তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনার মধ্যে কবির রসজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহাকে 'তুলনামূলক সমালোচনা' বলা হয়, 'কবিকলাপে' তাহাও দৃষ্ট হয়। আমরা কবির সমালোচনা-শক্তির নিদর্শন-স্বরূপ "কবিকঙ্কণ" নামক নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব :—

"কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাস অপেক্ষা কবিত্বশক্তিতে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ভাষারামায়ণ অপেক্ষা চণ্ডীকাব্যে কবিত্বশক্তির অধিকতর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্যরীতি উভয় গ্রন্থেই একরূপ অনুসৃত হইয়াছে, উভয়ের রচনাই মাত্রাবৃত্তিগত। কবিকঙ্কণের সময়েও পদ্যপ্রণালী পরিশোধিত হইয়া আইসে নাই, তদ্বশতঃ কবিকঙ্কণ রচনামালায় অন্যান্য গুণের যেরূপ হৃদ্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, শব্দাবন্ধ, মিল এবং প্রসাদগুণের তাদৃশ পরিচয় দিয়া উঠিতে পারেন নাই। যদি কল্পনা, বিভাবনা এবং স্বভাববর্ণনা প্রভৃতি কবির প্রকৃত লক্ষণমধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ সেই সকল গুণশূন্য ছিলেন না। কবিকঙ্কণকৃত কবিতা প্রসাদগুণশূন্য হইলেও বিলক্ষণ ওজস্বল ও হৃদ্য। ওজোগুণে তিনি বাঙালী কবিদিগের মধ্যে প্রধান। ইঁহার কল্পনাশক্তিও নিতান্ত দুর্বল নহে। কালীদহে কমলবাসিনী কামিনীর করী-ভোজনোদ্গিরণ-ব্যাপার, ভবর্তী কবির বিভাবনার এবং ঝড় বৃষ্টি, বসন্তবর্ণন প্রভৃতি স্বভাববর্ণনার উৎকৃষ্ট পরিচয়। বিশেষতঃ ইনি আপনার সময়ের আচার ব্যবহার যেরূপ বিকল বর্ণনা করিয়াছেন, বাংলা কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে তাদৃশ রচনা-চতুরতা ত্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের রচনার বিশেষ প্রশংসা এই যে, স্থান যেরূপে বর্ণিত হওয়া উচিত, সেই স্থান প্রায়ই তদ্রূপ শব্দালঙ্কার এবং বাবলীতে গ্রন্থন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত করুণরসাত্মক কবিতাগুলি এরূপ ভাবোক্ত শব্দে বিন্যস্ত যে, পাঠকালে যেন করুণরস আপনা আপনি উচ্ছ্বসিত য়া উঠে। ফুল্লরার বারমাস বর্ণন, খুল্লনার ছাগচারণ, ধনপতির কারামোচন ত্যাদি স্থান পাঠ করিলে কোন্ সহৃদয় কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষিযুগ নিরশ্রু কিতে পারে?" (পৃ. ২৫-২৬)

কবিকঙ্কণ সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা হয়তো সর্বাংশে নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে না, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে হরিশ্চন্দ্র যে সময়ে "ব্যকলাপ" রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্য লিতে একরূপ কিছুই ছিল না। হরিশ্চন্দ্রের সমালোচনায় আন্তরিকতা ছিল, গ্রাহিতাও ছিল। দীর্ঘ দিন জীবিত থাকিলে এবং উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ রিলে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হইতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ ই। সাময়িক-পত্রের সম্পাদকরূপেও তাঁহাকে বহু পুস্তক ও পত্রাদির ালোচনা করিতে হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত আলোচনায় তিনি গুণগ্রাহিতা ও

নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক ও সমালো হরিশ্চন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। যিনি চৌত্রিশ ব মাত্র জীবিত থাকিয়া একচল্লিশখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (পরলোক কেদারনাথ মজুমদারের 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৬২), যাঁহার সম্পা 'কবিতাকুসুমাবলী' একদিন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরবময় আসনে প্রতি হইয়াছে, (ঐ পৃ. ৩৫৮); যাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা একদিন বা সুধীজনকে মুগ্ধ করিয়াছে, করুণরসের ন্যায় হাস্যরসের সৃষ্টিতেও যিনি দক্ষ পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্য-সমালোচনার মধ্য দিয়া যাঁহার রসগ্রাহিতা প্রক হইয়াছে,—দিব্যধামবাসী সেই কবির উদ্দেশে আমরা বারংবার আম প্রণতি জ্ঞাপন করি।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

রব উঠিয়াছে,—সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা সহজবোধ্য নহে।

এই সম্পর্কে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য—পরিভাষা সহজ বা সর্বজনবোধ্য হওয়া কি না?

পরিভাষার ইংরেজী প্রতিশব্দ technical terms। ছোট *Ox. Dictionary*তে technical-এর অর্থ দেওয়া হইয়াছে—"of or in peculiar to a particular art or science or craft"। এই মানিয়া লইলে আমরা কি করিয়া আশা করিতে পারি যে, পরিভাষা সর্বজন হইবে? যিনি যে বিদ্যা বা শিল্পে পারদর্শী, তাঁহার পক্ষেই সেই বিদ্যা ব সংক্রান্ত পরিভাষা জানা সম্ভব। অন্য কাহাকেও এই পরিভাষার অর্থ জা হইলে, এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা য পারে। নিম্নে Ganot-র *Natural Philosophy* হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল:—

"Whenever light passes from one medium into a more refractiv there is nothing to prevent the refracted ray from approaching the p dicular to form an angle smaller than the angle of incidence; but if, contrary, the second medium is less refractive than the first, in which

refracted rays recede from the perpendicular, there is a limit to their ıtion and hence refraction may become impossible." (p. 418)

অন্য একটি পদার্থবিদ্যার পুস্তক হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে দেওয়া :—

If the charged plate of a parallel plate condenser be connected to a leaf electroscope and the other plate be earthed, the potential V of the ıated plate can be estimated from the divergence of the electroscope ıs." (p. 229, B. K. De's 'Magnetism and Electricity').

উপরে যে দুইটি পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত হইল, পদার্থবিদ্যার সহিত পরিচয় না ফলে, কোন সাধারণ ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উহার অর্থ বোধ া কি? অথচ এই দুইটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে পদার্থবিদ্যার দুইটি ⊦-প্রাথমিক পুস্তক হইতে।

পরিভাষা যে সর্বসাধারণবোধ্য হইতে পারে না এবং উহা যে শিক্ষণসাপেক্ষ, া করি, তাহা প্রমাণের জন্য আর উদাহরণের প্রয়োজন হইবে না। যদি এই দুইটি উদাহরণ যথেষ্ট না মনে করেন, তবে অন্য বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র ত ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

কেহ কেহ ইংরেজী হইতে উদ্ধৃত উদাহরণে আপত্তি করিতে পারেন, বলিতে নৈ—ইংরেজী বিদেশী ভাষা, কাজেই আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় বা আমরা না। তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বাংলা হইতে কয়েকটি উদাহরণ নীচে া গেল।—

১। পরিণামবাদীর মতে, উৎপাত্তির পূর্বে কার্য যদি অসৎ বা অভাব স্বরূপ হয়, তাহা হইলে কোনরূপেই তাহাকে সৎ করা যাইতে পারে না, যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হয় না, আবার যাহা সৎ তাহা কখনই অসৎ হইতে পারে না। (মায়াবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা)

২। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অবিবেক জনিত্। প্রকৃতি জড় ও পুরুষ দৃশি। (যোগ-পরিচয়, ৬ পৃষ্ঠা)

৩। পরমাণুর পরস্পর মিলনে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। কোন মৌলিক পদার্থের একটি অণুর সৃষ্টি হয় দুই বা বহু পরমাণু মিলে। একটি নূতন যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয় দুই বা বহু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে। (বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ, ৭ পৃষ্ঠা)

উপরি-লিখিত তিনটি ক্ষেত্রেও কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে এবং এই পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থও উহাদের সাধারণ অর্থ হ পৃথক, অতএব শিক্ষাপেক্ষ। শিক্ষা ভিন্ন জনসাধারণের পক্ষে এই শব্দ অর্থ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে।

অতএব আমরা ধরিয়া লইতে পারি, পারিভাষিক শব্দ কখনও কোন বা কোন কালে সর্বজনবোধ্য হয় নাই বা হইতে পারে না।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন—পারিভাষিক শব্দগুলি সর্বজনবোধ্য হওয়া উ কি না? সর্বজনবোধ্য হইতে হইলে, সাধারণত যে সকল শব্দ ব্যবহৃত পরিভাষাতে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে উদ্দেশ্যে পরিভাষা রচিত হয়, সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। প্রচ সাধারণ শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমুচিত বিবেচনা সহকারে প্রয়োগ হয় না; তাহারা প্রায়ই অনেকার্থবোধক। পরিভাষা কিন্তু একার্থবোধক চাই। এই কারণেই, বোধ হয়, সকল দেশেই পারিভাষিক শব্দগুলি প্রচ সাধারণ শব্দ হইতে কিয়ৎপরিমাণে পৃথক। পারিভাষিক শব্দের ইংরেজীতে এই পার্থক্য রক্ষা করা হয় গ্রীক ও লাটিন হইতে ধার কি বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃতের অতিশয় নিকট-সম্পর্ক বলিয়া 'সরকারী ব্যবহার্য পরিভাষায়' পারিভাষিক শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য অনেক সংস্কৃতের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে।

বস্তুত, একটু চিন্তা করিলেই, সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভ অধিকাংশ শব্দ দুর্বোধ মনে হইবার কোন কারণ নাই বলিয়া বিশ্বাস জা বাধ্য। যে কেন লোকের বেশভূষার সামান্য পরিবর্তনেও তাঁহাকে সময়ে অপরিচিত মনে হয়। যিনি চিরকাল গুম্ফ-শোভিত, যদি কোন সময় তাঁহার গোঁফ কামাইয়া ফেলেন, তবে তাঁহাকে চেনা কঠিন হইতে পা সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষার ক্ষেত্রেও অনেকটা এইরূপ ঘটিয়া কতকগুলি নূতন সংস্কৃত শব্দ অবশ্য ব্যবহার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইয়াছে কেবল সেরূপ স্থলেই যেখানে গত্যন্তর ছিল না, যেখানে প্রচলিত শব্দের প্রয়োগে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। যেমন পুলিসের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে 'আরক্ষা'। 'আরক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত হইতে গ্রহণ কি হইয়াছে, কেন না, প্রচলিত কোন বাংলা শব্দ দ্বারাই পুলিসের অর্থ সম্যক বোঝানো সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ স্থলেই কিন্তু প্রচলিত বাংলা-শ

ত উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করিয়া কাজ চালানো হইয়াছে। যেমন
।' শব্দের সহিত সকলেই পরিচিত ; 'অধি' উপসর্গও অপরিচিত নহে, এই
: যোগে 'ডিরেক্টারের' প্রতিশব্দরূপে 'অধিকর্তা' ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গণনা'
র সহিত সকলেই পরিচিত ; 'অ্যাকাউন্টেন্ট'কে গণনাকারী বলিলে হয়তো
আপত্তি উঠিয়াছে তাহা অপেক্ষা কম আপত্তি উঠিত, কিন্তু অর্থের গণ্ডগোল
রি সম্ভাবনা থাকিত। এই গণ্ডগোল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য এবং
রণ শব্দ ও পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য 'গণনাকারী'র
'গাণনিক' শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত মনে হইবার কোন কারণ দেখা যায়
পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক ক্ষেত্রেই পরিভাষা-সংসদ প্রচলিত
ালকেই সামান্য অদল-বদল করিয়া চালাইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য
ভাষিক শব্দের বৈশিষ্ট্য ও গাম্ভীর্য যথাসম্ভব বজায় রাখা।

শ্রীযোগজীবন ভট্টাচার্য

প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্‌রী

১। ভূমিকা

এশিয়া খণ্ডে, বিশেষত চীন ও ভারতবর্ষে, প্রথম প্রথম ক্যাথলিক
বীগণ তাঁহাদের উপরিতন কর্মচারীদিগকে যে-সব পত্র লিখিতেন তাহা
ম্বন করিয়া ফাদার পিয়ার্ ছ্য জারিক নামক দক্ষিণ-ফ্রান্সবাসী একজন
ইট্ পাদ্‌রী এশিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখেন। ইহার
য় খণ্ড ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে বর্দো নগরে প্রকাশিত হয় ; নাম *L' Histoire des
ses plus memorables advenues tant es Indes Orientales &c.*
তে ১৬০০ হইতে ১৬১০ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৬৮
৮। এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা নীচে
য়া গেল। অবশ্য প্রতাপাদিত্যের নাম নাই, তাঁহাকে চাঁদেকানের রাজা
য়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এই রাজা যে প্রতাপ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ
. কারণ বাকলার রাজা [রামচন্দ্র] ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আট বৎসরের শিশু এবং
দকানের রাজার জামাতা বলিয়া বর্ণিত, এবং বাকলা হইতে চাঁদেকান
সিবার পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শেষোক্ত রাজ্য সুন্দরবন
আর কিছু হইতে পারে না।

গ্রন্থকার বলিতেছেন (৮২৬ পৃঃ), সমুদ্র পাঠান ও দেশের আদিম বাঙ্গালীগণ বারো ভূঁইয়াদিগকে মানিয়া চলে; ইহাদের মধ্যে তিন জন যথা চাঁদেকান, শ্রীপুর এবং বাকলার রাজা, অপর নয় জন মুসল আরাকানের রাজা 'মগ-রাজ' নামে পরিচিত, ইনি ভিন্ন, অপর এক পক্ষ।

ভারতে জেসুইট্ ধর্মসম্প্রদায়ের পরিদর্শক (*Visiteur*) নি পিমেন্টা ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ফার্নাণ্ডেজ এবং ডোমিনিক্ সোসা দুইজন পাদ্রীকে, এবং তাঁহার পর-বৎসর মেলকিয়র দি ফনসেকা ও জাঁ বুএজ্ নামক অপর দুজন ফাদারকে পাঠাইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, ত প্রথমে [বঙ্গে] যেখানে উপযুক্ত বোধ হয় এরূপ কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিজ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং দুইজন সেই আড্ডায় স্থায়িভাবে করিবে, আর তখন অপর দুইজন ভ্রমণ করিয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে থা (৮২৭ পৃঃ)।

২। প্রথম পাদ্রীগণের আগমন

২২ ডিসেম্বর ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাদার ফ্রাঁসোয়া ফার্নাণ্ডেজ চাটগাঁর নিকা ভিয়াঙ্গা বন্দর হইতে পরিদর্শককে এই পত্র লেখেন :—

চাটগাঁ হইতে শ্রীপুর গিয়া আমি প্রতি রবি ও শুক্রবার ধর্মপ্রচার করিত মে মাসে (১৫৯৯?) ফাদার ডোমিনিক্ সোসা হুগলী যাইবার জন্য [* সঙ্গ] ছাড়িলেন। * * * অক্টোবর মাসে ফাদার ডোমিনিক আ লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্য সম্বন্ধে রাজার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমার চাঁদেকান যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজার (মত) পরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাহাই করিলাম। যখন রাজা জানিলে আমি পৌঁছিয়াছি, তিনি তাঁহার একজন প্রধান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া আ অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার আগমনে তিনি অত্যন্ত হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। প ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গে তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন (*fit beaucoup de caresses*) নিজ পরিত্রাণ (*salut*) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথা কহিলেন। * * * তথা হইতে আমি শ্রীপুরে ফিরিলাম। (৮২৮-৮২৯)

৩। পাদ্রীগণের দ্বিতীয় আগমন

২০এ জানুয়ারি ১৬০০, ফাদার মেলকিয়র দি ফন্‌সেকা চাঁদেকান হইতে
র্শককে এই পত্র লেখেন :—

গত নবেম্বর মাসে চাটগাঁ হইতে রওনা হইয়া, স্থানীয় পোর্তুগীজদের
রাধে বাকলা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজার সহিত দেখা করিলাম এবং
র রাজ্যে গীর্জা নির্মাণ করিতে, খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে, এবং লোকের
ক্রমে তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে অনুমতিসম্বলিত এক ফর্মান
র নিকট হইতে পাইলাম। [এই ফর্মান ৮৩০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।]
র পর বিদায় লইয়া আমি চাঁদেকানের দিকে চলিলাম।

বাকলা হইতে চাঁদেকানের পথের মত সুন্দর ও সুখকর পথ আমি আর
দেখি নাই। অনেক বড় এবং মিষ্টজলযুক্ত নদী—যাহাকে এ দেশে গঙ্গা
—তাহার মধ্য দিয়া নৌকা করিয়া চলিতে লাগিলাম। তীরগুলি সুন্দর
গাছে আচ্ছন্ন ; এক পারে হরিণের বড় বড় দল এবং গরুর পাল ঘাস
তেছে ; অপর পারে অতি বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। অসংখ্য খাল ; তাহাতে
লে দেখা যায় দুদিকে গাছ এমন করিয়া ঢাকিয়াছে যে, সূর্যের আলো
প্রবেশ করিতে পারে না। কোথায়ও বা গাছ হইতে মৌমাছির ঝাঁক
তেছে, কোথায়ও বা বাঁদর এক ডাল হইতে অপর ডালে লাফাইতেছে।
অনেক স্থলে সুন্দর ও উর্বরা। কোথায়ও বা ইক্ষুদণ্ডের ঝোপ। এই
অনেক গণ্ডার ও অন্যান্য বন্য জন্তু থাকে।

২০-এ নবেম্বর ১৫৯৯ চাঁদেকান পৌঁছিলাম এবং ফাদার সোসাকে দর্শন
য়া পরস্পর অত্যন্ত সুখী হইলাম। স্থানীয় পোর্তুগীজেরাও আমাকে খুব
র্থনা করিল। পরদিন আমি রাজাকে সম্মান করিতে গেলাম এবং
াকে বেরিঙ্গান্ জাতীয় কমলালেবু [*oranges de la race de Berin-*] উপহার দিলাম। এগুলি অতি সুন্দর এবং এ দেশে পাওয়া যায় না।
ন ইহা পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ
লেন।

তিনি আমাদিগকে এত মান্য করিলেন যে, আমাদের দেখিবামাত্র নিজ
াসন [*siege*, চেয়ার] ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া মাথা নত করিলেন [*nous t une grand reverence*]। ইহার কারণ এই যে, এ দেশের লোকেরা

ব্রহ্মচর্যকে [*chastete*] অত্যন্ত ভক্তি করে, এবং আমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য
করি শুনিয়া ইনি আমাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চমত পোষণ করিয়াছেন।

আমাদের বাসার কাছে একটা বড় জায়গা আছে। আমরা রাজার ক
সেটি চাহিলাম, যে, যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখ
বাস করাইলে তাহাদিগকে অতি সহজে সাহায্য করিতে এবং ধর্মপথে রাখি
পারিব। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এ সম্বন্ধে একখান ফ
শীঘ্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং আজ্ঞা দিলেন যে, ওই বাড়িতে যে-
হিন্দু [অর্থাৎ নূতন খৃষ্টানেরা] বাস করিবে তাহারা তাঁহাকে যে [কর] f
তাহা আমাদিগকে দিবে। পরে আমরা বিদায় লইলাম। * * *

বঙ্গদেশে জেসুইটদের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তুত হয় এবং ইহা
যীশুর গীর্জা নাম দেওয়া হইল। * * * পোর্তুগীজদের সাহায্যে এই গী
খুব জাঁকজমক সহকারে সাজানো হইল এবং ১লা জানুয়ারিতে খুব ধুমধা
সহিত উপাসনা করা হইল। চারদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল। * *
এই গীর্জা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজা সভাসদ্‌দের এক প্রকাণ্ড
লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজসজ্জা দেখিয়া অত
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জা-ঘরে প্রবেশ করিলেন এ
যখন প্রধান চ্যাপেলটির * নিকট আসিলেন, তখন জুতা খুলিয়া ফেলিলে
তাঁহার জন্য একখান চেয়ার আগে হইতে প্রস্তুত রাখা ছিল। কিন্তু আ
কিছুতেই তাঁহাকে তাহাতে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি কার্পেটে
নহে। তিনি শুধু সিঁড়ির উপর একখান ছোট মাদুরে বসিলেন, এবং সেখা
অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। গীর্জার বেদীর উপর যে-
দুর্লভ দ্রব্য ছিল এবং অন্যান্য জিনিস যাহা দেখিলেন তাহার সম্বন্ধে আমাদিগ
জিজ্ঞাসা করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীর্জা নির্মাণ করি
অনুমতি দিলেন, যাহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে। [এই গী
প্রস্তুত হয় নাই।]

পরদিন রাজপুত্র গীর্জার সাজসজ্জা দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটব
স্থানে যত হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, গীর্জা দেখিয়া গেল, কারণ ইহার জাঁ
জমকের খ্যাতি সর্বত্র প্রচার হইয়াছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থি
হইত। পনের দিনেরও বেশি ধরিয়া এইরূপ হইতে লাগিল। [৮৩২-৮৩৪ পৃঃ

৪। যশোর-রাজ-দরবারে পাদ্‌রীদের প্রতিপত্তি

যীশুর জীবনের একটি ঘটনার তিথিতে ওই গীর্জা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে
ান হইল (১৬০১ খ্রীঃ ?), কারণ প্রথম বৎসরে ওই তিথিতেই গীর্জাটি
সর্গ করা হয়। রাজার আজ্ঞায় জ্যেষ্ঠ কুমার, যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী
ং তাঁহার এক ছোট ভাই [এ দুজন বোধ হয় উদয়াদিত্য এবং
গ্রামাদিত্য] গীর্জা দেখিতে আসিলেন। রাজাও নিজে অনেক সম্ভ্রান্ত
ষ সঙ্গে লইয়া এটি দর্শন করিলেন এবং এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট
য়া, পাথরের গীর্জা নির্মাণ করিবার জন্য আমাদের যে অনুমতি দিয়াছিলেন
হা দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলত রাজা পাদ্‌রীদের প্রতি এত স্নেহ
খাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে-কোন প্রার্থনা পূরণে তাঁহার অতিমাত্র
ধ হইবে এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

পাদ্‌রীরা তাঁহার কাছে অন্য কিছুই চাহিল না। শুধু একজন পর্তু গীজের
লিয়া (*galiot*) নৌকা দেনার জন্য তিনি আটক করিয়াছিলেন, এবং
ন্য সভাসদের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া দেন নাই, কিন্তু এখন পাদ্‌রীদের
র্থনায় তাহা মালিককে ফেরত দিলেন। আর রাজার নিকট একজন হিন্দু
নেক টাকা ধারিত, ফাদারদের অনুরোধে রাজা তাহাকেও দেনা হইতে
ব্যাহতি দিলেন। [৮৩৫ পৃঃ]

৫। কার্ভালো-হত্যা (?) ও পাদ্‌রীদের দেশত্যাগ

ইহার পর সোনদ্বীপ লইয়া কি একটা বিষম গোলমাল বাধিল। মগের রাজা
ই দ্বীপ অধিকার করিয়া উহাকে দক্ষিণ বঙ্গ বিজয়ের আড্ডা (base of
perations) স্বরূপ ব্যবহার করিবার ফন্দী করিলেন। পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা
াবিল যে, মগদেশে ও বাংলায় রাজার অধীনে বাস করা তাহাদের পক্ষে সব
ময় নিরাপদ ও সুবিধাজনক নহে, কিন্তু যদি তাহারা সোনদ্বীপ অধিকার
রিয়া তথায় নিজ উপনিবেশ স্থাপন করে তবে স্বাধীন ও নিরাপদ হইবে।
ার, মুঘলেরাও বঙ্গ বিজয় করিয়া সোনদ্বীপের উপর হাত দিল।

সোনদ্বীপ শ্রীপুরের সামনাসামনি, এবং বঙ্গদেশ হইতে ৬ লীগ্ অর্থাৎ ১৩।
ক্রোশ দূরে। ইহার উৎপন্ন লবণে সমস্ত বঙ্গদেশের অভাব পূরণ হইত, এবং

* La maistresse Chappelle, এটা কি Holy of holies ?

রাজার প্রচুর রাজস্ব লাভ হইত। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায় ইহার ন্য সঙ্গত অধিকারী, কিন্তু ইহার পূর্বে অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি উহা ভোগ ক নাই, কারণ মুঘলেরা এই দ্বীপ জোরে দখল করিয়াছিল। এখন পোর্তুগীজে ওই দ্বীপ কাড়িয়া লওয়ায় তিনি তাঁহার সমস্ত স্বত্ব উহাদিগকে দান করিলে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ডোমিনিক কার্ভালো নামক একজন প্রসিদ্ধ বীর কাপ্তেন, কে রায়ের চাকরি করিবার সময় কেদার রায়ের সাহায্যে, ওই দ্বীপ মুঘলদের হ হইতে দখল করে। তার পর মগরাজা তাহাদিগকে আক্রমণ করায়, য পোর্তুগীজেরা জয়লাভ করে, কিন্তু তাহাদের এত সৈন্য ও নৌকা ধ্বংস হয় তাহারা নিজ হইতেই ওই দ্বীপ ছাড়িয়া দেয়। কার্ভালো জাহাজ মেরামত নূতন সৈন্য ভর্তি করিবার জন্য প্রথমে শ্রীপুরে, পরে হুগলী বন্দরে যায়। [৮৪ ৮৪৯, ৮৬১ পৃঃ]

এদিকে মগরাজা সোনদ্বীপ অধিকার করিবার পর বাকলা রাজ্যের বি [বোধ হয় বাখরগঞ্জের তীরবর্তী স্থানগুলি] দখল করিয়া, চাঁদেকান রাজ্য র করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। চাঁদেকানের রাজা [অর্থাৎ প্রত পাদিত্য] দেখিলেন যে এত প্রবল শত্রুকে তিনি একলা বাধা দিতে পারিবে না, এবং তজ্জন্য কুটিল নীতি দ্বারা নিজ বন্ধুদের (অর্থাৎ পোর্তুগীজ) ধ্ব করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার পথ বাহির করিলেন। তিনি জানিতে যে, আরাকানের রাজা কার্ভালোর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিনি (অর্থাৎ প্রতাপ নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং কার্ভালোকে বন্দী করিয়া তাহার মস্ত পাঠাইয়া মগরাজাকে তুষ্ট করার এবং এই উপায়ে নিজরাজ্য রক্ষা করিবার ফা করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ভালোর নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন তাঁহার নিকট আসিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিলে তিনি তাহ অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন।

কার্ভালো চাঁদেকানের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে, এইরূ তাঁহাকে সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ রাজা তাহাকে সৈন্যবল দিয়া সোনদ্বীপ উদ্ধা সহায়তা করিবেন। রণসজ্জায় পূর্ণ তিনখান বড় জাহাজ, ছয়খান কাট এবং ৫০খান জালিয়া এবং একদল সাহসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সে চাঁদেকা আসিল।

রাজা তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া, একটা জরির পোশাক

মূল্য ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে রাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য আবশ্যক সব [দ্রব্য, সৈন্য ও নৌকা] বেন। কিন্তু ১৫ দিন পর্যন্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে রাজের সহিত সন্ধি করিলেন যে, তিনি কার্ভালোর মাথা পাঠাইয়া দিবেন, র মগরাজ চাঁদেকান আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন।

অপর পোর্তুগীজগণ, বিশেষত পাদ্রীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ রিয়া কার্ভালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিল, যেখান হতে সে রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা াজার সহিত কথা চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনরব ঠিল যে রাজা কার্ভালোকে হত্যা করিবেন। কিন্তু কার্ভালো এরূপ করিতে ম্মত না হইয়া, নিজের কয়েকজন কাপ্তেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজাকে খিবার জন্য* গেল। তথায় তিন দিন পর্যন্ত রাজদর্শনের উপায় হইল না, বং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল। তিন দিন পরে, রাজার ক্রান্ত কার্যে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভালোকে য়েকজন পোর্তুগীজ সহ রাজবাড়িতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ রজা দিয়া ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার অনুবর্তী লাকদিগকে বাহিরে রাখা হইল। তাহাদের বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ াড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অপমানের সহিত তাহাদের ঘুষি মারিয়া, ায়ে লোহার বেড়ি পরানো হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ভালোকে াতীর পিঠে চড়াইয়া অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইল; সঙ্গে রাজার একজন সনানী ও চার জন রক্ষী সৈন্য। তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে গর্ভালো ও অপর কয়েকজন পোর্তুগীজকে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দীগণ ত্যুর পূর্বে কি কি [অত্যাচার ও যন্ত্রণা] সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং কতদিন বন্দীভাবে কাটাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদের হত্যা করা হয় [*il est asseure qu'ils furent ues*]। [৮৬৩-৮৬৪ পৃঃ]

তাহার পর, চাঁদেকানের অপর পোর্তুগীজগণ এই সংবাদ পাইয়া কি

* এখানে মূলগ্রন্থে আছে *a Iasor*. ইহার অর্থ কি *a Jasor* (অর্থাৎ যশোহরে) না *loisor* (অবসরক্রমে)?

অনা—

প্রতিকার করিবে স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল, রাজা কার্ভালোর চটিয়া আছেন, আমরা তো নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করি না। কিন্তু স্থানীয় পোর্তুগীজ উপনিবেশের [সাধারণ নাম 'বান্দেল' অ বন্দর] নিকটবাসী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গীগণের মহাশত্রু ছিল; তাহারা সংবাদ আসিবার রাত্রেই পোর্তুগীজদিগের বাড়ি ও সম্পত্তি লুঠ ও দগ্ধ করি লাগিল। * * * পরদিন রাজা কার্ভালো এবং অন্যান্য পোর্তুগীজদের জাহ গুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহাদের কারাগারে ফেলিলেন; সেখানে তাহ অশেষ দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিল। তাহাদের ধরিবার পরই দুজনের ম কাটিয়া ফেলা হইল এবং আর দুজনকে বর্শার আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা হইল।

ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাঁহারাও কষ্ট ভে করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কনফেশনের সময় তাঁহারা বন্দী পোর্তুগী দিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন যে তাহারা যেন রাজাকে তাহাদের খা করিবার জন্য অর্থ (ransom) না দেয়। এজন্য গুপ্ত ধন ও অস্ত্র অন্বে করিতে আসিয়া পাদ্রীদের বাড়ি উলট্‌পালট্ করা হইল। অবশেষে রাজা রা বলিলেন যে, পাদ্রীরা সকলে [তখন চাঁদেকানে চারজন ফাদার ছিলে তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ সেখানে না আসে।

এইরূপে এক মাস কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্তুগীজগণ তিন সহস্র পা (এগার হাজার টাকা) দণ্ড দিয়া খালাস পাইল। ফাদারেরা একেবারে বাং ত্যাগ করিয়া* চীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে খৃষ্টধর্ম প্রায় লোপ পাই [৮৫৫-৮৬৬ পৃঃ]

শ্রীযদুনাথ সরকার

অনা—

বাংলা দেশের ক্যাংলাপনা,
চোঁড়া সাপেই ধরার কণা;
একটি বচন ছাড়লে খনা
সাতটি কাহন আলোচনা।

* সুতরাং তাঁহারা কার্ভালোর শেষ দশা সম্বন্ধে কোনই সাক্ষ্য দিতে পারেন না।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ

১৩২৫ সালে দিল্লীভ্রমণের সময় আমার বন্ধু অধ্যাপক আবদুর রহমানের
ধ্যে একখান পুরাতন ফার্সী হস্তলিপি পাই। ইহাতে বঙ্গের নূতন
ওয়ানের অনুচর ও সঙ্গী আবদুল লতীফ্ গুজরাতের আহমদাবাদ শহর
তে বঙ্গের ঘোড়াঘাট পর্যন্ত নিজ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। যতদূর জানা
এই পুস্তক পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে, শেখ আলাউদ্দীন চিশ্‌তী, ওরফে
লাম খাঁ (আজমীরের পীর শেখ সলীম চিশ্‌তীর পৌত্র), বাংলার সুবাদার
ক্ত হইলেন। আবদুল লতীফ্, আবদুল্লা আব্বাসীর পুত্র ও আহমদাবাদের
ধিবাসী। তাঁহার প্রভু আবুল হসন্ (পরে আসফ খাঁ উপাধিতে ভূষিত, এবং
হজহানের শ্বশুর ও সাম্রাজ্যের উজীর) ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত
য়া, আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসেন। লতীফ্ তাঁহার অনুচর ও সঙ্গী
লেন।

নওয়ারায় (বাদশাহী যুদ্ধ-নৌকায়) চড়িয়া আমরা গঙ্গা বহিয়া আকবরনগর
—রাজমহল) হইতে নৌরাঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াশ্ পরগণা পর্যন্ত
লাম। [মুর্শীদাবাদ ও জলঙ্গী এই দুটি শহরের মাঝামাঝি গোয়াশ্ এক্ষণে
দ্মা হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ প্রকাশিত রেনেলের "বেঙ্গল
্যাটলাস্" গ্রন্থের ১০ নং ম্যাপে দেখা যায় যে, গঙ্গার প্রাচীন পথ গোয়াশের
তি অল্প উত্তরে ছিল।] গৌড়, তাঁড়া, মালদা ও পাণ্ডুয়া শহর বামে রাহল;
ামরা তথায় নামিলাম না।

২রা জানুয়ারি ১৬০৯ খৃঃ নবাব ইস্‌লাম খাঁর দূত মির্জা আলীর সহিত
স্‌মান্ আফ্‌ঘানের দূত আসিয়া সুবাদারের সাক্ষাৎ করিল। উস্‌মান্ বশ্যতা
ীকার ও রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া এবং নিজ ভ্রাতার সহিত বাদশাহের জন্য
উপহার পাঠাইবেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

[স্থানীয়] কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, নবাব
গোয়াশের কাছে গঙ্গানদীর তীরে নামিবেন এবং তাহার পর হয় ভাটী-প্রদেশের
দিকে, না হয় উস্‌মান্ আফ্‌ঘানের দেশে যাইবার পথের প্রারম্ভ ঘোড়াঘাটে—
যন্ত্রীরা যেদিকে ভাল মনে করেন,—সৈন্য সহ রওনা হইবেন। নদী পার হইবার
সময়, মহমুদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভূষণার জমিদার রাজা শত্রুজিৎ ওরফে
পাহজাদা রায়ের ভ্রাতা, কয়েকটি হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত দেখা

করিলেন, এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের দরখাস্তও পেশ করিলে এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে না। তাঁহার যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা; বিশ হাজার পাইক (পদাতি সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে। তাঁহার পুত্র কয়েকটি হাতী ও অন্যান্য উপহার লইয়া রাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করিয়াছিল ও তাঁহার নিকট হইতে অভয়বাণী পাইয়া [দেশে] ফিরিয়া যায়। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, 'আমি কি নিজে আসিব?'

মুহম্মদ ইয়ার নামক দূত কোঁচ-রাজা মুকুটনারায়ণের পক্ষ হইতে ৩টি হাতী ও ৮০টি টাঙ্গন ঘোড়া উপহার লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত দেখা করিল। এই টাঙ্গনগুলি পার্বত্য টাটু, মহিষের মত রঙের, জঙ্গল ও জনহীন স্থানে চলে কিন্তু বড় শক্ত, পরিশ্রমসহিষ্ণু এবং সুন্দর পথ চলে।

শাহজাদা রায় এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের আগমনের অপেক্ষায় আমরা দুই এক মাস নৌরঙ্গাবাদ জেলার আলাইপুর গ্রামে রহিলাম। [পদ্মার তীরে রাজশাহী জেলার শরদহের অপর পারে আলাইপুর নামক একটি গ্রামে এক স্টীমার থামে। কিন্তু পদ্মার গতি তিন শত বৎসরে এত বদলাইয়াছে যে নবাব এইখানে নবাব বাস করিয়াছিলেন অথবা পদ্মার পাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় নিকটে কোন গ্রামকে আলাইপুর নাম দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহা বলা কঠিন।]

আলাইপুরের এক যোজন (ফর্‌সখ = ৩ মাইল) দূরে দুই গ্রাম আছে, তাহার একটির নাম বাঘা, ইহা পরগণা চন্দনাবাজুর অন্তর্গত; অপর নাম মুলুক [? বা বলুক], আলাইপুর পরগণার অন্তর্গত।*

---

* বাঘা—এই স্থানটি রাজশাহী জেলার মধ্যভাগের দক্ষিণ সীমায়, শরদহ হইতে সাত মাইল দক্ষিণে। ১৮৩৫ খ্রীঃ প্রকাশিত এডাম সাহেব-এর *Second Report on Educat in Bengal* (pp. 87-42)-তে ইহার মাদ্রাসার বর্ণনা আছে। সে সময়কার মালিক বাদশাহী সনদ দেখান, যাহাতে "মৌলানা..."-কে আট হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের "মদদ্-ই-মাশ" (লাখরাজ) দেওয়া হইয়াছে (বোধ হয় শাহজহান কর্তৃক), ঐ জমি ১৮৩৫ পর্যন্তও মাদ্রাসার কর্তার দখলে ছিল, এবং ইংরেজ সরকার ঐ স্বত্ব মানিয়া লইয়াছেন। এ সাহেবের মন্তব্য—"This Institution has no organisation or discipline, and course of instruction is exceedingly meagre... The students leave [Madrasa] sooner or later according to their own caprice. Th attendance from day to day is equally uncontrolled and unregulated."

হাওয়াদ্‌হা (?) মিয়াঁ নামক একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ বাঘাতে বাস করিতেছেন। হার বয়স প্রায় এক শত বৎসর। এই গ্রামের মধ্যে একটি সুমিষ্ট জলের রিণী আছে। তাহার চারিপাড়ে ইঁহার পুত্র ও অনুচরগণ চক্‌বন্দী করিয়া নির্মাণ করিয়াছে। ৯৩০ হিজরীতে সুলতান হুসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত টি মসজিদ্‌ এইগ্রামে আছে।† হাওয়াদ্‌হা মিয়াঁর বাড়িতে একটি রাসার মত আছে; চালগুলি খড়ের, দেওয়াল মাটি দিয়া লেপা [অর্থাৎ া বাঁশের বা চাটাইয়ের]। তাঁহার অনেক অনুচর (? প্রজা) ও অন্য ার্থী এখানে শিক্ষালাভে নিযুক্ত। পুকুরের পাড়ে আম-কাঁঠালের গাছ, জ সজল ও ছায়াপ্রদ। গ্রামের চতুঃপার্শ্বের জমি ইঁহাকে ব্রহ্মোত্র (দদ্‌-ই-মাশ) স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে—সব সবুজ ও মনোরঞ্জক। বঙ্গদেশে গ্রাম ভিন্ন এমন একটি স্থান দেখিলাম না, যেখানে ইস্‌লামের গন্ধ নাকে ীছে। আহা! এই নিরিবিলি কোণের অধিবাসীদের কি সুখেই দিন কাটে! ারা পৃথিবীর অন্য লোকের খবর রাখে না; আর অন্য কোন লোকও াদের সহিত কোন সম্বন্ধ করে না। আশা করি সকল পরমসত্যানুসন্ধানীরই ালে যেন এইরূপ নির্জন আরামের কুঞ্জ জুটে!

আলাইপুরে নবাব বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা ও তোপখানার মহলা eview) দর্শন করিলেন। ২রা মার্চ ১৬০৯ খৃঃ আলাইপুর ছাড়িয়া ফরপুরের দিকে কুচ আরম্ভ হইল। পথে ফতেপুরে থামিয়া ইদ্‌-ই-কুর্বান ও রোজ উৎসব নির্বাহ করা হইল। এখানে ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ আসিয়া খা করিলেন; ১৮টা হাতী উপহার দিলেন। আমরা প্রায় এক মাস ফতেপুরে াইলাম।

ফতেপুর হইতে ৩০এ মার্চ কুচ করিয়া রাণা তাণ্ডাপুর পৌঁছিলাম। ানে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলীম খাঁ, পাচেটের রাজা ধনারায়ণের ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্যপুত্র, [একুনে] ১০৯টি ছোট ও হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন। নবাবের বিশ্বাসী য় কর্ম্মচারী শেখ কমাল্‌ তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিল।

'বাজু-ই-রাস্ত'এর অন্তর্গত বস্ত্রপুর নামক গ্রামে, ২৬এ এপ্রিল রাজা

† ৯৩০ লিপিকরের ভ্রম; ঠিক তারিখ ৯০৩ অথবা ৯২০ হইবে, কারণ হুসেন শাহের ৯২৫এ ্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। [নাটোর শহরের ১ মাইল উত্তরে এবং গুরুটিগাছার ৪ মাইল দক্ষিণে বজ্রপুর; রেনেল ৬নং ম্যাপ জ্যারেটের আইন্-ই-আকবরী,-২-১৩২ পৃঃ একটা বাজু-ই-রাস্ত আছে; কি তাহা এ স্থান নহে।] তিনি ৬টা হাতী, মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু, প্র পঞ্চাশ হাজার নগদটাকা ও অন্যান্য উপঢৌকন দিলেন। কয়েকদিন নবাবে দরবারে উপস্থিত থাকিবার পর বিদায় লইলেন।

৩০এ এপ্রিল বজ্রপুর হইতে কুচ করিয়া শাহপুর পৌঁছা গেল। যমুনার ধা বাস হইল। নবাব তথায় সৈন্যনিবাস রাখিয়া নাজিরপুরে গিয়া নয় দিন তথাকা জঙ্গলে থাকিয়া ৩২টা হাতী ধরিলেন। তাহার পর যমুনার উপর পুল বাঁধি পার হইয়া ঘোড়াঘাটে ২রা জুন উপস্থিত হইলাম। তথায় চালা (ছাপর বাঁধিয়া সকলে বর্ষা-যাপন করিল। [শাহপুর, ঘোড়াঘাটের ৩৫ মাইল দক্ষি পশ্চিমে, ইহার পাশের নদীর নাম জবুনা—যমুনা; রেনেলের ৫নং ম্যাপ।]

যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা শ্রীহরি কাশীতে একা অতি উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন, তাহা মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভাঙিয়া ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তু মানসিংহে মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়।

শ্রীযদুনাথ সরকা

মৃত্যুর পূর্বে

কিছুমাত্র ক্ষতি নাহি হবে
যদি দূরে যাই;
যদি মম কণ্ঠস্বর তোমার শ্রবণে
সঙ্গীত না ঢালে;
যদি দেহ নিয়ে
স'রে যাই পৃথিবীর এক প্রান্তদেশে;
যদি ভালবেসে
আর না নিকটে আসি।
আশ্রয় মিলিবে;
জানি স্বভাব তোমার;

মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, তবু নীড়কামী,
খুঁজে মরো ডালে ডালে ;
তুচ্ছ বাসা মাগি
ভ্রমণের অসীমতা বন্ধনের জালে
স্বেচ্ছায় নিজেই আনো।
ক্ষণাশ্রয় লাগি
অমর আত্মার কণা বিলাও নিমেষে,
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
দীন অতি, হীন অতি অবাঞ্ছিত জনে।
তোমার স্বভাব এই—
ক্ষতি নাহি হবে যদি আমি দূরে যাই।
যে আশ্রয় কিছুমাত্র মোহ নাহি আনে ;
ফাল্গুন-সন্ধ্যায়
আজ যারে অবহেলা করো অনায়াসে ;
বৈশাখী ঝঞ্ঝায়
সেই নীড় পাতা-ঘেরা ডাকিবে তোমায়।
শ্রাবণের দিনে
সেই নীড়ে ফিরে যাবে পথ চিনে চিনে।
চেনা কোন পাখি
তোমারে লইবে ডাকি,
ওগো বিহঙ্গম।
এ সান্ত্বনা মম,
যে আশ্রয় আজ আমি ধরেছি সাদরে
লতায় পাতায় ছাওয়া ;
দিনশেষে কভু
সে আশ্রয় ভেঙে গেলে একপল তবু
নিরাশ্রয় নাহি হবে।
স্বভাব তোমার কে জেনেছে, বল বন্ধু, আমার মতন ?
কাছে আছি তাই আছি !

অসংখ্য বিটপী, অসংখ্য নীড়ের মায়া।
চোখে যায়া ভাসে
তারাই আশ্রয় দিবে জানি, অনায়াসে।
ওগো বিহঙ্গম,
ব'য়ে গেল মনে মনে এ সান্ত্বনা মম।

শ্রীমতী বাণী রায়

অবশেষ

আমারে ডেকো না কাছে, কখনো ডেকো না,
তিমির-রাত্রির সঙ্গ নাহি তো অভ্যাস,
সহস্র শিখায় জ্বালি স্ফটিকের দীপ
অন্ধকারে মৃত্যু হানি আলোর প্রকাশ,—
—সেই চিরদিন মম দুরন্ত বিলাস।
হাতে হাত রাখিবারে ডেকেছ কাহারে?
উন্মত্ত যৌবন যার শিরায় শিরায়,
অগ্নির প্রদাহ যার যৌবনের তাপে,
তারে ডাকো প্লেটনিক প্রেমের খেলায়!
যদি ডাকো—সহিবে কি অগ্নির জ্বালায়?
দূরে থাকি সেই ভাল; নিরামিষ গান
শোনাই দূরেতে, করি মান-অভিমান;
বন্ধনে রেখেছি বেঁধে সমুদ্র উজান;
দেহ থাক্ দূরে দূরে—প্রাণে মেলে প্রাণ।
যদি ডাকো আরও কাছে, মনে দ্বার দিয়ে
ডেকো কাছে,—রেখো হাত আমার ললাটে,
রেখো হাত পরম সে স্নেহাস্পদ ব'লে;
তৃপ্ত হব, শান্ত রব সেই স্নেহ নিয়ে।
অসীম যে ভালবাসা দেখেছি স্বপনে,
সে প্রেম তোমারি আঁখি করুক বর্ষণ।
যৌবনের মধ্যদিন আজি অবসান,
যৌবন-প্রলাপ বন্ধু, ভুলে গেছ তাই?

ভুলে গেছ যে মনের নাহিক মালিক,
নীতিশাস্ত্র নাহি তার, বাধাবন্ধ নাই ?
সঞ্চিত যাহার স্রোত, সে নদী দুর্বার।
উত্তাল আবর্তে সে যে করে তোলপাড়।
পথভ্রষ্ট নৌকা নও, আশ্রয় মিলেছে,
নোঙর রয়েছে বাঁধা বটবৃক্ষতলে।
আমি ঝড় উচ্ছৃঙ্খল দিগন্ত-সীমায়,
আমারে ডেকো না আর এ তটিনী-জলে।
আমারে ডেকো না আর প্রেমের খেলায়;
প্রেম নহে খেলা মোর—ধ্বংসের অনলে
চিরদিন এ প্রেমের ভস্ম-অবশেষ,
সে ভস্ম-বিভূতি, বন্ধু, দেব না তোমায়।

শ্রীমতী বাণী রায়

মুসাফিরের ডায়েরি

যুগান্তে

বহুকাল পরে অসুখ হ'ল। খুব ক্লান্তভাবে বারান্দায় রেলিং ভর দিয়ে স্রোতের দিকে অলস দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে টর সামনে থামল।

একটু পরে দাদা উপরে এসে বললে, বেড়াতে যাবি ?

কোথায় ?

লেকে, মাঠে, গঙ্গার ধারে—যেখানে ইচ্ছা।

না, ভাল লাগছে না।

মণির কাছে যাবি ? ও একদিন এসেছিল, তোর খোঁজ করছিল।

মণি—মণি এসেছিল, কবে ? কই, এ কথা এতদিন বল নি তো ? চল, চল।

কুটুমবাড়ি—মণির শ্বশুরবাড়ি একটু ধোপদুরস্ত হয়ে যাওয়া উচিত বুঝেও সেমি ত্যাগ করতে পারলুম না, অমনই চললুম।

নানা প্রশ্ন জাগছিল মনে—কিছু জিজ্ঞেস করলুম না, কেমন ভয় ভয়

করতে লাগল—কেবল মনে হচ্ছিল; অতি সাধারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে হঠাৎ কি অবাঞ্ছনীয় সংবাদ শুনব, কে জানে। ওর বিয়ের পর ওকে দু-একবার দেখেছি—ভাল স্মরণ হয় না। কুমারী-রূপটাই মনে আছে। শুনেছিলুম, ওর শরীর ভেঙে পড়েছে, বড় দুর্বল।

বাড়িতে ঢুকে অন্দরমহলে খবর পাঠালুম। ও ছুটে এল হাসিমুখে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন গোলমাল হয়ে গেল—কাছে যা ছিল ওর হাতে তুলে দিলুম। ও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললে, বাঃ, ভারি সুন্দর তো, এ তুমি কোথেকে আনলে? যেখানে কাজ কর সেখান থেকে? হাতের তৈরি বাঁশের কাজ, না।

আমি ওকে আর বাড়িটাকে মিলিয়ে নিচ্ছিলুম মনে মনে, মাথা নেড়ে সায় দিলুম। ওর চেয়ে আমি কিছু বড়, কিন্তু ওর প্রণাম করা পছন্দ করি না। এটুকুও ভোলে নি দেখে স্বস্তিবোধ করলুম।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছি—দেওয়ালের থোপে থোপে রঙিন কাঁচের (Stained glass) সুঠাম ভঙ্গীর বহুমূল্য ছবি—লক্ষ্মী, সরস্বতী, নটরাজন। সুদৃশ্য শোভন একটি ঘরে গিয়ে বসলুম। একে একে ওর ছেলেরা এল—বেশ পরিচ্ছন্ন দেখতে, কিন্তু কেউ মায়ের রূপের অনির্বচনীয় ছোঁয়া পায় নি। ওদেরও বড় বড় চোখ, কিন্তু অমন চলচলে করুণ বিষণ্ণ মধুর চাউনি কারও হয় নি। ওর চিবুকের তিল, গালের টোল-খাওয়া হাসি কোথায়?

বললে, প্রণাম কর্—এঁকে তো তোরা চিনলি না।

মৃদু হেসে আমাকে প্রশ্ন করলে, তুমি নাকি আর বাড়ি থাক না, মুসাফির নিয়েছ; বাইরে বাইরে এমন ছন্নছাড়ার মত ঘুরতে ভাল লাগে? তোমার আর ঘরে মন নেই? তোমাকে কি খেতে দিই বল তো? শুনলুম, ও কিছু খাও না।

বললুম থাক্, ও নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না।

সত্যি কিছু খেতে দিলে না। একটু জেদ করলে না—দাবি করলে সেই পুরনো মণি—হারানো মণি বেরিয়ে এল রাঙতা-মোড়া বধূর আবরণ ফুঁড়ে। ওকে কখনও কোনও বিষয়ে জোর করতে দেখি নি—অথচ তার হয়তো বঞ্চিত হয় নি—জিতেই গেছে। সবাই ওর এই মাধুর্যকে, আত্মবিস্মরণকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছে, পাছে ও দুঃখ পায় ব্যথা পায়, এই আশঙ্কা ওর অনুচ্চারিত চাওয়া মিটিয়ে দিয়েছে।

একদা ওকে কি স্নেহই করতুম! সামান্য বয়সের পার্থক্য, অথচ ওকে পক্ষপুটে কে রাখতে চাইতুম, দৈনন্দিন জীবনের কোনও তাপদাহ কোনও নিষ্ঠুর চরণ যেন ওকে ম্লান না করে—এজন্য উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। ও তিবাদ করবে না, শুধু নীরব আয়ত আঁখি তুলে একবার চাইবে। ওকে একটা কথা কখনও বলেছি স্মরণ হয় না। ও মিনতি-ভরা দীর্ঘ শান্ত চোখ নিয়ে ছে এসে দাঁড়াত, ওর সকল বলা বুঝে নিতুম। কতদিন অতি প্রিয় ব্যাটখানা ড়ে ফেলে অত্যন্ত অপ্রিয় পুতুল খেলায় যোগ দিয়েছি। ও হ'ত গিন্নী—আমি জার-করিয়ে। ও ব'সে পরিপাটিভাবে ঘর সাজাত, আমি ঘুরে ঘুরে খেলার গ্য ফল মাছ সংগ্রহ ক'রে আনতুম। যথেচ্ছ মাঠে ঘাটে ঘোরার সুযোগ লত; গাছে চড়া যেত, পুকুরে ছিপ নিয়ে বসা হ'ত।

হঠাৎ ও ব'লে উঠল, তোমার সেই খেলাঘর পাতা মনে পড়ে? তোমার বজায় রইল, তুমি সেই যে বেড়াবার পথ বেছে নিলে, তাই চলেছে; আর মার এই সংসার—

ওর সংসার—ওর এ সংসার স্লেটের লেখার মত মুছে ফেলা যায় না?

পরিপূর্ণ সংসার—স্বামী, সন্তান, ধনজন, কিছু চোখে পড়ল না। লুম, সেই সোনার প্রতিমা—সেই রূপের ডালি আজ শীর্ণ শুষ্ক, ঘরের ী। প্রজাপতিকে কি মৌমাছির ধর্ম মানায়? সেই মণি, সেই নিন্দ্যসুন্দরী মধুস্রবভাবা কল্যাণী লক্ষ্মীমূর্তি মণি আজকাল সকাল থেকে কুটনো টে, ছেলে সামলায়, হিসাব রাখে—হাত নেড়ে নেড়ে পাকা বাঁধা বুলি ওড়ায়। সেই খ'সে-পড়া আলগা এলোচুলের বদলে আঁটসাঁট বিনুনির পা। হাতে অমৃতীপাকের একটা মোটা বালার বদলে একগোছা ভারী ী চুড়ি, সামনে কটকী কঙ্কণ। কানেও কি এক বেমানান মিনে-করা হীরের । সেই শিল্পের ইঙ্গিতভরা রোগা লম্বা আঙুল নেড়ে তেমনই কথা কয়। ঙ্কের রেখার মত কয়েকটা নীল শিরা ফুটে উঠেছে নরম সুন্দর ত্বকের নীচে। একটা হাত মুঠো ক'রে ধ'রে বললুম, বড্ড যে বুড়ো হয়ে গিয়েছিস, রে?

আর, ভাই, বয়স তো হ'ল ত্রিশের কাছাকাছি। তা ছাড়া এসব হাঙ্গামা, ভয় করে; রাতে সবাই ঘুমোয়, আমি জেগে থাকি; তবু হঠাৎ কিছু ন জানতে পারব তো!

ওর বড় ভয় ও ভাবনা হয়—আমি তার কিছু অংশ নিতে পারি না আ
বড় কষ্ট হ'ল ; বড় মায়া হ'ল। দশ বছর পরে দেখা—না হ'লেই ছিল ভাল
এসব কিছু ওকে মানায় না—এ পরিবেশেও ও মানায় না। মনে ম
হাতড়ে দেখলুম, ওকে সহজে কোথাও খাপ খাওয়ানো যায় না। কলে
লাস্যময়ী চঞ্চল মুখর মেয়ে, রূপের ঝলক তুলে ভাষার পরিপাট্য দেখিয়ে
চ'লে যাচ্ছে—এ যেন কষ্টকল্পনা। আধুনিক সমাজের সভাঘরে—উৎসবমহ
মধ্যমণি হয়ে সুরতরঙ্গে এবং সচেতন ভ্রূভঙ্গে ভক্তদলকে মূঢ় করেছে—এ
সম্ভব ? দেশপ্রেমে মেতে উঠে বক্তৃতার কশাঘাতে জনগণকে জাগিয়ে তুল
বা অধিকতম লোকের প্রভূততম হিতসাধনে কঠোর জীবন যাপন করছে—
হতে পারে না। ওর ব্রীড়াময়ী ভঙ্গী ও সহজাত মাধুরীর এমন অপচয় কখ
ঘটতে দেবে না ও। ও যেন রোমান্সের কল্পলোকের ছায়াময়ী নায়িকা
ধরা-ছোঁয়ার বাইরের রূপমঞ্জরী—সেই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা জুলিয়েট, য
উদ্দেশে গভীর রাতে রোমিও বীণ বাজিয়ে সেরেনেড শোনায় ; সেই অচি
পুরের রাজকন্যা, যে যাদুমন্ত্রে পাথর হয়ে পালঙ্কে শুয়ে আছে ; যাকে পাবার জ
রাজপুত্র অজগর, বন, তেপান্তরের মাঠ, গরলসাগর পেরিয়ে, কড়ির পাহা
হাড়ের পাহাড় ডিঙিয়ে পক্ষীরাজের পিঠে ছুটে চ'লে যায় কাছে এসে প্রে
সঞ্জীবনী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেয় আর সে তার হিমমিদ্রা থেকে স্বপ্নময় চে
মেলে চায়।

ফেরার পথে গাড়িটা যখন চ'লেই যাচ্ছে ওর দৃষ্টি-সীমানার বাইরে, ত
একটি ছবি মনে ভেসে উঠল। নিষুতি নিঝুম রাত—শহরের কোলাহল শ
হয়েছে, চোখ-ধাঁধানো আলোকসজ্জা স্তিমিত হয়েছে—মণি শোওয়ার আ
আড়ষ্ট গহনাদি খুলে বেশ ঢিলেঢালা ভাবে ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে,
ভয়করুণ চোখ ও শঙ্কাকুল মন নিয়ে অস্পষ্ট পটে আঁকা রয়েছে ওর ঈষৎ উজ্জ
আভাময় পেলব তনুরেখা, ওর বাঁ হাতের পরে রাখা চিবুকের ডোল, তা
ছোট্ট কালো তিল।

হয়তো একটি গাড়ি বেগে চ'লে গেল।

হয়তো কচিৎ কোনও নিশীথবিহারী বিলাসীর চকিত দৃষ্টি পড়ল ও
রূপকথার রাজকন্যার প্রতি। সে চমকে উঠল, কিন্তু ওর মগ্নচিত্তে চম
লাগল না।

"মুসাফির"

কয়েকটি সনেট

দয়িতার প্রতি

(Shall I compare thee to a summer's rose—হইতে)

বসন্তদিনের সাথে করিব কি তোমার তুলনা ?
তুমি নিরুপমা, সখি, জীবনের শান্ত সুষমায় :
উন্মত্ত পরনে কাঁপে ফাল্গুনের কুসুম-ললনা,
ক্ষীণ পরমায়ু ল'য়ে মধুঋতু হেথা আসে যায়।
নীলাভের দীপ্ত আঁখি দহে কভু দিগন্ত নীলিমা,
ম্লান হয়ে আসে কভু কষিত-কাঞ্চনবর্ণ তার,
সুন্দর যা কিছু তারা অস্তে যাবে বিগত-মহিমা,
নিসর্গ-নির্দ্দেশে কিংবা দৈবের বিধানে দুনিবার।

অনন্ত ফাল্গুন তব বিবর্ণ হবে না কোন দিন,
অক্ষয় গরিমা বহি চিরশ্যাম রবে, বরাননে,
মৃত্যুর তিমিরে, সখি, তুমি কভু হবে না বিলীন,
বিকশিবে যুগে যুগে সংগীতের চরণে চরণে।

যাবৎ রয়েছে দৃষ্টি, মানুষ শ্বসিছে প্রাণবায়ু
এ গান রহিবে বেঁচে, তোমারে যোগাবে পরমায়ু।

খদ্যোতের প্রেম

এ মোর খদ্যোৎ-দীপ্তি হানিবে না তোমার নয়নে
আলোকের কোন স্পর্ধা, সৌন্দর্য্যের কোন অহংকার :
অন্ধকার পথে চলি, তাই আপনার প্রয়োজনে
স্বল্প মোর আয়োজন—এ নহে দম্ভের অলংকার,
উৎসবের দীপাবলী। হে তারকা, তুমি জ্যোতিষ্মতী,
গ্রহপুঞ্জমাঝে তুমি স্বয়ংবরা আকাশ-বাসরে,
বুঝিবে না ক্ষীণদীপ্তি খদ্যোতের কুণ্ঠিত আরতি
কী মূল্য বহিছে হেথা জ্যোতি-রিক্ত মৃত্তিকার 'পরে।

জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ যত কোটীকল্প তোমার প্রণয়ে
ব্যর্থ পরিক্রমা করে—হে দূরচারিণি, দম্ভে তার

ভুল বুঝিও না মর্ত্য-পতঙ্গের দীন পরিচয়ে—
ভেবো না সে তব লাগি প্রণয়ের ভীরু উপচার।
মোর প্রিয়তমা আছে মাটির প্রদীপে কম্পমান,
তার প্রেমে মৃত্যু মোর, মোর প্রেমে সে হবে নির্বাণ।

স্বপ্ন

বাসনার প্রেতাত্মারা অন্তরের কোন্ রসাতলে
করিছে নরকবাস—হেথা শৃঙ্খলিত স্বর্গলোকে
ঝাপটি মরিছে ডানা রিক্ত জীবনের কোলাহলে
সুনীতির দেবদূত, মহত্ত্বের প্রদীপ্ত নির্মোকে।

মুহূর্তে মুহূর্তে তবু পাপ মন খোঁজে অবসর
স্বর্গের বন্ধন হতে পাড়ি দিতে আঁধার নিরয়ে,
অজস্র কামনা যেথা প্রতীক্ষিছে সাজায়ে বাসর
গূঢ় ছদ্মবেশে ঢাকি আপনার ক্লিন্ন পরিচয়ে।

রজনীর অন্ধকারে, দিবাস্বপ্নে, নীতির বিচার
শিথিল-শাসন যবে অবসন্ন মুগ্ধ অবকাশ,
বিপ্রলব্ধা বাসনার প্রেতলোকে মোর অভিসার,
আপনার অগোচরে সেথা মোর উন্মুখ বিলাস।

কলুষিত সে বিলাস ; তবু মাঝে মাঝে ভাগ্য মানি
প্রোসারপিনার স্পর্শে — নির্বাসিতা বসন্তের রাণী।

স্বপ্নাতীত

আমারে ভোলাবে স্বপ্নে! দীর্ঘদিন মেঘলোকচারী,
স্বপ্ন আর জীবনের সীমান্তে ছিলাম পরবাসী,
মধুর বসন্তদিনে ইন্দ্রধনু বর্ণে ভরি' ঝারি
রঞ্জিত করেছি আমি আকাশ-কন্যারে ভালবাসি।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবকাশে গোধূলির স্বর্ণমুষ্টি ভরি
করিয়াছি ধূলাখেলা ; শুনিয়াছি নক্ষত্রের গান ;

উষ্ণার অঞ্জলি দিয়ে তোমাদের হেমন্ত শর্বরী
করেছি উৎসরময়ী। কী স্বপ্ন করিবে মোরে দান।

তমসার তীর হতে কুরুক্ষেত্র উজ্জয়িনী বাহি
ডুবেছে সোনার তরী। সর্বস্বান্ত আমি আলাদিন,
জনসমুদ্রের গর্ভে ক্লান্ত প্রত্যাশায় অবগাহি
হারানো প্রদীপ খুঁজি, স্রোতাবর্তে যা হ'ল বিলীন।

জীবনের পাদপীঠে সূর্যচন্দ্রহীন দিনে রাতে
স্বপ্নের সান্নিধ্য নয়, কাছে এস, হাত রাখো হাতে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

অরণ্যপথ

জ্যোৎস্নার আলো চিক্‌চিক করে লেকের জলধারায়। রাত্রির অন্ধকার বাতাবরণখানি ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে হাজারো বার তারার ঝিকিমিকিতে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দেবু। এমনই ভাবে এক রাত্রের আকাশের নীচায় রাতুলদার মুখ থেকে সে নিয়েছিল মানুষের মুক্তির শপথ। ছাত্র, তরুণ দেবু। বহুদিন ধ'রে কলকাতার এই জনকোলাহলে সে শুনে আসছে মিছিলের প্রান্ত ঘোষণা, দেখে আসছে স্বৈরাচারী রাজশক্তির বেপরোয়া লাঠি, গ্যাস-বুকের ব্যবহার। চারিপাশের এই সান্ধ্যশ্রীর আলো উনিশটি বছর তার জীবনে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে গান গেয়ে গেছে। শিশু দেবু তার দিকে তাকিয়ে কতো দেখেছিল, মনে নেই সে কথা। আবছা আবছা স্মৃতির মত ভেসে ওঠে কৈশোরের নানা ছন্দ, নানা তাল। তাদের কিছু কিছু সে শুনেছিল, কিছু কিছু বা দেখেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন,…সূর্য সেন, তারকেশ্বরের ফাঁসি, গোপীনাথ সাহ ফাঁসি, বার্জকে হত্যা, ডাণ্ডি-মার্চ, চৌরীচৌরা, সত্যাগ্রহ, বিনেশ গুপ্তের ফাঁসি—এমনই ভাবে গল্প শুনতে শুনতে…দেখতে পেলে তারই গরীর মানুষ সুভাষ! আজ সে বলে তাঁকে, নেতাজী…। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের অধিনায়ক…সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোহিত…জাতীয় কিষাণ-মজদুর-রাজের নায়ক—নেতাজী।

১৯৪২-এর বিপ্লবে রাতুলদার সে দেখা পায়। দূরে একটা ট্রাম পুড়ছিল,

সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল দেবু।—চ'লে এস ভাই। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবার সময় এ নয়। পাগলা কুকুরের মত ছুটে আসছে সার্জেন্ট।

পিছু ফিরে তাকাতে না তাকাতেই মিলিয়ে যায় রাতুল।

শেষ হ'ল বিপ্লব···পরাভূত আত্মা তার নতুন শপথ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। ১৯৪৬-এ রাজনৈতিক মুক্ত বন্দীদের এক সম্বর্ধনা-সভায় আবার দেবু দেখে রাতুলদাকে। রাতুল বলছিল, বন্ধুগণ, মুক্ত বন্দীর সম্বর্ধনা-সভায় আজ আমি ফুলের মালা নিতে আসি নি, আমি চাইতে এসেছি এই জনতার সহযোগ ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের জন্যে। ভারতবর্ষে ৪২-এর বিপ্লব ম'রে গেছে ব'লে যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের ভুল। বিপ্লব মরে না; বিপ্লবীর ত্যাগ আর আত্মদানের ইতিহাস ভবিষ্যৎ বিপ্লবের স্বর্ণাক্ষরা ইতিহাস রচনা ক'রে যায়।

দেবুর মনে পড়ে, সে ভেবেছিল—সত্যি। কোন আন্দোলন তো ম'রে যায় নি। আন্দোলন অমর, তার পরিপূর্ণতা আগামী আন্দোলনের নব-কলেবরে। প্রতি মানুষকে এ কথা মনে রাখতে হবে, তাকে মনে রাখতে হবে।

সভাশেষে বেরিয়ে আসছে রাতুল। তার বলিষ্ঠ দেহরেখায় হাজারো সংকল্পের ভিড়। চোখে তার ঘৃণা, চোখে তার দরদ। সে ভালবাসে, অনুভব করে সেই সব মানুষদের, যারা তিল তিল ক'রে নিজেদের ক্ষয় ক'রে এক তিলোত্তমা সৃষ্টির আয়োজন ক'রে গেছে এবং আজও করছে। তার দরদ ঘিরে থাকে—টালিগঞ্জ ব্রিজের এগিয়ে-যাওয়া পথের দু পাশে যারা মহানগরীর সমস্ত বিলাস ও ঐশ্বর্যের সামনে, তার জ্ঞান ও সংস্কৃতির জৌলুসের সামনে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ভেঙে-পড়া খোলার ঘরের বস্তিতে পলে পলে আত্মহত্যা করছে। দেখেছে সে, এদের কোন ধর্ম নাই, নীতি নাই, শাসন নাই, সংযম নাই। বিকারহীন গ্লানিহীন জীবনের এই পঙ্কিল আবর্ত হো-হো ক'রে হেসে ওঠে রাতুলের কানে।—বেটা আপনারই পকেটটা শেষ পর্যন্ত মেরেছে? ফিরে যান বাবু। দেখি, কোন্ শয়তানটার কাজ; পাঠিয়ে দোব।

এই ওদের জীবন।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এদের দু হাতে আঁকড়ে ধরছে রাতুল। সমস্ত স্বপ্ন আশা ভরসা রাতুলের এদেরই বুকে।

দেবু লক্ষ্য করে রাতুলকে সভা থেকে বেরিয়ে আসার সময়। মনে হয়, সে যেন এর অপেক্ষাই করছিল।

তুমি···তুমিই না সেই বিয়াল্লিশে দাঁড়িয়ে ছিলে রসা রোডে জলন্ত ট্রাম-খানার দিকে চেয়ে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভোলেন নি আপনি সে কথা ?

রাতুল সস্নেহে একখানি হাত তুলে নেয় দেবুর।

কিছু বলবে ?

আমিও তো জনতার একজন ?

বলিষ্ঠ একজন।

আমার সহযোগ আপনি কি নেবেন ?

তোমার চোখের সামনে সেই জলন্ত ট্রামের আগুন আজও বুঝি নেবে নি ?

না।···আজও না। ১৯৪৬ আজ—তবুও না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মনোহরপুকুর রোডের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে রাতুল। নিঃস্তব্ধ অর্ধমৃত পার্কটার অরণ্যশীর্ষে কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। সেইখানে শপথ নেয় দেবু।

আজ প্রায় এক বছর আগেকার ইতিহাস। ভাবে দীক্ষিত দেবু। কত দিন, কত রাত কত শত ঘটনার ঘূর্ণিজালে সে জেগে উঠেছে নতুন ক'রে—৪৭-এর দেবুর মধ্যে।

দলের প্রতিটি লোকের, প্রতিটি কাজের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা নিয়ে দেবু কাজ ক'রে যায়; খুঁটিয়ে দেখে সবাইকে। আজ এই দীর্ঘ এক বছরের ইতিহাস তো কম নয়! সেখানে নতুন নতুন মানুষের আগমন। প্রত্যেকেই আসে দল বেঁধে। সম্মিলিতের ভিড়ের মধ্যে দেবুই শুধু একা। সে কাজ করে, কাজের সাথী যোগাড় করে না।

তারা-ভরা আকাশের তলায় অর্ধম্লান অন্ধকারে দেবু প্রতিজ্ঞা করে, তাকেও "রিক্রুট" করতে হবে—তার কাজের সাথী।

দর্শনের ক্লাসে শেরওয়ানী-পরা ছিপছিপে অথচ সুদৃঢ় ছেলেটি তাকে টানে। মহম্মদ ইব্রাহিমের কাছে স'রে দাঁড়ায় দেবু। স'রে চলে···দিনের পর দিন···আলাপে, আলোচনায়, সৌহার্দ্যে প্রীতিতে—রাজনৈতিক কর্মী দেবু।

ইব্রাহিম, এই আমাদের দেশ! সাদা বেনিয়ার শোষণ ও শাসনের তলায় পলে পলে আত্মহত্যা করছে। এ মৃত্যু কোন ধর্মের নয়, কোন সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র দেশের। তুমি হিন্দু নও, আমি মুসলমান নই—আমরা এই দেশেরই

ছেলে বন্ধু। এই দেশের চল্লিশ কোটি জনসাধারণের সুখ-সৌভাগ্যের জন্য স্বাধীনতা আমাদেরই অর্জন করতে হবে, রক্ষা করতে হবে তাকে।

মাঝে মাঝে তাই ভাবে দেবু। দেখি, একই কারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান, একই জাহাজে কয়লা দিচ্ছে হিন্দু-মুসলমান, একই ক্ষেতে চাষ করছে হিন্দু-মুসলমান। রুটির লড়াইয়ে এক হয়ে গেছে দেশের প্রাণ।

সমান আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন। তাকে রক্ষা করবার প্রশ্ন। ইস্ফলের রণাঙ্গনে শা নওয়াজ, ধীলন সায়গল একই সঙ্গে লড়ছে ভাই। আজাদ হিন্দ সৈনিকের পাত্রে মিশে গেছে হিন্দু-চা, মুসলমান-চা।

এমনই ক'রে এগোতে থাকে পরিচয়, জ'মে আসতে থাকে আলাপ।

রহমত আলী স্ট্রীটের সাদা একতলা বাড়িতে দেবু ব'সে প্রায়ই গল্প করে ইব্রাহিমের সঙ্গে।

কালীঘাট রোডের বাড়িতে আসে ইব্রাহিম।

বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন মানুষ দু দিক থেকে তাকিয়ে দেখে। এর ইঙ্গিত খুঁজতে চেষ্টা করে, কেউ-বা অসন্তুষ্ট হয়, কেউ-বা নির্বিকার থাকে।

* * *

দেশের মানুষ অবাক হয়ে বিস্ময়ে ভাবে দেশের ভাগ্যের কথা। বহুদিন থেকেই তারা ভেবেছে, ভাবছে রাতুল, ভাবছে বাদল, চিন্ময়, সঞ্জীবন। ইব্রাহিম এবং দেবুর মনেও তারা গভীরভাবে রেখাপাত করে। ওয়াভেল ফিরে গেল···মন্ত্রী-মিশন···মাউন্টব্যাটেন এসেছে। সৈনিক মাউন্টব্যাটেন—পুঁজিবাদী রাজশক্তির অভিযাত্রিক শ্রমিক সরকারের প্রতিনিধি হয়ে আসছে স্বাধীনতার মীমাংসা করতে। গান্ধী, নেহেরু, জিন্না, আম্বেদকর, যোশী, সাভারকর উঠে দাঁড়াল আপন আপন মঞ্চে। জনতার ঘোষণা কই? বিদ্রূপ ক'রে হাসতে চাইছে কুটিল ক্রূর শঠতায় পাকিস্তান। এতদিন যারা একসঙ্গে বাঁচছে, আর নাকি তারা পাশাপাশি এক অন্নে থাকতে পারছে না। স্বতন্ত্র অধিকারবাদ—পাকিস্তান।

ইব্রাহিম আর দেবু তাকিয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা চলে। লীগ নাকি বাদ প'ড়ে যাচ্ছে।

ডিরেক্ট অ্যাক্শান।

১৬ই আগস্ট।

সকালের মিষ্টি রোদ তেতে উঠে। রহমৎ আলী স্ট্রীটের সাদা বাড়ির পাশে নিমগাছের তলা থেকে সূর্য ক্রমশ উপরের দিকে এগিয়ে আসে।

সামনাসামনি বসে ইব্রাহিম আর দেবু।

দেবু ভাই, দেশের এই অবস্থায় আমাদের কিছু করা উচিত। একটা পরিস্থিতি যে ঘনিয়ে আসছে, তা তো আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কি করতে পারি? এর অস্ত্র জনসংগ্রাম—জনসচেতনায়। এতদিন আমরা মুসলমান জনসাধারণের কাছে ঠিক পৌঁছতে পারি নি। তাদের নিয়ে প্রস্তাব পাস করেছি, কাজে নামতে পারি নি। সেই দুর্বলতা বুঝি আজ প্রতিশোধ নেবে বন্ধু।

রাস্তার উপর হঠাৎ কেমন যেন চাঞ্চল্য দেখা যায়। রহমৎ আলী স্ট্রীটের ঘরে ঘরে মানুষ যেন মনে হয় ন'ড়ে উঠেছে, কেঁপে উঠেছে। পথের বুকে তারই আভাস। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায় দুজনে। দেবুর চোখে এক তিক্ত অভিজ্ঞতার হাসি, ইব্রাহিমের দৃষ্টিকোণে এক সন্ত্রাস। আদিম কোন হিংস্রতা রহমৎ আলী স্ট্রীটের মানুষগুলির চোখে মুখে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়ানো।

আমি এবার চলি ইব্রাহিম।

পাগল হয়েছ?

কেন?

দেখছ না ওদের দিকে তাকিয়ে? ডিরেক্ট অ্যাক্শানের নির্দিষ্ট দিন আজ। দাঙ্গার আয়োজন চলেছে।

বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকায় দেবু নিমগাছের একপাশের ছায়াটুকুতে। ঘরের চারি দেওয়ালে সহৃদয় কতকগুলি চোখ জেগে ওঠে। প্রশ্ন করে, দেবু, বর্বর এই অরণ্যপথে সমবেদনাটুকু কিসের? এমনই ক'রেই কি মানুষের জীবনে তা বারে বারে দেখা দিয়েছে?

আম্মাজান এসে ঘরের ভিতর দাঁড়ান। এতদিন তাঁর মুখ দেখতে পায় নি দেবু। দোরের পাশ দিয়ে চকিতে বোরখার কালো রেখা স'রে গেছে। আজ সেই আম্মাজান আরও স্নিগ্ধ দুটি চোখ তুলে দেবুর মুখের দিকে—দাঁড়িয়ে আছেন।

ইব্রাহিম, তোমার বন্ধুর আজ আর যাওয়া হতে পারে না। দেবু, মানুষকে নিয়ে মানুষের এ হিংসা কেন?

আম্মাজানের মুখ বেদনায় থমথমে হয়ে আসে।

মানুষ নিজেকে বুঝতে পারে না ব'লে।

মনে পড়ে তাঁর ইস্‌মাইলের কথা, মনে পড়ে ইউসুফের কথা। ঢাকা জন্মাষ্টমীর মিছিল ছায়াছবির মত ন'ড়ে উঠে। শান্তি চেয়েছিল ওরা···বলেছিল শান্তির মিছিলে ফিরিয়ে আনবে মানুষের সৌহার্দ্য, পারিবারিক ভালবাসা কিন্তু নাঃ। ওদের সবাই বললে, নিমকহারাম···ধর্মদ্রোহী। ইস্‌মাইল আ ইউসুফের শান্ত জ্যোতির্ময় মুখ দুটির ছায়া প'ড়ে আছে আজ দেবুর মুখে মাথায় একখানি হাত রাখেন তার।

বেড়ে চলে জনতার চীৎকার···ক্ষিপ্রতা। রহমৎ আলী স্ট্রীটের ঝিমিয়ে পড়া নোনা-ধরা জীবনে এতদিন কুকুরের হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি চীৎকার, আর মাঝে মাঝে পানওয়ালার কুৎসিত গালিগালাজ ছাড়া আর কি ছিল না।

ইব্রাহিম আছ নাকি ?—দুয়ারে করাঘাত জাগে।

এসেছে ওরা ··এসেছে ইব্রাহিমকে নিয়ে যেতে। ওরা মনে করে, ভাবে আম্মাজান—ইব্রাহিমও নামবে ছুরি নিয়ে পথে এই বর্বর মনুষ্যত্বহীন গুণ্ডা মিছিলে।

ছোট মেয়ে গুলাবজান—পাঁচ বছর বয়সের শিশু-মুখখানি দরজার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দেয়, বলে, ভাইয়ার শরীর খারাপ।

বিশ্বাস করতে চায় না ওরা। হিংস্র অবিশ্বাস্য চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে পাঁচ বছরের সন্ত্রস্ত শিশুটিকে।

কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে গুলাবজান।

ভেঙে গেছে আজ অরণ্যের বর্বর সিন্ধুতরঙ্গের উপর মানুষের গড়া সভ্যতার এই বন্দর। রহমৎ আলি স্ট্রীটের পরিধি বিস্তার পাবে সারা দেশ জুড়ে আকাশে হঠাৎ এক টুকরো মেঘ দেখা দেয়। ম্লান আলোকে, জানলা গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখে দেবু, সামনের কালু শেখের বাড়িতে গোছা গোছা লাঠি এসে জমা হচ্ছে। বেপরোয়া আজ কালু শেখ। ও জানে, সারা মুসলমান সমাজটাকে মেরে রেখে দিয়েছে হিন্দুরা। বড় বড় ব্যবসা, চাকরি, জমি-জায়গা কোথায় কজন মুসলমানের ? তাদের গড়া কারখানায়, তাদের জমিদারিতে ওরা দিন-মজুর। এতদিনকার এই বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে হবে। সেই

প্রতিশোধের, সেই মুক্তির অগ্রদূত জিন্নাসায়েব—এসেছে বেহস্ত থেকে। পয়গম্বর জিন্না!

পার্সেল-বাক্সের লোহার পাত কাটে শেখ। ফুটো কাঠের অন্তরালে ঝলসে ওঠে ইস্পাতের সম্পূর্ণ টুকরোগুলো। শেখের কাছে ওরাই—ওদের শানিত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগই সেই মুক্তির পরোয়ানা। একমুখ হাসিতে কালু শেখের বলিরেখা-গুলি ন'ড়ে ওঠে সরীসৃপের মত। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সে।

সামনের বাড়ির জানলার অপর তীরে চমকে ওঠে দেবু, কেঁপে ওঠে ইব্রাহিম।

* * *

মানুষের ক্ষমতা-বিস্তারের বাসনা দুটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নেতার রূপ অতি প্রত্যক্ষ। অনুচর জাগে পরোক্ষ প্রেরণায়।

করাচীর প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশে সংকোচ নেই। রহমৎ আলি স্ট্রীটে লজ্জা নেই। বেহস্তকে তারা অস্বীকার করতে পারে না।

কালীঘাট রোডে আতঙ্ক জাগে।

পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন দেবুর আত্মীয়স্বজন। সকালে—সকলে জানে, দেবু গেছে রহমৎ আলি স্ট্রীটে। সকলে বলে, বন্ধুত্বের ঋণশোধ করেছে সে।

সাপের জাত! ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাওয়া!

একটুও বুঝল না দেবু! এত বুদ্ধিমান ছেলে—

আজকালকার ছেলে, ওদের ধরনধারণই কেমন অদ্ভুত! সোজা কথা মানা ওদের ধর্ম নয়।

কাঁদতে থাকে দিদিমা। দেবু, তাঁর দেবু—কোন মানুষের কাছে কোন অন্যায় তো করে নি, কোন মানুষকে এতটুকু আঘাতও সে করে নি, তবে তার এ শাস্তি কেন? মনে পড়ে তাঁর হালিমকে, মনে পড়ে সুফীকে। ছোটবেলা কথা। গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশ···চণ্ডীমণ্ডপে পূজো হ'ত। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক আসত। হালিম আর সুফীও ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমীর ভাসান পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াত চণ্ডীমণ্ডপে। তাদের ছেলেমেয়েরাও আলপাকার জামা গায়ে ঠাকুর দেখতে আসত; প্রসাদ পেত আনন্দের সঙ্গে। ফটিকছড়ি গ্রাম থেকেই মহরমের মিছিল বার করত আশপাশের গ্রামের মুসলমানরা।

দিদিমার মনে পড়ে, সারা গ্রামের ছেলেবুড়ো মেয়ে সেই মিছিলের অপেক্ষা করত, সেই মিছিলে নেমে দাঁড়াত, হালিম আর সুফী ছিল সারা গ্রামের দাদা। কতদিন দিদিমা এদের কোলে চ'ড়ে নদীর তীরে বেড়িয়েছিলেন একই, সেদিন তো তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় নি কেউ হিন্দু ব'লে! সে বিশ্বাস সে প্রীতি কেমন ভাবে আজ যেতে পারে? কেমন ভাবে আজ তারা দেবুকে··· না না, এরা ভুল···এরা ভুল··· কথা এরাই বাঁকা করছে।

পাগলের মত বৈঠকখানা-ঘরে দীননাথ মাথার চুল ছেঁড়েন। তাঁ মাতৃহীন একমাত্র সন্তান দেবু। সে এমনই ভাবে প্রাণ দিলে, এমনিভাবে তাকে হারাতে হ'ল! ভাবতে পারেন না দীননাথ। রক্তের প্রতিহিংসা খুঁজে বেড়া তাঁর সারা মন।

দশ মিনিটের পথ রহমৎ আলি স্ট্রীট।

সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

গাঢ় অন্ধকার ঘিরে আসছে। জলুক রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো। জ্যোতি ওর ঢাকা প'ড়ে যাবে হিংস্র বিভীষিকায়।

কোথা থেকে এসে হাজির হয় চান্দু বিড়িওয়ালা।

বাবু, এসব কি সত্যি?

সব সত্যি চান্দু।

শালারা!···হুকুম করুন বাবু, হুকুম কেন, চলুন, আপনারা তো এতজ ঘরে রয়েছেন, চলুন সব রহমৎ আলি স্ট্রীটে, জ্বালিয়ে দিয়ে আসি শালাদের রক্ত কি আমাদের ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

সকলে অবাক হয়ে তাকায় চান্দুর দিকে। চান্দু শুধু বিড়িওয়ালা নয় চান্দু গুণ্ডা। সে দেখে আসছিল কসাইবাগান আর মেছোবাজার। ব্যবসা ক্ষতিতে চান্দুর বুকটা এতদিন জ্বলছিল।

চান্দু ভাবে, দেবুবাবু বার বার মরুক। বার বার আমায় নিয়ে যেতে হবে এদের! মিলমিশ···ভাই ভাই···এদিকে ব্যবসায় তার ভাটা প'ড়ে আসছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকিয়ে চান্দু বলে, আমরা মরদ কি না বাবু।

হ্যাঁ, আমি যাব!—কেঁপে ওঠেন দীননাথ।

আমরা যাব···যাব···

কোলাহলের মধ্য থেকে স'রে যায় চান্দু। ঘরের মানুষগুলি শুনতে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত।

গভীর হতে থাকে রাত্রি। ওরা দল বেঁধে অপেক্ষা করে। লাঠি, শাবল, বর্শা, বন্দুক, কেরোসিন, যে যা পারে সংগ্রহ ক'রে আনে।

ঘণ্টা কয়েক বাদে একখানি পাল্কিগাড়ি এসে দাঁড়ায়। একগোছা শক্ত পাকানো লাঠি আর কয়েকখানা ধারালো ছোরা, কয়েক টিন পেট্রোল নিয়ে নাবে চান্দু···আরও কয়েকজন মানুষ।

সমগ্র জনতা এগিয়ে চলে রহমৎ আলি স্ট্রীটের দিকে বিচ্ছিন্নভাবে নানা চোরাগলির মধ্য দিয়ে।

চান্দুর সশস্ত্র বেপরোয়া অভিযানের সামনে লুটিয়ে পড়ে রহমৎ আলি স্ট্রীটের মানুষ।

কালুশেখের ইস্পাতের ধারালো টুকরোগুলো জ্ব'লে ওঠে হাতে হাতে। চেঙ্গিস্ খাঁ—চান্দু। তার সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রহমৎ আলি স্ট্রীটের ধ্বংস-স্তূপ আর মৃতদেহের উপর গড়া হয়।

সারিবন্দী ঘরগুলি পেট্রোলে, কেরোসিনে হু-হু শব্দে জ্ব'লে যায়। পাকিয়ে আসে বিরাট অজগরের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

ওরা এসেছে দেবু। জ্ব'লে যায় রহমৎ আলি স্ট্রীট। মৃত্যু দেবু! পৃথিবীর সব আশা ভরসা, বিপ্লবীর সব স্বপ্ন, কিষাণ-মজদুর-রাজ ডুবে গেল ফুটো জাহাজের মত হিংসার অতলান্তে।

ভয় কি? আমি তো আছি।

তুমি নেই, তুমি থাকতে পার না দেবু। হিংসার এই নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশে কালীঘাট রোডের কাছে তুমি পর হয়ে গেছ, রহমৎ আলি স্ট্রীটের কাছে আমি পর হয়ে গেছি।

বাইরে উন্মত্ত চান্দু গুণ্ডার মিছিলের ধ্বনি জাগে—জয় হিন্দ!

শুনছ—জয় হিন্দ? হিন্দুস্থানের জয়, ভায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কামনা করছে—হিন্দুস্থানের খাঁটি সপুত্।

ভয় কি? একদিন পরের কাছে রক্ত দিয়ে শহীদ্ হয়েছি আমরা, আজ ঘরের মানুষকে ঢেলে দোব তাজা রক্তের অঞ্জলি।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় হিংস্র মিছিল। অন্ধকারে তাদের শু কেবল শ্বাপদের দৃষ্টি দেখা দেয়।

আমি···আমি দে—

শালা, কে তুই? মর্।

বর্শার ফলায় গেঁথে যায় দেবুর উষ্ণ বুকখানি। মানুষের জন্যে দরদ চিরদিন উষ্ণ ছিল, যার উষ্ণতা কোন দিন হারাত না। ভবিষ্যতেও মৃত্যুর মধ্য দিয়েও কোনদিন হারাবে না। দু চোখের আলো তার ম্লান হয়ে আসে। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে চারি পাশ। বড় পি পায় দেবুর। কে তাকে জল দেবে? নির্মল বিশুদ্ধ জলধারার একটি প্রবাহও নেই আজ। রক্তের লবণ—স্বাদে বিস্বাদ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ পিপাসু হয়ে দেবুর মৃত্যুপাণ্ডুর বুকে জেগে ওঠে···

গুলাবজানের আর্তধ্বনি ক্ষণেকের জন্য অক্ষম দেবুকে নাড়িয়ে সাধ্য কই? রক্তের পরিখায় ডুবে যাচ্ছে দেবু। নেচে ওঠে চারি নাগিনীর মুক্ত উল্লাসে হাজারো আগুনের শিখা···। অবসন্ন ক্লান্ত দেবু দেখে, রাতুলদা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে রাতুলদা নির্বিকার। তার নতুন প্রভাতের স্বপ্ন এতটুকুও ম্লান হয় নি।

* * *

রাত্রির সমস্ত ঘটনা দীননাথের কাছে কেমন যেন দুঃস্বপ্ন মনে হয়। ফেরে নি···দেবু ফিরবে না। দেবুর মৃত্যুর প্রতিশোধ তিনি নিয়েছেন রহমৎ আলি স্ট্রীটের উপর দিয়ে। কিন্তু কই, শান্তি কই? দেবুকে তো ফিরে পেলেন না?

চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। বাইরে জনহীন নিস্তব্ধ পথ—শু প'ড়ে আছে। মিলিটারি পুরুষের পদশব্দ দীননাথকে সচকিত ক'রে তে ফিরে আসেন তাই। শোবার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়ান। শিক্ষা-সং মার্জিত দীননাথ—কেমন ক'রে হারিয়ে যেতে পারে? বিহ্বল দৃষ্টিতে নি প্রতিবিম্বের দিকে নিজে তাকান। শূন্য দু চোখ দিয়ে তাঁর ঝ'রে পড়ে ভাঙা অশ্রুজল। দেবুর শোকে, না, আত্মতিরস্কারে? কে জানে!

পদচিহ্ন

স্বল্প কয়েকটি কথা ব'লে ছেলের কাছে বিদায় নিলেন কাশীর বউ। মাত্র য়কটি কথা। বললেন, আমি জানি, কোন অন্যায় তুই করিস নি বাবা। ও যে কষ্ট তুই পেতে চলেছিস, এর জন্যে দুঃখ তুইও করিস নে, আমিও ব না।

পুলিস-কর্মচারী কামদাবাবু একটু দূরে ব'সে ছিলেন। তিনি একটু চমকে লেন। সজাগ হয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। ভদ্রমহিলা তো সহজ নন, ারণ কথা তো বলছেন না তিনি।

গৌরীকান্ত বললে, তুমি বরং কাশী চ'লে যেও মা। আমি না-ফেরা পর্যন্ত খানে থাকাই ভাল।

তাই যাব। এখানে থাকা সম্ভবপর হবে না। আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে ঢ়তে ঢেলাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এক দিকে রাজরোষ, অন্য দিকে সমাজের ষ, এর পরে এখানে থাকবই বা কোন্ সাহসে?

ঢেলা পড়ছে বাড়িতে! কে ফেলছে মা?

হেসে কাশীর বউ বললেন, কি ক'রে বলব বাবা। যে ফেলছে, সে ভূতের দেখাতে চায়। বিশুদের বাড়িতেও পড়েছে ঢেলা। মানে, বোঝাতে চায় বিশু অপমৃত্যুতে ম'রে ভূত হয়েছে। তবে আমি জানি, এ কাজ মানুষের। র মত মেয়ের কি অধোগতি হতে পারে?

গৌরীকান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তুমি কাশীই চ'লে যেও মা।

যাব। গ্রামের লোকের দোষ দেব না। অপরাধ হয়তো আমাদেরই। নকার মাটিই হয়তো আমাদের ভার সহ্য করতে পারছে না। যাব, আমি ই যাব।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, তুই যেন ভয় পাস নে বাবা, নও যেন ভগবানে বিশ্বাস হারাস নে। দুঃখ কষ্ট যেখানে কর্মফলে আসে না, নই আসে, সেখানে জানিস, ভগবান দুঃখের তপস্যা তার মাথায় চাপিয়ে ন, আশীর্বাদের মত; বলছেন, ওই বোঝা মাথায় ক'রে এগিয়ে এস, আমি মার জন্যে সিদ্ধিফল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কামদাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, আপনার কে সত্য কথা বলতে বলুন না। এখুনি ছেড়ে দেব ওকে আমরা।

কাশীর বউ অসঙ্কোচে কামদাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি কথা?

নলিনী বাগচী ব'লে কাউকে ও জানে কি না। সে এখন কোথায়?

গৌরী কি উত্তর দিয়েছে?

কি আর বলবে! যা সকলেই বলে, প্রথমে তাই বলেছে—জানি না।

তা হ'লে ও সত্যিই জানে না।

আপনার ছেলের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে কিন্তু।

সে কষ্ট ওকে সহ্য করতেই হবে। রাজা কষ্ট দিলে তার প্রতিকার সা মানুষের সাধ্যের মধ্যে নাই। রাজার উপরে যিনি, এক তিনিই শুধু পা তাঁকেই ডাকুক ও। তাঁর যা অভিপ্রায় হবে, তাই ঘটবে। তিনি তো অ করেন না কারও।

কামদাবাবু নির্বাক হয়ে মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কি পর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আপনার কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আপ ছেলেই শুধু জানে না, আপনিও—। বলতে বলতে থেমে গেলেন কামদা তারপর বললেন, আপনাকে এইবার বাড়ি যেতে হবে।

কাশীর বউ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটি হাতে তুলে নিলেন। ছে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। গৌরী তাঁকে প্রণাম করলে।

কামদাবাবু বললেন, আপনাকে আবার বলছি আমি, আপনি ছে বলুন—ও যা জানে সব কথা খুলে বলুক। আমরা এটা জানি আর বিশ্বাসও যে, ও কোন কাজের কাজী নয়, শুধু ওদের সঙ্গে মেলামেশা হয়েছে। বেশি কিছু নয়। খুলে বললে, ভবিষ্যতে ওর ভাল হবে। গভর্মেণ্ট পড়ার ভার নেবেন। ভবিষ্যতে চাকরি দেবেন। বুঝেছেন?

কাশীর বউ কোন উত্তর দিলেন না, গৌরীর মাথার উপর থেকে হাত তুলে নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন একবার, তারপর বললেন, ওকে যাবার আগে কি আর একবার দেখা করতে দেবেন?

কামদাবাবু বললেন, না। ভোর-রাত্রেই গাড়ি ছাড়ব আমরা।

কাশীর বউ যেমন এসেছিলেন, একা হ'লেও একটি সম্ভ্রমের সঙ্গে, তে ভাবেই বেরিয়ে গেলেন।

কামদাবাবু বেরিয়ে এসে পবিত্রদের পাশে বসলেন। বললেন, একে খাঁটি ধাতু পবিত্রবাবু। টং টং আওয়াজ দেয়। কাশীর মেয়ে উনি না?

হ্যাঁ।

ব্যাপার কি? কামদাবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আপনার গলার ওয়াজটা—। বলতে বলতেই তিনি পাশের লণ্ঠনটা তুলে ধরলেন। লণ্ঠনের লোয় সকলে দেখলে, পবিত্রর চোখ থেকে দুটি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে সছে ধীরে ধীরে।

লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে কামদাবাবু বললেন, কি করব পবিত্রবাবু, পেটের য় চাকরির কর্তব্য আমাদের করতে হয়। নইলে—। মধ্যপথেই চুপ ক'রে লেন তিনি। দেওয়ালেরও কান আছে। বিশেষ ক'রে থানার কর্মচারী র ডিটেক্‌টিভ বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে একটা গোপন রেষারেষি আছে। র্ক হয়ে গেলেন তিনি।

বাড়িতে ফিরে কাশীর বউ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন জের অদৃষ্টের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে তাঁর জন্ম, কাশীর এক ফকের ঘরে। ইহলোক পরলোক জন্মান্তর অদৃষ্ট সমস্ত কিছুকে মেনেও রেজী সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত শহরের শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত। দুইকেই নি সমানভাবে মানেন। আজ বেদনার প্রচণ্ড আঘাতে মর্মস্থলের ধর্ম-াসই বড় হয়ে উঠেছে তাঁর মনের মধ্যে। তিনি ভাবছিলেন তাঁর এ জীবনের হাস, খতিয়ে দেখতে চাচ্ছিলেন, কোন্ কর্মের ফলে তাঁর উপর বিধাতা লেন এমন কঠিন আঘাত। কিছুক্ষণ পূর্বে থানায় তিনি গৌরীকে যে াসে আশ্বা রেখে আশ্বস্ত হতে ব'লে এসেছেন, তিনি নিজেই যেন এ মুহূর্তে বিশ্বাস আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারছেন না। প্রবল বন্যার স্রোত এমন বে তাঁর উপরে আজ অতর্কিতে এসে পড়েছে, আকর্ষণে আঘাতে এমনই ল ক'রে তুলেছে যে, ওই বিশ্বাসের অক্ষয় বটমূল-ধরা তাঁর দৃঢ় মুষ্টি কাঁপতে াতে শিথিল হয়ে এসেছে, আর তিনি ধ'রে থাকতে পারছেন না, এইবার ভেসে যাবেন। এর পর ঘটনার বন্যাস্রোতে, আশা-নিরাশার তরঙ্গদোলায় লায়িত, জন্মান্তর ও অদৃষ্ট বিশ্বাসের বেতস-লতার আশ্রয় ভিন্ন অন্য আশ্রয় হাতের কাছে পাচ্ছেন না! বন্যামগ্ন জীবনের চারিদিকে ব্যাকুল আগ্রহে কিয়েও যে কোন কূলও দেখতে পাচ্ছেন না!

নিজের কর্মের কথা তিনি অনেক ভেবেছেন, স্মরণ করেছেন জীবনের মূল ইতিহাস। কোন অন্যায়ের কথা তাঁর মনে হয় নাই; কোন ব্যথিত

জনের মুখ তো ভেসে উঠছে না মনশ্চক্ষে। বরং ভেসে উঠছে ক্ষমতাশালী কঠোর দৃষ্টি, উদ্যত তর্জনী; মনে পড়ছে, যখন তিনি গৃহত্যাগিনী ষোড়শী আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন স্বর্ণভূষণ যে দৃষ্টিতে তাঁর স্বামীর দিকে তাকি ছিলেন, সেই দৃষ্টির কথা; মনে পড়ছে, যে দিন তাঁর ভাই রবি এবং কিশোর পুলিস ধ'রে নিয়ে যায়, সে দিন তাঁর স্বামীর কঠিন দৃষ্টির কথা; আরও অ কথা মনে পড়ছে। আজ যেন মনে হচ্ছে, বিনা অপরাধেই—অন্তত এই জ কর্ম বিচার ক'রে মনে হচ্ছে, বিনা অপরাধেই বহু কাল আগে থেকেই কে দণ্ডদাতার বিধান তাঁকে দণ্ডিত করবার জন্ত বার বার এসেছে কিন্তু ফি গেছে—ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে, এতদিনে তাঁকে সে আঘাত করতে স হয়েছে। জন্মান্তরের কর্মফল ভিন্ন আর কোন হেতু তিনি খুঁজে তো পা না।

বাঁধানো দাওয়ার উপর তিনি শুয়ে পড়লেন।

ঝি এসে বললে, মা, একটু জল মুখে দিন।

না রে। কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। তেষ্টাও পায় নি।

তবে ঘরে চলুন। শোবেন।

এইখানেই একটু থাকি।

না, মা। এই একটু আগে সাপ বেরিয়েছিল। চলুন, ঘরে চলুন।

যাচ্ছি একটু পরে। আমায় একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দে। বলিস নে। ভাল লাগছে না।

ভাবতে ভাবতেই কখন তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হ তন্দ্রা ভেঙে গেল। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে, অস্বস্তিকর গ চারিদিক ভ'রে উঠেছে। বাঁধানো মেঝেটা উত্তপ্ত বোধ হচ্ছে। দে উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মেঝেটা। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। বি চমকাচ্ছে। দূরাগত মেঘগর্জন ভেসে আসছে ভেরীধ্বনির মত। অন্ধ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসছে।

তাঁর আবেগবিচলিত মন আরও বিচলিত হয়ে উঠল। মনে হ'ল সবই যেন তাঁকে এবং তাঁর গৌরীকে উপলক্ষ্য ক'রে ঘনায়িত হয়ে উঠ দেহের উত্তাপে উত্তপ্ত স্থানটার উপর হাত দিয়ে তাঁর মনে হ'ল, নবগ্রামের

প্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্পর্শে, বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁরই নিশ্বাসে। গ্রামের ভূমি, নবগ্রামের বায়ুমণ্ডল তাঁকে আর সহ্য করতে পারছে না। কাশে বজ্র উদ্যত হয়ে উঠেছে ঠিক সেই কারণেই।

ক্ষমা কর হে ভূমি-দেবতা, গ্রামলক্ষ্মী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। রাধ যদি হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। দেশের কেন্দ্রস্থলে যে াপ সঞ্চারিত হয়েছে, সে উত্তাপ যথানিয়মে যথাকালে তোমার বুকে সঞ্চারিত , আমি যদি অকালে তাকে বহন ক'রে এনে তোমায় বিচলিত ক'রে থাকি, আমাকে ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির অন্ধকার একটা আর্ত্ত চীৎকারে চিরে যেন ফালি-ল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি মানুষ কলরব ক'রে উঠল। ভয়ার্ত্ত রব!

সাপ! সাপ!

চমকে উঠলেন কাশীর বউ। সাপ! তবে কি সন্ধ্যার সেই সাপটা! ন উঠে স্তিমিত হ্যারিকেনটাকে বাড়িয়ে দিলেন। আলোটা নিয়ে তুলে নন। লণ্ঠনের আলো সমস্ত উঠানে ছড়িয়ে পড়ল। দূর দিগন্তে উচ্চকিত তের আভাও এসে পড়ছে মধ্যে মধ্যে। এমনই একটি বিদ্যুতের ছটায় ায় তিনি দেখলেন, সেই সাপটাই বটে। যে জল-নিকাশের নালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই দিক দিয়েই সে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকছে, এবার তার মন্থর নয়, গতি দ্রুত এবং চঞ্চল; নিশ্বাস ক্রুদ্ধ এবং উচ্চ; মধ্যে ণা বিস্তৃত এবং উদ্যত হয়ে উঠছে। মানুষের তাড়া খেয়েছে। দ্রুতবেগে টা এসে রান্না-ঘরের পুরানো দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল।

ও দিকে মানুষের কলরব সমানে উঠছে।

বাঁধো, বাঁধো। জোরে বাঁধো।

কেউ যেন কাঁদছে।

শিউরে উঠলেন কাশীর বউ। তবে কি কাউকে কামড়েছে ওই মৃত্যুমুখ ? কাকে কামড়ালে ? কাকে ?

মণিভূষণকে দংশন করেছে মৃত্যুমুখ কাল। পবিত্র ও মণিভূষণ এতক্ষণে ছিল থানা থেকে। সঙ্গে আলো নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সে ছিল পিছনে।

মণিভূষণের স্বাভাবিক চলাই একটু দ্রুত। এবং আজন্ম গ্রামে বাস ক অন্ধকারে চলা-ফেরায় অভ্যস্ত। সাপটা মানুষের সাড়া পেয়ে পথ অতি ক'রে রাধাকান্তের জল-নিকাশের নালার মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। ঢু ছিল, প্রায় অর্ধেকটা শরীর নিয়ে নালার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। লেজটা প পথের উপর। আজকের ঘটনায় উত্তেজিত মণিভূষণ পবিত্রের সঙ্গে আলোচ মত্ত ছিলেন। ঠিক পথের দিকে মনও ছিল না, দৃষ্টিও ছিল না। পিছ আলোয় নিজের ছায়া পড়েছিল তার সম্মুখে। এই আলো-আঁধারি অন্যমনস্কভাবে তার পা এসে পড়েছিল সাপটার লেজের উপর। পড়তেই তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে কামড়েছে।

প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কাশীর বউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখতে পারলেন মণিভূষণের আক্ষেপ তাঁর কানে আসছে। সে বলছে, হয়তো সন্তানে অভিশাপ। হে ভগবান!

তিনি বেরিয়ে এসে বলতে চাইলেন, না না, বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, অ মুহূর্তের জন্য মানুষকে দোষ দিই নি। কাউকে অভিসম্পাত দিই নি। কি কোন উপায় নাই, রাস্তা-ঘরে ঢুকে ওই কাল পথ আগলে কোথায় জেগে ব রয়েছে। তিনি স্থির দৃষ্টিতে রাস্তা-ঘরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে কলরব থেমে গেল।

ধরাধরি ক'রে মণিভূষণকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল সকলে। কাশীর তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুঃখের সঙ্গে এ কি লজ্জা তাঁর অদৃষ্টে জুটল! মণিভূষণ স্পষ্ট ব'লে গেল, এ সর্পদংশনের হেতু হ'ল তাঁর অভিশা এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়? ছি ছি ছি!

ইচ্ছা হ'ল, এই রাত্রির দুর্যোগের মধ্যেই তিনি চ'লে যাবেন এ পরিত্যাগ ক'রে। কাশী যাবার সংকল্প তিনি করেছেন, সে সংকল্পকে ক পরিণত করবেন আজই এই রাত্রেই।

সামনের দরজা দিয়ে যাবার পথ বন্ধ। কাল বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। কি বলছে, দুঃখ লজ্জা সমস্ত কিছুকে বরণ ক'রে নিয়ে অপেক্ষা কর, প্রস্তু কর, ফিরে আসবে তোমার গৌরীকান্ত, প্রসন্ন হবে এ গ্রামলক্ষ্মী?

বলুক, কাল যাই বলুক, তিনি এ আর সহ্য করতে পারবেন না। যে মতে সহ্য করতে পারবেন না, এ তাঁর পরাজয়। সে পরাজয় স্বীকারই ি

ছেন। পরাজিতের মত নতশিরে রাত্রের অন্ধকারে অপরিসীম বেদনা
লজ্জাকে বহন ক'রে তিনি চ'লে যাবেন।

ফোঁটা ফোঁটা ক'রে বৃষ্টি নেমে এল। সেই বৃষ্টি মাথায় ক'রে তিনি খিড়কির
খুলে অসমসাহসিনীর মত বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে নিলেন শুধু গহনা
এবং অল্প কিছু কাপড়। ঝির মাইনে মিটিয়ে দিলেন। প্রতিটি ঘরে তালা
য়ে দিলেন। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে তিনি এলেন বাউরী-পাড়ায়।
ক তুললেন সতীশ বাউরীকে।

বললেন, আমায় স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবি বাবা। আমার সঙ্গে তোকে
ত হবে।

সতীশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, এই রাত্রে! তারপর আকাশের দিকে
তুলে দুর্যোগের দিকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আকাশে মেঘ দেখেছেন মা?

দেখেছি। তবু আমি যাব বাবা। আমাকে যেতে হবে। মায়ের জন্ত
টু না হয় কষ্টই করবি রে! আয়।

বলতে বলতেই তিনি অগ্রসর হলেন। ভিজে ধূলোতে তাঁর পায়ের ছাপ-
। ফুটে উঠতে লাগল।

মনে মনে বললেন, হে গ্রাম-দেবতা, এই পায়ের ছাপ যেন মুছে না যায়।
ত্নীকে নিয়ে, তার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে একদিন যেন ফিরে আসতে
র। বাড়ির সদর-দরজায় যে কাল পাহারা রইল, তাকে মনে মনে প্রণাম
র বললেন, তুমিও অপেক্ষা ক'রো, রক্ষা ক'রো আমার গৃহ, আমার
ত্নীর সাধনপীঠ।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অকূল

আমি গান গাই
যে সুর নদীর জলে
ডুবে যায় আলোর রেখায়
একা নদী কূল তার নাই।
আঁধার ঘনায় যতদূর ততদূর নাই পরিচয়
পথ যেন ভয়ে থেমে যায়
জলের সীমায়।

শ্রীআরতি রায়

সাহিত্য ও রসতত্ত্ব

[ভট্টনায়ক : ভুক্তিবাদ]

আমরা ভট্টলোল্লটের এবং ভট্টশঙ্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আচার্য ভট্টনায়কের রসসূত্রের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত আলঙ্কারিক সমাজে ভুক্তিবাদ বলিয়া পরিচিত।(১)

আমরা দেখিলাম, ভট্টলোল্লট এবং ভট্টশঙ্কুক—রসসূত্রের এই দুইজন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাতা, তাঁহাদের কাহারও মতবাদেই সহৃদয়ের আনন্দময় অনুভূতির সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভট্টলোল্লটের মতে মুখ্যরসের আধার অনুকার্য দুষ্মন্ত প্রভৃতি নায়ক; এবং সহৃদয় অনুকর্তা নটে ওই স্থায়িভাবের আরোপ করিয়া তাহার অলৌকিক সাক্ষাৎকারের বলে আনন্দ অনুভব করে। ইহা যে সামাজিকগণের সম্পূর্ণ অনুভববিরুদ্ধ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরের সুখ দেখিয়া তটস্থ ব্যক্তির কোনও আনন্দই জন্মলাভ করিতে পারে না। আচার্য শঙ্কুক যদিও অভিনেতা নটের স্বরূপ বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তবুও নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবের অনুমানেই সামাজিকগণের অলৌকিক আনন্দানুভূতি আত্মলাভ করে, তাঁহার ওইরূপ কল্পনাও সন্তোষজনক নহে। তাঁহার মতেও সামাজিক কেবল তটস্থ, নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র। তাহার সহিত স্থায়িভাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। সে শুধু উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। পরের সুখ অনুমান করিয়াই তাহার আনন্দ। এই সিদ্ধান্তটিও রসানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। আবার রসের অনুভূতি যে নিতান্তই ব্যক্তিগত (personal), সহৃদয় দর্শকের একান্তভাবে আত্মগত—ইহাও বলা যায় না। সহৃদয় কি এইরূপ অনুভব করে যে, এই যে অনুভূতি, ইহা কেবল আমারই, আর কাহারও নহে? অনুভবের এই পরিমিতত্ব (limitedness), এইরূপ দ্বৈপায়ন চিত্তবৃত্তি বা insularity, কি সাহিত্যরসের ক্ষেত্রে সম্ভব?

---

(১) "...ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেণ বিবৃণ্মতে"—কাব্যপ্রদীপ, পৃ. ৬৬।

পরবর্তী টীকাকারগণের মতে ভট্টনায়ক সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ অবলম্বন করিয়া ভরতের রসসূত্রের তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছিলেন। সত্যই, সাংখ্যদর্শনের অনেক পারিভাষিক সংজ্ঞা ও সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত বহু পদার্থই ভট্টনায়কের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই বোধ হয় টীকাকারগণের ঐরূপ মন্তব্যের মূলে।

াহা হইলে লৌকিক চিত্তবৃত্তির সহিত সাহিত্যপাঠ বা নাট্যদর্শনজনিত অনুভূতির ফাত রহিল কোথায়? ব্যাবহারিক জগতের যে সকল অনুভূতি, সে সকলের লেই তো অহংতা (egoism) চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে,—উহা তো কান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক (egoentric)। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যদি সহৃদয় াত্মার এই অবিদ্যারচিত সংকীর্ণতা, 'নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর' লঙ্ঘন রিতে না পারে, তবে কবিকল্পিত বিশ্বের সহিত জড়জগতের ভেদ রহিল কোথায়? একটি কেন লৌকিক, এবং অপরটি কি জন্যই বা অলৌকিক বলিয়া ারিগণিত হইবে? সুতরাং ভট্টনায়ক বলেন, রস উৎপন্ন হয় না. অনুমিত হয় া; উহা আত্মগত নয়, আবার পরগতও নয়। (১) যদি বল, রতি প্রভৃতি ায়িভাবের আস্বাদই রসানুভূতি এবং ওই সকল স্থায়িভাবের আধার শ্রোতা বা প্রেক্ষক স্বয়ং, তবে শৃঙ্গাররসের অনুভবে যেমন সুখবোধ জন্মে, সেইরূপ করুণরসের অনুভূতিস্থলেও অনুরূপভাবে দুঃখ অনুভূত হয় না কেন? আমরা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমাভিনয় দর্শন করিয়া শৃঙ্গাররসের অনুভূতিবশে সুখে মগ্ন হই, কিন্তু ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্বের বিপ্রয়োগদর্শন করিয়া করুণরসানুভূতির ফলে দুঃখদগ্ধ হই না কেন? যদি শোক নিতান্ত আমারই হইত, তবে ক্রৌঞ্চপত্নীর মত আমিও দুঃখসন্তপ্ত হইতাম, অভিনয়দর্শনের সমস্ত আনন্দ মুছিয়া যাইত। আবার দর্শকের এইরূপ প্রতীতিও জন্মে না যে, শকুন্তলা আমারই কান্তা, সীতা আমারই পত্নী। যদিও বা সাধারণ নায়িকার স্থলে দর্শকের এইরূপ মমত্ববোধ জন্মিতেও পারে বটে, তথাপি যেখানে পৌরাণিক দেবদেবী নাটকের নায়ক-নায়িকার স্থলাভিষিক্ত সেখানে প্রেক্ষকের এইরূপ মমতাবোধ অসম্ভব। ত্রিভুবনপূজনীয়া দেবী পার্বতী কখনও সামাজিকগত রতিভাবের আলম্বনবিভাব হইতে পারেন না। যে সকল পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান সভ্যসমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অসম্ভব,—যেমন রামায়ণ-কথায় হনুমান কর্তৃক সমুদ্রলঙ্ঘন, সেই সকল ব্যাপার যখন নাট্যে অভিনীত হয়, কিংবা কবি কর্তৃক তাঁহার কাব্যে বর্ণিত হয়, তবে প্রেক্ষক অথবা পাঠকের রসপ্রতীতির তো কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না? কিন্তু যদি সামাজিকগণের চিত্তে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা ও মমতাবোধ জাগ্রত থাকিত, যদি সে সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক চেষ্টাসমূহকে একান্ত আত্ম-সম্বন্ধভাবে অনুভব করিত, তবে তাহার ওইরূপ অবিসংবাদিত রসপ্রতীতি

কখনই সম্ভবপর হইত না। সহৃদয় দর্শক কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অভিনয় দর্শন করিয়া যে শৃঙ্গাররস আস্বাদন করিয়া থাকে,—উহা যে ঐতিহা মহারাজ দুষ্মন্ত ও আশ্রমকন্যা শকুন্তলার পরস্পর রতিভাবের স্মরণেরই এইরূপ কল্পনাও যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। কেন না, সেই সকল অ বৃত্তান্তেরই স্মরণ সম্ভবপর,—যাহারা পূর্বে অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বর্তম কালের শ্রোতা ও দর্শক কেহই তো মহারাজ দুষ্মন্ত অথবা তাপস শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের পরস্পর অনুরাগও তাঁহা উপলব্ধিগোচর হয় নাই, সুতরাং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পর অনুরাগ বা রা স্মরণই যে প্রেক্ষকের রসানুভূতির প্রতি কারণ,—ইহা কেমন করিয়া স্বীং করিব? যদি বল কবিনিবদ্ধবাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পর প্রীতি সম্বন্ধে সামাজিকগণের চিত্তে যে শাব্দবোধ (verbal knowledg জন্মে,—উহাই তাহাদের অলৌকিক আনন্দানুভূতির হেতু, তবে জিজ্ঞা সাধারণ লৌকিক জীবনে লৌকিক নায়ক-নায়িকার পরস্পর অনুরাগবং শ্রবণ করিয়া শ্রোতার চিত্তে ওইরূপ রসবোধ সম্ভব হয় না কে প্রত্যুত, ব্যাবহারিক জীবনে নায়কমিথুনের অনুরাগবর্ণনা শ্রবণে শ্রোত চিত্তে তো লজ্জা, জুগুপ্সা প্রভৃতি ভাবেরই উদয় হয়, সে অনুভূতির মধ্যে ে আনন্দের লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না? ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ কিং আচার্য শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ইহার কোনটিতেই তো উপরিনির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহে সন্তোষজনক মীমাংসা লক্ষিত হয় না। লৌকিক ব্যবহার-জীবনের ভা হইতে কাব্যের ভাষার পার্থক্য কোথায়, লৌকিক পদার্থসমূহের সহিত কাং বর্ণিত ও নাট্যাভিনীত বিভাব প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য কি, এবং লৌকিক অনুভূতি সহিত কবিকর্মসমুদ্ভূত রসানুভূতির এইরূপ লক্ষণীয় বিভিন্নতার প্রতি হেতু কি আচার্য ভট্টনায়ক তাঁহার ভুক্তিবাদে এই সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাং করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বস্তুত, তাঁহার মতবাদ অবলম্বন করিয়া আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিব্যক্তিবাদে'র ভিত্তি প্রবর্তন করেন, এ ক অভিনবগুপ্ত স্বয়ং স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কবিকর্মজনিত রসানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টনায়ক তিনা বিশিষ্ট ব্যাপার বা function কল্পনা করিয়াছেন, 'অভিধা', 'ভাবনা', এব 'ভোগীকৃতি'। সামাজিকের রসবোধের প্রতি এই ব্যাপারত্রয়ের প্রত্যেকটি

রিহার্যভাবে অপেক্ষিত। আমরা যথাক্রমে এই তিনটি ব্যাপারের স্বরূপ না করিবার চেষ্টা করিব।

'অভিধা' বা denotation—ইহা শব্দের ব্যাপার। এই ব্যাপারের বলেই নও একটি বিশিষ্ট শব্দ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। বকর্ম প্রথমত কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে,—এবং ক্যসমূহ পৃথক্ পৃথক্ শব্দের সংহতিমাত্র। সুতরাং ওই সকল বিভিন্ন শব্দ-াত যখন আপন আপন 'অভিধা'শক্তির সাহায্যে স্ব স্ব অর্থের বোধ জন্মাইয়া , এবং সামাজিকগণ যখন ওই সকল অভিধেয় অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন রিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাদের অভীপ্সিত অর্থের প্রতীতি সম্ভব হইয়া কে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবি তাঁহার কাব্যরচনার দ্বারা সহৃদয়ের ত্তে যে অভীষ্ট অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে চাহেন, উহা কেবল শব্দের অভিধা-ক্তির সাহায্যেই সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাচ্যার্থবোধই তো কেবলমাত্র সহৃদয়ের ব্যপাঠ অথবা নাট্যাভিনয়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? আমরা এ কথা বারংবার ল্লেখ করিয়াছি যে, সামাজিকের রসপ্রতীতিই সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। ধু বাচ্যার্থবোধের দ্বারা তো ওই অলৌকিক অনুভূতি উদয়লাভ করিতে পারে ? ভট্টনায়ক সেইজন্য কবিকর্মের একটি বিলক্ষণ ব্যাপার কল্পনা করিয়াছেন, হার নাম 'ভাবনা' বা 'সাধারণীকৃতি', ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয়—universalisation। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাহিত্যিক রসোদ্বোধের চারিটি থক্ উপাদান স্বীকার করিতে হইবে,—বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ও ঞ্চারিভাব। উহারা অভিধেয় অর্থেরই শ্রেণীবিভাগমাত্র। কেন না, শব্দের ভিধাশক্তির দ্বারা যে সকল অর্থ প্রতীত হয়, তাহারা এই চারিটি উপাদানের ় কোন একটির শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেই। সুতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া পায় নাই যে, কাব্যবর্ণিত অর্থসমূহ বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি চারিটি উপাদানের াকারেই সামাজিকের চিত্তে প্রতিভাত হইবে। কিন্তু লৌকিক কার্য, কারণ বং চিত্তবৃত্তি হইতে এই সাহিত্যিক বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য কোথায়? একটু ন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, লোকদৃষ্ট অথবা লোকবর্ণিত অর্থসমূহ দ্রষ্টা অথবা শ্রোতার নিকট হয় একান্ত স্বকীয়ভাবে, নতুবা একান্ত পরকীয়ভাবে প্রতিভাত য়। লৌকিক জীবনে আমরা কোন একটি জিনিসকে, সে বাহ্যজগতেরই হউক থবা মনোজগতেরই হউক, হয় একান্ত আমার বলিয়াই গ্রহণ করি, নতুবা

উহার সহিত আমার যেন কোনও সম্বন্ধই নাই, উহা নিতান্তই পরকীয়, আমি কেবল উহার উদাসীন সাক্ষিমাত্র—এইরূপ ভাব দেখাইয়া থাকি। ব্যাবহারিক জগতে আমরা কোনও ক্রমেই এই ঐকান্তিক মমতা ও ঐকান্তিক তাটস্থ্য ঔদাসীন্য—এই সীমাদ্বয়কে অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু কবিবর্ণিত বিভাবাদির সহিত সহৃদয় সামাজিক চিত্তের সম্বন্ধ কি ব্যাবহারিক জীবনের ও মমতা ও ঔদাসীন্যরূপ পরিধিদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ভট্টনায়ক বলেন: তা নহে। সাহিত্যিক রসপ্রতীতির স্থলে কবিবর্ণিত অর্থসমূহ সামাজিকগণের চিত্তে একান্ত আত্মগত অথবা একান্ত তটস্থ কোনওরূপেই প্রতিভাত হয় না। বিভাব প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত পদার্থসমূহ স্ব-পর-বিকল্পের অতীতরূপে সর্বসাধারণ ভাবে সহৃদয়ের চিত্তে উপস্থাপিত হয়। সহৃদয় দর্শকের দৃষ্টিতে শকুন্তলা শকুন্তলারূপে, নিজের প্রেয়সীরূপে প্রতিভাত হন্ না। অথবা স্বতন্ত্র পরকীয়া নায়িকারূপেও অনুভবগোচর হন না। কবিকল্পিত শকুন্তলা পাঠকের অথবা প্রেক্ষকের নিকট শুধু একটি symbol মাত্র। আর কিছুই নহে। শকুন্তলা কেবলমাত্র কান্তারূপে সাধারণ সহৃদয়ের চিত্তভূমিতে অবতীর্ণ হন। কবিকল্পিতা সীতাদেবী তাঁহার সমস্ত ঐতিহাসিকতা বিসর্জন দিয়া সহৃদয়ের রসানুভূতি বিভাবরূপে আবির্ভূতা হন। তিনি তখন রাজর্ষি জনকের পুত্রী নন, মহারাজ দশরথের কুলপ্রদীপ রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্যা নন, তিনি তখন দেশকালবিনির্মুক্ত নায়িকার আদর্শ প্রতীক, একটি universal idea মাত্র। নায়কের ক্ষেত্রে সেই একই কথা। সুতরাং ঐতিহাসিক সর্বলোকবন্দনীয়া সীতাদেবী যদি তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্টতা লইয়া জনকতনয়ারূপে, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূরূপে সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির আলম্বন হইতে পারেন না বটে, তথাপি আদর্শনায়িকা শাশ্বত প্রতীকরূপে, কান্তারূপে তিনি সমস্ত সহৃদয়-সমাজেরই আলম্বনবিভাব হইতে পারেন, কোনও বাধাই আর থাকিতে পারে না—"তা এব চ পরিত্যক্ত বিশেষা রসহেতবঃ"। এই স্থলে অনেকে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন: সব ক্ষেত্রেই যদি কবিবর্ণিত নায়ক-নায়িকা আপনাদের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সর্বজনীনরূপে সহৃদয়ের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে, যদি সীতা এবং শকুন্তলা নিজ নিজ অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র কান্তারূপে প্রেয়সীরূপে দর্শকচিত্তে আবির্ভূতা হন, তবে নায়িকা যে-স্থলে নায়কের সোদরা ভগিনী, সে স্থলে দর্শকের চিত্তে এইরূপ কান্তাবুদ্ধি, প্রেয়সীবুদ্ধির উদয় হয় না

ন? কেনই বা সেই স্থলে তাদৃশ নায়িকাবিষয়ক শৃঙ্গারানুভূতি দর্শকের
ত্তে উপলব্ধ হয় না? রসগঙ্গাধর-প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভট্টনায়কবর্ণিত
ৎ সাধারণীকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ
রয়াছেন: কবিবর্ণিত নায়ক নায়িকা সহৃদয়ের রসানুভূতির প্রতি 'বিভাব'-
প কল্পিত হইতে পারে তখনই, যখন ঐরূপ 'বিভাব' হইবার পক্ষে কোনও
তিবন্ধক বর্তমান থাকিবে না। 'ভগিনী'তে কান্তাবুদ্ধি জন্মে না সে
দয়ের শৃঙ্গারানুভূতির 'আলম্বনবিভাব' হইতে পারে না,—কেন না, লৌকিক
ইতে ভগিনীর প্রতি প্রণয়মূলক আসক্তি গর্হণীয় সুতরাং এই লৌকিক
স্কার অভিনয়দর্শনকালেও সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে জাগরূক থাকে
বং সেই বাধজ্ঞানই সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।(১)
রুণ, বীর প্রভৃতি রসান্তরের স্থলেও অনুরূপ বাধজ্ঞানের অভাব থাকিলেই
য়কনায়িকা সামাজিকের রসানুভূতির 'বিভাব' হইতে পারে। অন্যথা নহে।
র্যোধনের উরুভঙ্গ দেখিয়া কোনও সহৃদয় দর্শকের চিত্তে করুণরসের উদ্রেক
য় না, কারণ পূর্ব হইতেই তাহার চিত্ত দুর্যোধনের প্রতি বিরূপ হইয়া আছে।
এইরূপ পাপিষ্ঠ কিরূপে আমাদের শোকভাজন হইতে পারে, ঈদৃশ দুষ্কর্মকারীর
ন্য শোক করা নীতিবিরুদ্ধ'—এইরূপ একটা সংস্কার সামাজিকের চিত্তে
মূলভাবে রোপিত থাকে, সেইজন্য দুর্যোধন কখনও প্রকৃত সহৃদয়ের করুণ-
নুভূতির আলম্বন হইতে পারেই না। সেইরূপ নায়কে কাপুরুষত্বজ্ঞান
রসের প্রতিবন্ধক। শৃঙ্গারের 'বিভাব' অগম্যা হইবে না, করুণের 'বিভাব'
শোচ্য হইবে না, বীররসের 'বিভাব' কাপুরুষ হইবে না—এইভাবে প্রত্যেক

(১) এইগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি দৈহিক ও সামাজিক নিষেধমাত্র,—psychologyতে
হাদের বলা হয় social inhibitions. যে দেশে বা সমাজে ভগিনীর সহিত প্রণয়সম্বন্ধ
তিবিগর্হিত নহে, তদ্দেশীয় দর্শকের পক্ষে অভিনয়স্থলে ভগিনীও কান্তারূপে তাহার শৃঙ্গার-
নুভূতির আলম্বনবিভাব হইতে পারে, কোনও বাধাই নাই। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়সমাজে
তুলসুতার পরিণয় প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত, সুতরাং পিতৃষসার পুত্র ও মাতুলের পুত্রীকে
য়কনায়িকারূপে কল্পনা করিয়া যেখানে নাটক রচিত হইয়াছে, সেখানে দ্রাবিড়দেশীয় সহৃদয়ের
ঙ্গারানুভূতির পক্ষে কোনও বিঘ্নই যে ঘটিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।—'স্বমাতুলসুতাং প্রাপ্য
দাক্ষিণাত্যস্তু নৃত্যতি'।—লৌকিক আচার ব্যবহার ও নীতিবোধ যে আমাদের সাহিত্যিক
নুভূতির উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ইহার দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত
য়।

রসের বিভাবের পক্ষে কতকগুলি নেতিমূলক জ্ঞান (negative judgmen অবশ্যই থাকিতে হইবে। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য : ভগিনীর স্থলে কান্তা যেমন 'ইনি অগম্যা' এইরূপ সংস্কারপ্রসূত বাধজ্ঞানের ফলে রসলাভ কি পারে না, শকুন্তলার স্থলেই বা কিজন্য এইরূপ বাধজ্ঞান কান্তাবুদ্ধির প্রতিব হইয়া দাঁড়ায় না? শকুন্তলার প্রতি, সীতার প্রতি প্রীতিও তো তুল্যভ নীতিবিরুদ্ধ? অনেকে বলিবেন, সহৃদয় আপনাকে দুষ্মন্ত প্রভৃতি নায়ক সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, সুতরাং শকুন্তলার প্রতি কিংবা সীতাদে প্রতি তাঁহার প্রণয়মূলক আসক্তি বা রতি লৌকিক নিষেধবুদ্ধির দ্বারা বা হইতে পারে না। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য: আমি একজন নিঃস্ব প্রাকৃত হইয়া কিরূপে সার্বভৌম নরপতি দুষ্মন্তের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করি আমি একজন আধুনিককালের নগণ্য মানুষ, কিরূপে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র হ উঠিব? এইরূপ শত শত বৈধর্ম্য উত্তীর্ণ হইয়া দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ম কিরূপে অভেদ সাধিত হইবে? ইহার উত্তরে ভট্টনায়ক বলেন : সত্য ব প্রেক্ষক আপনাকে নায়কনায়িকার সহিত অভিন্নভাবে কল্পনা করিতে প না। কেন না, দেশ, কাল, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি শত শত বৈধর্ম্য ঐরূপ অভেদবো প্রতিবন্ধক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাব্যপাঠ অথবা নাট্যদর্শন হইতে সামাজি গণের রসবোধের কোনও বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি নায়ি যেমন তাহাদের সাধারণীকৃত কান্তারূপ পরিগ্রহ করিয়া সামাজিকগ লোচনের সমক্ষে বিভাবরূপে প্রতিভাত হন, সেইরূপ আমি যে দুষ্মন্ত : কিংবা রামচন্দ্র নহি, এইরূপ ভেদবুদ্ধিও তখনকার মত স্থগিত বা প্রতি থাকে। 'আমি দুষ্মন্ত'—বিধিমুখে (positive) এইরূপ অভেদবুদ্ধি না জন্মি পারে বটে; কিন্তু 'আমি দুষ্মন্ত নহি' এইরূপ অসম্ভাবনা অভি দর্শনকালে সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে উদিত হইতে পারে না। এবং ভেদবুদ্ধির অভাবই নেতিমূলক হইলেও অভেদবুদ্ধির মতই রসবোধের সহা করে। আমরা Coleridge-এর ভাষায় এই জ্ঞাতীয় জ্ঞানকে "suspens of disbelief" বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।(১) কিন্তু এইরূপ সংশয়

(১) The true stage-illusion in this and in all others things consists—in the mind's judging it to be a forest, but in its remission of the judgn that it is not forest,"—Samuel T. Coleridge : *Lecture on the Progres Drama.*

ভাবনা কাব্যপাঠ অথবা অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় শ্রোতা বা দর্শকের চিত্তে প্রতিলাভ করে না কি জন্য ? কিরূপে উহা তখনকার মত অবলুপ্ত হইয়া , আচ্ছাদিত হইয়া থাকে ? লৌকিক শব্দসমূহ শ্রবণ করিয়া অথবা লৌকিক র্কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া ওই জাতীয় ভেদবুদ্ধির সৃজন কি জন্য সম্ভবপর হয় ? কাব্যপাঠ এবং অভিনয়দর্শনের ক্ষেত্রেই বা কেমন করিয়া রসপ্রতীতি-ঘাতক অসম্ভাবনাপ্রসূত ভেদবুদ্ধি তিরস্কৃত হইয়া থাকে ? আচার্য ভট্টনায়ক ই প্রশ্নের অতি সুন্দর মীমাংসা নির্দেশ করিয়াছেন, এবং পরবর্তী অভিনব-গুপ্তাচার্য প্রমুখ মনীষিবৃন্দ সাহিত্যিক রসানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য ট্টনায়কের এই সমাধানকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টনায়ক বলেন, ব্য ও নাট্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দসংঘাত ও লৌকিক প্রত্যক্ষের কটি প্রধান বৈলক্ষণ্য আছে, যাহার ফলে কাব্যবর্ণিত ও নাট্যাভিনীত অর্থ-হই কেবলমাত্র শ্রোতা ও দর্শকের সমক্ষে সাধারণীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, হার ফলে সামাজিকের সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ দূর হইয়া আত্মার সহিত নাটকীয় রত্রসমূহের ভেদজ্ঞান তাৎকালিকভাবে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কি সেই লক্ষণ্য, যাহার ফলে এই সাধারণীকরণ বা universalisation সম্ভবপর হয় ? াব্যের ক্ষেত্রে দোষাভাব এবং গুণ (যথা, ওজঃ, শ্লেষ প্রসাদ প্রভৃতি) ও লংকারসমূহের যথাযথ সন্নিবেশই এই সাধারণীকরণের মূলে। আমরা পূর্বেই খিয়াছি যে, কাব্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দপ্রয়োগের পার্থক্য প্রধানতঃ ক্রাক্তি অথবা অলঙ্কার সমাবেশে। এইভাবে বিবিধ গুণালঙ্কারমণ্ডিত ষিসম্পর্কশূন্য শব্দসমূহের গ্রহণের দ্বারা কবি তাঁহার পাত্র, পাত্রী, দেশ, কাল, বস্থা প্রভৃতি বর্ণনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে একটি শাশ্বত রূপ সংযোজনা করিতে র্থ হন, এবং তাহাদের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট শক্তির সঞ্চার করিতে রেন যাহা পাঠক অথবা শ্রোতার সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ বিলীন করিয়া দিতে ারে। নাট্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সামগ্রী অভিনীত পদার্থসমূহের সাধারণীকরণ ম্ভব করিয়া তুলে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক এই চতুর্বিধ ভিনয়, বিবিধ নাট্যালঙ্কার এবং লাস্যাঙ্গ, এবং গীত, বাদিত্র ও আতোদ্যের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা অভিনীত পদার্থসমূহ দেশ, কাল এবং অবস্থার সংকীর্ণ রিধি উত্তীর্ণ হইয়া সর্বদেশকালসাধারণ শাশ্বতরূপে সহৃদয়ের দৃষ্টিতে প্রতিভাত ব। সুতরাং এই সাধারণীকৃতি কাব্যের বিবিধ গুণ, অলঙ্কার, রীতি, ছন্দঃ

প্রভৃতি উপাদানের এবং নাট্যের বিচিত্র উপকরণের অলোকসাধারণ শক্তি। অভিনয়ের ক্ষেত্রে রঙ্গপ্রযোজক যে সকল চিত্র এবং পুস্তকর্মের (scenario) সমাবেশ করেন, পূর্বরঙ্গের অবতারণার সময় রঙ্গালয় যে তৌর্যত্রিকে বিচিত্র নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠে, পাত্রপাত্রীগণের উক্তিসমূহ ভারতী, সাত্ত্ব আরভটী এবং কৌশিকী প্রমুখ নাট্যবৃত্তির যথোচিত সংঘটনাবশে যে অপ ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, এ সমস্তই সহৃদয় দর্শকের পরিমিত সত্তা বিস্মরণের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্যই, এ সকলই অভিনীত পদা সমূহকে খণ্ডিত দেশকালের ক্ষুদ্র সীমা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার উপকরণ মাত্র তাহার ব্যঞ্জনিতার উপকরণ নহে। এই সকল বিচিত্র পরিবেশ এবং নাট্যাং এমনই অলৌকিক মহিমা যে, অতিশয় অহৃদয় ব্যক্তিও রঙ্গালয়ের পরিধির ম অবস্থানকালে আপনার অজ্ঞাতসারেই সহৃদয়তায় দীক্ষিত ও রসাস্বাদন হইয়া উঠে।(২) গুণ, অলংকার, রীতি, গীত, বাদিত্র, আতোদ্য, লাস্য প্রভৃ কাব্য ও নাট্যের উপাদানসমূহের বর্ণনীয় ও অভিনেয় পদার্থসমূহের অন্তর্নি সর্বজনীনতা প্রকট করিয়া তুলিবার ও পাঠক এবং দর্শকের পরিমিত ব্যক্তি প্রাচীর ধ্বংস করিয়া তাহাদের মধ্যে অপরিমিত অহংতাবোধ জাগ্রত কর তুলিবার এই যে অলৌকিক ক্ষমতা, ইহাই আচার্য ভট্টনায়কের সিদ্ধা 'ভাবনা' ব্যাপার বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু কাব্যবর্ণিত বা নাট্যাভিনীত পদার্থসমূহের সাধারণীকৃত দেশকালাত রূপের প্রতীতিই তো সহৃদয়ের রসাস্বাদের শেষ কথা নহে। রসচর্বণাজনি সামাজিক চিত্তে যে অলৌকিক আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার হেতু কি? আনন্দাংশের উৎস কোথায় নিহিত আছে, এবং কোন্ ব্যাপারবলেই বা রুদ্ধ উৎসমুখ নিঃসারিত হয়? ভট্টনায়ক রসচর্বণার এই আনন্দানুভূতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সহৃদয়চিত্তের একটি বিশিষ্ট ব্যাপার (function) স্বীক

(১) "তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাব-গুণালঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নি নিজমোহ-সঙ্কচিতা-নিবারণকারিণা বিভবাদিসাধারণীকরণাত্মনাঽভিধাতো দ্বিতীয়েনাং ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮।

(২) "সাধারণ্য মহিম্না সকলভোগ্যত্ব সহিষ্ণুভিঃ শব্দাদিবিষয়ময়ীভি (বৈ?)—রাতে গানবিচিত্রমণ্ডপপদবিন্যাসপণিকাদিভিরুপরঞ্জনং সমাশ্রিতং বেদ্যান্তরেঽপি হৃদয়বৈমল্যপ্রা সহৃদয়ৈরিষ্যতে"—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৮২-৮৩।

য়িয়াছেন, যাহার নাম 'ভোগীকৃতি'। 'অভিধা' এবং 'ভাবনা' পূর্ববর্ণিত এই ইটি ব্যাপার যথাক্রমে শব্দ ও অর্থের স্বতন্ত্র শক্তি। কিন্তু ভোগীকৃতি সম্পূর্ণ-পে সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার। ইহা একটি psychical process। সহৃদয়-ত তখন বাহ্যবস্তু হইতে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া আন্তরজগতের সাধারণীকৃত জ্ঞানমাত্রসার পদার্থসমূহের আস্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত, উহা তখন একান্তভাবে স্বমুখ। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাবের সাধারণীকৃতির ফলে নবচিত্তের যে স্বাভাবিক আসক্তি ও গ্রহণবর্জনস্পৃহা, তাহা তখনকার মত রোভূত হয়। ত্রিগুণাত্মক চিত্তে তখন রজোগুণ ও তমোগুণ ক্ষণিকের জন্য বৃত ও অভিভূত হইয়া থাকে। সুতরাং এই গুণদ্বয়জনিত চাঞ্চল্য, ও ড়তা দুঃখ ও মোহ সহৃদয়ের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হয়। হৃদয়ের অন্তঃকরণ সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ফলে নিরতিশয় স্বচ্ছতা াভ করে। তাহার মধ্যেই সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দময় পরব্রহ্ম—শৈবপ্রত্য-জ্ঞাবাদিগণের মতে যিনি পরমশিব, আপনার অখণ্ডস্বরূপে প্রকাশমান ন। চিত্ত তখন নির্বিষয়, স্থির, মোহবিনির্মুক্ত—আনন্দ ও বিজ্ঞানের াকর পরমশিবের সহিত ঐকাত্ম্যসূত্রে সম্বদ্ধ। বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত ওয়ায়, রজোবৃত্তির উদ্রেকবশত যে চাঞ্চল্য, সাংখ্যপ্রস্থানের আচার্যগণের তে যাহা সমস্ত দুঃখের নিদান, সেই অস্থৈর্য ও চাঞ্চল্য তখন লুপ্ত। ত্রিগুণাত্মক ত্তের সত্ত্বগুণের নিরতিশয় উদ্রেকের ফলেই চৈতন্যের স্বরূপাবরক সমস্ত মল খন দূরীভূত হয়। পূর্ণপ্রকাশমান আত্মচৈতন্য তখন উচ্ছলিত, অপরিমিত রূপানন্দের আস্বাদনে মগ্ন। বেত্তা ও বেদ্য তখন অভিন্ন। গ্রাহ্য ও গ্রাহকের ধ্যে, ভোগ্য ও ভোক্তার মধ্যে তখন কোনও ভেদ থাকে না। এই আস্বাদন কঘন, সমস্ত বিজাতীয় বিষয়চিন্তা হইতে নির্মুক্ত। কাব্যের ও নাট্যের াকাতীত মহিমাবলে স্বভাবত চঞ্চল ও দুঃখযোনি চিত্তে সত্ত্বোদ্রেকবশতঃ দানন্দঘন আত্মতত্ত্বের এই একান্তভাবে বহির্বিষয়পরাঙ্মুখতা, বিষয়ো-রাগবিনির্মুক্তি ও স্বরূপবিশ্রান্তি—ইহাই কবিকর্মজনিত আনন্দানুভূতির গূঢ় রহস্য। এইক্ষণে আত্মা বা পরমশিবের যত কিছু অবিদ্যাবিরচিত াবরণ বা মল, সে সকলই অকস্মাৎ অপগত হয়। তখন 'অহংতা'-বোধ াকে বটে, কিন্তু সে অহংতা (Egoism) সর্বব্যাপক—ব্যাবহারিক জীবনের ণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন অস্মিতা নহে। ব্যাবহারিক জীবনের অস্মিতা ও মমতা

কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমার মধ্যে সম্বন্ধ—দেহ আমার, পুত্র আমার, ঐ আমার, ভার্যা আমার, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ধনী, আমি দরি এইরূপ। কিন্তু যখন কাব্যের সাধারণীকৃতি ও ভোগীকৃতির মহিমাবশে পরিচ্ছিন্ন অহংতাবুদ্ধিলুপ্ত হয়, তখন বিশ্বের সমস্ত পদার্থই—ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড হই আরম্ভ করিয়া সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত কিছু, সমস্তই আমার হইয়া দাঁড় সকলের মধ্যেই আমি নিজের আত্মাকে অনুভব করি। 'সর্বভূতেষু চাত্মা সর্বভূতানি চাত্মনি'। আমি যেমন মানুষ, তেমনই আমি নদী, পর্বত, ত লতা, ওষধি, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ, বিহঙ্গম,—সমস্তই আমি। আমার ব্যক্তি সুখ দুঃখ চিন্তা যেমন আমার, সেইরূপ জগতের সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ চি প্রবৃত্তি সমস্তই তুল্যভাবে আমার। শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে এই ব্যাপক অহংতা ও মমত্ববোধ ইহার সহিত বৈদান্তিক দার্শনিকগণের অহংক ও মমকারের একান্ত শূন্যতা ও বিলুপ্তি, তাহার কোনই পার্থক্য নাই। সর্বা সৃষ্টিকে আমি ও আমার বলিয়া চিন্তা করা এবং অহংজ্ঞানের সম্পূর্ণ বি 'আমি ও আমার বলিয়া কিছুই নাই' এইরূপ বুদ্ধ পরস্পর অভিন্ন। এক দ্বারা যেমন আপনার খণ্ডিত অহংতাজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করি পারা যায়, অপরটিও সেইরূপ তুল্যভাবে মুক্তির সোপান। পূর্ণতা শুধু শূন্যত নামান্তর মাত্র। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাই—খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন অহং বোধই, কেবলমাত্র সমস্ত দুঃখের হেতু, অবিদ্যার আধার। সেইজন্য একজন প্রা দার্শনিক বলিয়াছেন: অহংকার ত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু তাহা দুষ্কর হয়, তবে অহংকারকেই আশ্রয় করিবে, কিন্তু সেই অহংবুদ্ধি সর্বত্র সম ভাবে জাগরূক থাকা চাই।(১) সাহিত্যে রসাস্বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দার্শনিক তথ্যের অবতারণা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে নিপুণভাবে বিচার করিলে ইহার উপযোগিতা ধরা পড়িবে। সহৃদয় দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনয় ও কাব্যপাঠের অবসরে কবিবর্ণিত প্রত্যেক চরি সহিতই আসক্তিশূন্য ঐকাত্মবোধ উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমি দুষ্মন্ত, অ শকুন্তলা, আমি অনসূয়া, আমি প্রিয়ংবদা, আমি কণ্ব, আমি বিদূষক।(২) ব

(১) "ত্যক্তব্যোঽহংকারঃ কিন্তু সর্বদা নৈব শক্যতে ত্যক্তুম্। কর্তব্যোঽহংকারঃ কিন্তু স কর্তব্যঃ"—অপ্পয়দীক্ষিত।

(২) ভারতীয় দর্শনে আত্মার জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। কত যুগযুগান্তর ক্লেশ ও কর্মবিপাকবশত কত বিচিত্র জাতি, আয়ু ও ভোগের মধ্য দিয়া আমার আত্মা প্রব

ামি দুষ্মন্ত নই, শকুন্তলা নই, অনসূয়া নই, প্রিয়ংবদা নই, কণ্ব নই, বিদূষক ই। সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই এই আত্মানুভূতি সম্ভবপর হয়, শুধু সর্বব্যাপক

য়া আসিয়াছে, সেই সকল ক্লেশকর্মবিপাকানুভবজনিত বিচিত্র বাসনা আমার চিত্তভূমিকে ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, বহুবর্ণ তন্তু যেমন পটকে বিচিত্র করিয়া রাখে, ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রন্থি যেমন স্তজালকে চিত্রিত করিয়া রাখে। সুতরাং উপযুক্ত উদ্বোধক হেতুর সদ্ভাবে সেই সকল বিচিত্র সনাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি াস বলিয়াছেন: "ক্লেশকর্মবিপাকানুভবনির্বর্ত্তিতাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসমূর্চ্ছিমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততম্"।—যোসহ, ভাষ্য ২।১৩। রবীন্দ্রনাথের াকার কয়েকটি কবিতায় ও 'জীবনদেবতা' তত্ত্বে বিচিত্র জন্ম ও অনুভূতির মধ্য দিয়া আত্মার অগ্রগতির তথ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন, "যুগে যুগে এসেছি চলিয়া, ছলিয়া ছলিয়া, প চুপে, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে।" (বলাকা-৮), "প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস / খের দুখের কাহিনী / পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই / অতীতের বত রাগিণী // পুরাতন সেই তি / সে যেন আমারি স্মৃতি / কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার / গোপনে রয়েছে নিতি / প্রাণে তাহা ত মুদিয়া রয়েছে / কত বা উঠিছে মেলিয়া / পিতামহদের জীবনে আমরা / দুজনে এসেছি লিয়া।"—ইত্যাদি। অভিনয়ের স্থলে সহৃদয় সামাজিক যে স্ত্রী ও পুরুষ, পাত্র ও পাত্রীর, চিত্র অনুভূতিসমূহের সহিত ঐকাত্ম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহাও ওই একই কারণে। ধুনিক শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারাও সহৃদয়ের এই অনুভূতি সমর্থন করিতে পারা যায়। ত্যক প্রাণিদেহের গঠনের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষণ বিদ্যমান আছে, ফলে তাহাদের নসিক গঠনও উভয়লক্ষণাক্রান্ত। আমরা কেহই দৈহিক বা মানসিক, কোনও দিক দিয়াই পুরুষ বা পূর্ণ স্ত্রী নহি—আংশিক পুরুষ এবং আংশিক স্ত্রী। তবে অংশের মধ্যে তারতম্য ছে বটে। সুতরাং আমাদের দেহ ও মনের এই দ্বিলিঙ্গতার (bisexuality বা her-aphroditism) ফলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ পাত্র পাত্রীর অনুভূতির সহিত আমরা নিজেদের কাত্ম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হই এবং ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। তুলনীয়:

"For a long time it was believed, not only by the ignorant but also by the structed, that masculine and feminine were two antagonistic and profoundly ferentiated entities. Man and woman were set widely apart in our minds, d the concept of the integrity of our own sex was maintained as an inviolate characteristic of personality. To cast any doubt on one's manhood or 's womanhood was regarded as an insult, especially to the male. Because this attitude, all intersexual states, whether they affected the physical te (hermaphroditism) or the psychological make-up (intersexual conditions, mosexuality), were looked upon either as repulsive monstrosities or else as nous sins.

"As a result of our biological survey, we are in a position to see that this

আত্মচৈতন্যের আবরক মলাপসরণের ফলে, উপরিবর্ণিত পূর্ণ অহংভাবোদ্ভ স্ফুরণের ফলে। এমন কি, রামায়ণপাঠকালে হনুমানের সাগরলঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক কার্যও তখন প্রকৃত সহৃদয়ের নিকট অপ্রাকৃত বলিয়া বোধ হয় না। উহার মধ্যেও তখন আমিত্ববোধ অনুস্যূত হইয়া থাকে। এই পরিপূর্ণ অহংভাব স্ফুরণের দ্বারাই চিরাতীত ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষীকরণ ও শ্রবণের ফলে কোন বাধবুদ্ধির উদয় হয় না; কেন না, আমাদের অন্তর্যামী যে অখণ্ড পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্য বা পরমশিব, তিনি সমস্ত কালের সহভাবী, তিনি অতীত, অনাগত ও বর্তমান প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন। এই পরিপূর্ণ আত্মতত্ত্বের অবচ্ছেদক কোন জাতি (genus) নাই, ব্যক্তি (gender) নাই, দেশ নাই, কাল নাই। সেইজন্যই সহৃদয় পুরুষ ও রমণী বালক ও বৃদ্ধ প্রত্যেক পাঠক ও দর্শক সমভাবে নাট্যবর্ণিত সর্বজাতীয় পদার্থের সহিত সহানুভূতি বোধ করিতে সমর্থ হন। সীতার দুঃখে যেমন আমরা কাতর হই, হনুমানের বীরত্বে তেমন

---

was an entirely false way of looking at sex, and that we must change our views. The two sexes, masculine and feminine, are not two separate and distinct entities standing widely apart. Rather must we regard them as two conditions that may approach each other and 'end by fusing in a phase of primitive ambiguity' (Maranon). In every male lurks a female, in every female a male, sometimes so arrogant as to mask the true personality, sometimes so shy as to be scarcely perceptible. No longer can we speak of 'male type' and of the 'female type', but rather of a series of infinite gradations "which extend from a flagrant hermaphroditism to forms so attenuated that they merge into normality itself" (Maranon)". *The Physiology of Sex*: Kenneth Walker. পৃ. ৩২-৩৩ (Pelican Books, 1945). Freudও বলেন: "A certain degree of an atomical hermaphroditism really belongs to the normal. In no normally formed male or female are traces of the apparatus of the other sex lacking .... The conception which we gather from this long known anatomical fact is that there is an original predisposition to bisexuality, that in the course of development this changes to monosexuality, leaving only slight remnants of the stunted sex.

"It was natural to transfer this view to the psychic sphere and to conceive the inversion in its aberrations as an expression of psychic hermaphroditism." Sigmund Freud: *Three Contributions to the Theory of Sex*. পৃ. ৫৫৮ (*The Basic Writings of Sigmund Freud*: The Modern Library, New York, 1938).

ৎসাহিত হই, আবার মহারাজ দুষ্মন্ত কর্তৃক অনুগম্যমান এক মৃগপোতকের
তিও (৩) আমাদের চিত্তে সমানভাবে ভয়ানকরসের সঞ্চার করে। এই
শকালবয়োবস্থাজাতিব্যক্তি প্রভৃতি ব্যাবহারিক অবিদ্যারচিত অবচ্ছেদক বা
mtation-এর অতীত আত্মচৈতন্যের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ অহংতাবোধ
ত্যেকের সহিতই সমানভাবে অনুস্যূত হইয়া থাকে। সুতরাং অভিনয়দর্শন-
লে সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তের যে অলৌকিক প্রতীতির উদয় হয়, উহা যেমন
ক দিকে একান্ত ব্যাপকভাবে personal বা আত্মকেন্দ্রিক, অপর দিক দিয়া
চার করিলে উহা সম্পূর্ণ impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক। কেন না, যে
হংজ্ঞানের মধ্যে কোনও খণ্ডতা নাই, তাহা অহংকারশূন্যতারই নামান্তর।
র্বেই বলিয়াছি—অখণ্ড শূন্যতা ও অখণ্ড পূর্ণতা বিচারদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন।
ইজন্যই আচার্য ভট্টনায়ক সহৃদয়ের রসচর্বণাকে যোগিগণের ব্রহ্মাস্বাদের সহিত
গনা করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ অহংতাবোধ, সম্বোদ্রেক, চৈতন্যের
স্তর্মুখীনতা, স্বসংবেদন ও আনন্দনির্ভাস সমান।(১) তবে উভয়ের
স্পর ভেদ কোথায়? সাহিত্যিক রসাস্বাদ ও জীবন্মুক্ত যোগীর আত্মসাক্ষাৎ-
রঞ্জনিত আনন্দচর্বণার প্রকার এক হইলেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে।
াগিগণের সাক্ষাৎকার বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট। কিন্তু
হৃদয়ের রসচর্বণা অন্তর্মুখীন হইলেও, বাহ্যবস্তুর সহিত অনালিঙ্গিত হইলেও,
ান্তর রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের প্রতিভাসের দ্বারা শবলিত। আত্মচৈতন্য
মন স্বমহিমায় প্রকাশ পাইতে থাকে, সেইরূপ ওই চৈতন্যের স্ফুরণের দ্বারা
ান্তর রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবও প্রকাশিত হইয়া উঠে। সেইজন্যই ভট্টনায়ক
াচর্বণাকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়াছেন। সুতরাং রসচর্বণায় আত্মার আনন্দ

(৩) যাঁহারা প্রসিদ্ধ ছায়াশিল্পী Walt Disneyর দ্বারা চিত্রিত ও প্রযোজিত 'Bambi' াচিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, একটি সামান্য তির্যক্ প্রাণীর, মৃগশিশুর জন্ম ও কৈশোরবৃত্তান্ত মানবের জীবননাট্যের মতই সহৃদয়ের চিত্তে বিভিন্ন রসের দ্রেক করিতে পারে ও তাহাতে পরিপূর্ণ অহংতাবোধের জাগরণের প্রতি কোনই প্রতিবন্ধক স্থিত হয় না।

(১) পাঠ্যাদথ ক্রবাণানাং ততঃ সম্পূরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হৃদ্যত্যন্তর্মুখঃ ক্ষণম্।
ততো নির্বিষয়স্তস্য স্বরূপাবস্থিতো নিজঃ।
ব্যজ্যতে হ্লাদনিষ্যন্দো যেন তৃপ্যন্তি যোগিনঃ।"—ব্যক্তিবিবেক, পৃ. ৯৪।

ও চৈতন্যাংশ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা উপরক্ত,—ওই সকল স্থায়িভ চিদানন্দময় ব্রহ্মের উপাধি বা adjunct মাত্র। সেইজন্যই শৃঙ্গার, হাস্য, করু রৌদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রসানুভূতির স্থলে আনন্দোপলব্ধি যদিও সর্বসাধার তথাপি সেই আনন্দের মধ্যে প্রকারভেদ আছে, বৈলক্ষণ্য আছে। এব স্ফটিকখণ্ড যেমন জবা, নীলোৎপল, প্রভৃতি কুসুমের সান্নিধ্যবশত যথাক্রমে র নীল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হ সেইরূপ স্বরূপাবস্থিত আত্মচৈতন্যের নৈসর্গিক আনন্দ যদিও অপরিণামী ভেদশূন্য, তথাপি কাব্য ও নাট্যের ভাবনাব্যাপারের বশে রতি প্রভৃতি বিভি স্থায়িভাব যখন হৃদয়সংবাদক্রমে সহৃদয়ের অন্তরের মধ্যে সংক্রামিত হই নিরাবরণ চৈতন্যের সান্নিধ্যে উপস্থাপিত হয়, তখন সেই সেই স্থায়ীর দ্বা উপরঞ্জিত আনন্দও স্বরূপত অভিন্ন হইলেও সহৃদয়ের অনুভূতিতে বিভিন্ন আকা প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এইজন্য, শৃঙ্গারে আমরা যে আনন্দ অনুভব কা করুণরসের চর্বণাজনিত আনন্দোপলব্ধি হইতে উহা বিলক্ষণ। কেন প্রথমটিতে আনন্দাংশের উপাধি রতি, দ্বিতীয়টিতে শোক।

সুতরাং ভট্টনায়কের মতে রসচর্বণার উপযোগী ব্যাপারত্রয় কল্পনা করি হয়—অভিধা, ভাবনা, ও ভোগীকৃতি। এই তিনটির মধ্যে 'ভোগীকৃ ব্যাপারটিই মুখ্য, অন্য দুইটি তাহার অঙ্গ মাত্র। সেইজন্য ভটনায়ক বলিয়াছেন 'দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্যে কাব্যগীর্ভবেৎ।'

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী টীকাকারগণ ভট্টনায়কের উপরিবর্ণি ভুক্তিবাদকে সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পনা করেন। সত্য বে সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ, এই গুণত্রয় ভট্টনায়ক স্বীকার করিয়াছেন, এবং সাংখ্য দর্শনই উহাদের আকর। কিন্তু পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য দার্শনি প্রস্থানও সাংখ্যদর্শনের ওই গুণত্রয়বাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার দ্বা ভট্টনায়কের মতবাদ যে সাংখ্যসিদ্ধান্তের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এইরূ নিঃসন্দেহ উক্তি যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। সত্ত্বগুণের উদ্রেক, এবং রজঃ তমোগুণের অভিভবের ফলে অন্তরে যে সুখ ও নৈর্মল্যের অভিব্যক্তি হই থাকে, ইহা কেবল সাংখ্যদর্শনেরই সিদ্ধান্ত নহে, পরন্তু অধিকাংশ আস্তিক দর্শনেরই সাধারণ সিদ্ধান্ত, পারিভাষিক সংজ্ঞায় যাহাকে বলা হয় "সর্বত সিদ্ধান্ত"। ভট্টনায়ক ভোগীকরণের ক্ষেত্রে রজঃ ও তমোগুণের অভিভব এ

ত্বাস্বেকজনিত নৈর্মল্য ও সুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য
ই বিষয়ে তাঁহার মতবাদ সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিপরীতগামী। সাংখ্যমতে সুখ
চিত্তের ধর্ম, চৈতন্য বা পুরুষের ধর্ম নহে, কিন্তু ভট্টনায়কের মতবাদ সূক্ষ্মভাবে
লোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, রসচর্বণাজনিত আনন্দ সচ্চিদানন্দময়
ত্মচৈতন্যেরই স্বরূপ। সাংখ্য দর্শনই যদি আচার্য ভট্টনায়কের উপজীব্য হইত,
বে রসানুভূতি, সুখ ও দুঃখ, উভয়াত্মক হইত।(১) কিন্তু আমরা দেখিলাম
ট্টনায়কের রসচর্বণার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র নাই, উহা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।
তরাং ভুক্তিবাদ এবং সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে এইরূপ গূঢ় ভেদ বর্তমান
কিতে আমরা কিরূপে ভট্টনায়ককে সাংখ্যমতানুসারী বলিয়া কল্পনা
রিব? (২)

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আচার্য ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ
াশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শারদাতনয় তাঁহার
াবপ্রকাশ' গ্রন্থে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং আমরাও সেই অনুসারেই
ক্তিবাদের ব্যাখ্যা দিয়াছি। কাশ্মীর প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রধান কেন্দ্র, এবং
শ্মীরই আচার্য ভট্টনায়কের জন্মভূমি। অভিনবগুপ্ত কুন্তকাচার্য মহিমভট্ট
ভৃতি প্রাচীন সমস্ত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিকই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রস্থানের দার্শনিক
লেন, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থের মঙ্গলাচরণশ্লোক প্রভৃতি আলোচনা করিলেই

(১) "যেন স্বভাবাদি-সুখদুঃখজননশক্তিযুক্তা বিষয়সামগ্রী বাহ্যের। সাংখ্যাদৃশা সুখদুঃখ-
াবো রসঃ ..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮। সত্য সত্যই রসানুভূতির স্থলে দুঃখেরও
ভূতি সম্ভব কি না, ইহার বিস্তৃত বিচার পরে করা যাইবে। 'নাট্যদর্পণকার' রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র
নুভূতির এই দ্বৈধস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(২) প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক Hiriyanna ওই সকল ভেদ লক্ষ্য না করিয়াই
াব্যপ্রদীপ'কারের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ'কে সাংখ্য-
দ্ধান্তানুসারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য:

"I have stated that in not a few systems of philosophy, there was a delibe-
e application of fundamental principles to the interpretation of *Rasa*. The
tinctive doctrines of more than one system are found mentioned in Sanskrit
rks on Poetics. As an illustration of them, I shall take up the theory of
sa associated with the name of *Bhattanayaka* and show how it is identical
ch the Samkhya theory...."—*Indian Aesthetics*., Proceedings and Transac-
ns of the First Oriental Conference: Poona 1919, পৃ. ২৪৬।

বুঝা যায়। ভট্টনায়কও যে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী দার্শনিক ছিলেন, ইহা তাঁহ রসসূত্রের ব্যাখ্যার ভাষা ও শৈলী হইতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হই থাকে। সংবিদ্‌বিশ্রান্তি, আনন্দঘন, উল্লাস প্রভৃতি শব্দ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শ বিশিষ্ট সম্পদ্ এবং ভট্টনায়ক তাঁহার রসসূত্রের ভাষ্যে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনস এইরূপ বহু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ থা তবে আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিনবভারতী'তে ভট্টনায়ক বিরচিত মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেইটি আলোচনা করিতে অনুরোধ কি

নমস্ত্রৈলোক্যনির্মাণকবয়ে শম্ভবে যতঃ।
প্রতিক্ষণং জগন্নাট্যপ্রয়োগরসিকো জনঃ॥

ইহার সহিত শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদের অন্যতম প্রধান আচার্য উৎপলদে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তুলনা করিয়া দেখিলে ভট্টনায়কের দার্শনিক মতবাদ সম্ব আর কোনও সংশয় অবশিষ্ট থাকে কি?—

নিরূপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥

এই শম্ভু, শূলী বা পরমশিব বেদান্তদর্শনের আত্মচৈতন্যেরই নামান্তর। কি বেদান্তদর্শনের সহিত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রধানতম বৈলক্ষণ্য হইতেছে, আত্মতত্ত্বের স্বরূপ লইয়া। বেদান্তমতে আত্মা নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, বাহ্যপ্রপঞ্চে সহিত সংস্পর্শবিরহিত; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতে চৈতন্য সতত পরিস্পন্দশী উল্লাসময়, প্রপঞ্চের সৃষ্টিই আত্মার নিয়ত লীলা। বেদান্তমতে আত্মা উদাসী প্রত্যভিজ্ঞামতে আত্মার সহিত জগৎসৃষ্টিক্রিয়া সতত বিজড়িত। বেদান্তম জগৎ মায়াময় মিথ্যা; প্রত্যভিজ্ঞামতে চৈতন্য ও প্রপঞ্চের সত্তা সমান্তরা সহভাবী, অবিচ্ছেদ্য। বেদান্তমতে অহংতা ত্রিগুণাত্মক জড়চিত্তের ধর্ম, শৈ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে আত্মচৈতন্যের প্রকাশের মধ্যেই "পরিপূর্ণ" অহংতার স্ফু বর্তমান, অহংতা চৈতন্যের ধর্ম, জড়ের নহে। বেদান্তমতে অহংতার বিলো আত্মতত্ত্বলাভ সম্ভব; শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে খণ্ডিত অহংতা বি করিয়া পরিপূর্ণ অহংতাবোধ জাগ্রত করিয়া তোলাই মুমুক্ষু যোগীর প্রধান লক্ষ্য। আর সব বিষয়ে বেদান্ত ও শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা প্রস্থানের মধ্যে কো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই। উভয় মতেই চৈতন্য পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ জ্ঞা পরিপূর্ণ আনন্দের আধার খণ্ডিত সত্তা, খণ্ডিত জ্ঞান, খণ্ডিত আনন্দ

বাধ শুধু চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানেরই বিচিত্র লীলা—বেদান্তমতে এই জ্ঞানেরই অপর নাম অবিদ্যা; শৈবপ্রত্যভিজ্ঞামতে মল। সত্ত্বের উদ্রেকের লে এই অবিদ্যা অথবা মল অপসারিত হইয়া, আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশানন্দময় রূপ অনাবৃত হইয়া পড়ে—তাহাই মুক্তি। কাব্যেরও তাহাই লক্ষ্য। বেদান্ত, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতবাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সাম্যবশতই পরবর্তী ালঙ্কারিকগণ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত আচার্য অভিনবগুপ্তের সসিদ্ধান্তকে,—যাহা 'অভিব্যক্তিবাদ'রূপে সাহিত্য-মীমাংসাক্ষেত্রে পরিচিত,— বদান্তদর্শনের সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা অভিব্যক্তিবাদের ালোচনা প্রসঙ্গে সেই মতবাদের পরীক্ষা করিব।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সংবাদ-সাহিত্য

অত্যন্ত আশা ও আশ্বাসের কথা যে, ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের সাময়িক আদেশের প্রতিবাদ করিয়া "বন্দে মাতরম্"কেই ভারতের জাতীয়-সঙ্গীতরূপে বহাল রাখিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। বাম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রিয়াছেন যে, "বন্দে মাতরম্" ছাড়া অন্য কোনও গান ভারতের জাতীয়-জীত হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। যতদূর জানি, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-র্তৃপক্ষ অনুরূপ মত পোষণ করেন, আসামও "বন্দে মাতরম্" চায়। ইঁহারা যে াহস করিয়া সমবেতভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। াংলা দেশ হইতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী সর্বাগ্রে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন ত্য, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অদ্ভুতভাবে নীরব আছেন। ম্ভবত তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক দড়ি-টানাটানি খেলায় পরস্পরকে স্থানচ্যুত রিবার গুরুতর কাজে এত অধিক ব্যাগ্র ও ব্যাপৃত আছেন যে, এই সকল াল্‌কা বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় তাঁহাদের নাই। আমাদের ববেচনা অন্যরূপ। যে প্রসঙ্গ লইয়া জান্ কবুল করার কথা, সেটিকে উপেক্ষা রিয়া বা ধামাচাপা দিয়া মরা কংগ্রেসের সদস্য আহরণ, সংযোজন ও বিতাড়ন ইয়া এইরূপ মাতামাতি করার মধ্যে ক্ষমতা ও অর্থ অর্জনের যে কুৎসিত লোভ

প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বীভৎস স্বরূপ দেখিয়া আমরা লজ্জিত ও শঙ্কি হইতেছি। কনট্রাক্ট ও চাকুরির ঘুষ দিয়া দল বজায় রাখিয়া শাসন-ক্ষম অব্যাহত রাখিতে ইহারা এতই উদ্‌ভ্রান্ত ও "উৎক্ষিপ্ত" হইয়া উঠিয়াছেন মাতৃ-বন্দনা চুলার দুয়ারে গিয়াছে, ইহাদের ভাড়াটে কবিকে দিয়া "ব স্বার্থম্" গান লিখাইয়া সেটিকে কি করিয়া জাতীয়-সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া য ভিতরে ভিতরে তাহারই চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং ইহাদের নীরবতা অকা নয়। যে মায়ের ডাকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ইহারা মিলিত হইয়াছিলেন, মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করিয়া ইহারা ফাঁসির মঞ্চ, আন্দামান, কারাগার এ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎপীড়ন-অত্যাচার অকাতরে অতিক্রম করি স্বাধীনতার সিংহদ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাহার কাজ ফুরাইয়াছে; এখ যে জনগণের তুষ্টি-অতুষ্টিতে ইহাদের মরণ-বাঁচন, সেই জনগণের মন ভুলাইবা মন্ত্র প্রয়োজন। অতএব বিদায় "বন্দে মাতরম্"।

* * *

ইহারা নীরব থাকিলেও বাংলা দেশে "বন্দে মাতরমে"র সরব বিরোধীর অভাব নাই। স্বদেশী আন্দোলনের কালে যে দুইটি অধুনালুপ্ত সাময়িক পত্রি "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র প্রচার করিয়া বাংলা-ভাষাভাষীদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-সম্মানে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, তাহারই একটির নাম ভাঙাইয়া যে বাংলা দৈনিক আজ ব্যবসা করিতেছে তাহার বিবেকবুদ্ধিহীন লেখনী "বন্দে মাতরমে" বিরুদ্ধেই উদ্যত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের একজন চিরবালখিল্য সাহিত্যিক দেশকে মা-মা করার কুসংস্কার বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না, বাবা বিধাতা বন্দনা তাই ইঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। একদল সর্বসংস্কারমুক্ত নিরাকারধর্ম ভক্তও এই সঙ্গে জুটিয়া "জয় হে জয় হে" শুরু করিয়াছেন। তাঁহারা ভুলি গিয়াছেন, মায়ের নামে মাতামাতি করাই ভারতবর্ষের স্বভাব, এ দেশে প্রাণধর্ম মাকে কেন্দ্র করিয়াই স্ফূর্তি পায়; বাংলা দেশের এই বিশেষত্ব কে সর্বজনবিদিত। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিধাতার দরবারে পৌছিবা পূর্বে দীর্ঘকাল এই মায়ের ঘরেই মনেপ্রাণে সাধনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমে "বন্দে মাতরমে"র সেই আদর্শ ও প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীত হইতে মুছিয়া ফেলা সম্ভব নহে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই যে শুরু করিয়াছিলে "তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ", প্রবীণ স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ সে

ভূবন্দনার ধুয়াই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিযুগে সক্ষম ভাবেই ধরিয়া গিয়াছেন। যে ভাষী একদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার-যুদ্ধে অগ্রণী হইয়া নেতৃত্ব করিয়াছিল, হাদেরই বুকের রক্তে এবং মনের প্রেমে সিক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গানের নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি ভারতবর্ষের সাহিত্যে আজিও স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল রিতেছে—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক্
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো—
ওমা তোর চরণেতে দিলেম আমি মাথা পেতে
দে গো তোর পায়ের ধূলা সে-যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা ব'লে ভাসা তরী।
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে—
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে।
এস বজ্র মহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে।
ও গো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র অগ্নিবরণ।
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচলতলে আকাশতলে মৈত্রবসনী।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা;
অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,

অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বলধরণী, জনক-জননী-জননী।
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে;
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা,
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা—ভুলতে সে-যে পারব না মা।
মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে—
আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি, চরণে তোর দেব মেলে।
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে খুলল দুয়ার মন্দিরে যে
লগ্ন ব'য়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য।
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর গো।
আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ"—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে।
জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে,
থেকো না থেকো না ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে।

* * *

এক বা একাধিক ভ্রান্ত বা অহংসর্বস্ব দাম্ভিকের মিথ্যা কুযুক্তির জব দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই অপূর্ব মাতৃস্তুতিমন্ত্রের অবতারণা করিতে না, তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া এগুলি যে সকলকে আবার শুনাইতে পারিতে ইহাতেই তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতেছি। আমাদের প্রধান বক্ত এই যে, "বন্দে মাতরমে"র মত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশমাতৃকার বন্দনা-গান বাতিল করিবার শক্তি বা অধিকার একজন জওহরলাল অথবা একজন আজা হাতে যেন না থাকে। সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জ শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক ও ঋষিকল্প বাঙালীরা যে "ব মাতরম্"-মন্ত্রের সাধক ও সমর্থক, গোখলে তিলক লাজপৎ রায় ও মহা

ান্ধীর মত দেশপূজ্য নেতারা জাতীয়-সঙ্গীত হিসাবে যে "বন্দে মাতরম্"কে ধিকার করিয়াছেন, তাহাকে অপমান করিয়া স্থানচ্যুত করিবার পূর্বে ভারত-াষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধারেরা যেন আর একবার বিবেচনা করেন।

* * *

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। গত সংখ্যায় "বন্দে াতরমে"র সমর্থনে গান্ধীজীর যে উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, কেহ কেহ ন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা জনাকীর্ণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার রিপোর্ট াত্র, সুতরাং ততটা নির্ভরযোগ্য নয়। এই সঙ্কট হইতে শ্রীনির্মলকুমার সু আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে গান্ধীজীর স্বহস্তলিখিত ক্ত রিপোর্টের ফোটোগ্রাফিক কপি দিয়াছেন, আমরা আগামী সংখ্যায় াই চার পাতা লেখার প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়া সকলের সন্দেহ নিরসন রিব। গান্ধীজী ওই বক্তৃতা দেশবন্ধু পার্কে দেন নাই, দিয়াছিলেন কলিকাতার ড্ল্যাণ্ড্‌সে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট তারিখে। অনবধানতাবশত গত ংখ্যায় স্থান ও কালের ভুল হইয়াছিল।

* * *

আর একটি কথা। কথা উঠিয়াছে "বন্দে মাতরম্" সমবেতভাবে সামরিক ীতে গাহিবার উপযুক্ত নয়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সুরশিল্পী গমিরবরণের সাহায্যে "বন্দে মাতরমে"র যুগোপযোগী সমবেত সুর প্রকাশ রিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকারের সহযোগিতায় গমিরবরণের সুরকেই সহজ ও সর্বায়ত্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন। "বন্দে াতরমে"র বিরুদ্ধে সমবেতভাবে গীত হইবার অনুপযুক্ততার অপবাদ আর ওয়া চলিবে না। যাঁহারা পুরাতনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের অবগতির জন্য যুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৫ সালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের তৃত্বে স্বদেশসেবক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত সমবেতভাবে গীত "বন্দে াতরম্" গানের এক ছাপা স্বরলিপি আমাদের দিয়াছেন। এই স্বরলিপি ইচরণ মুখোপাধ্যায় কৃত। ইনি মহারাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের সেতার-শিক্ষক ও সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। কৌতূহলী পাঠকের জন্য আমরা স্বরলিপিটি এখানে প্রকাশ করিতেছি।—

স স ধ নি ধ প ম গ ম ঋ ঋ স স
স্বে ০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ত র ম্।
সঁ সঁ ঋ গঁ মঁ ঋ ম গঁ মঁ প পঁ পঁ প
সু জ লাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সু জ লাং
পঁ পঁ পঁ পঁ প ধঁ পঁ ম ম গঁ মঁ ঋ ম গঁ
ম ল ম জ শী ত লাং শ স্য ০ ০ ০ ০ ০
মঁ প পঁ ধঁ প ম গঁ মঁ ঋঁ সঁ সঁ সঁ
০ ০ ভা ম লাং মা ০ ০ ০ ত র ম্।
মঁ পঁ নি স স সঁ সঁ ঋঁ ঋঁ নি নিঁ সঁ
শু ০ ভ্র জ্যোৎ স্না পু ল কি ত যা ০ মি
সঁ সঁ স ঋ ম গঁ মঁ ঋঁ ঋঁ সঁ সঁ সঁ সঁ
নী ম্ ফু ল্ল ০ ০ ০ কু সু মি ত দ্রু ম
ঋঁ সঁ সঁ নিঁ ধঁ পঁ ম গঁ মঁ ঋ ম গঁ ঋ
০ দ ল শো ভি নীম্ স্ত হা ০ ০ ০ ০ ০
প প পঁ পঁ পঁ পঁ প ধঁ পঁ সঁ সঁ স
সি নীং সু ম ধু র ভা ষি নীম্ সু খ দাং
নিঁ নি ধ প ম গঁ মঁ ঋঁ ঋঁ সঁ সঁ
র দাং ০ ০ মা ০ ০ ০ ত র ম্।
স সঁ ম মঁ ম মঁ মঁ মঁ মঁ মঁ পঁ প
স প্ত কো টি ক ণ্ঠ ক ল ক ল নি না
মঁ পঁ ধঁ ধ পঁ ধ সঁ সঁ সঁ সঁ স সঁ
ক রা ০ লে বি স প্ত কো টি ভু জৈ ধৃ

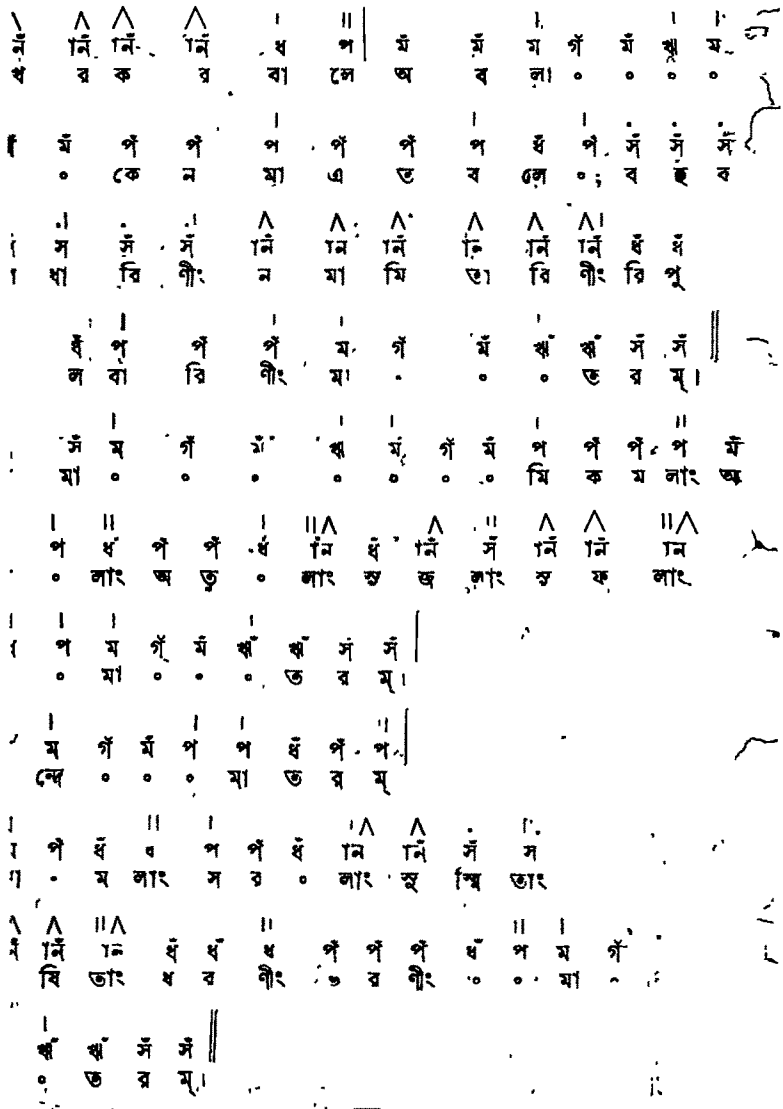
ধীরকরবালে অবলা ০ ০ ০ ০
মম পঁপঁপ পঁপঁপ ধঁপ সঁসঁসঁ
০ কেন মা এত বল ০; বহ ব
সসঁ সঁ নিঁ নিঁ নিঁ নিঁ ধঁ ধঁ
ধা রি ণীং ন মা মি তা রি ণীং রি পু
ধঁ পঁ পঁ পঁ মঁ গঁ মঁ ঋঁ ঋঁ সঁ সঁ
লবা রি ণীং মা ০ ০ ০ ত র ম্।
সঁ মঁ গঁ মঁ ঋঁ মঁ গঁ মঁ পঁ পঁ পঁ পঁ মঁ
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মি ক ম লাং অ
পঁ ধঁ পঁ পঁ ধঁ নিঁ ধঁ নিঁ সঁ নিঁ নিঁ নিঁ
০ লাং অ তু ০ লাং স্ত জ লাং স্ত ফ লাং
পঁ মঁ গঁ মঁ ঋঁ ঋঁ সঁ সঁ
০ মা ০ ০ ০ ত র ম্।
মঁ গঁ মঁ পঁ পঁ ধঁ পঁ পঁ
ন্দে ০ ০ ০ মা ত র ম্
পঁ ধঁ ধঁ পঁ পঁ ধঁ নিঁ নিঁ সঁ সঁ
০ ম লাং স র ০ লাং স্থ স্থি তাং
মঁ নিঁ নিঁ ধঁ ধঁ ধঁ পঁ পঁ পঁ ধঁ পঁ ম গঁ
স্থি তাং ধ র ণীং ধ র ণীং ০ ০ মা ০
ঋঁ ঋঁ সঁ সঁ
০ ত র ম্।

ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে এক রাজা বসিয়াছেন—রাজা গোপালাচারী; হায়দ্রাবাদে হিজ এক্সলটেড হাইনেস নিজাম বসিয়া আছেন এবং তাঁহার কৃপায় রাজাকরদের অত্যাচার ও জুলুমের সীমা নাই। ভারতবর্ষের রাজা সত্ত্বেও প্রজাকররা সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে রাজাকরদের এই অত্যাচার থামিবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কগুলি রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কল্যাণে তাহাদের তেমন দাম নাই। সুতরাং এখন গোলমাল বাধিয়াছে কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি লইয়া। কলিকাতাবাসীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং যত্নে লালিত পালিত পাঠাগারটিকে মধ্যে দিল্লীতে চালান দেওয়ার কথা উঠিয়াছিল, চলিয়া যাইতও; নেহাৎ চেঁচামেচি এবং যুদ্ধবিগ্রহের হাঙ্গামায় দিল্লীওয়ালারা কাবু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর দ্বিতীয় বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধে জাপ বোমার ভয়ে এস্‌প্লানেড হইতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে রাজকীয় পাঠাগার বইগুলি আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। বোমার যুক্তিটা আসলে তেমন খাঁটি নহে, কারণ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউও কিছু বোমার রেঞ্জের বাহিরে ছিল না। আমরা যতদূর বুঝি, প্রভুদের দরকার হইয়াছিল বড় বড় বাড়িগুলিতে যুদ্ধ নামে আপিস খুলিয়া বসিবার। যুদ্ধের অজুহাত দূর হইতেই আসে এস্‌প্লানেড-ভবনে পাঠাগার স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু বাড়িটিকে কর্তারা চাই-ই। যাঁহারা গিয়াছেন এবং যাঁহারা জুড়িয়া বসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তফাত কেবল মোড়কের—খাঁকি আর খদ্দরের তফাত; আসলে মাল সব এক। কনট্রোল ডিস্‌পোজাল এই সবের নামে আপিস খুলিয়া বসিতে পারিলে দেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাইয়া দেশপ্রেম করা যায়। সুতরাং কোলাহল ও স্থানাভাবের অজুহাতে ওই রাজনামাঙ্কিত লাইব্রেরিটা বেলভেডিয়ারে চিড়িয়াখানার ধারে পাঠাইয়া দাও—গরিব পাঠকেরা না যাইতে পারুক, চিড়িয়াখানার দর্শকরাও তো এক চক্কর দিয়া লাইব্রেরির মর্যাদা রাখিতে পারিবে।

রসিকতা যাক, এই প্রসঙ্গে কলিকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা গত জুলাই তারিখে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে। আমি মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি—

The news that the Imperial Library, Calcutta, is to be transferred to Belvedere, Alipore, has not been altogether well received. This is hard

prising. Belvedere is several miles from the University and from most rts in which Calcutta scholars reside. It is poorly served by any form public transport. The Library was only recently transferred—at consider- cost and inconvenience—from its wartime premises in Chittaranjan nue ; it has still not been properly arranged, and serious damage sustained its wartime home to valuable books and manuscripts has still to be repaired. as is alleged, there is insufficient room for its collections at Esplanade may be primarily due to invasion of the premises by certain mushroom artments connected with the war or the disposal of warlike material. If, vever, the Government is determined to provide lavish alternative accom- dation, Government House might be a preferable alternative ; a constitu- al Governor might prefer to be accommodated in the less extensive, but e comfortable splendour of Belvedere.—*Statesman*

যাঁহারা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে বসিয়া অথবা বই আদান-প্রদান করিয়া ড়িতে লেখাপড়া করেন, তাঁহারা সাধারণত দরিদ্র অধ্যাপক, গবেষক শ্রেণীর াক, অধিকাংশই ট্রাম-বাসের খরিদ্দার, দুই-একজনের গাড়ি থাকিলেও লাভাব। আলিপুর পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া জ্ঞানস্পৃহা নিবৃত্তি অনেকেই করিতে রিবেন না। ফলে ঘাঁটাঘাঁটির অভাবে বেল্‌বেডিয়ারে ইম্পীরিয়াল ইব্রেরির বল্মীকস্তূপে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। সেই আশঙ্কা নিবারণের ন্য 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র নির্দেশ অনুযায়ী সহৃদয় প্রদেশপাল বাহাদুর যদি গবর্মেণ্ট উসটি ছাড়িয়া নাও দেন, আমরা প্রস্তাব করি, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরির দিস্থান মেট্‌কাফ হলে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করিয়া স্বদেশ-প্রেমিক কর্তাদের যোগাযোগের সুবিধার্থ বর্তমান এস্‌প্লানেড ভবনটি তাঁহাদিগকে দেওয়া ক। মেট্‌কাফ-হল কোলাহল-বর্জিত স্থানে অবস্থিত, বাড়িটিও বড়; এখন খানে দুই-একটি মৃত সোসাইটির কবর যাহা আছে, সেগুলি সরাইয়া স্থান লান মোটেই কষ্টসাধ্য নহে।

* * *

পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলেই মেট্‌কাফ হলে ইম্পীরিয়াল ইব্রেরির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমীচীনতা প্রতীয়মান হইবে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্যসাধক-চরিতমালার 'প্যারীচাঁদ মিত্র' গ্রন্থে এই তিহাস এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে :

"ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি

"১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়ো হয়। পর-বৎসর ২১এ মার্চ সাধারণের জন্য 'দি ক্যালকাটা পাবলি লাইব্রেরি'র দ্বার উন্মোচিত হয়। তখন এসপ্লানেড রো'তে ডাঃ স্টুডের বা নিচের তলায় এই লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল। ৮ মার্চ ১৮৩৬ তারিখে লাইব্রে কর্তৃপক্ষ প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্যারীচাঁদকে এই প্রতিষ্ঠাে 'সাব্-লাইব্রেরিয়ান' নিযুক্ত করেন।

"১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও ভারতব কৃষি-সমাজকে এক খণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপর ৬৮ হাজার ট ব্যয়ে মেটকাফ-হল নির্মিত হয়। লর্ড মেটকাফ এদেশ ত্যাগ করিলে উপযুক্ত তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি কোর্ট উইলিয়ম কলেজ হই (এখানে লাইব্রেরি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে উঠিয়া আসে) মেটকাফ-হ দ্বিতলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। মেটকাফ-হল নির্মাণে ক্যালকাটা পাবলি লাইব্রেরি প্রায় ১৬৪০০ টাকা দিয়াছিলেন; এই টাকা প্রধানত প্যারীচাঁ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সংগৃহীত হইয়াছিল।...লাইব্রেরির সর্ববিধ উন্নি জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া, যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শ জন্য লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অবৈতনিক সেক্রেটরি ও লাইব্রেরিয়ান করে প্রতিষ্ঠাবধি লাইব্রেরির পরিচালনভার সাধারণত তিন জন কিউরেটারের হ ন্যস্ত ছিল; এই বৎসর হইতে প্যারীচাঁদ অবৈতনিক কিউরেটার হইলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নূতন ব্যবস্থা অনুসারে লাইব্রেরি-পরিচালনের ভ কাউন্সিল গঠিত হয়।"

মেট্‌কাফ হলে স্থাপিত এই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিই ই ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে পরিণত হয়। সুতরাং ইম্পীরিয়াল লাইব্রে যথাযোগ্য স্থান যে মেট্‌কাফ হল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, কর্তৃ অবিলম্বে মেট্‌কাফ হলে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করিয়া আমাদের জাত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন।

—

পরস্বাপহরণ সরকারী আইনে দণ্ডনীয় ; কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, জাতীয় পরস্বাপহারীরা সর্বদাই সরকারের দরবারে পুরস্কৃত হইতেছেন। রূপ বিপরীত আচরণের প্রতিকার প্রয়োজন হইয়াছে। কার্ল মার্ক্সের ায় মানুষ জন্মগত অধিকারের দাবিতে পৈতৃক সম্পত্তিতেও অবাধ অধিকার াইতে বসিয়াছে। যাহারা জন্মের দাবিতে সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের ন অধিকার করিতেছেন, অথচ টানা দুই লাইন লিখিতে পারেন না, অন্যের ামের জোরে তাঁহাদিগকেই সামাজিক ও সরকারী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে খিলে সন্দেহ হয়, আমরা বুঝি মোগল আমলেই বাস করিতেছি। কিছুকাল ৎ কলিকাতার কোনও একটি মাসিক পত্রিকায় একটি সরকারী বিভাগে র্ধচারী নিয়োগ ও বদল সম্বন্ধে জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, লেখা সম্বন্ধে সম্পাদক শিশুর মতই নিষ্পাপ। কিন্তু উত্যক্ত সরকার যখন সন্ধান ও পরামর্শসভা বসাইলেন, তখন মোটা ভাতায় উক্ত নিষ্পাপ াদককেই প্রধান সদস্য করা হইল। যে ব্যক্তি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কেরণ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া মরিলেন, অর্থাৎ যিনি অনুসন্ধান ও পরামর্শসভায় লে সত্যকার কার্যকরী কিছু নির্দেশ দিতে পারিতেন, তিনি মাস-মাহিনার রালে অবহেলিত রহিয়া গেলেন। ইহা একটি দৃষ্টান্তমাত্র। দৈনিক ত্রিকার ব্যাপারেও যাঁহারা এরোপ্লেনে চড়িয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছেন, ড়ার সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার বেলাতেও তাঁহাদের বক্তৃতা মাহিনা-করা 'গারীকে লিখিয়া দিতে হয়। এ যুগে এরূপ হওয়া সঙ্গত নয়। জমিসংক্রান্ত মিদারি যেখানে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সেখানে পয়সার জোরে সাংস্কৃতিক মিদারি চলিতে দেওয়া এক ধরনের মহাপাপকে প্রশ্রয় দেওয়া।

—

সাপ হইয়া কামড়াইয়া ওঝা হইয়া ঝাড়িবার কৌশল যাঁহারা আয়ত্ত রতে চান, তাঁহারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি—পরিভাষা-সদের ভাষায় ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট বেদন করুন। তাঁহার কাছে শিক্ষা লাভ করিলেই বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের ভুক্তি লইয়া যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা সাফল্য লাভ করিবেন। ন্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—

ভারতভাগ্য-বিধাতা পণ্ডিত জওহরলাল কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে ক সাধারণকে সাবধান করিয়াছেন; কিন্তু কম্যুনিস্ট কাহারা, কেমন কি তাহাদের সনাক্ত করিতে হয় সে সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ দেন নাই। এক স ছিল যখন লাল পতাকা পাজামা শার্ট দেখিয়া অথবা স্লোগান শুনিয়া ধরা যাই কিন্তু সম্প্রতি গোলে হরিবোল দিয়া এলোমেলো-ক'রে-দে-মার দল খুব সাবধা অবস্থান করিতেছেন। একজন বুদ্ধিমান বন্ধু একটি তুক বলিয়া দিয়াছেন য প্রয়োগ করিলে চেনা সহজ হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল অথবা বল্লভভাই প্যাটে কিরণশঙ্কর অথবা সুরাবর্দী সাহেব জানেন না পাকিস্তান বা হায়দারাবা এমন গুহ্য গোপনীয় সংবাদ যিনি অতিশয় গোপনে আপনাকে নিবে করিবেন, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ও সরবরাহের কথা, ঘাঁটি নির্মাণ সৈন্য সমাবেশের অতিশয় ভয়ানক ভয়ানক খবর যাঁহারা আপনার কানে কা দিবেন, কলিকাতার এক অঞ্চলে বসিয়া অন্য অঞ্চলের খুন-জখমের নিখুঁ হিসাব যিনি দিতে পারিবেন তাঁহাকেই কম্যুনিস্ট বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে কোনও ধর্মঘট বা আইন-অমান্য ব্যাপারে জনসাধারণকে উৎসাহ দিয়া বিপদে সময় যাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহারাও এলোমেলোধর্মী। সুতর সবজান্তা লোকের গুহ্য পরামর্শ এবং অচেনা লোকের হিতৈষীপনা কান পাতি শোনা অভ্যাস করিলেই চিনিতে ও বুঝিতে শিখিবেন।

* * *

কম্যুনিস্টরা কোথায় কিভাবে অবস্থান করিতেছেন জানি না, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, কলিকাতায় এলোমেলো-ক'রে-দে-মার দল আবার তৎপর হইয়াছেন। হায়দারাবাদ অজুহাত মাত্র, আসলে তাঁহারা আবার একটা শুভক্ষণে কাণ্ড বাধাইয়া তুলিতে উৎসুক। এক দিকে এক দল অতিশয় প্যাঁচালে জিলিপীধর্মী লোক ধিকিধিকি তুষের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া সাধারণ মানুষকে তাতাইয়া তুলিতেছেন, অন্য দিকে ধর্-মার্-কাট্ শ্রেণীর আর এক দল দেশকর্ম প্যাঁচালোদের দেওয়াল-বিজ্ঞাপন "অমুক দলকে বৈধ কর" হইতে ঐকার তুলিয়া দিয়া কাজ সহজ ও হালকা করিতে চাহিতেছেন। এই বৈধ-দল ও রধ-দলে মাঝখানে পড়িয়া বিশ্বাসী নিরীহ জনসাধারণের অবস্থা এমনই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা সমাজ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে; মানুষ পরস্পরকে দেখিলে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা-নিবারণ করিতে

হন নাই, এই অবিশ্বাসের আতঙ্ক ও অজ্ঞাতের ভয় হইতে সাধারণ মানুষকে
ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গত এক বছরের অভ্যাসে সাহস ফিরিয়া
সিয়াছিল; কিন্তু যাহারা আলুর গুদামে আগুন লাগাইয়া আলুপোড়া খাইতে
লবাসে, এই চালু অবস্থা তাহাদের সহিতেছে না। এখানে বসিয়া গোপন
ল্লা করিলে অথবা পরিবারের সহিত পরামর্শ করিয়া দা-বঁটি-ক্ষুর শানাইলে
রত-সরকারের অথবা নিজাম-সরকারের কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হইবে না,
ন্তু মাঝ হইতে ফুটবল খেলার মাঠ হইতে ফিরিতে গিয়া অথবা ঘুড়ি ধরিতে
পাড়ায় গিয়া আমরাই নিখোঁজ হইয়া যাইব। আর একটু বাড়াবাড়ি হইলে
ড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা-কমিটি বসিবে—মাঝ হইতে দাঁও করিবে চোরাকারবারীরা।
ই-দুইটা মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে নাই,
কটা দাঙ্গায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। লোক
কটা মরিবার তো মরিয়াছেই, সমস্ত বাংলা দেশটা এখন অভাব-অনটনের
লায় মরিতে বসিয়াছে। অর্থনৈতিক এমন দুঃসহ অবস্থা কখনই পৃথিবীতে
ট নাই—এক চীন মহাদেশে ঘটিলে ঘটিতে পারে। যে বিরুদ্ধ শক্তির
রোচনায় চীন আজ ছিন্নভিন্ন, ভারতবর্ষে তাহারই ক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
ই সাবধান হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

—

অগ্নিদগ্ধ রোম নগরীতে বসিয়াই সম্রাট নীরো বেহালা বাজাইয়া
রকালের জন্য স্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার
তমনই এই অন্ন-বস্ত্র-বাস্তু-সুখ-শান্তিবর্জিত দেশে ফিল্‌ম্ সেন্সর বোর্ডের
ধব-কমিটি বসাইয়া চিরকালের জন্য রসিকখ্যাতি অর্জন করিতে চলিয়াছেন।
হারা হাতে আর কোনও কাজ পাইলেন না, ভারতবর্ষে প্রদর্শিত ফিল্‌মের শত-
রা পাঁচ ভাগ মাত্র যাহা বাংলা দেশে নির্মিত হয়, তাহার দুর্নীতি দমন করিয়া
দশকে পরিশুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেশের যে নৈতিক অধঃপাত
ইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার কারণ জ'লো পান্‌সে বাংলা ছবি
য়; হলিউড এবং বোম্বাই হইতে লক্ষ লক্ষ গজ যে মাল প্রত্যহ আমদানি
ইয়া প্রদর্শিত হইতেছে, সর্বপ্রথমে তাহার প্রচার বন্ধ করা আবশ্যক। ইঁহারা
এখন পর্যন্ত ভাল কিছু করিতে পারিলেন না, কিন্তু যে শিল্পব্যবসায় সরকারী-
াহায্য-নিরপেক্ষভাবে বাংলা দেশে মাত্র কয়েকজনের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়া

[illegible] ... [illegible]
ত বেশি লেখাপড়া শেখা যায়, সেটা তাঁরা কল্পনাও করতে পারছেন না ...
নয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের এই অজ্ঞতা এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কর্ম-
তাঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যাঁরা বর্তমান পুতুল ও গোলাম গড়ার শিক্ষাকে
ায় রাখতে চান তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছেন।...এই সব অসুবিধা ও
পদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে জাতীয় বিশেষত কংগ্রেস সরকারের অস্তিত্ব
কর্মপন্থা। এতদিন ইংরেজ রাজত্ব ছিল; সবাই জানত, ওরা আমাদের
জল চায় না, ওদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা গোলাম তৈরি করারই ব্যবস্থা।...আজ
াতীয় সরকার থাকায় এবং তাদের নামে-মাত্র পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা
বর্তনের সম্ভাবনায় জনসাধারণের সেই সাহায্য সহানুভূতিও পাওয়া কঠিন
য়ে দাঁড়িয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা কংগ্রেসের স্বীকৃত জাতীয় শিক্ষা। কংগ্রেস
মজে 'হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ' এই প্রতিষ্ঠানটিকে গ'ড়ে তুলেছে। এঁরা কাজ
রেছেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানের মতই প্রামাণ্য। অথচ
কার আজ Central Govt.-এর আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য নামে
নিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে, অথচ কাজে অন্য শিক্ষা চালু করার ব্যবস্থা
রেছেন। সরকারী কমিটিতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রত্যক্ষ কর্মী এক বিজয়কুমার
ট্টাচার্য ছাড়া কেউ নেই।

"বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে সর্বতোভাবে সাহায্য
য়োজন। এর ওপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।
অন্যান্য সকল প্রদেশ এ বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, আমরাই পিছিয়ে
পড়লাম।"

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এখন কথায় কথায় কমিটি সাব-কমিটি কমিশন
বসাইতেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের গূঢ় মতলব কি, তাঁহারা যদি
জ্জা বা অন্য কারণে সরাসরি না বলিতে পারেন, কমিটি বা কমিশন বসাই
তাঁহাদের মুখ দিয়া বলান, অকারণ ধাপ্পা দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত
বেইজ্জৎ করিবেন না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্তমানে অন্তত লক্ষ লোকের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিতেছে, তাহা টুঁটি টিপিয়া মারিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে বসিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের যে প্রচার-অধিকর্তার প্ররোচনায় এই সকল রিপি ব্যাপার ঘটিতেছে, তিনি অবাঙালী এবং এক বর্ণ বাংলা বুঝেন না। বঙ্গ সরকার যোগ্য লোককে এই পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হাতে দেশের কল্যাণক প্রচারের ভার দিলে গায়ের জোরে ফিল্মের মাধ্যমে সৎসাহিত্য প্রচারে প্রয়োজন হইত না।

* * *

অথচ যে বুনিয়াদী শিক্ষা দেশের বর্তমান দুরবস্থায় জনশিক্ষার একমা সহজ পথ বলিয়া দেশের জ্ঞানী গুণী ও কর্মীদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার সেই শিক্ষা-প্রচারের সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, পদে পদে বাধ সৃষ্টি করিতেছেন। যে পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার সহিত কর্তৃপক্ষের অনেকের আর্থিক স্বার্থ জড়িত, সুতরাং বাধা স্বভাবতই আসিতেছে. কিন্তু এ কথা স্থির হইয়া গিয়াছে যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে দেশের কল্যাণ নাই বুনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান অসুবিধা সম্বন্ধে বঙ্গীয়-বুনিয়াদী-শিক্ষা-পরিষদে সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] গুপ্ত আমাদিগকে যে [illegible] দিয়াছেন, তাহা [illegible] উদ্ধৃত করিয়া এই অসুবিধার সামান্য আভাস দিতেছি। পশ্চিম-ব সরকার যদি সর্বাগ্রে এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিশুদ্ধ করিয়া দেশের সাধারণ মানুষে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই নিজে ভালমন্দ বুঝিতে পারিবে—সেন্সর বোর্ড বসাইয়া তাহাদিগকে অপমান করিব সুযোগ সরকার পাইবেন না।

শ্রীযুক্ত অনিলমোহন গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে খুব একটা ভ্রান্ত ধারণার ফলে শিক্ষকরা এ জনসাধারণ উভয়েই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনকে ভয়ের চোখে দেখছেন এবং এ প্রবর্তনে যথাসাধ্য বাধা দিচ্ছেন। শিক্ষকরা ভাবছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তি হ'লে তাঁদের চাকরি যাবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভাবছেন যে, তাঁদে বিদ্যালয় ভেঙে যাবে। জনসাধারণ ধ'রে রেখেছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা ছোটলোকের জন্য, এটা ভদ্র-সমাজ বা শিক্ষিতদের জন্য নয়। ওতে কেব

পরিবারের চিঠি
৩৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৫

জীবন-বাণী

হাজার হাজার বছর হয়েছে পার—
এই ভারতের তপোবনতলে নিভৃত তপস্যায়
একান্তে বসি তাপসেরা যত লভিলেন অন্তরে
বাগ্দেবী-বুরে কল্যাণবাণী অপূর্ব অপরূপ,
বাক্য-বিভূতি মস্তিষ্কের কোটরে জন্ম যার,
ঋক যজুঃ সাম—উপনিষদের রূপে
বিধৃত হইয়া সাধকজনের সাধনলব্ধ বাণী ;
হ'ল প্রচারিত কল্যাণে মানুষের।
ধ্যানাসনে বসি লভিলেন যাঁরা বাণীর আশীর্বাদ
ঋষি যে তাঁহারা, আমরা তাঁদের আজিও প্রণাম করি।

তার পরে দেখি পশ্চিমে পূবে দার্শনিকের দল
ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বিচার করি
লিখিল সূক্ত সূত্র ও টীকা ভাষ্য সূক্ষ্ম অতি
সমাজ মানুষ ধর্ম জগৎ ধাতারে কেন্দ্র করি।
কথায় কথায় গড়িয়া উঠিল বাক্যের হিমালয়,
ছন্দে ও সুরে উথলি উঠিল শব্দের পারাবার,
জটিল কুটিল ন্যায়তর্কের ঘোরালো বচনরাশি—
এই ধরণীর সাধারণ যারা, তারা তা শোনে না কানে,
শুনিলেও তারা বোঝে না কথার মানে।
কপিল কণাদ পতঞ্জলি ও অ্যারিস্টট্‌ল প্লেটো
কন্‌ফুসিয়াস লাওৎসে আর সেনেকা চার্বাকেরা
কেউ মহাজ্ঞানী কেউ উপাসক ক্ষুরধার বুদ্ধির,
আজও পণ্ডিতে প্রণাম তাঁদের জানান শ্রদ্ধাভরে।

আরো এসেছেন মহাকবি কবি ঋষিকল্প যে তাঁরা—
বাল্মীকি ব্যাস হোমর দান্তে ভার্জিল মিল্‌টন
কালিদাস আর শেক্সপিয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ

শ্লোকে শ্লোকে ঢালি অমৃতের ধারা মর্ত্যধরার শোকে,
মিলনে বিরহে প্রেমে ও ঘৃণায় ত্যাগে বীরত্বে তাঁরা
মাটির মানুষে স্বর্গদেবতা গড়ি
ভালবাসা দিয়ে হৃদয়-অর্ঘ্যে কাব্য সৃজন করি'
কালের বক্ষে লিখিয়া গেছেন নাম,
রসিক জনের শ্রদ্ধা প্রণাম লভিয়া আছেন বাঁচি।
শব্দব্রহ্ম সৃষ্টি এঁদের, বাণীর বাহক এঁরা,
হৃদয় অথবা মস্তিষ্কের পথে
এঁরা লভেছেন ভগবদ্‌কৃপা, বিলায়ে গেছেন তাই।
বাণী-গৌরবে প্রণম্য এঁরা—প্রণমি এঁদের পায়ে।

যুগ-প্রয়োজনে এসেছেন যাঁরা কর্মের অবতার
তাঁদের চরণে ঋষি কবি জ্ঞানী সবার নমস্কার।
দুঃখী ব্যথিত পীড়িত মানুষে করিতে পরিত্রাণ
অত্যাচারীর লাঞ্ছনা হতে, ইঁহাদের সম্ভব।
লীলাময় বিধি মানুষের প্রেমে মানুষের রূপ ধরি'
রাজার প্রাসাদে অথবা গরিব ছুতারের কুঁড়ে ঘরে
আপনি স্বয়ং নামিয়া আসেন সহজ আকর্ষণে—
যুগে একবার হয় সম্ভব এমন আবির্ভাব।
কর্মে তাঁদের বিশ্বের পাপ ধুয়ে যায়, যায় মুছে।
জীবনাশ্রিত তাঁহাদেরই বাণী চলে ধর্মের নামে—
এক হতে দুয়ে দুই হতে দশে দশ হতে অর্বুদে
বাণী তাঁহাদের ধর্ম হইয়া মানুষে ধারণ করে।
প্রতি দিবসের কাজে তাঁহাদের তাঁহারা থাকেন বেঁচে
প্রতিদিনকার সহজ কথার মাঝে;
বাণীরূপ ধরি চিরজীবী হয় তাঁদের জীবনটাই।
শ্রীরামচন্দ্র কৃষ্ণ বুদ্ধ জিনগুরু মহাবীর
প্যালেস্টাইন ও আরবমরুতে খ্রীষ্ট-মুহম্মদ
পতিত মথিত শ্যামল-বঙ্গে প্রেমী চৈতন্যের

বাণী তাই আজো সত্য ও সুন্দর—
জীবনে সে বাণী সার্থক হ'ল ধন্য হইয়া কাজে
হিত মনোহর রূপ ধ'রে আছে আদর্শ আশ্রয়ে।

আমাদের এই ইটকাঠ-ঘেরা লোহা-ইস্পাত-যুগে—
এ বস্তুবাদী জড়বিজ্ঞান-যুগে,
বিশ্বধ্বংসী স্বার্থদুষ্ট হীন হিংসার যুগে—
অবতাররূপে ভারতে তাঁহার পরম আবির্ভাব।
দূর পশ্চিম সমুদ্রতীরে বৈশ্যের ঘরে তিনি
জন্ম নিলেন, মানবসেবার সুকঠোর ব্রতে নামি'
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিতে হিংসার বিভীষিকা
হিংসার হাতে অনায়াসে তিনি দিলেন আত্মাহুতি।
মহামানবের সারা জীবনের কাজ
বাণীরূপ নিয়ে উজ্জ্বল হ'ল বিশ্বজগৎ মাঝে—
মস্তিষ্কের কোটরে বিধৃত জ্ঞানের বাণী তা নয়,
কবি-হৃদয়ের নহে তাহা উচ্ছ্বাস,
দর্শন নয়, ধ্যানাসনে পাওয়া অপৌরুষেয় বাণী
নয় তাহা নয়। বাণীর পাপড়ি মেলি
জীবন তাঁহার উঠেছে ফুটিয়া পদ্মের শোভা ধরি'।
কবিতা ও গানে বাণী দুই-চারি আমরা স্মরণ করি'
নর-অবতার গান্ধীচরণে নিবেদি নমস্কার।

* * *

এক

নূতন ধর্ম প্রচার করিতে চাহি নি আমি,
গড়িয়া তুলিতে চাহি না নূতন সম্প্রদায়,
এই ভারতের আমি দীনহীন সেবার কামী
দেবতা হবার নাই এতটুকু অভিপ্রায়।
মানবজাতির সেবক হইতে বাসনা মোর,
খুশি হব যদি সেই কাজে ছেঁড়ে জীবন-ডোর।

দলের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে যেন কভু না নামি,
চাহি যে বহিতে যে আছে যেখানে সবার দায়।
নূতন ধর্ম প্রচার করিতে চাহি নি আমি
গড়িয়া তুলিতে চাহি না নূতন সম্প্রদায়॥

সত্যেরে আমি করেছি গ্রহণ জীবনে মম
আমার মতে,
জেনেছি জগতে অহিংসা পথ মহোত্তম—
চলি সে পথে।
নূতন সত্য প্রচারের দাবি নয় আমার,
প্রাচীন সত্য নূতন আলোকে করি প্রচার,
কর্মের মাঝে যাচাই করি তা দিবসযামী
বাণী মোর সদা কর্মধারায় স্ফূর্তি পায়।
নূতন ধর্ম প্রচার করিতে চাহি নি আমি
গড়িয়া তুলিতে চাহি না নূতন সম্প্রদায়॥

দুই

লিখিতে বসিয়া নাহি ভাবি আমি কি যে বলিয়াছি আগে
নাহিক লজ্জা যদি আগে পরে ঘটে কিছু গরমিল,
আমি মানি সেই সত্যে মনে যা লিখিবার কালে জাগে
সত্য হইতে সত্যেতে তাই বাড়িয়াছি তিল তিল।
কি বলেছি ভেবে স্মৃতির উপরে চাপাই না বৃথা ভার,
কাজের বেলায় অবাক হয়েছি ঘটে নি কোথাও গোল—
অর্ধশতক আগে যা বলেছি ভিত্তি টলে নি তার
আসল যা তাহা রয়েছে অটুট, বদলেছে শুধু খোল॥

তিন

অহিংসা আর সত্যেতে মোর বিশ্বাস বাড়ে প্রতিটি দিন
আমি বেড়ে যাই যত এই দুয়ে ক'রে চলি আমি অনুসরণ—
নিত্য নূতন অর্থের যোগে করে তারা মোর মনোহরণ
যত বাজে, হয় মধুরতর যে অহিংসা আর সত্য-বীণ॥

চার

ভুল যদি হয় গান্ধীবাদ সমূলে হউক তা বরবাদ,
সত্য এবং অহিংসার ক্ষয় নাই জেনো নাই ক্ষতি,
সম্প্রদায়ের পড়িলে ফাঁস গান্ধীবাদের হোক বিনাশ
মোর নামে যেন স্পর্শে না কভু গোঁড়ামির দুর্মতি ॥

পাঁচ

পুঁথি দিয়ে হয় না প্রচার
জীবনে পালিতে হবে নীতি,
সে জেনেছে সত্যের সার
কাজে যার জন্মেছে প্রীতি ॥

ছয়

মাহাত্ম্য মোর একটু বাড়ে না মহাত্মা বিশেষণে
আমি যে গান্ধী—সেই গান্ধীই আছি ;
মহত্ত্ব ব'লে আমি যা জেনেছি শুধু সেই আচরণে
সকলের মাঝে হয়তো রহিব বাঁচি ॥

সাত

এই জেনেছি সার,
আমার 'পরে দেন নি বিধি
ভবিষ্যতের ভার।
ঘটবে কি যে আরো পরে
নাই ভাবনা তাহার তরে,
যা ঘটে এই বর্তমানে
হিসাব রাখি তার।
আমার 'পরে দেন নি বিধি
ভবিষ্যতের ভার ॥
দুর্ভেদ্য যে প্রাচীরখানি
সামনে আছে খাড়া
আশিস্ সম তারেই মানি
দিই না তাতে নাড়া।

যেটুকু পথ সামনে পড়ে
সুগম হউক মোদের তরে,
ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলে
কাটবে অন্ধকার।
আমার 'পরে দেন নি বিধি
ভবিষ্যতের ভার॥

আট

দূষিছে আমারে সবে, মত্ত আমি স্বল্প পরিবেশে,
ভারতের এক প্রান্তে অতি ক্ষুদ্র নোয়াখালি-গ্রামে—
বিশাল সমুদ্র ছেড়ে কেন সঁপি গোষ্পদেতে মন!
ভারত-সমস্যা যদি প্রাণ দিয়ে মিটাইতে পারি
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব যত স্বভাবত হবে অবসান।
আমি কিন্তু ভিন্ন মত অন্তরেতে করি যে পোষণ,
শিখেছিনু মার কাছে শিখেছিনু বালকবয়সে
ছোট বড় বৃথা ভেদ, যথা পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডেও তথা
সূক্ষ্ম-পরমাণু-বুকে অন্তহীন বিশ্বের প্রকাশ।
যেথানে যখন থাকি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিবেশে
করি যদি নিজ কাজ চলি যদি সত্য-ন্যায়-পথে
তা হ'লে নাহিক ভয়, বিশ্ব মোর গ্লানিমুক্ত হবে।
যারা রহে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মোর আশেপাশে
যারা করে মোর 'পরে অহরহ একান্ত নির্ভর
তাদের দুঃখের বোঝা ভালবেসে না নামাই যদি
বিশ্বের মহিমা কিছু বাড়িবে না আমার চেষ্টায়।
ছোট পরিবেশে সেবি যে না পারে করিতে কল্যাণ
তাহার বৃহৎ কর্ম চিরদিন হইবে বিফল॥

নয়

বাহিরে শত্রু—তাহারে করি না ভয়,
মনের অরিরে মানি যে ভয়ঙ্কর,

কাম-ক্রোধ আদি পাশবিক রিপুচয়
তাহাদের ভয়ে কম্পিত অন্তর।
শত্রু ইহারা মোর অন্তরচারী
শাসনে যদি বা স্ববশে রাখিতে পারি,
বাহিরের বাধা সহজে করিয়া জয়
আমিই হইব আমার ভাগ্যধর।
বাহিরে শত্রু—তাহারে করি না ভয়,
মনের অরিরে মানি যে ভয়ঙ্কর॥

কামনা-বাসনা দেহেরে নিয়ত টানে
মন দেহে থাকে বাঁধা,
সংযম-বশে যে থাকে না সজ্ঞানে
লাগে যে তাহারি ধাঁধা।
অতি মনোহর ধরার বাসনা-জালে
জড়াইলে নাই মুক্তি তো কোনো কালে;
মোর কিছু নয়—এই যার পরিচয়
তারেই সতত রাখেন যে ঈশ্বর।
বাহিরে শত্রু—তাহারে করি না ভয়,
মনের অরিরে মানি যে ভয়ঙ্কর॥

দশ

আমারে তিনি গেলেন ল'য়ে বুড়া দেউলছায়ে
খানিক খোলা জমি
দাঁড়িয়ে তথা আছিল সারি সারি
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া আধমরাদের দল,
দেহেতে প্রাণ আছে কি নাই বুঝিতে হয় ভুল,
নৈরাশ্যের যেন সচল ছবি—
পাঁজরে হাড় সকলি যায় গনা
দেহের শিরা চোখেতে যায় দেখা,
নাহিক পেশী, মাংস নাই জীর্ণ দেহ 'পরে,

শুষ্ক আর কুঞ্চিত ত্বক শুধু
ঢাকিয়া আছে হাড় কখানি দেখিলে বোঝা যায়।
চোখে তাদের নাইকো জ্যোতি বক্ষে নাই আশা,
একটি শুধু কাম্য মনে—মরণ হবে কবে।
একটি মুঠা অন্ন যাহা দয়ার শুধু দান
তাহারি লাগি যা-কিছু ব্যাকুলতা।
ভুলিয়া গেছে কাজের কথা মূল্য-বিনিময়ে;
করিত কাজ হয়তো তারা পাইলে ভালবাসা।
একটি মুঠা দয়ার দান উদরে পূরি তাই
রাখিতে প্রাণ দিনের পর দিন—
লজ্জা ঘৃণা মনেতে নাহি জাগে।
মানুষ হয়ে জন্মেছে যে এহেন দুর্দশা
ঘটেছে তার ভাবিতে পারি নাকো,
অথচ এরা নারী-পুরুষ মোদেরি ভাইবোন,
ভীষণতম মৃত্যুমুখে ছুটেছে তিলে তিলে।
নিরুপায়েরা চিরটাকাল কাটায় উপবাসে
ইচ্ছাকৃত নয় সে উপবাস—
ভাগ্যগুণে যেদিন তারা ভাঙে সে অনশন,
মোদের সুখী জীবন তারা ঘৃণার চোখে দেখে।
দরদী কোথা দেখিবে ইহাদেরে?

এগারো

মৃত্যুর মাঝে জীবন মোদের
ধ্বংসের মাঝে বাস,
এক নিমেষেই পারে যে ঘটিতে
চরম সর্বনাশ।
আকাশ-সৌধ করি কল্পনা
মিছা আমাদের যত জল্পনা—
ভঙ্গুরতার বহিছে সাক্ষ্য
অতীতের ইতিহাস।

মৃত্যুর মাঝে জীবন মোদের
ধ্বংসের মাঝে বাস ॥
অনিশ্চয়ের মাঝে নিশ্চয়
ধাতার আশীর্বাদ,
ঘুচিবে চকিতে সব সংশয়
তাঁর যদি হয় সাধ।
সঁপিয়া নিজেরে চরণে তাঁহার
যদি কাঁধে নিই কর্মের ভার
সার্থক হবে জীবন—ঘুচিবে
মৃত্যুর মহাত্রাস।
মৃত্যুর মাঝে জীবন মোদের
ধ্বংসের মাঝে বাস ॥

বারো

বিবর্তন ও বিপ্লব আছে প্রয়োজন উভয়ের,
মানবজাতির উন্নতি মূলে দুয়ের সমান দান।
মোদের জীবনে মৃত্যু অমোঘ সত্য চিরন্তন
অমোঘ সত্য হ'লেও মৃত্যু বিপ্লব ঘোরতর।
জন্ম এবং জীবন-ধারণ ক্রমিক বিবর্তন
জন্ম হইতে মৃত্যুর মাঝে গতি তার অতি ধীর।
জন্মের পরে মৃত্যু না হ'লে মানবাত্মার গতি
থামে মাঝপথে—মর্ত্যজনের দুইই তাই প্রয়োজন।
এই জগতের সেরা বিপ্লবী আপনি যে ঈশ্বর,
প্রলয়-বন্যা তাঁহারই সৃষ্টি, তিনিই তোলেন ঝড়—
যেখানে শান্তি মুহূর্ত আগে সেথা হয় তোলপাড়।
তিলে তিলে অতি সযত্নে গড়া বিরাট নগাধিরাজে
এক নিমেষেই ধূলিসাৎ করি' সীমাহীন প্রান্তর
তিনিই করিতে পারেন সৃজন—সর্বশক্তিমান।
দেখেছি শান্ত নভোমণ্ডল—যত দেখিয়াছি তত

মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমো বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা করিয়াছেন।...ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহি সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে ('আত্ম-চরিত' পৃ. ৯৪-৯৫)। গ্রন্থপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য গ্রন্থকার প্রচ্ছদপ একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রকট করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈরগুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

এই প্রসঙ্গে এইবারের "সংবাদ-সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।—স. শ. চি.]

ভূমিকা

অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত সকল হিন্দু শাস্ত্রে কীর্ত্তিত সকল হিন্দুর পরমাত্ম পরব্রহ্মের উপর নির্ভর করিয়া, এই মহাহিন্দু-সমিতির প্রস্তাবনা প্রকাশ করি প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে সেই অক্ষয় পরম বেদিতব্য বিশ্বের পরম নিধান হি চিরন্তন পৈতৃক দেবতার নামে সকল হিন্দু সম্মিলিত হউন, তাঁহার নি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

এই প্রস্তাব গত শ্রাবণ মাসে নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ তাহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল।

মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association ন জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন Anglo-Indian-Defer Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Eurasian and Ang Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ঐ সেইরূপ হিন্দুদিগের একটী জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন ও প্রয়োজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেই প্রয়োজন হিন্দুদিগের অনেক আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধি রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদি উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে। মধ্যে মধ্যে এমন এক একটী ক গবর্ণমেণ্ট করিয়া বসেন যে, তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকা উপর হস্তার্পণ হয়। সম্প্রতি এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট, পু রাজার হস্ত হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের উপর তাঁহার বংশপরম্পরা

র্ত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন।* ভারতবর্ষীয় সকল হিন্দুদিগের একটী সমিতি কিলে, যদি তাহা হইতে উক্ত অপহরণের প্রতিবাদ হইত, তাহা হইলে র্ণমেণ্ট সমীপে তাহার কথার যেমন জোর হইত, এমন আর কিছুতেই হইবে । কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুঃখ নিবারণ জন্য এরূপ সমিতি সংস্থাপন করা যে বশ্যক হইতেছে এমত নহে। দেববাণী সংস্কৃতের চর্চ্চা ভারতবর্ষে একপ্রকার াপ পাইয়াছে বলিলে হয়। সরস্বতী দেবী এক্ষণে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া, ইন নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের যুবকদিগের ক্রমশঃ রীরিক অবনতি হইতেছে। আমাদিগের বিদ্যালয় সকলে ধর্ম্মশিক্ষা না র্কা প্রযুক্ত যুবকদিগের নৈতিক অবনতি হইতেছে। তজ্জন্য এক্ষণকার লোকেরা শঃ সংশয়বাদী, স্বার্থপর ও ইউরোপীয় বিলাসানুরাগী হইতেছে। আমাদিগের শের লোকে ক্রমশঃ পানাসক্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে দিন দিন দরিদ্রতার দ্ধি হইতেছে। এমন কি গবর্ণমেণ্ট সম্প্রদায়ের একজন† নিজ মুখে স্বীকার রিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে পাঁচ কোটী অর্দ্ধাসনে ন যাপন করে। আমাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল—এমন কি গ্রান্ত দেশালাইটী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমদানী করিতে হয়। ভারতবর্ষের মর উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, যদি আমাদিগের স্বদেশীয় রাজা কত; তবে এই দুরবস্থার প্রতিকার হইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন ধারণবর্গের সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহা হওয়া কর্ত্তব্য। হে হিন্দু মহোদয়গণ! পনারা এই দারুণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি কোন চেষ্টা করিবেন না? পনারা কি আলস্য নিদ্রায় চিরকাল যাপন করিবেন? পুরাকালে পৃথিবীর ল জাতির মধ্যে হিন্দু জাতির যে অগ্রণীপদ ছিল, সেই অগ্রণী পদে তাহাকে ঃস্থাপিত করিতে কি আপনারা সচেষ্ট হইবেন না? চিরকাল পরমুখাপেক্ষী য়া থাকিলে কি এ কার্য্য কখন সাধিত হইতে পারে? গবর্ণমেণ্টের উপর ল বিষয়ে এত নির্ভর করেন কেন? আপনারা কি এমন প্রত্যাশা করেন যে, অন্ন আপনারা ভক্ষণ করেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট আপনাদিগের মুখে তুলিয়া

* পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উপর পুরীর রাজার বংশপরম্পরাগত কর্ত্তৃত্বের উপর ল গবর্ণমেণ্টের হস্তার্পণের যে কথা ভূমিকাতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই, প্রস্তাব মুদ্রিত ার সময় তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন।

† Sir W. W. Hunter.

দিবেন? তাঁহারা বিদেশীয় লোক। আপনারা কি প্রত্যাশা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপনাদিগের উপকার করিতে থাকিবেন? এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট হইতে কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

হিন্দুদিগের উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা করিতে গেলে তাহা ধর্ম্মমূলক করা চাই, যেহেতু হিন্দুরা অতি ধর্ম্মপরায়ণ জাতি। হিন্দু ধর্ম্মের নিয়মানুসারে আহার করে, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে পান করে, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বেড়ায়, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে নিদ্রা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কোন পত্র লিখিতে গেলে ঈশ্বরের নামে পত্র আরম্ভ করে। হিন্দু কোনখানে যাইতে হইলে ঈশ্বরের নাম করিয়া বেরোয়। পৃথিবীতে কোন্ জাতি এমন ধর্ম্মপরায়ণ আছে? ইংলণ্ডের লোক যেমন "অগ্নিস্থান ও গৃহ" (Hearth and Home) বলিলে, কিম্বা জর্ম্মেনেরা পিতৃভূমি (Fatherland) বলিলে, যেমন উন্মত্ত হইয়া উঠে, তেমনি হিন্দুরা ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে। হিন্দু জাতি উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা যদি ধর্ম্মমূলক না করিয়া সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে বুনিয়াদশূন্য ও গাঁথুনিশূন্য আল্গা ইষ্টকের বাড়ী যেমন প্রবল বায়ুর প্রচণ্ড ঝট্‌কাতে পড়িয়া যায়, তেমনি সভা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য মহা হিন্দু-সমিতিকে ধর্ম্মমূলক করা হইয়াছে। এই জন্য এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের স্তব করিয়া সভা আরম্ভ হইবে এবং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেব পূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, কারণ ভারতমাতার হিতার্থ একত্রিত হওয়া অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্মক্রিয়া শ্রেষ্ঠতর?

মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপন করিতে গেলে হিন্দু কাহাকে বলা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। হিন্দুয়ানী খাওয়াদাওয়ার উপর নির্ভর করে না, এ কথা বলিলে পাঠকবর্গ বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা জ্যামিতি প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুরা বন্যশূকর-মাংস ভক্ষণ করে না, রাজপুত হিন্দুরা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুরা কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে না—কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া মান্দ্রাজের সকল হিন্দুরা তাহা খাইয়া থাকে। পাঞ্জাবের শিখ হিন্দুরাও ঐরূপ করে। ইহা সকলেই জানেন যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের সহিত ব্যবহারে হিন্দুদিগের পান পানি

য়েব নাই। কাশ্মীরের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা বাজার হইতে মুসলমান ভৃত্য দ্বারা
ই মাংস ক্রয় করিয়া আনাইয়া ভক্ষণ করেন, কেবল পরিবেশন সময়ে স্বজাতীয়
কে হাতে করিয়া দেয়। তবে আহার সম্বন্ধে এক বিষয়ে নিয়মের কাঠিন্য
ছে সন্দেহ নাই। গো-খাদককে কখনই হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যাইতে
রে না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, খাওয়াদাওয়ার উপর হিন্দুত্ব নির্ভর
ন্ন না। হিন্দুত্ব পরিচ্ছদের উপর নির্ভর করে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন
শবাসী হিন্দুদিগের পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দুত্ব রীতিনীতির উপরেও তত
র্ভর করে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি
ন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মণদিগের কুশণ্ডিকা করিয়া বিবাহ ও বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠি বদল
য়া বিবাহ করা কত ভিন্ন, কিন্তু উভয়েই হিন্দু। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার
রিতে হইবে যে, সকল হিন্দু জাতির কতকগুলি সাধারণ আচার ব্যবহার
ছে। হিন্দুত্ব ধর্ম মতের উপর নির্ভর করে না। শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে মতের
ন্তর কত! সাধারণ হিন্দুর মত জৈন সম্প্রদায়ের মত হইতে কত বিভিন্ন,
ন্তু জৈনেরা হিন্দু। তবে হিন্দুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে? যে যে বিষয়ের
র হিন্দুত্ব নির্ভর করে, তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ভারতীয়
র্য্যবংশোদ্ভব না হইলে হিন্দু বলা যায় না। অন্যান্য আর্য্য জাতির যে সকল
শারীরিক লক্ষণ আছে, ভারতীয় আর্য্যদিগের তাহা আছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে
আর্য্য জাতি হইতে পৃথক করা যায়। ভারতীয় আর্য্যেরা যে সকল জাতিকে
র্য্য শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেও আর্য্য বলিয়া গণ্য করিতে
বে যথা—মান্দ্রাজের ব্রাহ্মণ ছাড়া নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ও যে সকল সাঁওতাল
ন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে জাতি রামায়ণ ও মহাভারত ও
ষ্টাদশপুরাণ জাতীয় পুরাকালীন ইতিহাস অথবা প্রবাদভাণ্ডার বলিয়া মান্য
র না, তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ
জাতির আদি ভাষা সংস্কৃত ও আধুনিক ভাষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে
ৎপন্ন কোন ভাষা অথবা যে ভাষা আদৌ সংস্কৃত নহে, কিন্তু যাহাতে প্রচুররূপে
স্কৃত শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন ভাষা—যেমন মান্দ্রাজের ভাষা—
জাতি হিন্দুজাতি। চতুর্থতঃ যাহারা হিন্দু তাহারা সংস্কৃত নাম অথবা সংস্কৃত
ষা হইতে উৎপন্ন কোন নাম ধারণ করে। পঞ্চমতঃ যাহারা পরব্রহ্মকে
থবা কোন দেব অথবা দেবীকে পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা হিন্দু।

পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। এক স্থলে মাত্র এই নিয়মে ব্যভিচার আছে। জৈনেরা পরব্রহ্মের উপাসনা করে না, কিন্তু তাহারা হিন্দু তাহাদিগের প্রধান দেবতা তীর্থঙ্কর, কিন্তু তীর্থঙ্কর সংস্কৃত নাম। জৈনেরা হিন্দু দেবদেবীকে তীর্থঙ্করের নিম্নপদস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু যাহা হউক হিন্দু দেবতাতে বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত তাহারা হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়। এই এক ব্যভিচারস্থল ব্যতীত পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। হিন্দু দিগের ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এক।

আমি আমার প্রস্তাবে ব্রাহ্মদিগকে এবং বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিয়াছি। যখন পরব্রহ্মকে সকল হিন্দুশাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছে এবং পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা, তখন যাহারা তাঁহার বিশেষ উপাসক, তাহাদিগকে কেন হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারি না। হিন্দুশাস্ত্রে নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠাধিকার এবং সাকার উপাসনা কনিষ্ঠ অধিকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা হিন্দু বলিয়া কেন গণ্য হইবেন না, তাহা বলিতে পারি না যখন কবিরপন্থী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, শিখ, সাধ, চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনন্যকুল বৈষ্ণব, যাঁহারা জাতিভেদ আদৌ স্বীকার করেন না, যখন জৈনেরা পর্য্যন্ত—যাঁহাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা সাধারণ হিন্দুর উপাস্য কোন দেবতা নহে, ইহারা পর্য্যন্ত যখন হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়েন, তখন ব্রাহ্মেরা কেন হিন্দু বলিয়া গণ্য হইবেন না? যে সকল বিলাত-ফেরত ব্যক্তি হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারা হিন্দু বলিয়া কেন গণ্য হইবেন না তাহাও বুঝিতে পারি না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গোখাদক কখনই হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু আমরা জানি যে, যাঁহারা ইংরাজী খানা খান, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ গোখাদক নহেন। কোন বিশেষ হিন্দু বিলাতে গরু খাইয়াছেন কি না, কিম্বা এখনও খান কি না, সে বিষয়ে আমা-দিগের খানাতল্লাসী করা কর্ত্তব্য নহে। প্রস্তাবিত মহাহিন্দু-সমিতির একটী নিয়ম এই যে, সমিতি গোরক্ষণে ও গোজাতির উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন। এই নিয়ম জানিয়াও যে ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইবেন, তাঁহাকে গোরক্ষায় যত্নবান, অতএব গোখাদক নহে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

মহাহিন্দু-সমিতিতে যোগ দেওয়ার প্রতি কোন হিন্দু কোন আপত্তি করিতে রেন না, বিশেষতঃ যখন উহাতে খাওয়াদাওয়ার কোন ব্যাপার নাই।

আমাদিগের সকলেরই এই কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে,

মরা যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।

ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল। বৃদ্ধ হিন্দু

মহাহিন্দু-সমিতি নামে একটী মহাসমিতি সংস্থাপনের সূচনা।

"ছিন্ন, ভিন্ন, হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল
করিতে কি ভয়?"

জাতীয় সঙ্গীত।

(১) কেবল হিন্দুরা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। যে কেহ হিন্দুকুলোদ্ভব ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মেতে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন তিনিই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। হিন্দুরা দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। বৈদান্তিক ও ব্রাহ্ম নিরাকারবাদী হিন্দু। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক, তথাপি যখন তাঁহারা বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তখন হিন্দু-সমাজের যেমন অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়, সেইরূপ হিন্দু তাঁহাদিগকেও গণ্য করা কর্ত্তব্য। বিলাত-ফেরত হিন্দুরা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এই দলভুক্ত। সকল প্রকার হিন্দু এই মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারেন।

(২) হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন করা মহাহিন্দু-সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদিগের প্রিয় পদার্থ, এমন আর কিছুই নহে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সময়ে নিমতলার ঘাটে শবদাহ বিষয়ক এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাসসময়ে শালগ্রাম শিলার অবমাননা উপলক্ষে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজীতে শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্মেরা

সাধারণ হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদিগের প্রিয় পদার্থ এমন আর কিছুই নহে এবং হিন্দুসমাজে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকারের প্রতি হস্তার্পিত হইলে, সমস্ত হিন্দুসমাজ সমবেত হইয়া যেন একটী মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করে।

(৩) দ্বিতীয় পেরাগ্রাফের প্রথমে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সকল সাধন করিবার জন্য মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষস্থ সকল হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী ১৮৫৭ সালে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমতী ভারত-সাম্রাজ্ঞেশ্বরী দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের রাজ্যভার-গ্রহণ উপলক্ষে তিনি যে মহা ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন, বিনীত অথচ আশ্বাসিত চিত্তে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সমিতি উক্ত কার্য্য সাধন করিবেন। ইহা যথার্থ যে, হিন্দুদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অথবা জাতিভেদ সম্বন্ধীয় বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু এক রাজার অধীন হওয়াতে রাজভক্তিতে ও রাজনৈতিক উন্নতির আশাতে সকল হিন্দু ঐক্য আছে। এতদিন উক্ত ঐক্য নিগূঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে উক্ত রাজকীয় মহৎপত্রী সমস্ত হিন্দুজাতির দৃষ্টিসম্মুখে সেই ঐক্য জাজ্বল্যমানরূপে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকল হিন্দু-সম্প্রদায় ও জাতি পরস্পর সদ্ভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং উক্ত রাজকীয় মহাপত্রী অনুসারে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে এবং সাংসারিক উন্নতি ও সৌভাগ্যের সমান আশা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অনায়াসে জাতীয় উন্নতি সাধন করিবার জন্য আপনাদিগের মতবিভেদ ও জাতি-বিভেদ ভুলিয়া ঐক্য ভাবে কার্য্য করিতে পারে। ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর সকল হিন্দুর উপাস্য, তিনি আত্মার আত্মা ও হৃদিস্থিত, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের অথবা গুণের রূপকমাত্র। ঈশ্বর আত্মার আত্মা ও হৃদিস্থিত, এভাব অন্য কোন ধর্ম্মে নাই কেবল হিন্দুধর্ম্মে আছে। হিন্দুধর্ম্মের এই সাধারণ ভাব, হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার যাহা ভারতবর্ষের সকল হিন্দু জাতির আছে, হিন্দুদিগের সাধারণ গৌরব সূচক পুরাকালের মহিমার প্রবাদ—এই সকলকে পত্তন-ভূমি করিয়া, ভারতবর্ষীয় সমস্ত হিন্দু জাতির উল্লিখিত ঐক্য সাধন হইতে পারে। প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও উক্ত মহিমার প্রবাদ সকল অবলম্বন করিয়া পতিত জাতি উত্থিত হইতে সমর্থ হয়। আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত উক্ত ঐক্য সাধন হইতে পারে না, যে হেতু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আচার ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ

আমাদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ হইতে বিভিন্ন—কিন্তু যখন আমরা একদেশবাসী ও এক রাজার অধীন, তখন তাঁহাদিগের সহিত অন্য ঐক্য না হউক, রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্য সাধিত হইতে পারে। তাহার প্রমাণ, সুরেন্দ্র বাবুর কারাগার-গমন সময়ে মহারাজনৈতিক আন্দোলন এবং লর্ড রিপণের বিলাত গমন সময়ে তাঁহার অভিনন্দনে হিন্দুমুসলমানের ঐক্য। আমাদিগের সহিত মুসলমান ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়েও এক প্রকার ঐক্য সাধন হইতে পারে। সুরেন্দ্র বাবুর কারাগার উপলক্ষে জজ্ নরিস কর্ত্তৃক শালগ্রাম শিলার অবমাননা লইয়া যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে উক্ত অবমাননার কার্য্য দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকার আক্রমণ করা হইয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতিবাদার্থ মুসলমানেরা হিন্দুর সহিত এক হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে পাটনা নগরে কোন মৌলবী উক্ত আক্রমণের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ প্রকার ঐক্যসাধন ব্যতীত মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের গাঢ় সম্মিলন পূর্ব্বে উল্লিখিত কারণ সকল জন্য অসম্ভব। কিন্তু হিন্দুদিগের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ প্রিয় বস্তু রক্ষা জন্য তাঁহাদিগের এইরূপ সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। এই সূচনাপত্রের প্রণেতা হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। মহাদেশ-সাধারণ-সভা (National Congress) এবং প্রজাসমিতিতে (Mass-meeting) এই প্রকার ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত বিশেষ সম্মিলন হওয়া অসম্ভব। যে প্রণালীতে মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, এইরূপ প্রণালী অনুসারে তাঁহাদিগের জাতীয় ভাবানুযায়ী আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের দ্বারা একটি মহা-মুসলমান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং এই উভয় সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনে একত্র কার্য্য করিতে পারে। মুসলমানদিগের সহিত রাজনৈতিক ঐক্যসাধনবিষয়ে জাতিগত প্রতিবন্ধক থাকিতে দেওয়া উচিত হয় না। আবার এদিকে আমাদিগের স্বজাতির অর্থাৎ হিন্দুজাতি উন্নতি জন্য যদি আমরা একটি সমিতি স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করি; মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত গাঢ় সম্মিলন অসম্ভব বলিয়া মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপন না করা বিধেয় নহে। সকল দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সকল কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য হওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) মহাহিন্দু-সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে,* তাহাতে "ঈশ্ব ও মাতৃভূমি" এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এই বাক্যের নিম্নে একটি পদ্ম পুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে। পদ্মপুষ্প এ দেশে ঈশ্বরের সৃজন-শক্তি এবং দে পূজার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গণিত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু দেবদেবী পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত সহস্র প্রকারে জড়িত রহিয়াছে। উহা এই দেশে ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপও গণ্য হইতে পারে। যেম গোলাপ পুষ্প ইংলণ্ডের চিহ্ন, মিসেলটো পুষ্প স্কটলণ্ডের চিহ্ন, শ্যামরক পুং আয়র্লণ্ডের চিহ্ন. স্থলপদ্ম ফ্রান্সের চিহ্ন, তেমনি পদ্ম ভারতবর্ষের চিহ্নস্বরূপ গ হইতে পারে। মহাহিন্দু-সমিতির প্রত্যেক সভ্য উক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন মহাবাক্য নিজ নিজ অঙ্গুরীয়ের উপর অঙ্কিত করিয়া তাহা ধারণ করিবেন এইরূপ অঙ্গুরী ধারণ মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইবে।

(৫) হিন্দুদিগের মতে সকল বিষয়েরই ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে মহাহিন্দু-সমিতির অধিবেশনে হিন্দুসমাজের সকল প্রকার উন্নতি অর্থা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কেবল সাধারণ হিন্দুবর্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে যেমন ঘোরতর মনোবাদকারী তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা, এই সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে সেরূপ তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সামাজিক বিষয় আদবে বিতর্কিত হইবে না। যেহেতু উহা হিন্দুসমাজের মধ্যে ঘোরত বিবাদস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা আলোচনা করিতে গেলে সভ্যদিগে মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। সমাজসংস্কার কার্য্য স্বতন্ত্ররূপে সমাজসংস্কারকের হস্তে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধের বিষয় লইয়া তর্ক হইবে। প্রস্তাব পাঠ ও তর্ক ব্যতীত

* "Patriotism, the life flowing out of national instincts, is one of th characteristic types of true spiritual life in a nation ; and from this point c view, a banner, a flag, a color, an emblem of any kind that has become asso ciated with a nation, must always be sacred. That nation is near destruction if not already destroyed, that has no outward symbol of its unity round which and under which its sons can gather."

The "Dawn" quoted in the "Liberal" 9th April, 1884

মিতিতে এমন সকল বক্তৃতা পাঠ করা হইবে, যাহা ভারতের পূর্ব্ব-মহিমার
ত সভ্যদিগের মনে জাগরিত করিয়া এবং ভারতের বর্ত্তমান অনুন্নত অবস্থার
তি তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ
জাতীয় ভাব অবতারিত এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে
ক্য সাধন করিতে পারে।

বক্তৃতার নমুনা

"হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের
ঙ্গ কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত
লে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী-তীর-বাসী আদিম
র্য্যদিগের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট
ম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং হি নো
তা" "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্," "স্বাদু সখ্যং সাধী প্রণীতি" "ত্বং
স্মাকং তবাস্মি।" "তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা"
ুমি সখা পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা," "তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু,
ম আমাদিগের, আমরা তোমার।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের
শ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি
লিয়া গিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহতং গুহায়াং পরমে
্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" "যিনি সত্যস্বরূপ,
নস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থিত বলিয়া
নেন, তিনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ
রেন।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই
রণীয় আর্য্যমূর্ত্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন, "শান্তং
বমদ্বৈতং" "তিনি শান্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈতস্বরূপ।" যখন
মরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর
টাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন,
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।" "আপনার মঙ্গলের যাহা
তিকূল, পরের প্রতি তাহা করিবে না।" যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ
রি, তখন আমাদিগের মনের সম্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের
রণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন "যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং

বালকাদপি অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।" "বালক যদি যুক্তিযু বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলে তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, আমাদে মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন দূর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যি পিতৃসত্যপালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয় ছিলেন ও সংযত মনের এবং পরস্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্ব্বোত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষে সেই নন্দের নন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েন, যিনি জ্ঞানীর শিরোমণি প্রেমিকের শিরোমণি, যিনি ধর্ম্মবক্তার প্রধান, যাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদগীত সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকর্ত্তৃক বেদের পরেই সর্ব্বপ্রধা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কালে ভারতবর্ষে ও ইয়ুরোপখণ্ডে উভয়ত্রই স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে, যিনি ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের সংস্থাপক অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি, যাঁহা বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্রসকল স্বীয় স্বীয় রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্ত রূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার পরমাদ্ভুত চরিত্র মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে চিরকালই হার মানিয়াছে ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মু যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্ম শব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, সেই অলোক-সামা পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনা মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এব শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদে প্রদান করিয়াছিলেন। ওই নাম উচ্চারিত হইলে, সেই মহাযনা রাজর্ষি জনক আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত্ত অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্খলিত হইতেন না এই নাম উচ্চারণ করিলে, মহাত্মা পুরুকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজাণ্ডারে নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজাণ্ডার "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবে" এই উত্তর দিয়াছিলেন

ন্দুনাম কি মনোহর! ঐ নাম কি আমরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারি? ই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, াঞ্জাবী, রাজপুত, মাহারাট্টা, মাদ্রাজী—সমস্ত হিন্দুগণ এক হৃদয় হইবে; াহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার স্বাধীনতা-াভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্য-শোণিতের শষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমরা এ নাম রিত্যাগ করিব না। আমরা আমাদিগের জাতীয় ভাব কখন পরিত্যাগ রিব না। মহাত্মা নিউমান বলিয়াছেন, "জাতীয় ভাব প্রত্যেক সুস্থমনা ব্যক্তি ক্ষে মাতা এবং স্ত্রীর ন্যায় প্রিয় ও পবিত্র বস্তু। আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনাম রিত্যাগ করিয়া সম্যকপ্রকারে কি অন্য জাতির ক্রীতদাস হইব? আমরা খনই এইরূপ ক্রীতদাস হইব না। আমাদিগের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনা-দিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি ন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। হিন্দুরা প্রাচীন কালে তাহাদিগের ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি হিন্দুদিগের পৈতৃক অধিকার। বাহ্য বিষয় সম্বন্ধীয় সভ্যতা অপেক্ষা াধ্যাত্মিক সভ্যতা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যেমন আমরা পূর্ব্বকালের আধ্যাত্মিক সভ্যতা ক্ষা ও বৃদ্ধি করিব, তেমনি বাহ্য সভ্যতাও বৃদ্ধি করিব। আমরা আশা করি, এই রূপে আমাদিগের জাতি পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রণী হইবে; কিন্তু আমরা যদি জাতীয় ভাব হারাই, তাহা হইলে এইরূপ অগ্রণী-পদ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়াছি। আবার কি সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা আমাদিগকে হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন; "যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্দ্ধেক পুরুষত্ব হারায়।" যদি আমরা সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদিগের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে কি মনের বীর্য্য থাকে? মনের যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতিলাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এই রূপে সর্ব্বপ্রকারে পর-হস্ত-গত হইয়া কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ত ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল,

পুনরায় হিন্দুজাতি সেই বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ও ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্‌টন স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছে "Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam."—আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি "আমি দেখিতেছি, আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় বীরত্বগৌরবে স্পন্দন করিতেছে এবং দৈববিক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে। হিন্দুজাতির কীর্ত্তি হিন্দুজাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ বক্তৃতা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যগণ নানাস্থানে বিঘোষিত করিবেন।

(৬) ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সকল সংস্থাপিত হইবে। এই সমস্ত শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু-সমিতি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) প্রত্যেক শাখায় একজন সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইবেন। যদি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য অথবা শাস্ত্রী-শ্রেণী মধ্যে তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে না করিয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে মনোনীত করা যাইবে।

(৮) যে ঘরে শাখা-সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দ্বারে নারিকেল ফল ও আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ সংস্থাপিত হইবে। যে গালিচা বা মাজুরির উর্পরে অধিবেশন হইবে, তাহার মধ্যস্থলে পুষ্পপূর্ণ পুষ্পপাত্র শোভার্থ রাখা হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত ভারতীয় চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি ও "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য-অঙ্কিত ধ্বজা প্রতি অধিবেশনে সভাগৃহের উপরে সংস্থাপিত হইবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধুনা পোড়া

ইবে ও ধূপ, দীপ জ্বালা হইবে এবং শঙ্খধ্বনি করা হইবে। দিবসে অধিবেশন হইলেও দীপ জ্বালা হইবে।

(৯) সম্পাদক, উপস্থিত সকল সভ্য যেরূপ আপনি আপনি বসিয়া গিয়াছেন, সেই অনুসারে সকলের কপালে চন্দনচিহ্ন ও গলায় মালা দিয়া সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিবেন। তার পর সভাপতি সকল হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপযোগী, ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত স্তব দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন; সভ্যেরাও তৎসময়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্॥"

"তুমি মুমুক্ষু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের উৎকৃষ্ট আশ্রয়, তুমি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক ও নিত্য পুরুষ। তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই এবং তোমার প্রভাব অনন্ত। আমি দেখিতেছি তোমার বাহু অনন্ত, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র এবং প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ। তুমি স্বতেজে এই বিশ্বকে প্রদীপ্ত করিতেছ। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তুমি পরমধাম। হে অনন্ত! তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় তোমাকে সহস্রবার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার। তুমি অনন্তপ্রভাব, তুমি অমিতবিক্রম, সকলই তোমার আয়ত্তাধীন অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তুমি চরাচর ভুবনের পিতা, তুমি পূজ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা

গুরু। ত্রিলোকে তোমার সমান কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিকও ে নাই। তোমার প্রভাব অসীম। তুমি স্তবনীয় ঈশ্বর, এই জন্য আমি তোমা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি; তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।"*

সভাপতি উক্ত স্তব উভয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় পাঠ করিলে পর সক সাষ্টাঙ্গে ঈশ্বরকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইলে সভাপ বলিবেন, "ঈশ্বরের যে অমিত প্রভাব আমি এক্ষণে কীর্ত্তন করিলাম, ে প্রভাবের অণুমাত্র আমাদিগের উপর অবতরণ করিয়া আমাদিগের সমি পবিত্র কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুক। ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া যাহাকে আমি মাত্র কীর্ত্তন করিলাম, তিনি আমাদিগের প্রিয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন তৎপরে সভাপতি ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রের কেবল মাত্র নিম্নলিখিত বাঙ্গ অনুবাদ পাঠ করিবেন।

"একত্রে গমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের মন এক বলিয়া জা তোমাদিগের মন এক হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদি চেষ্টা এক হউক, তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদিগের অনুগামী হইবে।"

উক্ত মন্ত্রার্থ পঠিত হইলে পর, উপস্থিত সভ্য সকল উল্লিখিত দণ্ডায়ম অবস্থায় থাকিয়া সমস্বরে বলিবেন, "আমরা ঐরূপ করিব, আমরা ঐরূপ করি জাতীয় ঐক্যকে নমস্কার করি, জাতীয় ঐক্যকে নমস্কার করি।" তৎ সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ উল্লিখিত দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিয়া সমঃ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই শোকার্দ্ধ তিনবার পাঠ করিবে তৎপরে উপবিষ্ট হইবেন। তৎপরে কোন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলি আর্য্যনামাবলী পাঠ করিবেন। এই আর্য্যনামাবলীতে ভারতবর্ষের বিখ্য আর্য্যদিগের নাম উল্লেখিত আছে। মহাহিন্দু-সমিতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা স আপন আপন অভিমতানুসারে তাহাতে নূতন নাম সংযুক্ত করিতে পারে আর্য্যনামাবলী পঠিত হইলে পর সাধারণ হিন্দু মহাত্মাদিগের কীর্ত্তনপূর্ণ গীত হইবে। ঐ আর্য্যনামাবলী ও গান ইহার পরেই দেওয়া গেল।

---

* ভগবদ্গীতা হইতে সঙ্কলিত এই স্তোত্র জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহা নিকটে ঋণী আছি। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা প্রকার আকারবাদীর সভার নিমিত্ত প্রকার অসাম্প্রদায়িক স্তোত্র না হইলে চলে না।

আর্য্যনামাবলী

রাজা

(১) মান্ধাতা
(২) পুরুরবা
(৩) সগর
(৪) দিলীপ
(৫) ভগীরথ
(৬) অজ
(৭) দশরথ
(৮) পরশুরাম
(৯) শ্রীরামচন্দ্র
(১০) লব
(১১) কুশ
(১২) জরাসন্ধ
(১৩) দুর্য্যোধন
(১৪) যুধিষ্ঠির
(১৫) নন্দ
(১৬) মহানন্দ
(১৭) চন্দ্রগুপ্ত
(১৮) হরিশ্চন্দ্র
(১৯) তেজশেখর
(২০) বিক্রমাদিত্য
(২১) দেবপাল দেব

বীর

(১) রাম
(২) লক্ষ্মণ
(৩) শ্রীকৃষ্ণ
(৪) ভীম
(৫) অর্জ্জুন
(৬) ভীষ্ম
(৭) কর্ণ
(৮) দ্রোণ
(৯) কৃপ
(১০) বঙ্গদেশের বিজয় সিংহ
(১১) পুরু (সেকন্দার সাহার প্রতিপক্ষ)
(১২) কাশ্মীরের ললিতাদিত্য
(১৩) পৃথুরায়
(১৪) রাণা প্রতাপ সিংহ
(১৫) শিবজী
(১৬) যশোমন্তরায় হোলকার
(১৭) রণজিৎ সিংহ

বীরাঙ্গনা

(১) সীতা
(২) সাবিত্রী
(৩) দময়ন্তী
(৪) দুর্গাবতী
(৫) পদ্মাবতী
(৬) সমরশীর স্ত্রী কর্ম্মদেবী
(৭) পত্তুর মাতা কর্ম্মদেবী
(৮) পত্তুর ভগিনী কর্ণাবতী
(৯) পত্তুর স্ত্রী কমলাবতী

কবি

(১) বাল্মীকি (৪) ভবভূতি
(২) ব্যাস (৫) মাঘ
(৩) কালিদাস (৬) শ্রীহর্ষ
(৭) জয়দেব

দার্শনিক

(১) ব্যাস (৫) কপিল
(২) বশিষ্ঠ (৬) পতঞ্জলি
(৩) গৌতম (৭) কণাদ
(৪) জৈমিনী (৮) শঙ্করাচার্য্য
(৯) মাধবাচার্য্য

পুরাবৃত্ত লেখক

(১) রাজতরঙ্গিণীর লেখকগণ

জ্যোতির্ব্বেত্তা

(১) বরাহমিহির (২) ভাস্করাচার্য্য
(৩) আর্য্যভট্ট *

গীত।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

আর্য্যগুণনিধিগণে করহে স্মরণ,
ধরাধামে সে নিধির নাহিক তুলন।
আর্য্য-শূর সম শূর, আর্য্য-কবি সম কবি,
আর্য্য-জ্ঞানী সম জ্ঞানী, মিলিবে কোথায়?
খুঁজে এস, ত্রিভুবন।
মনে কর না এমন, পুনঃ হবে না কখন,
ভারত-আকরে এ হেন গুণ-রতন।

* সংস্কৃত ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনীন ভাষা এবং সংস্কৃতে লিখিত পুস্তক সকল, ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির সাধারণ সম্পত্তি হওয়াতে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাগণের নাম ফর্দ্দে উঠিয়াছে।

(২)

য়ুনান জাগিল, ইটালী জাগিল,—
জাগিবে না কি ভারত পুনঃ ?
নব রবি সম জাপান উদিল,
উদিবে না কি ভারত পুনঃ ?
গাইবে নাকি দ্বিতীয় বাল্মীকি ? যোধিবে না কি দ্বিতীয় অর্জ্জুন ?
চিন্তিবে না কি দ্বিতীয় শঙ্কর ? গণিবে না কি দ্বিতীয় ভাস্কর ?
নব্য ভারত হবে কি ন্যূন ?

(৩)

আর্য্য-গুণ নিধি স্মরি, পদ-চিহ্ন অনুসরি
উন্নতি বন্ধুর পথে চলহ সকলে।
ধর্ম্মরূপ বর্ম্মপরি, ধৃতি অসি করে ধরি,
কুসমূহ * সনে রণ করহ সকলে।

(৪)

ঈশ্বর উপরে, সাহস অন্তরে,
লাগ লাগ ভারত উদ্ধারে।
অসুর-নিচয় হইবে হে জয়,
ধর্ম্ম যুদ্ধে কে বারিতে পারে ?
নিত্য স্বর্গ তার যে হে একবার
সে সমরে প্রাণ দিতে পারে।

আর্য্যনামাবলী পঠিত ও উক্ত গান গীত হইলে অধিবেশনের নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(ক) শাখা সমিতি অথবা সমস্ত সমিতি দ্বারা অনুষ্ঠায়মান হিন্দুজাতি ধারণের উন্নতিসাধক কোন কার্য্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ।

(খ) সমস্ত হিন্দুজাতির অথবা স্থানীয় হিন্দুদিগের সাধারণ কুশল-সাধক বিষয় সম্বন্ধীয় কোন লিখিত প্রস্তাব যদি কোন সভ্য পাঠ করিতে চাহেন, তাহা পাঠ করিবেন।

* সকল প্রকার মন্দ।

(গ) সভ্যদিগের দ্বারা উক্ত প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা।

(ঘ) স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক বক্তৃতা।

যদ্যপি সমিতির কোন অনুষ্ঠায়মান কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিবেচনার বিষয় থাকে, প্রস্তাব পাঠ ও বক্তৃতা না হইয়া কেবল তাহাই আলোচিত হইবে। বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাঠ অপেক্ষা কার্য্য অধিক প্রয়োজনীয়। সভার কার্য্যের পরে "বন্দে মাতরং," "জয় ভারতের জয়" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে। পরিশেষে জাতিসাধারণ রাজ-মঙ্গল-গীতি National Anthem গীত হইলে এবং সভাপতি আশীর্ব্বচন ঘোষিত করিলে সভা ভঙ্গ হইবে। জাতি-সাধারণ রাজ-মঙ্গল গীতি গীত হইবার সময় সকলে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

(৯) স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু সীমন্তিনীগণ যে ঘরে সমিতির অধিবেশন হইবে তাহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ঘরে বসিবেন। দুই ঘরের মধ্যে একটি পরদা ফেলা থাকিবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিতব্য ক্রিয়া-পদ্ধতিতে সমস্বরে বলিবার জন্য যে সকল বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল বাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে তাঁহারা পরদার ভিতর হইতে পুরুষদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন। এবং উল্লিখিত গীত সকলের মধ্যে প্রত্যেক গীত পুরুষেরা গাইলে পর, তাঁহারা তাহা গাইবেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি যে সকল দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত আছে, সেখানে উল্লিখিত পরদার আবশ্যক নাই, কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে স্ত্রীলোকের গাওনা হইতে পারে না, সে সকল স্থানে তাহা হইবে না।

(১০) যে স্থানে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষাতে তাহার কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(১১) মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও-দেবনাগর অক্ষর অবলম্বন করিয়া পরস্পর পত্র লিখেন ও আলাপ করেন; সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। ঐরূপ আলাপের জন্য বিদেশীয় ভাষার সাহায্য লওয়া স্বদেশপ্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে তথাকার সভাদিগের উক্ত কার্য্যসাধন জন্য হিন্দি শিখা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা হিন্দি শিখেন, ইংরাজী ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে। ভারতবর্ষের কোন বিশেষ দেশে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যের

রস্পরকে অবশ্যই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে পত্রাদি লিখিবেন। স্বদেশ-প্রেমী ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিদিগের ইহাই করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে, সেই দেশের অতি অল্প লোকেই ইংরাজী জানে, অতএব সেই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতেই সভার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে আলাপ অথবা তাহাদিগকে পত্র লিখিবার সময় হিন্দি (অগত্যা ইংরাজী) ব্যবহৃত হইবে।

(১২) প্রত্যেক গ্রাম বা নগর যেখানে শাখা সমিতি সংস্থিত, সে নগরে অথবা গ্রামে মধ্যে মধ্যে নগর-সংকীর্ত্তন হইবে, তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক বাক্য-অঙ্কিত ধ্বজা সকল হস্তে বাহিত হইবে। ঐ নগরসংকীর্ত্তনে জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে। যদ্যপি শাখার সভ্যেরা খোল করতাল ঐরূপ সঙ্গীতের উপযুক্ত অঙ্গ মনে না করেন, তাহা হইলে অন্য বাদ্য ব্যবহার করিতে পারেন।

(১৩) মহাহিন্দু-সমিতি যুবকদিগের জন্য ব্যায়ামাগার সংস্থাপন করিবেন এবং তাহাদিগকে ব্যায়ামাভ্যাস ও পৌরুষসূচক ক্রীড়া করিতে উৎসাহ প্রদান করিবেন। অস্ত্র-আইন প্রযুক্ত ভারতবর্ষের লোকরা বন্য পশু এবং বন্য পশু অপেক্ষা নির্দ্দয় দস্যু তস্কর হইতে এক্ষণে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম। অস্ত্রের ব্যবহারের অভাবে তাহারা ক্রমে ভীরু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যে জাতি পৃথিবীর অন্য জাতি অপেক্ষা জনসংখ্যায় অধিক এবং এক সময়ে সাহস জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই জাতি উক্ত আইন বশতঃ হীনবীর্য্য ও পৌরুষহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেনা আহরণের উপায় ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে; অতএব মহাহিন্দু-সমিতি উক্ত আইন রদ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিবেন।

(১৪) মহাহিন্দু-সমিতি যত দূর সাধ্য, দেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং য়ুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবেন। আমরা এ বিষয়ে অনেক করিতে পারি, অল্প করিয়া যেন আমরা তাহাই "যত দূর সাধ্য" মনে না করি। মহাহিন্দু-সমিতি দেশীয় শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল এবং কাপড়ের কল প্রভৃতি সংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন।

(১৫) মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির জন্য এবং দিন দিন

গোজাতির যে অবনতি হইতেছে, তাহা নিবারণ জন্য বিবিধ উপা অবলম্বন করিবেন। ভারতবর্ষের লোক কৃষিজীবী। গাভী যেমন তাহাদি উপকারী, এমন অন্য কোন জন্তু নহে; এ জন্য তাহারা গাভীকে অতি পবি জীব জ্ঞান করে। গোদুগ্ধ হিন্দুজাতির প্রধান আহার। তাহা তাহাদিগে বলবীর্য্যের প্রধান কারণ। গোজাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন জন্য চেষ্টা যে সাধারণ হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের উপায়, এমন অন্য কিছু নহে মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষে গোহত্যা নিবারণ জন্য বৈধ আন্দোলন ও চে চেষ্টা করিবেন।

(১৬) মহাহিন্দু-সমিতির মফস্বলবাসী সভ্যেরা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগে হিন্দুনীতি শিক্ষা এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল সংস্থাপ যত্নবান হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের মহিমা ধার্ম্মিকতা বিষয়ে এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা মোচন এবং বর্ত্তম অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সম্পা জন্য বক্তৃতা করিবেন।

(১৭) মহাহিন্দু-সমিতি আপনাদিগের অধীনে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যা সকল স্থাপন করিবেন। সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রাচীন কী সংরক্ষণে সমিতি যত্নবান হইবেন।

(১৮) মহাহিন্দু-সমিতির অধীনে ইংরাজী ভাষার বিদ্যালয় সক নীতিশিক্ষা দেওয়া হইবে। হিন্দুশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত নীতিশিক্ষা দেও হইবে। নীতির কথা বলিতে গেলে ঈশ্বর আসিয়া পড়েন কিন্তু ঈশ্বরের ক এমন ভাবে বলা হইবে যে, কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিক কষ্টদায়ক না হয়।

(১৯) মহাহিন্দু-সমিতির অধীনে বিদ্যালয় সকলে সকল বিষয়ে বিশেষ পুরাবৃত্ত ও ভূগোল বিষয়ে এমন সকল পুস্তক পড়ানো হইবে, যাহাতে ম স্বদেশপ্রেম উত্তেজিত হয়।

(২০) মহাহিন্দু-সমিতির শাখা যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানের শাখাসমি নূতন পুষ্করিণী খনন অথবা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবেন।

(২১) মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যেরা দরিদ্র সভ্যদিগকে সাধ্যমত অর্থানুকূ করিবেন ও সাধারণ দরিদ্রের দুঃখ মোচনে যত্নবান হইবেন।

(২২) মহাহিন্দু-সমিতি বিদ্যালয়োত্তীর্ণ অতি দরিদ্র হিন্দুবালকদিগকে টা

। দিয়া, কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইবেন। তাহাদিগের সচ্চরিত্রের প্রতিষ্ঠা-
। লইয়া ঋণ দিবেন। তাহারা ব্যবসায়ে সফল হইলে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে
ং সমেত উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবে এমন অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিবে।
বসায়ে সফল না হইলে, তাহাদিগকে ঐ টাকা মাফ করা হইবে, কিন্তু এমন
শেষ প্রমাণ দেখাইতে হইবে যে, অনতিক্রমণীয় কার্য্য বশতঃ সাফল্য লাভ
রিতে পারে নাই।

(২৩) মহাহিন্দু-সমিতি বক্তা ও গায়ক ও কথক নিযুক্ত করিয়া
রতবর্ষের নানা স্থানে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল বক্তা ও গায়ক ও কথক
র্য্যকীর্ত্তি-কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে স্বদেশপ্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন, কিন্তু
ং কীর্ত্তন সাম্প্রদায়িকভাবে হইবে না, সাধারণ হিন্দুভাবে হইবে। ইহারা
না স্থানে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সংস্থাপনে ও সমিতির অন্যান্য কার্য্য সাধনে
বান্ হইবেন।

(২৪) ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গ্রামে মহাহিন্দু-সমিতির
খা সংস্থাপিত হইবে। এই সকল শাখা পরস্পর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবেন;
ন্তু সকলেই সমিতির সাধারণ উন্নতি জন্য যত্নবান্ হইবেন। গ্রামস্থ সমিতি
ল নাগরিক সমিতির এবং নাগরিক সমিতি সকল মহানাগরিক সমিতির
াদর্শ গ্রহণ করিবেন। মহানাগরিক শাখাসমিতি সকল নিম্নলিখিত নামে
খ্যাত হইবে।

(১) কলিকাতা শাখাসমিতি
(২) বোম্বাই শাখাসমিতি
(৩) লাহোর শাখাসমিতি
(৪) প্রয়াগ শাখাসমিতি
(৫) মান্দ্রাজ শাখাসমিতি।

সকল গ্রাম্য, নাগরিক এবং মহানাগরিক শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু-সমিতি
মে আখ্যাত হইবে। ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, প্রবল জাতীয়
বে গঠিত উক্ত গ্রাম্য সমিতি সকল ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মহোপকারী
বে।

(২৫) প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের মহানগরে সেই দেশের
কল শাখা-সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের একটি সাধারণ সভা হইবে

এবং প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষের সকল স্থানের শাখা-সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মহাসভা হইবে। এই মহাসভার অধিবেশন কোন বৎসর কলিকাতা, কোন বৎসর বোম্বাই এইরূপ কোন মহানগরে হইবে। মহাদেশ সাধারণ সমিতি National Congress যাহা বৎসর বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে হইতেছে, সেই মহাসমিতিতে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। সেই সকল প্রতিনিধি তথায় আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র কার্য্য করিবেন।

(২৬) প্রত্যেক সভ্যকে সভ্য হইবার পূর্ব্বে সমিতিকে প্রবেশ-দক্ষিণা স্বরূপ এক টাকা এবং বাৎসরিক দাতব্য অন্যূন এক টাকা দিতে হইবে।

এই অনুষ্ঠানপত্র এক্ষণে হিন্দুসমাজের বিবেচনার জন্য অর্পিত হইল। যদ্যপি ইহা কোন গ্রাম অথবা নগর অথবা নগরের বিশেষ পল্লীর ব্যক্তিদিগের মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একেবারেই শাখা-সংস্থাপন করিতে পারেন, পরে ঐ সকল শাখা সভার মধ্যে যোগ সংস্থাপিত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত না এইরূপ যোগ সংস্থাপিত হয়, প্রত্যেক শাখার সভ্যেরা আপনাদিগের সংগৃহীত অর্থ কেবল সেই শাখার ব্যয়ে অর্পণ করিতে পারেন।

বৃদ্ধ হিন্দু

গান্ধীচরিত

দিনচর্য্যা

নোয়াখালি যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বিহারে দাঙ্গা শুরু হইয়া গিয়াছিল। তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গান্ধীজী ১৯৪৬ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোদপুরে থাকিতেই খাওয়ার পরিমাণ অর্ধেক করিয়া দেন; এবং এ কথাও বলেন যে, যদি বিহার শান্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অনশন গ্রহণ করিতে হইবে। নোয়াখালি পৌঁছিবার পর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, বিহারে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন অবস্থা শান্ত এবং আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী পুনরায় ধীরে ধীরে আহারের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেন। সেই জন্য নোয়াখালি জেলায় শ্রীরামপুর গ্রামে থাকার সময়ে প্রথমে তাঁহার যাহা আহার ছিল, ক্রমে তাহার কিছু পরিবর্তন হইতে লাগিল। কিন্তু আহার যেমনই হউক না কেন, গান্ধীজীর

দনন্দিন কাজের পদ্ধতির মধ্যে অনশন বা অর্ধাশনের কারণে সহজে ব্যতিক্রম টিত না। এমন কি রেলে বা ষ্টীমারে যাতায়াতের সময়েও তিনি যথাসম্ভব নচর্যা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

ভোরে ওঠা তাঁহার বরাবরের অভ্যাস কিন্তু ঋতু অনুসারে বা কাজের গাগিদে কখনও কখনও ঘুমের সময় কমাইয়া দিতেন। শ্রীরামপুরে থাকার ময়ে তিনি বেঙ্গল টাইম পাঁচটা, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চারটার ময়ে উঠিতেন। বালিশের নীচে একটি টে কঘড়ী থাকিত, ঐটুকু ঘড়ীর ধ্যেও অ্যালার্মের ঘণ্টা ছিল। কিন্তু অভ্যাসের বশে প্রায়ই তিনি ঘণ্টা াজিবার পূর্বেই উঠিতেন, এবং হয়তো ওঠার কয়েক মিনিট পরে শোনা যাইত, ড়ী বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে বিছানায় গান্ধীজী শুইতেন তাহার পাশে দুটি বেঞ্চিতে কাগজপত্র, লখার সরঞ্জাম ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হইত, এবং পাশে একটি নীচু জল-চৌকিতে দুইটি বোতলে জল ও দাঁতন গোছানো থাকিত। দাঁতনের এক দিক ামরা শক্ত কোন জিনিস দিয়া ঠুকিয়া রাত্রে নরম কুচিতে পরিণত করিয়া াখিতাম। উল্টা দিকে কিছুদূর পর্যন্ত আধাআধি চিরিয়া রাখা হইত, যেন াতনের পর জিব-ছোলার কাজ উহার দ্বারা সহজে সমাধা হয়। একটি মাটা মুখওয়ালা তালমিশ্রীর শিশিতে অর্ধেক জল দিয়া দাঁতনটি রাত্রে ডুবাইয়া াখা হইত; জল কম-বেশি হইলে গান্ধীজী নিজেই জল ঢালিয়া দেখাইয়া দিতেন, ঠিক কতটুকু রাখার প্রয়োজন। পাশে একটি ছোট শিশিতে মিহি াঠকয়লার গুঁড়াতে নুন মিশাইয়া মাজন করিয়া রাখা হইত। আর একটি ড় বোতলে মুখ ধুইবার জল, ও একটি বহুদিনের ব্যবহৃত পরিষ্কার লোহার ামলা থাকিত। বিছানার নিকটে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া খুব কম রিয়া রাখা হইত।

গান্ধীজী একসময়ে প্লুরিসিতে ভুগিয়াছিলেন, সেই জন্য বরাবর তাঁহার র্দির ধাত ছিল। অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই, বিশেষত বাংলা দেশের স্যাঁৎসেঁতে াওয়ায় তাঁহার অতি অল্পেই সর্দি ধরিয়া যাইত। সেইজন্য ভোরে তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইতেন না।

ওঠার পরে মশারির বাহিরে হাত বাড়াইয়া খাটের নীচে রাখা পেশাবদান গ্রহণ করিতেন এবং তাহার পরেই দাঁতন করিতে আরম্ভ করিতেন, কোলের

উপরে লোহার গামলাটি থাকিত। বেশ ভাল করিয়া মাজনের সাহায্যে দাঁতন করিবার পর মুখ ধুইয়া ফেলিতেন। ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিস প্রত্যহ ঠিক একই জায়গায় রাখা চাই। তিনি বলিতেন, এগুলি যদি ঠিক একই জায়গায় না থাকে, অভ্যাসবশে যদি এই সকল কাজ না চলে এক প্রতিদিন জিনিস যদি আমাকে খুঁজিয়া লইতে হয়, তবে অকারণে খানিক সময় নষ্ট হয়। অতএব এগুলি যেন যন্ত্রের-মত চলিতে থাকে, কোন জিনিস খুঁজিবার বা তাহার জন্য ভাবিবার প্রয়োজন যেন না হয়। গান্ধীজীর দাঁত একটিও ছিল না, তিনি মাড়ির উপরেই দাঁতন করিতেন, ভিতরে বাহিরে পরিষ্কার করিয়া দাঁতনের পর মুখ ধুইয়া ফেলিলে আমরা লোহার গামলা সরাইয়া লইতাম। তখন প্রার্থনার আয়োজন হইত।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথমে শ্রীপরশুরাম ও আমি ছিলাম। তখন প্রার্থনার কাজ পরশুরাম চালাইতেন। মাসখানেক পরে আমাদের কাজের বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অবসর কম হইতে লাগিল। তখন মনু গান্ধী আসিলেন এবং প্রার্থনার কাজ তিনিই পরিচালনা করিতেন।

প্রার্থনার সময়ে গান্ধীজী বিছানার মধ্যে প্রথম অংশে বসিয়া থাকিতেন প্রার্থনার সূচনায় লণ্ঠনের আলো খুব কম করিয়া, হয়তো বা একখানি খাতা দিয়া আড়াল করিয়া রাখা হইত। গান্ধীজী বিছানায় এবং আমরা নীচে একটি মাদুর বা কম্বলের উপরে অন্ধকারে বসিয়া থাকিতাম। সর্বপ্রথমে গান্ধীজী ইঙ্গিত করিতেন, 'নম্যো'। মনু তখন গভীর কণ্ঠে তিন বার ধীরে ধীরে বিলম্বিত তালে নিম্নলিখিত জাপানী বৌদ্ধ মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতেন :

নম্যো হো রেঙ্গে ক্যো।

—যাঁহারা বুদ্ধত্ব (আলোক) প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। ইহার পরেই গান্ধীজী বলিতেন, 'দো মিনিটকি শান্তি', অর্থাৎ দুই মিনিটকাল আমরা নিস্তব্ধ হইয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। গান্ধীজীর জপের জন্য একটি তুলসীর মালা ছিল। পুরানোটি কাহাকেও দিয়া দেন, তখন আবার ছোট রুদ্রাক্ষের মত বীজের আর একটি মালা বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনা হয়। তাহাতে ১০৮ দানা ছিল, কিন্তু সে ব্যাপার পাটনা যাত্রার সময়ে ঘটে; অতএব নোয়াখালির সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। যাহাই হউক, দুই মিনিট মৌনকালের মধ্যে গান্ধীজীর হাতে মালা থাকিত। তিনি কোন্ মন্ত্র জপ

করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। দুই মিনিট কাল অতিবাহিত হইলে তিনি নির্দেশ দিতেন, "প্রার্থনা"। তখন মনু ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক পাঠ করিতেন :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

তাহার পর নিয়মানুক্রমে অন্যান্য শ্লোক পাঠ করিতেন। তাহার মধ্যে একটি বিশেষ ভাবে আমার মনে আছে :

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

—আমি রাজ্য বা স্বর্গ অথবা অপুনর্ভব বা মোক্ষ চাই না। দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখের নাশ হউক—ইহাই আমার কামনা।

ওই সময়ে একটি ভজনগান হইত। মনুই গাহিতেন, কিন্তু তিনি বাংলা গান বেশি না জানায় আমাদের শিবিরে যে সকল সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রার্থনায় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদেরই কেহ রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইতে কিছু গান করিতেন। একদিন গান্ধীজী স্বয়ং একটি ইংরেজী কবিতা ওই সময়ে পাঠ করিলেন। সেটির আরম্ভ এইরূপ : Oh Lord ! Our help in ages past.

গান শেষ হইলে কিছুক্ষণ রামধুন বা নামসংকীর্তন হইত। কোন দিন হয়তো "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম", কোন দিন বা নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে" এইরূপ কোনও কীর্তন হইত। গান্ধীজী মৌন অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু রামধুনের সময়ে গায়ের চাদরের ভিতর দিয়াও আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম, তিনি তালি দিয়া তাল রাখিতেছেন।

রামধুন কীর্তনের পর প্রত্যহ গীতা পাঠের নিয়ম ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে একবার করিয়া সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ করা হইত। কোন দিন কোন্ অধ্যায় পাঠ হইত, তাহার তালিকা দিতেছি। শুক্রবার—১ম ও ২য় অধ্যায়; শনিবার—৩য়, ৪র্থ, ৫ম অধ্যায়; রবিবার—৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম অধ্যায়; সোমবার—৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ অধ্যায়; মঙ্গলবার—১৩শ, ১৪শ, ১৫শ অধ্যায়; বুধবার—১৬শ, ১৭শ অধ্যায়; বৃহস্পতিবার—১৮শ অধ্যায়। যে

সময়ে গীতা পাঠ হইত, তখন গান্ধীজী বিছানায় শুইয়া পড়িতেন এবং মনোযোগ দিয়া সব শুনিতেন। পাঠের কোনও ভুল হইলে শুইয়া শুইয়াই তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন; কোনও শব্দ অসাবধানতার বশে ছাড়িয়া গেলে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। একদিনকার ঘটনা হইতে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

সেদিন ২২এ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল। আগাখান প্রাসাদে বন্দিনী অবস্থায় ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ সালে কস্তুরবা গান্ধীর দেহান্ত ঘটে সেই অবধি, প্রতি ইংরেজী মাসের ২২ তারিখে ভোরবেলা সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পড়া হইত। ডাঃ সুশীলা নায়ার এই রীতি প্রবর্তন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থানকালে ২২এ নভেম্বর সমগ্র গীতা পাঠ হইবে বলিয়া গান্ধীজী অপরাপর দিনের চেয়ে বোধ হয় এক ঘণ্টা আগে উঠিলেন। অন্যান্য দিনের মত প্রার্থনা চলিতে লাগিল, গীতাপাঠ একজনের উপরে ভার না দিয়া আমরা কয়েকজন ভাগ করিয়া লইলাম। শ্রীরামপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর সমগ্র বাড়ীঘর দাঙ্গায় পুড়িয়া বা ভাঙিয়া গিয়াছিল তিনি ভোরের প্রার্থনায় যোগ দিবার জন্য আগের রাত্রে আমাদের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপরে সেদিন ১১শ অধ্যায় পাঠের পালা পড়িল অনুকূলবাবু সোজা বাংলা উচ্চারণে গীতাপাঠ করিয়া গেলেন, এবং এত দ্রুত পড়িতে লাগিলেন যে, আমাদের কানেও অনেক সময়ে শব্দগুলি যথাযথভাবে ধরা পড়িল না। অনুকূলবাবুর পরে আবার অপর কেহ পাঠ আরম্ভ করিলেন সমগ্র গীতাপাঠ সমাপ্ত হইলে প্রার্থনাও শেষ হইল।

প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী উঠিয়া বসিতেন; তখন আমরা মশারি খুলিয়া ফেলিতাম। তিনি একটি ছোট জলচৌকি বিছানার উপরে বসাইয়া, লণ্ঠনের আলোয়ে তখন কাজে বসিতেন। সেদিন আমরা মশারি তুলিয়া সরিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গীতাপাঠ কে কে করিয়াছে? অনুকূলবাবুকে ডাকিয়া তিনি তখন কতকগুলি কথা বলিলেন। বলার সময়ে তাঁহার ভঙ্গিতে কোনও উত্তেজনার লক্ষণ ছিল না বটে, কিন্তু যে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে গভীর আবেগের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ইংরেজীতে বলিলেন, 'আমি মৃতজনের স্মৃতিকে এরূপ পাঠের দ্বারা অবমাননা করিতে দিব না। সংস্কৃত উচ্চারণ কঠিন, কিন্তু গীতা

অর্থ এবং সম্যক্ উচ্চারণ তোমাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। কোনও কাজই ঢিলাভাবে করিও না।'

I will not allow you to insult the memory of the dead by such reading. I do not know if the departed soul knows what is happening here. I don't know, but I believe in some way it may be of some good to the soul. At least it is good for our soul.

Sanskrit is difficult, therefore I have taken sufficient pains to learn the correct pronunciation. Pandits in Kashi and Shrirangam read it correctly and I do not pretend to read it as well as they do. But you must learn both the meaning as well as the correct pronunciation before I permit you to read the Gita any more on a similar occasion. I would far rather that we should keep silent than do it in the present fashion.

Never slur over a thing. You never deceive anyone else except yourself.

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী অংশটুকু আমি নিজের ডায়েরি হইতে তুলিয়া দিলাম। কেবল সর্বপ্রথম বাক্যটি উহাতে লেখা নাই। আমার মনে ছিল। কিন্তু বড্ড কড়া শব্দ বলিয়া কি ভাবিয়া জানি না, ডায়েরিতে লিখি নাই; আজও স্মরণে আছে বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম।

যাহাই হউক, পরদিবস অর্থাৎ ২৩এ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল, শনিবার ছিল বলিয়া গান্ধীজী ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায় পর্যন্ত আর আমাদের উপরে ভরসা না করিয়া নিজে পাঠ করিলেন, আমরা তাঁহার নির্দেশমত সামনে গীতা খুলিয়া ধীরভাবে শুনিতে লাগিলাম। গান্ধীজীর উচ্চারণ শুদ্ধ, তিনি নিজে খুব দ্রুত পড়িতেছেন না, এবং পড়ার সময়ে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পড়িতেছেন, অর্থাৎ শুধু মন্ত্রপাঠই করিতেছেন না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। গান্ধীজীর নিজের পাঠ ওই একবারই শুনিয়াছি। অপরাপর সময়ে সুশীলা নায়ার, সুশীলা পাই প্রভৃতি অনেকেরই গীতাপাঠ শুনিয়াছি। মনু ১৯-১২-৪৬ তারিখে শ্রীরামপুরে আসিবার পর তো নিয়মিতভাবেই পড়িত। ইহাদের সকলেরই উচ্চারণ শুদ্ধ নির্দোষ। কিন্তু পাঠ এত দ্রুত হইত যে, আমাদের মত শ্রোতার মনে অর্থাগম হইবার পূর্বেই দ্রুত শ্লোকপাঠের রথ ছুটিয়া চলিত, আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতাম।

দুইটি ঘটনা এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ভোরের প্রার্থনার সময়ে আমরা চার-পাঁচজনের বেশি তো শ্রীরামপুরে প্রায়ই হইতাম না। সেখানে যে ভজন গান হইত, তাহা বাংলাতেই হইত। রবীন্দ্র-সংগীতের উপরেই আমাদের নির্ভর ছিল। এক-আধ দিন ঘটনাচক্রে, যেমন যীশুখ্রীষ্টের

জন্মদিন উপলক্ষ্য করিয়া, হয়তো কোনও গান পড়িয়া লওয়া হই একদিন দৈবাৎ সাংবাদিক বন্ধুদের মধ্যে কেহ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহা অনুরোধ করায় তিনি মীরাবাঈয়ের একখানি ভজন হিন্দী ভাষায় গাহিলে গান এবং প্রার্থনা শেষ হইলে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর গান্ধীজী আমা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হিন্দী ভজনটি গাওয়া হইল, তাহা কি আমরা গাহিতে বলিয়াছিলাম? আমি বলিলাম, সংবাদিক বন্ধু স্বয়ং আপনার প্রীত্য উহা গাহিয়াছেন। গান্ধীজী তখন বলিলেন যে, তিনি বাঙালী হইতে এবং মনে প্রাণেই তাহা হইতে চান। সেইজন্য একান্তেও যখন প্রার্থনা তখনও যেন বাংলা দেশে বাংলা গানই গাওয়া হয়। উহা শুধু ভজন ন গুরুদেবের গান, তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ হ দাঁড়ায়। গুরুদেবের গান তিনি মোটামুটি বুঝিতেন; মাঝে মাঝে কো প্রচলিত শব্দের অর্থবোধ না হইলে মানে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন আমরা শ্রীরামপুর ছাড়িয়াছি। চণ্ডী নামক গ্রামেও তিন-চার দিন অতিবাহিত হইয়াছে। ৭ই জানুয়ারি ১৯৪ সেইদিন হইতে গান্ধীজী প্রতিদিবস এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে যাত্র সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছেন। আমরা সকাল ৭৷৷০ টায় মাসিমপুর অভিমু যাত্রা করিব; কিন্তু তখনও ভোরের অন্ধকার ঘন হইয়া রহিয়াছে। প্রার্থন সময়ে গান্ধীজী গুজরাটীতে "বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ জে পীড় পরাই জা রে" গানটি গাহিতে বলিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন বৈষ্ণব স্থানে মা মাঝে 'ঈশাই' বা 'মুসলীম' শব্দপ্রয়োগ করা হয়। মনু গান গাহি লাগিল। অকস্মাৎ মশারির মধ্য হইতে ভারি গলায়, অনভ্যস্ত হইবে মোটামুটি সাদাসিধা কিন্তু শুদ্ধ সুরে গান্ধীজীর গানের শব্দ বাহির হইয়া আসি লাগিল। আমরা অবশিষ্ট দুই-চারজন অবাক হইয়া সেই শব্দ শুনি লাগিলাম।—

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ জে পীড় পরাই জাণে রে।
পর দুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান ন আণে রে॥
সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে, নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে, ধন ধন জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।

জিহ্বা থকী অসত্য ন-বোলে, পরধন নব ঝালে হাথ রে ॥
মোহ মায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামশুঁ তালী লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমা রে ॥
বণলোভী নে কপট রহিত ছে, কাম ক্রোধ নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়া তেহুঁ দরসন করতাঁ, কুল একোতের তার্যা রে ॥

—বৈষ্ণব জন তো তাহাকেই বলে যে পরের দুঃখ বুঝিতে পারে। অপরের
খে যে তাহার উপকার করে, (কিন্তু) মনে কোনও অভিমান আসিতে
য় না।

সকল মানুষকে বন্দনীয় বলিয়া মনে করে, নিন্দা কাহারও করে না ;
ক্য, কাজ ও মন যে নিশ্চল বা স্থির রাখিতে পারে, তাহার জননী ধন্য।

সকল বিষয়ে যাহার দৃষ্টি সমভাবাপন্ন থাকে, যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছে,
ন্ত্রী যাহার নিকট মাতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, যাহার জিহ্বা ভুলিয়াও
সত্য বলে না, পরের ধনে যে হাত দেয় না ;

মোহ এবং মায়া যাহাকে আচ্ছন্ন করে না, যাহার মনে দৃঢ় বৈরাগ্য
মোন, রাম নাম শুনিয়া যে তালি দেয়, তাহার তনুতে সকল তীর্থ বিরাজ
রে ;

যাহার মন বনে পড়িয়া আছে, যাহার মধ্যে কপটতা নাই, কাম এবং ক্রোধের
গকে যে নিবারণ করিয়াছে,

নরসৈঁয়া বলিতেছেন, এমন লোকের দর্শন করিলে, সমগ্র কুল তরিয়া
য় ॥

প্রার্থনার পরেই গান্ধীজী লণ্ঠনের কাছে বসিতেন। নোয়াখালিতে
ত্যহ তাঁহার প্রথম কাজ ছিল বাংলা পড়া। অক্ষর-পরিচয়ের জন্য নানা বই
সিয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু তাহার মধ্যে শ্রীঅনাথনাথ বসুর 'বড়দের পড়া'
বলম্বন করিয়া গান্ধীজী বাংলা শেখা আরম্ভ করিলেন। বইখানি বড়দের
ন্য লিখিত, কিন্তু বাঙালী বয়স্কদের জন্যই লেখা হইয়াছে। অর্থাৎ ভাষা
হাদের জানা আছে, তাহাদের লেখা ও পড়া শিখিবার জন্য ইহা যোগ্য বই।
ঠক্রম বেশ সহজ ধাপে ধাপে সাজানো। গান্ধীজী ইহাই পড়িতেন ; কিন্তু
ছদিন পরে তিনি বলিলেন, বাংলা ভাষা তাঁহার জানা না থাকায় চলতি
ায় তাঁহার মাঝে মাঝে আটকাইয়া যাইতেছে। গান্ধীজী বলিতেন, বইখানি

বড়দের উপযোগী ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমি তো নয়, আমি শিশুদেরই মত। অতএব শিশুদের উপযোগী পুস্তকই আমার উপযোগী হইবে। সেই সময় নানা বই বাছিয়া হিন্দী ভাষায় লিখিত ব শেখার উপযোগী আর একখানি বই আমরা অবলম্বন করিলাম। গান্ধী প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হাতের লেখা লিখিতেন; প্রত্যহ অন্তত তিন লাইন না-দেখিয়া লেখা চাইই। একদিন আমায় বলিলেন, প্রতি নিয়ম করিয়া অন্তত পাঁচ মিনিট বাংলা অভ্যাস করিতেই হইবে। অবশ্য পাঁচ মিনিট প্রায় রোজই দশ-পনরো মিনিটে পরিণত হইত। নোয়াখালিতে কোনদিনই পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই। বিহা বাংলা পড়া চলিতে লাগিল, দিল্লীতে থাকার সময়ে শেষের দিকে তখ বাংলা পড়া চলিতেছে, খবর পাইয়াছি। নোয়াখালি ছাড়িবার পর গান্ধী দিল্লী হইতে ১৯৪৭ সালের ৯ই মে পুনরায় পাঁচ দিনের জন্য কলিকা আসিয়াছিলেন। তখন সঙ্গে হাতের লেখার অক্ষরে ছাপা দুইখানি বাংলা তাঁহার সঙ্গে ছিল। ছাপা অক্ষর পড়া ছাড়িয়া তখন তিনি প্রত্যহ ঐ বইখ হইতে কিছু কিছু পড়া অভ্যাস করিতেছেন। ছাপা এবং লেখা বাংলা অক্ষ মধ্যে প্রভেদ তাঁহার চোখে বড় বেশি বলিয়া মনে হইত। সেই জন্য উহা আ করিবার চেষ্টা। ঠিক নিয়মিতভাবে তিনি দিনের পর দিন করিয়া চলিতে নিয়মের বা সংকল্প পালনের ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিতে দিতেন না।

ভোরের বেলা ছাড়া অপর সময়ে অবসর পাইলেও বাংলা পড়ার অভ্য চলিত। একদিন সকালে পড়াইতে গিয়া দেখি, নূতন পাঠ আগে হইতে এ পড়িয়া রাখিবার অবসর পান নাই। এক টুকরা কাগজে রহস্য করি পেন্সিলে লিখিয়া আমাকে জানাইলেন:

A pupil to be worthy must make previous preparation for t lesson before the teacher. (সোমবার, ২৩-১২-৪৩)

ইতিমধ্যে প্রায় ভোর ৫৷৷০ টায় (বেঙ্গল টাইম) সময়ে গান্ধীজী বড় এ গ্লাস ভর্তি গরম জল খাইতেন। জলে তিন চামচ, অর্থাৎ প্রায় আধ ছটা বা এক আউন্স মধু ও পাঁচ গ্রেন খাইবার সোডা মিশাইয়া দেওয়া হইত সেই গরম জলের গ্লাসটি বাঁ হাতে কোন রুমাল বা ছোট কাপড়ের টুকরা দি জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতে একখানি কাঠের চামচ দিয়া গান্ধীজী অল্পে অ

ম জল পান করিতেন। তাহার আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে এক গ্লাসে প্রায় রো আউন্স বা দেড় পোয়া লেবুর রস করিয়া আনা হইত। সচরাচর মোসম্বি ংবা শরবতী লেবু অথবা ঋতুঅনুসারে কমলালেবুর রস তৈয়ারি করা হইত তাহার সহিত এক আউন্স বা আধ ছটাক পাতিলেবুর রস চামচ দিয়া লিয়া দেওয়া হইত। ইহাই ছিল গান্ধীজীর প্রাতরাশ।

যে কোন কারণেই হউক, গান্ধীজীর গন্ধ সম্বন্ধে বোধ ছিল না। স্বাদের পর্কে তিনি সাধনা করিয়াই উদাসীন হইয়াছিলেন। কমলা বা মোসম্বির পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলে আনারসের রসও কোনও কোনও দিন য়াখালিতে সকালে ঐ সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে; গান্ধীজী কোনও ন আপত্তি করেন নাই বা সে সম্পর্কে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই।

ফলের রস করিবার জন্ত কাচের এক রকম যন্ত্র পাওয়া যায়; লেবুটিকে টের কাছে আধাআধি ভাগ করিয়া মন্দিরের চূড়া অথবা বরণডালার শ্রীর মত ালো অংশের উপরে চাপিয়া ঘুরাইলেই রস বাহির হইয়া পড়ে। আমরা ন রস করিতাম, তখন খুব সাবধানে করিতাম; অর্থাৎ কোন অপচয় হাতে না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতাম। কিন্তু মনু আসিবার পরে এ সকল র তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। সম্পূর্ণভাবে টিপিয়া সব রসটুকু বাহির করিয়াও তিনি কমলা বা মোসম্বি ফেলিয়া দিতেছেন, ইহা লক্ষ্য রিতাম। অর্থাৎ যেখানে হয়তো দশটি লেবুতে আমরা কাজ সারিতাম, মনুর খানে এগারোটি লাগিয়া যাইত। অবশ্য লেবুর অকুলন আমাদের কোনদিন য়াখালিতে ঘটে নাই; গ্রামের নরনারী ও বাহিরের যাত্রীদলও প্রায়ই লেবু পহার দিতেন। সেরূপ উপহার পাইলে গান্ধীজী সচরাচর সমবেত জনতার ধ্য বালক-বালিকাদের ডাকিয়া ফল বিলাইয়া দিতেন। তাহা সত্ত্বেও মাদের ভাণ্ডারে লেবুর অপ্রাচুর্য হইত না। গান্ধীজীর কড়া নির্দেশ ছিল, ন একটি ফলও নষ্ট না হয়। ফলের রস খাইবার আগে হইতেই গান্ধীজী খার কাজ লইয়া বসিতেন। কোনদিন হয়তো কোন চিঠি পড়িয়া উত্তর তেন, বা গভর্মেণ্টের নিকট নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানাইবার ত থাকিলে সে সম্বন্ধে পত্র লিখিতেন; মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রেরণের জন্ত য়তো বা বিবৃতি রচনা করিতেন। কখনও কখনও দেখিতাম কোনও পুস্তক ঠি করিতেছেন। আমাদের সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষার পুস্তক ভিন্নও প্রায়

৫০।৬০ খানি অন্য বইও ছিল। শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজী মোট ৪২ ছিলেন বলিয়া আমাদের কিছু সম্পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। অলডুস হাক্সলে লি 'পেরেনিয়্যাল ফিলসফি' নামক পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া সুহরাবর্দি সা রচিত 'সেইংস অভ্ মুহম্মদ' প্রভৃতি বই বা প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিধান সং হিন্দী ভাষায় লিখিত বইও আমাদের সঙ্গে ছিল। কদাচিৎ সেই পুস্ত মধ্যে কোন একটি গান্ধীজী হয়তো কিছুক্ষণের জন্য পড়িতেন। কিন্তু তাঁ বেশির ভাগ সময় চিঠিপত্র পাঠ করিতেই অতিবাহিত হইত। সে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করিব।

ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে সাতটা বেলা হইয়া আসিত। সে সময়ে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

মুসাফিরের ডায়েরি

কষ্টিপাথর

শুক্লা একাদশীর রাত; জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা। নদীর ধারে আমরা ক'সে গল্প করছি। মৃদুমন্দ বাতাসে নদীর শান্ত জলে অসংখ্য বীচিবিকে জেগে উঠছে, আবার মুছে যাচ্ছে। এমনই কতশত প্রশ্ন মনে উদয় হ তারই খণ্ডবিচ্ছিন্ন আলাপ চলছিল। কাছে জেলেদের একটি মেছো নৌ তারই পাশে বাঁশের বেড়াজাল পাতা, কয়েকটা মাছ বন্দী হয়ে খলখল করছে। ব্যাঙেরা তারস্বরে সমবেত সঙ্গীত জুড়ে দিয়েছে। ও বালিয়াড়ির সাদা রেখার পারে বাবলাগাছের সারি—মাঝে দু-একটা কুঁ সমগ্র ছবিটা কেন যেন রঙের আভাস দেয় না—একটা উদাস ভাব জাগ

শুধু ব্যাঙের ডাক, বৃষ্টির তো কোন লক্ষণ নেই। গরমটা খুব বেশি—ব দেরিতে নামবে।

এ যেন শুধু বাহ্য আড়ম্বর আছে আর প্রাণরসের প্রকাশ নেই।

ঢং ঢং ক'রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শোওয়ার শেষ ঘণ্টা বেজে উঠ একটু সচকিত হয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে আবার মামুলী কথা কইতে লাগল অনেকক্ষণ পরে একটা শেয়াল পাশ দিয়ে ছুটে গেল। রাত গভীরতর হ বুঝে উঠে পড়লুম, হাতে বাসনের গোছা তুলে নিলুম। শিবিরের সময়-ম

ঃ-বাঁধা দিনের কর্মশেষে এসেছিলুম নদীতে বাসন ধুতে। স্বাধীনতার পূজারী রা, কিন্তু কি পরাধীন নিয়মতান্ত্রিক জীবন! আমরা দুজনে দুই কুটিরের দস্যা। বড় ঘড়িটির দিকে চেয়ে দেখি, কাঁটা ঘুরে ঘুরে একটার কাছে এসে ছ, অর্থাৎ বিলাতী মতে নতুন দিন আরম্ভ হয়েছে। নিতান্ত অন্যমনস্কচিত্তে ছি ঘরের পানে—আমার ঘরটা একটু একান্তে, শিবিরের ডাক্তারখানায় ছই। সহবাসিনীরা নিদ্রামগ্ন—বাতি জ্বলেছে ক্ষীণভাবে, বাতাসে কম্পমান শিখা। ঘরের দাওয়ায় পা দিয়ে উঠতে যাব, হঠাৎ শুনলুম কে যেন নাগলায় ব'লে উঠল—পাঁনি দাঁও না—পাঁান—বড় তেষ্টা।

ভয়ে পাথর হয়ে গেলুম, পা আটকে গেল, শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুতের শিহরণ াকের জন্য। "টুলুদি, একবার শুনুন না।"—ব'লে এগিয়ে দেখি—এক নারী-, অনাবৃত-বক্ষ, কোমরে একটু কাপড় জড়ানো, পেটটা ফোলা, বুকের হাড় াজির করছে, সরু হাত পা, কয়েকগোছা চুল মাথার এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে ছ, হাতে রূপার বালা।

মুসলমানী মেয়ে।

বললুম, কে তুমি? কোত্থেকে এলে এখন?

আমি পাশের গাঁ নলদায় থাকি। জ্বর দেখাতে এসেছিলুম, রোদে আর র ধমকে আর যেতে পারি নি। একটু পানি দাও।

আমার সাড়া পেয়ে অন্যেরা উঠে এল; বললে, দিদি, আমরাও এ শব্দ ছি, কিন্তু আপনাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে ভয়ে উঠি নি। কথাটা নেহাৎ জত নয়, রাত দুটো পর্যন্ত আমাকে ডেকে না পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ ও জাগা আমার এক বিলাস। যা হোক কজনে ওকে প্রাণভরে জল খাইয়ে ধরি ক'রে পাশে রোগীর ঘরে খাটে শুইয়ে দিল। ডাক্তারবাবুকে ডেকে লুম, ফুঁড়ে ওষধ দেওয়া হ'ল। ও একটু ঝিমিয়ে পড়ল, নীরবও হ'ল। রা যে যার শুতে গেলুম। ওর মাথার কাছে রইল জলের ভাঁড়।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, ছটফট করছি। কিছু পরে মৃদু গোঙানির ভেসে আসতে লাগল, তার আর বিরাম নেই। তবু উঠে দেখতে গেলুম া ভাঙা ভাঙা ভাষায় ওর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলুম যে, ও তৃতীয় পক্ষের স্বামী আছে, কিন্তু ভাত-কাপড়ের দায় বহন করে না, মা ও শাশুড়ী ছে। নিতান্ত দুঃখী, বহুদিন ভুগছে। সঙ্গী একজন বাহনরূপে এসেছিল, কিন্তু

বেগতিক দেখে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু ও এল কখন, কোথায় ছি সারাদিন? সন্ধ্যাবেলাও আমি ঘরে ছিলুম, ওকে দেখি নি বা শুনি নি তে এই তো স্ত্রীলোকের মূল্য—এই গরিবের জীবন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আকাশে সামান্য প্রভাতী রঙ ধরতেই গেলুম। কোথাও রোগীর চিহ্ন মাত্রও নেই। এ কি ভৌতিক কাণ্ড, আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের স্বপ্নজাল? দীর্ঘ অবকাশের মাঝে মাঝে আ কাতরানি শোনা গেল। শব্দ অনুসরণ ক'রে খুঁজে দেখি, সামান্য দূরি একটা বুনো আগাছার ঝোপের পাশে মাটিতে ও শুয়ে আছে—প্রায় বি হয়ে। কোনও প্রশ্নের সাড়া পেলুম না। বুঝলুম, বিকারের ঝোঁকে এসেছে। বিকারের ঝোঁকেই আমার ঘরের বারান্দায় গিয়েছিল—হয়তো সন্ধ্যা এমনই কোথাও প'ড়ে ছিল। সকল বিপদে যাকে প্রথম মনে পড়ে, বিশুদার ঘরের দিকে ছুটলুম।

বিশুদা, ও বিশুদা, উঠুন শিগগির একবার বেরিয়ে দেখুন।

কি, হ'ল কি আবার? আপনার জ্বালায় আর ঘুমোবার জো নে ঘোড়া-টোড়া এল না কি?

না, ওসব নয়, আপনি আসুন না। মাঝে মাঝে ভাঙা বেড়ার ফাঁক দি অন্যের গরু ঘোড়া আমাদের সব জিবাগানে ঢুকে ক্ষতি করে আর ওঁর ঘু পড়ে।

সব ঘটনা বললুম। প্রতিষ্ঠানের চালককেও জানালুম। বিশুদা এ দেখে বললেন, এর আয়ু আর ঘণ্টা দুই মাত্র। মরার আগে ওকে প্রতিষ্ঠা থেকে সরাবার জন্য ব্যস্ত হলেন অনেকে। আমি চাইলুম ওর আত্মীয়ে অন্তত খবরটা দিতে; না হ'লে যে দিনকাল, হিন্দুরা মেরে ফেলেছে ব' অপবাদ দেবে, হয়তো এই অজুহাতে দ্বন্দ্বের ছিদ্র হয়ে থাকবে। কো মানুষটার দরদের যে কিছু দরকার আছে, এদিকে নজর দিলুম না, নিজে নিষ্কলঙ্ক থাকতে চাইলুম। তৎক্ষণাৎ একজন নলদায় ছুটল।

তখন জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আমাদের প্রভাতফেরী ও সূত্রযজ্ঞ নিয়মিত ধারাবাহিক অনুষ্ঠান চলছে; আমরা ভোরে সারি বেঁধে "বন্দে মাতর ধ্বনি দিয়ে গ্রামের পথে যাত্রা করলুম। আমার হাতে প্রেম ও সাম্যের প্রতী চরকা। দু-এক পা গিয়ে আমি ফিরে এলুম, একটি সঙ্গিনীও এল। সে অ

া ওকে ধ'রে ঘরে শুইয়ে দিল,—কাপড় বদলে দিল; সেই পরিত্যক্ত মলদুষ্ট ড়টা পুড়িয়ে, বিশোধক ওষুধ দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে দিল।

স্বার্থপর ও শুশ্রূষাবিমুখ মন আমার এ কাজে নিতান্ত অনভ্যস্ত। আট-হাত দূরে থেকে শুধু মূক দর্শক হয়ে রইলুম। চরকাটা মাটিতে প'ড়েই ।। মনে হ'ল, মিথ্যে, এ সব মিথ্যে। এতদিন কর্মচক্রে আবদ্ধ থেকে থকে ও পরকে ঠকিয়েছি। কতদিন কত বক্তৃতায়, কত বৈঠকে, কত য়া ব্যক্তিগত আলোচনায় বিশ্বপ্রেম, মৈত্রী, ধনী-দীনের সমভাব, কিষাণ-র-রাজ, সমাজসেবা প্রভৃতির ফাঁকা বুলি আউড়েছি। সমাজের সেবা র অমোঘ ব্যক্তিগত কর্তব্যের ঔচিত্য বুঝিয়েছি। নিজেও কি বুঝি প'ড়ে ছি, এই অভিমানের অচলায়তনের স্বপ্নে মগ্ন থেকেছি। আজ যখন বিধাতা াকে কষ্টিপাথরে ঘ'ষে নিলেন তখনই মেকি হয়ে গেলুম, একেবারে খাদে সোনার জলে মোড়া পিতল বেরিয়ে পড়ল। সারা ভারতের জনগণের ধর কল্পনায় ম্লান ও ক্লিষ্ট যার চিত্ত, সেই আমি আজ একজন বাস্তব মানুষের কালে পাশে দাঁড়াতে পারলুম না, একটা 'আহা' উচ্চারণ করতে পারলুম একবার মুমূর্ষুর শীতল আড়ষ্ট হাতখানা নিজের প্রাণময় হাতে ধরতে লুম না। না পেলুম সংসারী মায়ের অবুঝ মোহান্ধ স্নেহ, না পেলুম াসী উপগুপ্তে'র প্রেমের প্লাবনস্নাত শুচিশুদ্ধ চিত্ত। তবু তো এ কালাজ্বরের ী; কলেরা নয়, বসন্ত নয়, যক্ষ্মা নয়। ভেদদৃষ্টি রয়েছে ষোল আনা। ও হায়, পরম দরিদ্র, তাই তো ওকে উপেক্ষা করেছি, জ্বরকাতর ওকে একা ল রেখে সুখশয্যায় শুয়েছি। আমি আবার ভেক্ নিয়ে হয়েছি গ্রামসেবিকা, ীশিষ্যা! গান্ধীজী, ওঁর এলাকায় কখনও এমন অঘটন ঘটতে দিতেন না। ম শুধু তঞ্চকের বঞ্চনার পথ বেছে নিয়েছি। ঘরের নিশ্চিত কর্তব্যের স্থূল াজনকে পিছনে ফেলে এসেছি, সংসার করার দায়বহনে ভয় পাই, আবার র কর্মক্ষেত্রের দাবিদাওয়ার সম্মুখীন হওয়ার অযোগ্য। নিজেকে কিছুতে ত পারছিলুম না, ক্ষমা করতে পারছিলুম না। এমন ভাবে কতক্ষণ কেটে ছে। কে এসে বললে, ও মারা গেছে।

একবার দেখতে গেলুম। নিস্পন্দ দেহ, আবক্ষ খাদি কাপড়ে ঢাকা। রুক্ষ কয়েকগাছা চুল এলোমেলো ছড়ানো, খসখসে মুখের চামড়া, অত্যন্ত কুৎসিত রুগ্ন আকৃতি। নেহাৎ অনাত্মীয় নির্বান্ধব পরিবেশে বিধর্মীর দেওয়া জল

খেয়ে ওর প্রাণ শেষ হ'ল। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না, কাউকে ওর অন্তিম বাসনা জানিয়ে যেতে পারল না। ওর মুখের দিকে চেয়ে চে আমার প্রিয়জনের মুখ ভেসে উঠল মনে, যদি তাদের এমন হ'ত, কি করতুম এমনই নিশ্চিন্ত আরামে শয্যাশায়ী হতুম কি? কতদিন দর্পভরে মাকে বলেছি বেশ, এ পথে দুঃখ পাই পাব, না হয় পথে প'ড়ে মরব।—সে মৃত্যু কি এমনই মাগো—

ওর আত্মীয়রা এল, এল ওর স্বামী। বিনিয়ে বিনিয়ে একটু কাঁদল জীবনভোর অনাদৃত বঞ্চিত লাঞ্ছিত বুভুক্ষু অস্তিত্বে শেষে মরণের পর ও দুটো জিনিস পেলে, একটা আট টাকা দামের শবাচ্ছাদন বস্ত্র আর এই শিরোপ যে—ও খুব ভাল রাঁধতে পারত।

"মুসাফির"

পদচিহ্ন

তারপর চ'লে গেছে, সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর।

উনিশ শো ষোল সাল, আর উনিশ শো চুয়াল্লিশ সাল। পনেরো বছরে গৌরীকান্ত আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়।

আজ তেরো শত একান্ন সালের ১লা বৈশাখ। সুদীর্ঘকাল ধ'রে জীবন যুদ্ধে কত আঘাত কত দুঃখ সহ্য ক'রে, জয় ক'রে, প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে ফি এসেছে নবগ্রামে। তার মা কাশীর বউ একদা বর্ষণমুখর রাত্রে ভিজে মাটিতে যে পদচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে নবগ্রাম থেকে সুগভীর বেদনা বুকে বহন ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন কাশী, সেখান থেকে তিনি আর ফিরেন নাই। কিন্তু তাঁ কামনা পূর্ণ ক'রে গৌরীকান্ত ফিরেছে। গৌরীকান্ত আজ প্রতিষ্ঠাবান লেখক জীবনে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে গিয়ে সে নূতন কথা বলছে যারা দুঃখ দৈন্য কঠোরতম নির্যাতনকে বরণ ক'রে বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রো ক'রে মুক্তির গান গাইলে, তাদের কথা যাঁরা গেয়ে গেলেন, তাঁদের পথকেই অনুসরণ করেছে। তারা ছাড়াও অগণিত মানুষ, যারা অবহেলিত উপেক্ষি হয়েও এই দুঃখবরণকারী মুক্তিসাধকদের নীরব সমর্থক মূক মুক ভক্ত, যাঁর প্রাণের নীরব শক্তিকে এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছে নীরবে, তাদের কথ বলছে। দেশ শুনছে। কত কাল ধ'রে নবগ্রাম শুনে এসেছিল বহির্জগতে বাণী, বহির্জগতের ভাবের ঢেউ এসে তার তটভূমে আঘাত করেছে, আলোড়

ছে, পুরাতনকে ভেঙেছে, নূতনকে গড়ার প্রেরণা দিয়েছে; তার মধ্যে গ্রামের হৃদয়ে উঠেছিল একটি তরঙ্গ, সেই তরঙ্গ বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়েছে; র করেছে নবগ্রামের কথা। এইটুকুই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলে ন করে গৌরীকান্ত। তাই সে দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসেছে গ্রামে। াম করতে এসেছে।

কিন্তু কোথায় তার সে নবগ্রাম? নবগ্রাম আজ প্রায় শ্মশানে পরিণত ছে। ত্রিশ বৎসরে বিরাট পরিবর্তন ঘ'টে গেছে। নাই, সে নবগ্রাম নাই, রিয়ে গেছে কাল-সমুদ্রে। ধ্বংস্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, আর ধ্বংসস্তূপ! বর্ধিষ্ণু স্থদের মাটির কোঠাবাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে। মানুষ নাই। তের শো াশের মহামারীতে প্রায় সব শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা আছে তারা মানুষ , দেহে মনে কোথাও আর কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট নাই,—দেহ বলতে াবৃত কঙ্কাল, মন বলতে হতাশার নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতচেতন ব জীবন—এ ছাড়া আর কিছু নাই।

তাই তো আজ সকালে সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকে প্রণাম ক'রে বলেছিল, র শো একান্ন সালের হে সূর্য-দেবতা, তোমার রশ্মিজাল থেকে সংহরণ কর ল কল্যাণ, শুধু নবগ্রামের আকাশের উপর থেকেই নয়, এই দেশের সকল ীর উপর থেকেই, সংহরণ কর তোমার সকল কল্যাণকর রশ্মিজাল, জাগ্রত তুমি, মহা রুদ্রতেজে দগ্ধ কর, ভস্মীভূত কর, অবসান কর সকল যন্ত্রণার, ল দুর্ভাগাদের, সকল বন্ধনের, উত্তাপে শুষ্ক কর সকল অশ্রু।

শান্তি বললে, এই কি আপনার বইয়ের সমাপ্তি?

গৌরীকান্ত বললে, এই শেষ।

শান্তি বললে, শেষ তো হয় নি।

হেসে গৌরীকান্ত বললে, ইতিহাসের শেষ হয় না। ইতিকথা, যা একটি ুষকে অবলম্বন ক'রে চলে, তার শেষ আছে। তোমার আমার কথার ষ আছে। নবগ্রামের কথার শেষ নাই।

চারু ক্লান্ত দেহে একপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। জীর্ণ মলিন কাপড় তার নে, বয়স এবং দারিদ্র্যের ক্লান্তিরেখা তার মুখখানিকে শীর্ণ রেখাঙ্কিত ক'রে লছে। গৌরীকান্ত তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই আমার অতীত গ্রাম, আজ ওই রয়েছে বর্তমান জুড়ে। তুমি আমার ভবিষ্যতের নবগ্রাম।

শান্তির মুখখানি লাল হয়ে উঠল। সে বললে, আমি তো নবগ্রামের নই
গৌরীকান্ত বললে, তুমি নবগ্রামেরই। কাশীতে তোমাকে দেখলাম যেদি
সেদিনের কথা মনে আছে? রজনী-পিসীমা বললেন মাকে, এইটি আমার স
ছেলে, এইটি মেয়ে। মা বললে, অবিকল বিশুর মত দেখতে। রজনী-পিসী
বললে, তুমি ঠিক ধরেছ কাশীর বউ, ও ঠিক আমার ছোট কালের বিশুর ম
দেখতে। দুজনেই বাপের মুখ পেয়েছে। ও যদি বিশুর মৃত্যুর পর জন্মা
কাশীর বউ, আমি ভাবতাম, বিশুই আমার ফিরে এসেছে আমার সতীনে
কোলে। আমি কিন্তু সেদিন থেকেই দেখেছিলাম, তোমার মধ্যে বিশুদিকে
বিশুদির আত্মাকে আমি তোমার মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তুমি বি. এ
পাস ক'রে আজ মাথা উঁচু ক'রে বিশুদির বিদ্রোহকে সার্থক ক'রে এখানে এ
মেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়েছ, আমার মনে হচ্ছে, বিশুদির বিদ্রোহ আজ বিপ্লে
পরিণত হয়েছে। তাই তো আশা করছি, কল্পনা করতে পারছি—তুমি
আমার ভবিষ্যৎ নবগ্রামের রূপ। তাই তো আশা করতে পারছি, এই ধ্বংস
স্তূপের মধ্য থেকে আবার একদা হবে নূতন সৃষ্টি—নব রচনা।

একটুখানি স্তব্ধ থেকে, আবার গাঢ়স্বরে সে বললে, নইলে আজ যা চোখে
দেখেছি—নবগ্রামের রূপ, দীর্ঘ বৈদেশিক শোষণ, বিদেশীর চক্রান্তে সৃষ্ট তেরো
শো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী নবগ্রামের যে অবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছে
তাতে তো কল্পনা করতে ভরসা পাই না, নবগ্রামের জীবনে, দেশের জীবনে,
হয়তো সমগ্র পৃথিবীর জীবনেই কোনদিন আসবে না নবপ্রভাত। তোমায়
দেখে ভরসা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, শেষ হয়তো নূতন ক'রে রচনা করতে হবে।

শান্তি তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, বিশুদিকে আপনি সত্যিই
ভালবেসেছিলেন?

গৌরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আমার নবগ্রামের কাহিনীর মধ্যে
সে কথা কি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে নাই শান্তি?

শান্তিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

গৌরীও নীরব হয়ে ব'সে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে। মনে পড়ছে আরও
অনেক কথা। কাশীর কথা। রজনী-ঠাকরুণ নূতন ক'রে ঘর বেঁধেছিলেন কাশী
গিয়ে। হঠাৎ এক সতীনের কঠিন রোগের সংবাদ পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন।
মৃত্যুকালে সতীন একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে সাশ্রুনেত্রে কাতর মিনতি

নিয়ে রজনী-ঠাকরুণের হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন, ওদের ভার যদি আপনি
ন দিদি, তবেই তো—। আর তিনি বলতে পারেন নাই, চোখের জলে বুক
স গিয়েছিল।

রজনী-ঠাকরুণ তাদের ভার নিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন। তারপর
দের নিয়ে গিয়েছিলেন কাশী, নবগ্রামে থাকতে পারেন নাই। কাশীতে গিয়ে
শীর বউকে বলেছিলেন, তুমি চ'লে এলে, আমি আর থাকতে পারলাম
ভাই। মনে হ'ল, এখানে যেন আমার ঠাঁইই নাই।

নবগ্রামের তখন জমজমাট অবস্থা। ঝলমল ঐশ্বর্যে দীপ্যমান পুরীর মত
গ্রাম তখন উজ্জ্বল ঐশ্বর্যময়ী। সে আনন্দের হাটে তিনি থাকতে পারেন
ই। বিশেষ ক'রে কাশীর বউ চ'লে যাওয়ার পর ঐশ্বর্যময়ী আনন্দমুখর
গ্রাম তাঁর কাছে আরও অসহ্য ব'লে মনে হয়েছিল।

দু বৎসর পর মুক্তি পেয়ে গৌরীকান্ত গেল কাশী। শান্তির দাদা অমল-হ'ল
র বন্ধু। অমলকে দেখে গৌরীর মনে পড়ে নলিনী বাগচীকে। গৌরী
দিন গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিলে, সেদিন অমলের
খ দিয়ে আগুন ছুটে বেরিয়েছিল। উত্তর-ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের
তিটি ক্ষেত্রে অমলের পদচিহ্ন আঁকা আছে। অমলও নলিনীর মত পুলিসের
লি খেয়ে মরেছিল। অমলের বোন শান্তি। তেজস্বিনী শান্তি নবগ্রামের
পানে ফিরে এসেছে, ভবিষ্যৎতের নবগ্রামের রূপের আভাস নিয়ে। তার মা
শীর বউ একদা যে পদচিহ্ন এঁকে গভীর রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন,
ই পদচিহ্ন ধ'রে এসেছে শান্তি। তিনিই তাকে ছেলেবেলায় পড়িয়েছিলেন,
নিই তার ইস্কুলে পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। বলেওছিলেন, শান্তি,
রিস তো লেখাপড়া শিখে নবগ্রামে ফিরে যাস মা। আমার নিজের মেয়ে
ই, থাকলে তাকেই পাঠাতাম। বড় দুঃখ বড় অপমান ভোগ ক'রে সেখান
কে চ'লে এসেছি। তুই সেখানে যাস। সেখানে গিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া
খিয়ে তাদের সক্ষম ক'রে তুলিস। তাদের বড় দুঃখ বড় লাঞ্ছনা।

শান্তি তাঁর কথা রেখেছে।

শান্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। বললে, আমি যে এইবার বাড়ি
ব গৌরীদা। রাত্রি কত হ'ল দেখুন তো?

রাত্রি? ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠল গৌরীকান্ত। এ যে একটা বাজে!

একটা? তাই তো। তারপর হেসে ফেলে শান্তি বললে, নবগ্রামে লোকের খুব একটা বড় খোরাক হবে। যাকগে। আজ দুপুরে আপনাকে প্রণাম জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম, সেটা দেওয়া হয় নি। নিন পয়লা বৈশাখের নববর্ষের প্রণাম।

কবিতাটি পড়তে পড়তে গৌরীকান্তের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে থেকে কেউ ডাকলে, গৌরীকান্তদা। চমকে উঠল গৌরীকান্ত।—কে?

আমি চক্রধারী।

চক্রধারী!

হ্যাঁ। একবার আপনাকে যেতেই হবে। হালখাতায় যাঁরা এলেন, তাঁরাই বললেন, তিনি কই? দুবার এসে ফিরে গিয়েছি। দেখলাম—

দরজা খুলে বেরিয়ে এল গৌরীকান্ত। ডাকলে, এস শান্তি।

শান্তিও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। গৌরীকান্ত দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে বললে, চল।

শান্তি মৃদুস্বরে বললে, চারুদি?

থাক, ঘুমোক। তারপর আরও মৃদুস্বরে বললে, ও বেচারাকে আর মিথ্যা কলঙ্কের পাত্রী করা কেন বল? যা ঘটবে, সে আমাদের ভাগ্যেই ঘটুক। আমরা সইতেও পারব। পারবে না?

শান্তি তার দিকে তাকালে।

গৌরীকান্ত তার হাত ধ'রে বললে, না হয় নবগ্রামের ভবিষ্যৎ রচনার ব্রত আমরাই গ্রহণ করব হাতে হাত মিলিয়ে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গৌরী বললে, তোমার কবিতাটি বড় ভাল লাগল। ওই কবিতাটি দিয়েই শেষ করব আমার বই। শুধু পালটে দেব প্রথম কথাটি। হে গুরু'র জায়গায় 'জননী' কথাটি বসিয়ে দেব।

জননী, গ্রহণ কর রিক্ত নমস্কার
আজিকে নূতন বর্ষে, নব চেতনায়,
ভবিষ্যের পদধ্বনি যেন শোনা যায়
অধুনার অন্ধকারে। লুপ্ত চারিধার
আলোকে প্রকাশমান হবে যে আবার।

তার মাঝে দেখি যেন মোর কল্পনায়,
নতশির পাঞ্চালীর রুক্ষকেশভার
বেণীতে সম্বদ্ধ হ'ল বিশ্বের সভায়।
দেখি যেন কঙ্কালের পঞ্জরে পঞ্জরে
জীবনের জয়গানে বিপ্লব সঞ্চরে।

শান্তির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

চক্রধারীর ওখানে ওরা এসে পড়েছিল। গৌরীকান্ত বললে, তুমি একটু অপেক্ষা কর চক্রধারী, ওঁকে আমি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

চক্রধারী হাত জোড় ক'রে বললে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস করি নি। কিন্তু যখন গৌরীদার কৃপায় আপনাকে পেয়েছি, তখন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

শান্তি বললে, আমায় মাপ করবেন।

ব'লে সে আপন পথে একাই এগিয়ে গেল।

গৌরীকান্ত বললে, দাঁড়াও শান্তি।

দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।

বলতে বলতেই, অসমসাহসিনী অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। গৌরীকান্ত ভবিষ্যতের সঙ্গে কল্পনা করেছিল ওর; ভবিষ্যৎ যেন চকিতের মত দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, সূর্য উঠলে আবার কাল সকালে শান্তি আসবে।

হঠাৎ ছুটে এল বাউরীদের শম্ভু।

বাবু!

কি?

শিগগির চলেন মাশায়। চারুদিদিকে—

কি?

চারুদিদিকে সাপে কামড়েছে।

সাপে? কি সাপ রে?

আজ্ঞে সেই পেকাণ্ড গোখুরটা, আপনকাদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরে—

সেই কালের সঙ্গে তুলনা করেছিল গৌরীকান্ত—সেই সাপটা?

কালের বিষে জর্জরিত চারু, দুঃখিনী চারু, অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল?

গৌরীকান্ত উঠে আলোটা হাতে নিয়ে বললে, শম্ভু, তুই বালিকা-বিদ্যালয়ের দিদিমণিকে ডেকে আন্। বুঝলি? খবর পেলেই সে আসবে।

শেষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী*

১৮৬৪-১৯১৯

১

ভূমিকা

"বন্দে মাতরম। বাংলা নামে দেশ তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পা হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সে শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল।...এমন সময় মর্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণে-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হ'ল।"

—বাংলার এই রূপ যিনি দেখিয়াছিলেন, বাঙালী তাঁহাকে ভুলিয়াছে। এই সচল নদীমাতৃক দেশের মানুষের ভোলাটাই হয়তো স্বভাব—বাঙালী কাহাকেই বা মনে রাখিয়াছে! এক শত বৎসর পূর্বে বাঙালী কি ছিল, বাঙালী তাহা জানে না। তাই বাঙালী কোন কিছু ভুলিয়াছে বলিয়া দুঃখ হয় না—এখন দুঃখ হয় বাঙালী অকৃতজ্ঞ বলিয়া। উপরে যাঁহার লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন না, বাঙালী হইয়াছিলেন বাঙালী কোনও দিন বাংলা দেশকে এমন প্রাণ দিয়া ভালবাসে নাই বাঙালীত্বকে কেহ এমন পূজা করে নাই, যেমন অবাঙালার সন্তান এই রামেন্দ্রসুন্দর করিয়াছেন। তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া কখনও এক পা নড়িতে চাহিতেন না—'বন্দে মাতরম্' বলিয়া এই হতভাগ্য দেশের মাটি আঁকড়াইয়া তিনি আমৃত্যু পড়িয়া রহিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর যে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন-উৎসবে বাঙালী মাতিয়াছিল, তাহার সূচনা হইয়াছিল রামেন্দ্রসুন্দর আর

* রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় ধারাবাহিক চারিটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।—স. শ. চি.

বীন্দ্রনাথের কল্পনায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মনে জাগিয়া আছেন, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর কোথায়? 'দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?'

বন্ধু ও সতীর্থ জানকীনাথ ভট্টাচার্য সত্যই লিখিয়াছিলেন :—"স্বদেশ-প্রীতিই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি ছিল। তিনি দেশসেবায় স্বেচ্ছাকৃত সৈনিক ছিলেন, লেখনী ছিল তাঁহার নির্বাচিত অস্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব বোধ করিতে ও বর্তমান অবনতিতে বেদনা পাইতে, তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। অতীত ও বর্তমানের এই সংমিশ্রণেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-চেষ্টার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে এক দিকে ছিল ঋষিসন্তান-সুলভ প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে ছিল বর্তমান মুহূর্তের দ্বন্দ্ব-কোলাহল, ক্রন্দনবিলাপের সজীব অনুভূতি। এই ভারত-প্রেমের দ্বারাই তাঁহার জীবন-চরিত ও কার্যকলাপ বুঝিতে পরা যায়। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে একজন মহাপণ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক বা মহারথ সাহিত্য-সেবক হারাইয়াছি, তাহা নহে; আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোন্মত্ত প্রচারকও হারাইয়াছি।"

রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘজীবী ছিলেন না, মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে যে অক্ষয় সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন, আশা হয়, বাঙালী একদিন তাহার মর্যাদা বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইবে। বিজ্ঞান ও দর্শনকে এমন ভাবে আত্মসাৎ করিয়া বাংলা ভাষায় রূপদান করিতে তাঁহার মত আর কেহ পারে নাই; পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি মাতৃভাষার ভাণ্ডারে বহু রত্ন উপহার দিয়াছেন, আমাদের দুঃখ, ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাঙালী সে রত্নগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। এই গ্রন্থরত্নরাজি পড়িয়া হজম করিবার মত মনের দৃঢ়তা ও স্থৈর্য বাঙালীর আছে কিনা সন্দেহ হয়। বলহীন কখনও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বাঙালী যে দিন মনের শক্তি ফিরিয়া পাইবে, রামেন্দ্রসুন্দর সে দিন আবার বাঁচিয়া উঠিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর-বলিতে আমরা শুচিশুভ্র একটি পূত চরিত্র বুঝি, কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানসাধনায় যাহা কঠোর, নিঃস্বার্থতা ও অবারিত আনন্দে যাহা চিরপ্রসন্ন। এমন চরিত্রের প্রভাবে পড়িয়াও বাঙালী কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে, ইহা

অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার আর কি হইতে পারে! তিনি নিজে বি
দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্জিত অ
জাতির ওষ্ঠ পর্যন্ত উঠিল কই! জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণে যিনি জী
উৎসর্গ করিয়া গেলেন, জাতির জীবনে তিনি স্থান করিতে পারিলেন ক

জন্ম : বংশ-পরিচয়

মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুরের নিকট পূতসলিলা ভাগীরথী-তীরে বৈষ্ণপুর নামে গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর পূর্বে, র গোত্রীয় ত্রিস্রৌতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম ত্রিবেদী এই গ্রামে আসিয়া বাস নির্বাচন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমো-রাজবাটীতে লক্ষ্মীনারায় কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভ জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণসুন্দর, কৃষ্ণসুন্দরের দুই পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দ এই গোবিন্দসুন্দরই রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা। তাঁহার পিতা, পিতৃব্য, পিত সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন; কেহ নাটক লিখিয়াছেন, কেহ কা লিখিয়াছেন। এই কাব্যামোদী পরিবারে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আ (১২৭১, ৫ই ভাদ্র) চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়।

ছাত্র-জীবন

রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। এ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছি [২৫ মে ১৮৭০]। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের ও স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষ ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফল হইয়াছিলাম।

পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইত

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় [নবেম্বর ১৮৭৫] জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা বহি পড়ায় নেশা জন্মিয়াছিল।

পরে কান্দি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হই [২১ জানুয়ারি ১৮৭৬]। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজী স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এনট্রান্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।

পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় [ইং ১৮৮৩] দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণ-পদক লাভ করি।

১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ ত্যাগ করি। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে 'নবজীবনে' আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামীতে লিখিয়াছিলাম।

পর-বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব একটি "ক্লাস এক্সারসাইজ" দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ওই পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—"আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ওই Out and out the best"—(কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার)—"Out and out the best।" তাঁহার ওই বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের

জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশ প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার ক করি।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর-বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্র পাইয়াছিলাম (১৮৮৮)। পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—"I candidate who took up Physics and Chemistry is perha the best student that has as yet taken up these subje at this examination." অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত সকল ছাত্র ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের ম বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেত বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পেড্‌লার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ('২ ভাষার লেখক,' পৃ. ৮০১-৩)

সাধারণ পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে আ ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলেন; এই সময়ে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহপ ছিলেন। কিন্তু আইন-অধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাগে নাই, অল্প দিন পরেই কি উহার সহিত অসহযোগ স্থাপন করেন।

বিবাহ

কান্দি ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়নকালে, ৬ মে ১৮৭৮ তারিখে, ১৪ বৎসর বয়ঃ জেমোর রাজবাটীতে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়। পাত্রী—ইন্দুপ্রভা দে নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা।

অধ্যাপনা

ছাত্র-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত হইলে শিক্ষা-বিভা রামেন্দ্রসুন্দরের একাধিক চাকরি জুটিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা ত্যাগ করি হইবে ভাবিয়া তিনি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। "রামেন্দ্রসুন্দর কায়মনোবাক্যে বাঙালী হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান করিয়া বঙ্গ-ভারতীর সেব আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই ইহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।...এই সময়ে রিপন কলেজে তাঁহাকে

ইয়া যাইবার জন্য লোক আনাগোনা করিতে লাগিল।" তিনি ১৮৯২ সনে রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে প্রবিষ্ট হইলেন। কলেজে তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহারই প্রাক্তন ছাত্র প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"১৯০১ সালে আমি রিপন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।... তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর একটু বিশেষত্ব ছিল।...রসায়নবিদ্যার হাতে খড়ি এই সময়েই আমাদিগকে করিতে হয়। নূতন বিদ্যার উপর বক্তৃতা দিয়া, বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা সহজসাধ্য নয়; বিবেচনা করিয়া, তরলমতি যুবকদিগের মনে রসায়ন-প্রীতি জাগাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীকে আমরা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সে পদ্ধতি হইতেছে, প্রথমে কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রদর্শন (Practical Experiments)। বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে নূতন পদার্থ উৎপাদন করিয়া তিনি আমাদিগের মনকে 'নূতনের দিকে' আকৃষ্ট করিতেন। নূতনের মোহে আমরা নূতন জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। দর্শন-জনিত আনন্দ আমাদিগের কৌতূহলী মনকে জিনিসটার স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যগ্র করিত। আর সকলেই স্বীকার করিবেন, এই কৌতূহল-সৃষ্টিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কৌতূহল না জন্মিলে জিনিসের প্রকৃত তথ্য যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না। এই জিনিসটা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রথমে পরীক্ষা দেখাইয়া, পরে পরীক্ষিতব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন। আর বোধ হয়, এই কারণেই আমি বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

যথাসময়ে আমি এফ-এ পাশ করিয়া উক্ত কলেজেই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। পাস ও অনার্সে রামেন্দ্রবাবু পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, বরাবরই তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষাদান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না বুঝিয়া, প্রচলিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া—গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসান না দিয়া, তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিতেন। আমরাও বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতাম। ইংরেজী

ভাষাতে পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া, তিনি বাঙ্গালায় বর্ণিত বিষ
আবার ইংরাজীতে বলিতেন। যাঁহারা তাঁহার পদতলে বসিয়া
বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্ব
করিবেন যে, পদার্থ-বিদ্যার জটিল বিষয়গুলি (Mathema
portions) দুরূহ অঙ্কপাত (Higher Mathematics) ব্যতিরেকে
শিক্ষা দিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন—বোধ হয়, এ কথা বলিলে অ
হইবে না যে, এ বিষয়ে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন না। আমার
হয়, Tait-এর *Heat* নামক পুস্তকের তাপতত্ত্ব (Thermodynam
নামক দুর্ব্বোধ্য অংশ সহজ সরলভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইতে
মত কেহ পারেন কি না সন্দেহ।" (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত: 'অ
রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ১৫৭-৪৮)

১৯০৩ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ছয় মাসের অবসর
করিলে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার স্থলে অস্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অব
কাল পূর্ণ হইলে কৃষ্ণকমল আর কর্ম্মে যোগদান করিতে পারেন নাই। রা
সুন্দরই রিপন কলেজের অধ্যক্ষ-পদে স্থায়ী হইয়াছিলেন। "তাঁহার অধ্যক্ষ
রিপন কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সক
নিজ নিজ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। কাহারও কখনও
হইত না যে, প্রিন্সিপালকে খোশামোদ করিবার বা তুষ্ট রাখিবার
কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে।" এই প্রসঙ্গে
কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ যাহা লিখিয়া গিয়া
তাহাও উদ্ধারযোগ্য:—

"তিনি রিপন কলেজটিকে কেন এত প্রাণের বস্তুর মত আঁকড়
ধরিয়াছিলেন, তাহা আমি বাহির হইতে বুঝিতাম না। ভিতরে আ
সে রহস্যের সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম, কলেজের যে-দিকটা যন্ত্রধর্ম্মী,
দিকটা তিনি যন্ত্রবৎই পরিচালন করিয়া যাইতেন। কিন্তু ইহার সক
তো যন্ত্র নহে, যন্ত্রের মধ্যে যে কতকগুলি জীবন্ত মানুষ শিক্ষক ও ছাত্র
লইয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার আসল কারবার ছিল এই
সমষ্টি লইয়া। ছাত্র-সংখ্যা অপরিমেয়, সুতরাং তাহাদের সকলের স
প্রাণের সম্বন্ধ পাতান অসম্ভব ব্যাপার; তথাপি যে অল্প কয়েকটি

বি-এস-সি ক্লাসে তাঁহার বিজ্ঞান-ব্যাখ্যান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন। তিনি যে বঙ্গভাষায় অধ্যাপনা করিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী ভাষার কৃত্রিম আবরণের মধ্য দিয়া যন্ত্রের কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু প্রাণের কারবার চলে না। তাঁহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল, সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীর বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও, তিনি অনেক স্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যে সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুলি আফিসের হাত দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু রামেন্দ্রবাবু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইত যে, প্রত্যহ অপরাহ্ণে যখন তিনি ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন সে ঘরে ছাত্রের ভিড় লাগিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না। ছাত্রদিগের সম্পর্কে তাঁহার কঠোর কোমল দুই মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। এক দিকে যেমন দারিদ্র্য বা অক্ষমতাজনিত অভাব-অভিযোগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি দেখা যাইত, অন্য দিকে তেমনি নৈতিক অপরাধের দণ্ডবিধানে তাঁহার রুদ্রকঠোর দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। অপরাধী ছাত্রদিগকে জরিমানা করিয়া যে টাকা উঠিত, তাহা তিনি কলেজের সাধারণ অর্থকোষে না দিয়া, তদ্দ্বারা দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যকল্পে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে যখন কোন বিষয়ে অনুযোগ করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তিনি কেবল-মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাহারা ভারতীয় ছাত্র; তাহাদের আচরণের উপর ভারতের খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করিতেছে। ছাত্রদের আনন্দমিলনে যোগদান করিতে তিনি ভালবাসিতেন।...

কলেজের বিরাট্ যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক-নামধারী আর একদল যে মানুষ ছিল, তাঁহাদের সহিতই তাঁহার প্রধান কারবার ছিল। রিপন

কলেজের অধ্যক্ষের জন্য কেন যে পৃথক্ খাসকামরা নাই, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টারদিগের নিকট তাঁহাকে অনেক বার কৈ দিতে হইয়াছে। তিনি বলিতেন,—'আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া এক ঘরে কি করিয়া থাকিব?' খাসকামরা থাকিলে, কলেজযন্ত্রের চালান-পক্ষে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি তো এ শুধু কল চালাইতে আসেন নাই, সেটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসিতেন প্রাণবিনিময়ের আনন্দ উপভোগ করিতে। অপরাহ্ণে যখন আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার ঘরে একটা আনন্দ ফুটিয়া চলিত। কখনও বা বৈদিক যজ্ঞ, কখনও বা ইহুদীজাতির ইতি কখনও বা প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, কখনও বা বৌদ্ধদর্শন, কখন বৈষ্ণবতত্ত্ব, এইরূপ একটা না একটা বিষয় লইয়া সরস আলোচনা চলি সে যে কি আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহা যাহারা উপভোগ করিয়াছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল নবীন অধ্যাপকদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট্ য আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি যাহাতে আলো দিকে প্রসারিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, সেই ছিল তাঁহার প্র চেষ্টা। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের মনের গতি লক্ষ্য করিতেন কখনও প্রশংসা দ্বারা, কখনও প্ররোচনা দ্বারা, কখনও বা তিরস্কার কা সকলকে বাণীর সেবায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। "চর্চ্চা অনুসন্ধান কর, লেখ"—এ ছিল তাঁহার কথা। এই উদ্দেশ্যের বশ হইয়া তিনি কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ইচ্ছা করি তিনি এই সঙ্ঘে কোন আইন কানুন বাঁধিতে দেন নাই। ইহার তিনি প্রাণের স্বচ্ছ লীলা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে হয় নিজে অথবা কোন অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিতে হয়ত বা বাহির হইতে দুই একটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া হইত। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা শুশ্রূষু তাহাদিগকেও ডাকা হই সকলের সম্মুখে প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হইত; এবং সর্ব্বশেষে মি জলযোগ সহকারে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপিত হইত। এই অধ্যা সঙ্ঘের সম্মুখে তিনি যে ধারাবাহিক দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছি তাহাই সম্প্রতি 'জগৎকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশে নহে, পাশ্চাত্যজগতেও অতি বিরল। কলেজ-সম্পর্কে তাঁহার আর একটি প্রিয়বস্তু ছিল 'রিপন-কলেজ-পত্রিকা'। এই পত্রিকা তাঁহারই উৎসাহে ও নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, রামেন্দ্রবাবুর প্রভাবে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে কেমন একটা সজীবতা আসিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ দেওয়ার প্রণালীই একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তিনি নিজের ছাঁচে সকলকে ঢালিতে চাহিতেন না। কাহার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন্ বিষয়ে কাহার স্বাভাবিক অনুরাগ, এইটি লক্ষ্য করিয়াই তিনি কথা কহিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার চিত্তের উদারতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হইত। কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য যখন গ্রন্থ ক্রয় করা হইত, তখন তিনি কেবল নিজের রুচি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থনির্বাচন করিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ যে তাঁহার প্রিয় হইবে তাহা তো স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আধুনিক ইউরোপের দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক—কিছুই তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না। নবীন অধ্যাপকেরা যে-সকল অতি-নবীন কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, তিনি নিজে না পাঠ করিলেও তাঁহাদের নিকট সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম শুনিয়া লইয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার নিজের আলোচ্য বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন রচনা নূতন প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গসোঁর দার্শনিক মত, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের বংশক্রমতত্ত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবি ভাসের নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।" ('আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ১৪০-৪৪)

রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যক্ষ-রূপে আমরণ—সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর রিপন-কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বিদ্যায়তনটির বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য যথার্থই লিখিয়াছেন :—

"রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন, এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। তখন ইহার

ছাত্রসংখ্যা আট শতের অধিক নহে; একটি হিন্দু গৃহস্থের আবাস-গৃহ এবং তৎসংলগ্ন একটি সুপ্রশস্ত খেলিবার ঘর, এই ছিল তখন কলেজ-ভবন; কলেজের গ্রন্থাগারে সামান্যই গ্রন্থ ছিল এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ছিল না বলিলেই চলে। তিনি রাখিয়া গেলেন, সুপ্রশস্ত হল-মণ্ডিত এক বিশাল কলেজ-গৃহ, সুন্দর ও সুপুষ্ট গ্রন্থাগার, সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশালা এবং আঠার শতের অধিক শিক্ষার্থী। এই যে সফলতা, ইহা কেবল কাল-পরিণতির ফলমাত্র নহে, অক্লান্ত উদ্যম ও কঠোর প্রয়াসের দ্বারা এ সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কত শত বিঘ্ন-বিপৎ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কলেজ অভিভূত হয় নাই। প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই তাঁহার বিদ্যালয় সংবর্দ্ধিত দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল।" ('আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর,' পৃ. ১৩৩-৩৪)

ইউনিভার্সিটি কমিশন: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনোদ্দেশ্যে ১৯১৭ সনে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। কমিশন তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সকলের পাঠ করা উচিত। "লেখক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই দুইটি ভাবের মধ্যে কোন একটি ভাববিশেষের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন না; প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষা হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণীয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারার সম্মিলন ঘটাইয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।"* তিনি এই বলিয়া তাঁহার শেষ মন্তব্য করিয়াছেন:—

Western education has given us much; we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture; a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life.

রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিয়া কমিশন অতীব সন্তুষ্ট হন; তাঁহারা রিপোর্টে উহার অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"রামেন্দ্রসুন্দরের কথিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ কৃতিত্বে

* শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী: 'রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ. ২৪২, ২৪৫। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ৩১৭-৩৪) রামেন্দ্রসুন্দরের সুদীর্ঘ মন্তব্যটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আমরা মুগ্ধ, এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। আমরা শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, আশা করি তাঁহার সঙ্কল্পিত আদর্শ লাভ হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয় নবজীবনের সৃষ্টিসাধন ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবসমূহের মধুর সম্মিলন ঘটিবে।"*

সাহিত্যসাধনা

রামেন্দ্রসুন্দর নিজের সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন:—"যথাশক্তি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।" কৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি শৈশব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। এই সাহিত্যানুরাগ সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"শৈশবেই বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়ীতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম। সব বুঝিতাম না। বিষবৃক্ষের অধ্যায়ের হেডিংগুলা,—নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন, পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে?—ইত্যাদি হেডিংগুলা কিরূপে মনের উপর একটা চমক দিত। তখন বিষবৃক্ষের রস আস্বাদনের ক্ষমতা জন্মায় নাই—অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।

ক্রমে আর্য্যদর্শন বাহির হইল। তাহাতেই প্রথম জানিলাম যে আমরা আর্য্যজাতি, জানিয়া একটা অহমিকা জন্মিয়াছিল, তাহা মনে আছে। পরে বান্ধব বাহির হইল। বয়স্কদের মুখে প্রভাত-চিন্তার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলার প্রশংসা শুনিতাম, কিন্তু পড়িয়া আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, যখন এগারো বৎসর বয়স, তখন আর্য্যদর্শনে ও বান্ধবে নবীন-চন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা পড়িয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

* শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী: 'রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ. ২৪৫।

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে চারি পয়সা করিয়া চাঁদা তুলি একখানা 'পলাশীর যুদ্ধ' কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনাই।

আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাণ বান্ধবের, পাত উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ, পড়িতাম; পড়িয়া আন পাইতাম। ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাই না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষে ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত।...

বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শ আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি ক্রমে অদৃশ্য হইল। অল্পজীবী মাসিক সাহিত্যে প্রতি রাগ হইতে লাগিল।

যখন কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়িতেছি, তখন ঢাক বাজাইয় নবজীবন বাহির হইল [শ্রাবণ ১২৯১]। সংবাদপত্রে ঘোষণা বাহি হইবামাত্র, দেহে নবজীবন সঞ্চারের স্ফূর্ত্তি লাভ করিলাম; ঘোষণামা ৫১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে কার্য্যালয়ে গিয়া মূল্য দাখিল করিয়া গ্রাহক হইয় আসিলাম। মাসের ১লা তারিখে নবজীবনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয় বসিয়া থাকিতাম; সূর্য্য অস্ত যাইত, রাত্রি নয়টা বাজিত, পত্রিকা ন পাইয়া হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।...

নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক-পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনামীতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতু সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। গুরু মহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গল সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।

তার পর নবজীবনে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি,—কতক স্বনামী, কতক বেনামী। এইরূপে আমার সাহিত্য-সেবার সূত্রপাত।...নবজীবনও

চারি [পাঁচ ?] বৎসরেই অন্তর্দ্ধান করিল। সাময়িক পত্রিকার উপর আমারও রাগ বাড়িল। কয়েক বৎসর গোসা করিয়া বাঙলা মাসিক পড়া ছাড়িয়া দিলাম।

কালেজ হইতে বাহির হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন্ কাগজ পড়িব ? বাঙলা মাসিকের তুলনায় 'ভারতী' তখন বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছে ; হয়তো উহা হঠাৎ ফাঁকি হইয়া অন্তর্দ্ধান করিবে না। অতএব ভারতীর গ্রাহক হইলাম। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সম্পাদিকা। ভারতীতে হেঁয়ালি-নাট্য তখনও বোধ করি বাহির হইতেছে। ভারতীতেই আমি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রথম পরিচয় পাইলাম—ইহা একটা পরম লাভ মনে করিয়াছিলাম।

তখন কংগ্রেসের নূতন অভ্যুদয়—আমি তখন ঘরে বসিয়া উৎকট কংগ্রেস-ওয়ালা। কংগ্রেসের খবর পাইবার জন্য মন আন্‌চান্ করিত। ভারতীতে কংগ্রেসের আলোচনা থাকিত ;—ভারতীর প্রতি আকর্ষণের ইহাও একটা প্রধান কারণ।

নূতন বেশ-ভূষায় 'সাধনা' বাহির হইল। সাধনায় আমার নূতন করিয়া হাতে-খড়ি হইল। তখন আমি রিপন কালেজে আসিয়াছি—সম্পাদকের দল আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক আমাকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেকের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম।...

তদবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীর সাধ্যমত সেবা করিয়াছি।

('ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৩)

রামেন্দ্রসুন্দর যখন বি.এ. পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে বাংলা-লেখায় তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। ১২৯১ সালের পৌষ-সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত "মহাশক্তি" প্রবন্ধটিই তাঁহার লিখিত প্রথম রচনা। 'নবজীবনে' তাঁহার আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ১ম, ২য় ও ৪র্থ বর্ষের 'নবজীবনে' "লেখকগণের নাম"-এর বার্ষিক সূচীতে তাঁহার নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু রচনার শেষে তাঁহার নাম না থাকায় কোন্ কোন্ রচনা তাঁহার লিখিত, তাহা বাছিয়া বাহির করা কঠিন। ৩য় বর্ষে প্রকাশিত

একমাত্র "সৃষ্টি-তত্ত্ব" প্রবন্ধ ছাড়া অপর কোন প্রবন্ধের নামোল্লেখ তিনি কোথাও করেন নাই। আমাদের অনুমানে 'নবজীবনে' প্রকাশিত এই রচনাগুলি তাঁহার :—

১ম ভাগ :	পৌষ	১২৯১ ...	মহাশক্তি
২য় ভাগ :	বৈশাখ	১২৯২ ...	বিবর্ত্তন
	অগ্রহায়ণ	১২৯২ ...	মহাতরঙ্গ
	আষাঢ়	১২৯৩ ...	জড় জগতের বিকাশ
৩য় ভাগ :	শ্রাবণ, ভাদ্র	১২৯৩ ...	সৃষ্টি-তত্ত্ব
৪র্থ ভাগ :	শ্রাবণ	১২৯৪ ...	বৈদেশিক সভ্যতা

দুরূহ ও জটিল বিষয় সর্বজনবোধ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে রামেন্দ্রসুন্দর অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভাল ক'রে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশঃ দেখলাম যে, আমি যে সব কথা বলতে চাই তা, ও ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হ'ল" (বিপিনবিহারী গুপ্ত : 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' পৃ. ২০)। তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই লিখিয়াছেন :—

"অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য—যে দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত, এমন নয়; সত্য সত্যই তাহার মধুরতা প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনা মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুরী'ই বল, 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'ই বল, আর যে কোনও প্রসঙ্গই বল, সবই যেন কবিত্বময়। এ মহা কবিত্বের বীজও তিনি আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন।...এরূপ কাব্যামোদী পরিবারে যিনি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার বাল্যকাল কাব্যচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল কার্য্যেই, সকল লেখায়ই, সকল বক্তৃতায়ই যে কাব্যের গন্ধ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

চা খাওয়ার প্রস্তাবটার মধ্যে একটা নূতন আলোক যেন দেখতে পেলেন রূপচাঁদ। রোজই তিনি চা খেয়ে যান, কিন্তু আজ যেন এটাকে একটু অভিনব ব'লে মনে হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর সহসা সোৎসাহে বললেন, দেখ, একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি যখন তোমায় ভার নিয়েছি, তোমার ভয় নেই। তুমি যদি চাকরি করতে, তা হ'লে আমার পক্ষে সেটা সহজ হ'ত। লোকাকড়ির দিক থেকে নয়, লোকচক্ষুর দিক থেকে। একজন অপরিচিতা বিদেশিনীর এখানে থাকার একটা সঙ্গত অর্থ করতে পারত তারা, অবশ্য তাতেও যে তাদের মুখ বন্ধ হ'ত তা নয়, তবে আমার দিক থেকে দেবার মত একটা জবাবদিহি থাকত।

অপ্রত্যাশিতভাবে ডানা ব'লে উঠল, কে কি বলবে তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা—

ব'লেই থেমে গেল সে মুচকি হেসে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন রূপচাঁদ। তবু চুপ ক'রেই রইল ডানা। কিন্তু রূপচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন।

তোমার ভাবনাটা কি শুনিই না, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে।

আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। নিজের কাছে যদি আমার আচরণ নিখুঁত হয়, তা হ'লে অপরের মতামতের তোয়াক্কা তত করি না। আমার নিজের আচরণ নিখুঁত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না।

ও।

আর কিছু বলবার পূর্বেই চা নিয়ে চাকরটা প্রবেশ করল এবং টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চা ছাঁকতে লাগল। রূপচাঁদ নীরবে নিবিষ্টচিত্তে চাকরটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার চেহারা, চলন, মুখভাব, পরিচ্ছদ, চা-ছাঁকবার ভঙ্গী—প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এইটে তাঁর একটা স্বভাব। কোনও প্রশ্ন না ক'রে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন, এবং যখন সেটা করেন তখন কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এত বড় একটা কঠিন কাজে লিপ্ত আছেন।

চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল।

চা শেষ হতেই উঠে পড়লেন রূপচাঁদ।

চাদরটা দাও, এবার যাই—

ডানা চাদর আনতে পাশের ঘরে গেল। রূপচাঁদ পকেট থেকে একটা বার করলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে।

ডানা ফিরে আসতেই বললেন, একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস ক পারছি না। খোলাখুলি সেটা জিজ্ঞেস্ করাই ভাল বোধ হয়।

কি কথা?

আমি যে এখানে আসি যাই, তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি, এ আর যে যা বলে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার মনে কোন রকম সং হয় না তো আমার সম্বন্ধে?

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ডানার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। সত্যি কথাটা সোজা ক'রে বলতে পারলে না ডানা। একটু হেসে বললে, রকম কোনও কারণ ঘটে নি তো এখনও।

ক্ষণকাল নীরব থেকে কথাটা প্রণিধান করলেন রূপচাঁদ। তারপর বলকে যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ আমাকে হিতৈষী আত্মীয় ব'লে মেনে নি আপত্তি নেই তা হ'লে?

এত ভূমিকা কিসের বলুন তো?

তা হ'লে এইটে অসঙ্কোচে দিতে পারতাম তোমাকে। খামটা দেখালে কি ওটা?

আমি চ'লে যাবার পর খুলে দেখো।

খামটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগল ডানা তারপর মনস্থির ক'রে ফেললে।

আচ্ছা, দিন।

খামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন রূপচাঁদ।

ডানা খুলে দেখলে, একশো টাকার নোট রয়েছে একখানা, আর তার সং ছোট একখানা চিঠি। ইংরেজীতে টাইপ করা। চিঠির মর্ম:—অতি সসঙ্কোচে টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। বন্ধুর সাহায্য হিসেবে নিতে যদি তোম বিবেকে বাধে, ঋণ-স্বরূপই নিও। যখন সুবিধা হবে, শোধ দিও। বলা বাহু আমার দিক থেকে কখনও কোনও তাগাদা থাকবে না। নীচে কোনও ন নেই।

ভানা নোটখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ নীরবে। রূপচাঁদ-বুর উপর রাগ হ'ল না। সঙ্কোচও হ'ল না তেমন কিছু। তবে তার আতসারেই তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল একটু। যে নিষ্ঠুর নিয়তি র জীবনকে সুখের শিখর থেকে চ্যুত করেছে, তারই করাল ছায়া খর উপর পড়ল যেন ক্ষণকালের জন্য। মনে পড়ল একটা চিত্র। তারা ন বর্ষা থেকে পালায়, তখন পথে এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছিল, লিয়ে আসছিল যথাসর্বস্ব ফেলে। তফাত ছিল না ধনী আর ভিক্ষুকে। ত পীড়িত ভগ্নহৃদয় বুভুক্ষু জনতার সেই মিছিলটা ভেসে উঠল তার চোখের ার আবার। হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি সকলের খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন- টি নদীর তীরে। জলের সুবিধার জন্যই সম্ভবত। আয়োজন বিশেষ কিছু । মোটা চাল-ডালের খিচুড়ি আর শাক-সবজির একটা ঘণ্ট সারি সারি তা পেতে দিচ্ছিলেন সবাইকে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে আবাল-বনিতা তাই খাচ্ছিল সাগ্রহে বার বার চেয়ে চেয়ে। পথে উপর্যুপরি তিন ন কোনও খাবার পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটি লোক খাচ্ছে । খিচুড়ির দিকে চেয়ে পাতার সামনে ব'সে আছে চুপ ক'রে। লোভ মূর্ত র উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে ব'সে আছে া ক'রে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ে সিল্কের ময়লা পাঞ্জাবি, তে বেমানান-রকম উজ্জ্বল হীরের আংটি একটা। কর্মকর্তাদের মধ্যে কজন এগিয়ে এসে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, আপনি খাচ্ছেন না কেন? াকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে। তারপর নিজের ারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু, বললে, হ্যাঁ, ব। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন। কর্মকর্তা বললেন, কি ুন? একটু ইতস্তত ক'রে লোকটি বললে, আমার পাতাটা যদি সরিয়ে একটা ালাদা জায়গায় দেন। কর্মকর্তা লোক ভাল ছিলেন, আলাদা জায়গাতেই াতে দিলেন তাকে। ভানা পাশেই ছিল, সবিস্ময়ে শুনছিল সব। লোকটি ক্তি থেকে আলাদা জায়গায় ব'সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, ারপর বোকার মত হাসতে হাসতে কর্মকর্তার দিকে চেয়ে বললে, আপনাকে ই দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই কয়েকদিন আগেই আমি কোটিপতি

ছিলাম। আমার বাড়িতেই প্রত্যহ আড়াই শো কাঙালী ভোজন করাতাম এখন আমি সর্বস্বান্ত, তবু ওদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে খেতে পারছি না। আবার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর গপগপ ক'রে খেতে লাগল। ডানার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সমস্ত ছেড়ে এসেছেন বর্ষায়, একটা জিনিস কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেন নি। অহঙ্কার। অনেক দিন পরে আজ আবার মনে পড়ল ছবিটা। মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে অশোভন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করবে না সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। সকালবেলা আনন্দবাবু এসেছিলেন নদীর ওপারের আকাশটা মনোহর হয়ে উঠেছিল তখন। সাদা মেঘের বিরাট একটা জাল টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন নীল আকাশপটে। আনন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথাগুলো এখনও ডানার কানে বাজছে।

আপনি আর আমি কিন্তু ঠিক এক রকম দেখছি না। পৃথিবীতে কোন দুটি লোক ঠিক এক রকম দেখে না, যদিও একই জিনিস দেখে।

তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। মনে হ'ল দৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেল যেন ওই নীল অসীমের মাঝখানে।

হঠাৎ বললেন, কাগজ আছে?

চিঠি লেখার প্যাড আছে একখানা।

দেবেন? একটা কবিতা লিখতাম তা হ'লে।

তার প্যাডে একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।

ডানা টেবিলের কাছে স'রে গিয়ে কবিতাটা পড়ল আবার।

আকাশ কেবল বাহিরেই নাই, সখি,
মনেরও ভিতরে আকাশ রেখেছ ঢাকি
সে আকাশ ভরি' যে তারার ঝকমকি
গভীর নিশীথে দেখেছ কখনও তা কি?
তোমার আকাশে জাগিছে তোমারই ভাষা
হয়তো নয় তা সারেক তপন তারা
আমার আকাশে কাঁপিছে আমার আশা
আপনার সুরে আপনি আত্মহারা

তোমার আকাশে যে রাগিণী শোন তুমি
আমার হয়তো শুনিতে আছে তা বাকি।

তোমার আকাশে যে ইন্দ্রধনু ছটা
তাহার মহিমা একাই দেখেছ তুমি
আমার আকাশে বরষার ঘনঘটা
আকুল করিয়া তোলে মোর মনোভূমি
তব-অভিসার ছায়া পথে পথে যবে
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে থাকে মোর আঁখি।

বাহির-আকাশে জাগে অনন্ত নীল
মনের আকাশে বহু বর্ণের খেলা
এ দুয়ের মাঝে আছে কি না কোনও মিল
তারই সন্ধানে বসেছে কবির মেলা
যুগ-যুগান্ত জাগিছে তন্দ্রাহীন
ছন্দে ছন্দে তাহারই হিসাব রাখি।

দুই অম্বরে বাজে গম্ভীর বাণী
জানি না কি সুরে কে যে সঙ্গীত গাহে
কান পেতে আছে কবি গুণী সন্ধানী
শিল্পী তাহারে চিত্রে আঁকিতে চাহে
বৃথা সন্ধানে হয়তো জীবন কাটে
ভুল রঙ দিয়ে সত্যের ছবি আঁকি'।

ভানার সহসা মনে হ'ল, আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাঁদবাবুর একশো কার নোট একই জিনিসের দুই রূপ, রসায়নশাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক ডিফিকেশন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। মনের অন্ধকারে ন হ'ল, প্রেতের মতন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

৩

অতিশয় উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের বাড়ির ছন দিকে। দোয়েলটা খুব ডাকছে নিমগাছের উঁচু ডালটায় ব'সে। এটা

তাঁরই দোয়েল, অর্থাৎ গত বছর যে পাঁচটা দোয়েলের পায়ে তিনি রিং পরি দিয়েছিলেন এটা তারই একটা, বাকি চারটেকে এখনও দেখতে পান নি তিনি এটাকেও এতদিন খুঁজে পান নি। হঠাৎ আজ নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানি তাঁর নোট-বুক বার ক'রে তাড়াতাড়ি তারিখটা লিখে নিলেন, দোয়েলটা কোথায় প্রথম দেখা গেল, তাও লিখলেন। হঠাৎ আবার সেই সন্দেহটা ম জাগল। সমস্ত শীতকাল এদের এত কম দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হ এরা বোধ হয় এ দেশে থাকেই না। শীত একটু কমলে তবে আসে। ি করাচী প্রভৃতি স্থান থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে দোয়েলরা যে চ' আসে—এ কথা লাহা মশায় লিখেছেন। হয়তো শীতের সময় ওরা ওই অঞ্চলে চ'লে যায়, কে জানে! শীতকালে ও-দেশের টেম্পারেচার কত থাকে এ খোঁজ করতে হবে।...দোয়েলটা উড়ে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের তারের উপর গানের ধরনটাও গেল বদলে। ধমকের সুর ফুটে উঠল। বৈজ্ঞানিক আ পাশে চেয়ে দেখলেন, কারণটা কি, নিশ্চয় আর কেউ এসেছে। দেখতে পেলে না কিছু। পাখিটা লেজ খাড়া ক'রে তেড়ে যেতেই চোখে পড়ল আর এক দোয়েল। এইটেই প্রত্যাশা করছিলেন। দ্বিতীয় দোয়েলটা তাড়া খে অপরাধীর মত পালিয়ে গেল কিছুটা দূর, কিন্তু কিছু দূর গিয়েই রুখে দাঁড়াল তাৎপর্যটা বুঝতে বৈজ্ঞানিকের দেরি হ'ল না। এ কথা বইয়ে পড়েছেন ও আগে। প্রত্যেক পাখিরই নিজের নিজের এলাকা থাকে। নিজের এলাকা কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দুটো এলাকার মাঝখানে থাকে খানিক 'এজমালি' এলাকা, সেখানে সব এলাকার পাখিই যেতে পারে। দ্বিতী দোয়েলটি প্রথম দোয়েলের এলাকায় ঢুকে যে বে-আইনী কাজ করেছে তা বে জানে, তাই অপরাধীর মত স'রে পড়ল তাড়া খেয়েই। কিন্তু এজমা এলাকায় গিয়ে, যেখানে তারও অধিকার আছে, সে আর বকুনি সহ্য করে রাজী নয়। পালক ফুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাখিটা তেড়ে গে তার দিকে, দ্বিতীয়টা তুড়ুক ক'রে স'রে বসল আর একটা ছোট ডালে আ তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অমরবাবুর মনে হ'ল, এটা গান তো নয়ই হাহাকারও নয়, অনেকটা হুমকি-গোছের। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে লেজটা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বারংবার, মনে হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি বলছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছু হটার ভাবও আছে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হ'ল

গারীকে। প্রথম পাখিটা এমন ছোঁ মেরে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল যে, ক থাকা অসম্ভব হ'ল তার পক্ষে। চোঁ-চা দৌড় দিলে বকুলগাছের পাশ য়। প্রথম পাখিটা আর পশ্চাদ্ধাবন করলে না, ফিরে এসে বসল নিম-ছের সেই উঁচু ডালটাতে। এটা তার নিজের নিমগাছ, এর ত্রিসীমানায় তীয় কোনও দোয়েলকে আসতে দেবে না সে আর। বৈজ্ঞানিক নিজের ট-বুকে এই দোয়েলটির এলাকার ম্যাপ এঁকে নিলেন একটি। বকুলগাছ র আমগাছের মাঝামাঝি জায়গাটা বোধ হয় এজমালি এলাকা। পূর্বদিকে গাছ, পশ্চিমে মল্লিকের বাগানের দেওয়াল, উত্তরে মালিদের ওই ঘরটা আর কণে আস্তাবল। প্রায় বিঘে দশেক জায়গা হবে। এইটুকুই মনে হচ্ছে দোয়েলটির স্বরাজ্য।...এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল বকুলগাছটাতে, মগাছের যে ডালটা সবচেয়ে উঁচু, তার উপর এসে বসল একটা পুরুষ টুনি। কুচকুচে কালো রঙের উপর নীলের আভা বেরুচ্ছে। ডানার পাশে টি একটু লাল জ্বলছে আগুনের মত। চি হুইট্, চি হুইট্, চি হুইট্...মুখ ক'রে ডাকতে লাগল পাখিটা। সারি দিয়ে বাঁশপাতি পাখী উড়ছে দল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দূর থেকে ভেসে আসছে পিয়ার অবিশ্রান্ত ডাক।

...ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর মনে হ'ল, নি যেন কোনও অবাস্তব স্বপ্নলোকে এসে হাজির হয়েছেন, যেখানে সুর আর ছাড়া প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সহসা যেন তিনি ভুলে গেলেন , দোয়েল পাখির জীবনের অনেক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে, নমনস্ক হ'লে চলবে না। কিন্তু মনকে কি এমন ক'রে একমুখী ক'রে রাখা ধ্রুব? একই মন সহস্র দিকে সহস্র ডানা মেলে উড়তে চাইছে যে অহরহ। য়েলের ডাকেই ঘোর ভাঙল বৈজ্ঞানিকের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, নিম-ছের উঁচু ডালে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাইছে। এক ঝাঁক গিটকিরি যেন দৃপ্ত পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাঁশীর তানে ভর ক'রে। একটু আগেই যে এই াখিই মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তা কে বলবে! একটু দূরে টুনটুনি ডাকছে, য়ার ঝাঁক বসেছে পাশের বকুলগাছে, বাঁশপাতি পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে চ্ছন্দে আশেপাশে, দোয়েলের তাতে আপত্তি নেই। দ্বিতীয় আর একটি য়েল এলে কিন্তু ও আর কিছুতে সহ্য করবে না তাকে। আত্মীয়-প্রীতি

মোটে নেই। কারই বা আছে? হঠাৎ মনে হ'ল বৈজ্ঞানিকের। আত্মীয়ের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয় না, কারণ তাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কটা এত উগ্ররকম মুখ্য যে, প্রীতির সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাতে উৎসুক তারা সর্বদা। তোমার ঐশ্বর্যে যদি ভাগ বসাতে দাও তাদের, তা তারা সুখী হবে না, হিংসায় জ্বলে মরবে। জটিল মনস্তত্ত্ব। এই জন্যে পৃথিবীর বড় বড় কাব্যের বিষয় বোধ হয় আত্মীয়-বিরোধ। বড় বড় গণিত যেমন শক্ত শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন, বড় বড় কবিরা তেমন জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্য নিয়ে আত্মহারা হতে চান। থিয়োরিটা খাড়া ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। আশ্চর্য! অনাত্মীয়ের সঙ্গেই প্রেম হয় যার সঙ্গে কোনদিন চেনাশোনা ছিল না, সেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ আগে সভ্যসমাজে লোকে বোনকেই বিয়ে করত, সে যখন আরও সভ্য হ'ল তখন এ প্রথা উঠে গেল। বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পরের মেয়েকে গৃহিণী করার প্রথা শুধু যে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, এ মনে করবার কোনও কারণ নেই। প্রজনন-বিজ্ঞান অনেক পরের ব্যাপার। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম জমে না—এই সত্যটাই মানুষ বোধ হয় অনেক আগে আবিষ্কার করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন ...চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। দোয়েলটার দিকে আবার মন দিতে চেষ্টা করলেন। ওই যে সঙ্গিনীটিও এসে নীচের ডালে বসেছেন। ভাবটা, যেন কিছুই জানেন না। ওকে কেন্দ্র ক'রেই যে এখনই অত বড় যুদ্ধ একটা হয়ে গেল, ওরই উদ্দেশ্যে উপরের শাখায় যে অমন সঙ্গীতচর্চা চলছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে আর একটা ডালে বসল। যদিও গায়ের রঙ পুরুষ পাখিটার মতই, কিন্তু অত চকমকে কালো নয়, এবং পাঁশুটের আভাস আছে। কিন্তু ওই পাঁশুটে কালোর মধ্যেই বেশ সুন্দর একটি। পুরুষটার চেয়ে একটু বেশি মার্জিতও যেন। পুরুষ পাখি উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় বসল, আবার শুরু করল গান।

...পদশব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, রত্নপ্রভা আসছেন পিছনে একজন চাকর, তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা আয়না।

রত্নপ্রভা বললেন, এটা কোথায় রাখব?

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মত।

ওই নিমগাছটার তলায় রাখলে কেমন হয়! গাছপালা দিয়ে একটু ঘেরে তে হবে কিন্তু। আর আমরা কোন্‌খানটায় বসব বল দিকি? কাছাকাছি মাদেরও বসবার একটা জায়গা করতে হবে, ফোটো তুলব কিনা!

আমাদের ছোট তাঁবুটা এখানে টাঙিয়ে দিলেই তো হয়।

বেশ তো, তা হ'লে চমৎকার হবে।

ওই উঁচু জায়গাটায় দিই?

তা হ'লে তো গ্র্যাণ্ড হবে। গাছপালা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কিন্তু। নে তাঁবু-টাবু দেখে পাখিটা—

বুঝেছি। আগে তুমি খেয়ে নাও। চা ভিজিয়ে এসেছি।

ও, চল।

বৈজ্ঞানিক ফিরেই দেখলেন, কবিও আসছেন।

ও, আপনি এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আজ একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট রব ভাবছি।

কি?

দেখতেই পাবেন, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক, চলুন।

ক্রমশ

"বনফুল"

"বাদ"

সব "বাদ" বাদ দাও, মনে রাখ সার—
আপনি বাঁচিলে বাঁচে নিখিল সংসার।

"সুচরু"

নেতা

টাকাকড়ি লোকজন করিয়াছ জড়ো,
শহীদ হইয়া সবে দেশকর্ম কর।
হাসিল হইলে কাজ জয়ধ্বনি দিয়া,
শোভাযাত্রা ক'রো মোরে পুরোভাগে নিয়া।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ কথা

স্বাধীনতার এক বৎসর পরে

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেও মাসের উপর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে পথের মাঝখানে হয়ে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখার দরকার, আমরা কতদূর আসিলাম এবং আমাদের ঠিক আছে কি না। যে লক্ষ্যের দিকে আমরা যাত্রা করিয়াছিলা সেদিকে চলিয়াছি তো?

সম্প্রতি প্রায়ই কলিকাতার বাহিরে, কাছাকাছি জেলাগুলিতে ঘোরাফে করিতে যাই। কলিকাতার মধ্যেও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁহাদের দৈনন্দি দুঃখের সংবাদ পাই; কাপড় কালোদাম ভিন্ন খরিদ করিবার উপায় না রেশনের চাল খারাপ, গভর্মেণ্ট-আপিসে কংগ্রেসকর্মী অথবা আধাকর্মী কিং সিকিকর্মীর অবাধ গতি, জনসাধারণের উপরে তাঁহাদের মাতব্বরির সীমা না এমনই অসংখ্য দুঃখের কাহিনী। আমার মনে বারংবার প্রশ্ন জাগিতেছে, ধরি লইলাম, সমস্ত অভিযোগই সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমরা যখন সংগ্র করিয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে কি ছিল? কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আম ছুটিয়াছিলাম?

ভাবিয়া মনে হইয়াছে যে, আমরা কংগ্রেসের নামেই আন্দোলন করি অথ হিংসার আশ্রয়ে বিপ্লবপ্রচেষ্টাই করি, আমরা সর্বপ্রথম ইংরেজকেই তাড়াইব চেষ্টা করিয়াছিলাম, দূর-ভবিষ্যতের বিষয়ে তত ভাবি নাই, দূরের সাধ্যের ও সাধনকে যথাযোগ্য ভাবে নির্মাণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই দ্রুত কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে জার্মানির, সম্ভব হইলে জাপানে নিকট অস্ত্রসাহায্য সংগ্রহের চেষ্টাও করিয়াছি; আশু প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা পরিচালনার ব্যাপারে অনাচার ও অধর্মকে আশ্রয় করিতেও পশ্চাৎপদ হই নাই আমাদের মনের পিছনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যাহারা জীবন পণ করি দেশোদ্ধারের ব্রতে আগুয়ান হইতেছে, তাহারা কখনও স্বার্থ-দুষ্ট হইবে না সেই ভরসা ছিল বলিয়াই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে বিপ্লবের নেতৃত্ব সমধি পরিমাণে উদিত হইয়াছিল। বিপ্লব যত আগুয়ান হইবে, ততই ক্র সাধারণ চাষী মজুর জাতীয় মানুষ অগ্রণী হইয়া আসুক, এবং মধ্যবিত্তগণ ক্রমে তাহারা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া দিক, পূর্বতন নেতাগণ জীবন-ভা

ইতে জীর্ণ পত্রের মত শুকাইয়া খসিয়া পড়ুক, ইহার জন্য বিশেষ কোনও ায়োজন অথবা চেষ্টা আমাদের ছিল না।

ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, ভারতশাসনের ভার ইংরেজের পরিবর্তে ভারত-াসীর হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক ক্তিকেন্দ্রগুলি গান্ধীজী আঠারো দফা গঠনকর্মের সহায়তা গড়িয়া তুলিতে াহিয়াছিলেন, তাহা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। লে পরিশ্রমজীবীদের আয়ত্তে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা না আসিয়া পরশ্রমজীবীদের ায়ত্তে আসিয়াছে। প্রত্যেকেই দাবি করিতেছে যে তাহারাই পরিশ্রমজীবীদের কৃত প্রতিনিধিত্ব করে। যে দল আজ শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সে দল লিতেছে যে, নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তির দিকেই তাহারা দেশকে লইয়া চলিয়াছে; ন্তু জগতের বর্তমান অবস্থায় এবং যখন রাষ্ট্রকে বিগত যুগের সমস্যারাজীর জর টানিয়া চলিতে হইতেছে, তখন ইহা অপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব নয়। লিবার চেষ্টা করিলে দেশকে আরও গুরুতর বাধার আঘাতে হয়তো পথ চলাই ন্ধ করিতে হইবে। আবার অপর পক্ষে যাহারা শাসনে অধিকারীবৃন্দের ালোচনা করে, তাহারা বলিতেছে, তোমাদের দলের দ্বারা হইবে না। আমরা ার পাইলে দেখাইয়া দিতে পারি, কি করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ পুষ্টি করিতে য়। ভবিষ্যতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের জন্য সমালোচকদল বর্তমান অধিকারীদের রুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসন্তোষের সুযোগ লইতেছে এবং সেই অসন্তোষ বৃদ্ধি রার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করিতেছে।

উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শুনিয়া আমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। আজ াহারা সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজ্‌মের নামে বর্তমান শাসককুলকে সরাইয়া াষ্ট্র-পরিচালনার ভার লইতে চায়, তাহারা অধিকারী হইলে অবস্থাটি কেমন াড়াইবে?

রুশ দেশের অবস্থাই বিবেচনা করা যাক। সেখানে মস্‌কো ট্রায়েলের সময়ে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর, এমন কি বিপ্লবের নেতা হইয়াও মানুষের ার্থবুদ্ধি, ক্ষমতাপ্রিয়তা অনেক সময়ে দূর হয় না। ভারতীয় সাধনার ভাষায় লিতে গেলে বলিতে হয়, মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিলেই যে মানুষ সকল সংস্কার-াশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা নহে। শ্মশানসাধনায় এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ টিতে পারে। কিন্তু তেমন সাধুকেও মহান্তের গদিতে বসাইলে যে সকল

সংস্কারের বীজ তাহার অন্তরে দগ্ধ হইয়া যায় নাই, সেগুলি অবাধ ক্ষমতালাভে আবহাওয়ায় আবার অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে। ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি রুশ দেশে যে পথ অনুসৃত হইতেছে তাহা হইল, ব্যক্তির বুদ্ধি ও চরিত্র অপে পার্টির উপরে বেশি নির্ভর করা। পার্টিকে আবার বিশুদ্ধ রাখিবার চে অন্ত নাই। কিন্তু পার্টির ভিতরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সংশ অবসান ঘটে না। লেনিনকে সময়ে সময়ে একা চলিতে হইয়াছে; অ তিনি সত্য লাভ করিয়াছেন, অপরে লাভ করে নাই—এই বিশ্ব পার্টি অপেক্ষা সত্যকেই তিনি নিবিড়তরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলে যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে রিএক্শন মৎলববাজ ছিলেন, এমন নয়। রোজা লুক্সেমবর্গের মত ব্যক্তিও কোন সময়ে লেনিনের মতের সহিত কিছুতে এক হইতে পারে নাই। অতি তর্কের দ্বারা, প্রয়োজন হইলে অতি উগ্র ভাষা বা বাক্যবাণের আঘাত সহায়তায় তিনি পার্টিকে স্বীয় মতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার দৃ বিরল নহে। নিউ-ইকনমিক-পলিসি প্রবর্তনের সময়ে লেনিনকে লেফ্‌ট্-উ কমিউনিজ্‌ম-অ্যান-ইন্‌ফ্যাণ্টাইল-ম্যালাডি নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়া জনমত স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাহাতে যুক্তি প্রচুর আছে; যুক্তিকে গলাধঃকরণ করাইবার জন্ত ঝালমসলা প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া বু এই খোরাকটিকে পরিবেশন করিতে হইয়াছিল।

তেমনই আবার পরবর্তী কালে রুশ দেশকে আত্মরক্ষার আশু প্রয়োজনে সময়ে জার্মানির ফাসিস্ট শক্তির সহিত অনাক্রমণের চুক্তি করিতে হইয়াছি যখন যুদ্ধ সমগ্র জগতে প্রবলভাবে চলিতেছে, সমগ্র বিশ্ব দুই যুধ্যমান গোষ্ঠী বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখনও এক পক্ষে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ অপর প অবস্থিত জাপানের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে; আজও সম্ভ কুলবর্তী কুওমিনটাঙের গভর্মেণ্টের সঙ্গে মিতালি করিয়া চীনের কমিউনি শক্তির সম্পর্কে অন্তত বাহিরে উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে হইতেছে এই সকল জটিল ব্যাপারের মধ্যে কোন্‌টি নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পোষ কোন্‌টি নয়, তাহার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ তো প্রায়ই দিশাহারা হইয়া যা সেই সন্দেহের অবস্থায় পার্টি বলিয়া দেয়, কোন্ পথ ঠিক, কোন্‌টি নয়। পার্টি মধ্যেও দেখিয়াছি, যেখানে স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্ন উঠে না, সেখানেও মতের আঁকা

তাল প্রভেদ হওয়া বিচিত্র নয়, এবং অবশেষে দুর্যুক্তিকে গলাধঃকরণ যাইবার কালে গালাগাল-মন্দের অনুপান কম দিতে হয় না। তাহার চেয়ে ঠোরতর উপায়ের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সবই মানিলাম ঠিক, না। সম্পূর্ণরূপে মানিয়াই লইলাম, রুশ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অভ্রান্ত গতিতে নসাধারণকে মুক্তির অভিমুখে লইয়া চলিয়াছেন। এবং পার্টির মধ্যে যখনই ন হইয়াছে কলুষ প্রবেশ করিতেছে, তখনই সংশোধনের জন্য বলপ্রয়োগ ড়া অপর কোনও অস্ত্র তাঁহারা পান নাই; অর্থাৎ অভিপ্রায়ের কখনও চ্যুতি ঘটে নাই।

ইহাতে হইল কি? পার্টি পরিচালনকার্যের দায়িত্ব লওয়ার পর উহা একটি ক্তিকেন্দ্রে পরিণত হইল। জগতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণেরাও অপরিগ্রহ এবং স্তেয় ব্রত অবলম্বন করিয়া অবশেষে অনাগারিক অবস্থায় সমাজ-পরিচালনার য়িত্ব লইয়াছিলেন। কিন্তু নববাহ্মণসমাজ ভাবিতেছেন, নিজেদের সংঘকে দ্ধ রাখিয়া জগতের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে এমন দ্রুত পরিবর্তনের পথে লইয়া ইবেন, প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে পুরুষকারের দ্বারা এত ত্র সম্পাদিত করিবেন যে, অবস্থার গুণে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন শোষকশ্রেণী আর দানা াধিতে পারিবে না। এবং এই অবসরে পার্টিতে শক্তির কেন্দ্রীকরণে যে াষটুকু হয়, তাহা শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা দূর করিয়া দেওয়া সম্ভব ইবে না। রাষ্ট্র আয়ত্তের সময়ে ডিক্টেটরশিপ অপরিহার্য অস্ত্র, কিন্তু তাহার রেই উইদরিং-অ্যাওয়ে-অফ-দি-স্টেটের পর্ব আরম্ভ হইবে। ধনতন্ত্রবাদী ৎপাদন-ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীকরণ রচিত হইয়াছে, তাহার কাঁটা তুলিতে হইলে কেন্দ্রীকরণের অপর একটি কাঁটার প্রয়োজন। সেই উৎপাটনকারী কাঁটার াম ডিক্টেটরশিপ-অফ-দি-প্রোলেটারিয়েট। কিন্তু কার্যত আজ আমরা খিতেছি, তাহার স্থলে ডিক্টেটরশিপ-অফ-এ-পার্টি-রেপ্রেসেন্টিং-দি-প্রলেটারিয়েট স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাহারও আয়ুষ্কালের ক্ষীণতা সম্বন্ধে কোনও রসার সংবাদ পাইতেছি না।

আজ ভারতবর্ষে যে দল রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহারা কেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী না হইলেও সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছেন, তাঁহারা তো খোলাখুলি কেন্দ্রীকরণেই বিশ্বাসী; কেবল তাঁহাদের কেন্দ্রীকরণের ধরণ-ধারন স্বতন্ত্র। এই লইয়াই দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে।

রুশ দেশের মধ্যে শক্তির কেন্দ্রীকরণকেও সাময়িক ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না। কেন না, উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ইচ্ছা থাকিলেও দেশরক্ষার ব্যাপারে যতক্ষণ মানুষ অস্ত্রশস্ত্রের উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ সেখানে কেন্দ্রীকরণ থাকিয়া যায়, ততক্ষণ সেই কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থাতেও বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয় না। যে রাষ্ট্র অস্ত্রবলের দ্বারা দেশরক্ষা করে, যে রাষ্ট্র সামরিক ক্ষমতাকে একান্তভাবে পুঞ্জীভূত করিলে তবে প্রজার প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয়, এবং এই পুঞ্জীকৃত শক্তি লইয়া অবস্থাবৈগুণ্যে কখনও জার্মানি, কখনও ইংলণ্ড আমেরিকা, কখনও বা কুওমিনটাঙের সঙ্গে মিতালি করিবার ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাখিতে বাধ্য হয়, সেই রাষ্ট্রশক্তি জীবনের অর্থনৈতিক ব্যাপারে কখনও বিকেন্দ্রীকরণ স্বীকার করিতে পারে না। যে সেরূপ পরামর্শ দেয়, সে যুধ্যমান রাষ্ট্রকে আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতে বলে। অতএব যুদ্ধার্থে কেন্দ্রীকরণের ছায়াতলে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা রোদের অভাবে ক্যাকাশে রঙ ধরিয়া অকালে মরিয়া যায়।

ভারতবর্ষও আজ দেশরক্ষায় হিংসার নীতিকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে সে অমোঘভাবে যে কেন্দ্রীকরণের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহা বিষয়ে চিন্তা করিয়া সাধারণ মানুষের মুক্তি বা স্ব-রাজের আলোর কিরণ দেখিতে পাইতেছি না। আজ ভারতশাসনের ধরণ-ধারণ দেখিয়া, তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহার জন্য আংশিক পরিমাণে অধিকারীবৃন্দ যে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সংগ্রাম করিতে শিখিয়াছিলেন, রাজ্য-পরিচালনার অভ্যাস কখনও করেন নাই। সদভিপ্রায় থাকিলে এবং বুদ্ধিযুক্ত পরিশ্রম করিয়া লইলে হয়তো শিখিয়াও লইতে পারিতেন। কিন্তু সব দোষটুকু ব্যক্তিগতভাবে অধিকারীবৃন্দের উপরে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আরও সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিতেছি, পার্টিকে দেবতায় পরিণত করার ফলে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছে, হিংসা এবং পরিচালনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছে। অতএব আজ যদি তথাকথিত বিপ্লবের দ্বারা বর্তমান শাসকবর্গ পদচ্যুত হয় এবং সেই স্থলে সমালোচকদল গদিতে বসিতে পায়, তাহা হইলে মুক্তির দিকে আমরা আগাইয়া যাইব, তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। অধিকারীবৃন্দের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা অক্ষমতার বশে যাহা ঘটিতেছে, উহা

অধিকারী তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত হইলে, সেই দোষের নিরাকরণ সম্ভব। কিন্তু পার্টি-দেবতার প্রসাদে যে দুঃখের উদয় হয়, সমাজে শক্তির কেন্দ্রীকরণে যে দোষ দেখা দেয়, তাহা তো থাকিয়াই যাইবে। রুশ দেশের বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া সে বিষয়ে কোনও ভরসা পাইতেছি না।

কমিউনিজ্‌ম্ কিছু কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিছু পড়িয়া, কিছু শ্রদ্ধাসম্পন্ন কমিউনিজমে বিশ্বাসী বুদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করিয়া। কিন্তু একটি বিষয় আমার অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে। দ্বন্দ্বমূলক জগতে সকল অবস্থারই প্রতিশক্তি কালে উদিত হয়। মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংগ্রাম ইতিহাসে চলিয়া আসিতেছে, সেই শ্রেণী-সংগ্রামে যে হিংসার অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই হিংসার প্রতিশক্তি কি কখনও উদিত হইতে পারে না? হিংসার দ্বারা ফললাভ সুচারুরূপে হয় না, তবু হিংসাকেই মানবসমাজ বারংবার দ্রুত কার্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার নানা দোষ জানিয়াও, আরও উত্তম অস্ত্র নাই বলিয়াই মানবসমাজ হিংসা পরিবর্জন করিতে ভরসা পাইতেছে না। এইখানে প্রশ্নের উদয় হয়, হিংসারূপ মোটা অস্ত্রের দোষের সম্পর্কে যখন আমরা সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহার প্রতিশক্তির প্রয়োগ কি মানুষের বুদ্ধির অতীত বস্তু হইবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, ইহার সম্ভাবনা আছে। মানুষ পূর্বকালে ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তাড়ন করিত। পাগলের চিকিৎসার জন্য মারধোর করা তো প্রচলিত ঔষধ ছিল। অপরাধীকে সংশোধনের জন্য ওই একই অস্ত্র হাজার বছরেরও বেশি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু আজ মনোবিজ্ঞান এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, শিশুশিক্ষার ব্যাপারে, পাগল অথবা অপরাধীকে সংশোধনের জন্য সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করা সম্ভব; মনোজগতে বস্তুত বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে একের পরিবর্তে বহুর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, সেখানে আজও আমরা মনে করি, বলপ্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সমাজের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ রাষ্ট্র যাহারা অধিকার করিয়া আছে, তাহাদিগকে আসনচ্যুত করিতে হইলে, এবং সেই আসনে বসিয়া নূতন সমাজ-রচনার পথকে নিষ্কণ্টক করিতে হইলে, হিংসার ব্যবহার অপরিহার্য; অর্থাৎ প্রতিপক্ষের মনকে ভয় ভিন্ন ভালবাসা দিয়া কিছুতেই পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইবে না।

এইখানে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা আমার মনে হইয়াছে, গান্ধীজীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের কৌশল পরীক্ষার যোগ্য। ছোট ছোট স্বার্থের দ্বন্দ্বে ইহার দ্বারা হিংসামূলক উপায় অপেক্ষা সুফল লাভ করা যায়, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বৃহত্তর স্বার্থদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ইহার সম্যক্ পরীক্ষা হয় নাই। আমাদের দেশ যখন সত্যাগ্রহকে আশ্রয় করিয়া মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন সত্যাগ্রহের নূতন রণকৌশলটিকে সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করা, অথবা তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিলে তাহাকে শুদ্ধতর করা অপেক্ষা আশু ইংরেজ-বিতাড়নের দিকে আমাদের ঝোঁক ছিল। বহু রণক্ষেত্রে আমরা স্বীয় সংস্কারকে আদরে আঁকড়াই ছিলাম বলিয়াও সত্যাগ্রহের যথাযথ পরীক্ষা হয় নাই। ঠিক বিজ্ঞানদৃষ্টি লইয়া কার্য করিলে হয়তো ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহকে আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা আরও উত্তম অস্ত্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইব। গান্ধীজী ইহাকে যতদূর শাণিত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে হয়তো আমাদের দ্বারা উহার আরও উন্নতি সাধিত হইবে।

যাহাই হউক, আজ নবভারতে যে সকল দোষত্রুটি দেখিতেছি, তাহা বিরুদ্ধে আমার রাগ নাই। মনে হয়, যাহারা সত্যাগ্রহের অসম্পূর্ণ পরীক্ষার পর হিংসার অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, যাহারা পার্টিরূপ দেবতার পূজা প্রবর্তন করিতেছে, যাহারা জগতের দুঃখ নিবারণকল্পে কেন্দ্রীকরণের কাঁটা কেন্দ্রীকরণের দ্বারাই উৎপাটিত করিতে চায়, তাহাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাদোষের জন্য সংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া থাকার জন্য যতটুকু অপরাধ ঘটিতেছে, তাহা না ধরিলে মূলেই তাহারা এমন কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, যাহা অ বহু দোষের আকর। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের বদলে সোশ্যালিস্ট পার্টি, আ সোশ্যালিস্ট পার্টির বদলে কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করি কেমন করিয়া তাহারা সকলে আসলে পার্টি-দেবতার পূজক; ওই দেবতার পূজার মন্ত্রই এম যে, তাহার দ্বারা নূতন শৃঙ্খলের রচনা হয়। এক উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া অ উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িবার কালে ধনকৌলিন্যের পরিবর্তে পার্টি-কৌলিন্যে উদ্ভব হয়। এবং বিপ্লবকৌশলই যেখানে হিংসার সাধনকে আশ্রয় করিয়া চ সেখানে হিংসার দাসত্ব আরও গভীরভাবে মানবসমাজের বুকে চাপিয়া বসে।

এই নাগপাশ হইতে গান্ধীজী মুক্তির উপায় আবিষ্কার করার চে করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ছিল, যে শক্তিকে আমরা পরাস্ত করিতে চা

সেই শক্তির প্রতিশক্তিকে অবলম্বন করাই একমাত্র সার্থক উপায়। কবিতার ভাষায় তিনি বলিতেন, দ্বেষকে প্রেমের দ্বারা জয় করিতে হইবে, হিংসাকে অহিংসার দ্বারা। কিন্তু সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও মোটা ভাষায় তিনি বলিতেন, কেন্দ্রীকরণকে পরাস্ত করিতে হইলে বিকেন্দ্রীকরণ ভিন্ন উপায় নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

নোয়াখালিতে সমস্যার সমাধান যখন প্রাদেশীয় গভর্মেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের সাধ্যের অতীত হইয়াছিল, যখন উভয় গভর্মেণ্ট সেখানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া 'শান্তি' প্রতিষ্ঠিত করিলেও মূল রোগের নিরাকরণ করিতে পারেন নাই, তখন গান্ধীজী সম্পূর্ণ নূতন উপায়ে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিলেন। নোয়াখালিতে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস, নারীর অবমাননা সবই ঘটিয়াছে। যে কোন সংগ্রামের মধ্যে এ তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিতে মূল সমস্যা ছিল অন্য। নোয়াখালির মুসলমান-জনতা স্থির করিয়াছিল যে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের বলপ্রয়োগের বশে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে সংখ্যালঘু-সমস্যার আমূল সমাধান হইয়া যাইবে। অর্থাৎ একটি এলাকায় শুধু একই ধর্ম, একই পোশাক, একই ভাষা থাকিবে, ইহা তাহারা বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার প্রতিকার গভর্মেণ্টের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। গান্ধীজী বলিলেন, যদি সকল হিন্দু নোয়াখালি হইতে চলিয়াও যায়, আমি তাহাদের একক প্রতিনিধি হইয়া থাকিব, এবং আমার ধর্মবিশ্বাস স্বাধীনভাবে অনুসরণ করিয়াই থাকিব। মুসলমান-জনতাকে শাসন করিয়া নয়, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, কিন্তু স্বীয় ধর্মমত পুরাপুরি পালন করিয়া, তিনি তাহাদের অন্তর জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিন্নধর্ম-পালনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য একক সত্যাগ্রহীর মত সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যারও গান্ধীজী এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমাধান করিবার পথ দেখিয়াছিলেন। চরকা এবং অপর কুটিরশিল্পের সাহায্যে গ্রামবাসীগণ সমবায়-সমিতি গড়িয়া কি করিয়া অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বহু দিন উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, চাষ যৌথভাবে করিতে হইবে, গোপালন একা একা না করিয়া যৌথভাবে করিতে হইবে; এবং সেই সবই লাভের কড়ির জন্য নয়, তৎপরিবর্তে ব্যবহারের জন্য

করিতে হইবে। চুরি-ডাকাতি নিবারণের জন্য পুলিসে যাহা পারে করুক কিন্তু জনসাধারণ অন্যভাবে সচেষ্ট হইবে। চুরির ধন, শোষণের ধন কেহ ঘরে রাখিবে না; অতএব অস্ত্রের সাহায্যে তাহা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও থাকিবে না। তখনও যদি কোনও লোক শিক্ষা বা সংস্কারের দোষে চোর হয়, শোষক হয়, তবে সত্যাগ্রহের দ্বারা তাহাকে পরিবর্তিত করিতে হইবে, এই শিক্ষা গান্ধীজী দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত এবং সমবেত চেষ্টায় তিনি যে নূতন সমাজ-রচনার শিক্ষা দিতেন, সেখানে যে পরিশ্রম করে না তাহার স্থান নাই; সেখানে আর্থিক অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেরূপ সমাজের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য—অর্থাৎ শোষণবিহীন সমাজে ব্যক্তিগত ব্যবহারে সম্পত্তি এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—গান্ধীজী সত্যাগ্রহকেই অমোঘ অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন; মানুষকে কেন্দ্রীকৃত সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রাণরক্ষা অপেক্ষা 'আত্ম'-রক্ষার এই শুদ্ধতর পথকে আশ্রয় করিবার উপদেশ দিতেন।

বর্তমান ভারতের শাসকবৃন্দের অপরে যে-দোষ দেখান না কেন, সে কীর্তন আমি যোগ দিতে পারিব না। কিন্তু এ দোষ তাঁহাদের দিব যে, গান্ধীজী বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকে তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে পরিপোষণ করিতেছেন না কিন্তু এই দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিলে অপরাধী হইতে হয়। জাতি জীবনে এক বৎসর কিছু নয় মানি। পুরাতন দিবসের পুঞ্জীভূত আবর্জনাস্তূপ বিপদ ঘটাইতেছে, তাহাও মানি। কি উপায়ে আমাদের পক্ষে বর্তমান অবস্থার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তাহারই ইঙ্গিত দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

আজ দেশের মধ্যে অন্ন এবং বস্ত্রের অভাব। যাহা উৎপাদন হইতেছে তাহা পর্যাপ্ত নয়, উপরন্তু যুদ্ধের প্রসাদে যাহাদের হাতে ছাপা টাকা জমিয়াছে তাহারা বাজার আরও খারাপ করিয়া দিতেছে। ফলে যতটুকু চাল বা কাপড় দেশে উৎপন্ন হয়, তাহারও বণ্টন অত্যন্ত অসমভাবে ঘটিতেছে। নিতান্ত দরিদ্র যাহারা, অথবা যাহাদের কালোবাজারে যোগাড় করিবার ক্ষমতা না থাকাধরি করিবার কেহ নাই, তাহাদের কষ্টের শেষ নাই। শোনা যায়, গভর্মেণ্ট মিলের মালিকদিগকে অনুরোধ উপরোধ করিতেছেন যেন উৎপাদন তাঁহারা বাড়ান। গভর্মেণ্ট নিজে এদিকে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর এবং আধুনিক যুদ্ধ

রিদ করা ও সৈন্যবিভাগকে সুগঠিত করার ব্যাপারে এমনই বিব্রত যে, লকারখানার জাতীয়করণ করিতে পারিতেছেন না। মিল-মালিকেরা ঝোপ ঝিয়া কোপ বসাইতেছেন, তাঁহারা চান গভর্মেণ্ট জাতীয়করণের নীতি রিহার করুন, অর্থাৎ মালিকদের লাভের কড়ি যেন কোনদিন খোয়া না যায় ন্ধীস্মৃতি-তহবিলে চাঁদা দিবার শর্তস্বরূপ তাঁহারা নিজেদের সুবিধাজনক তকগুলি দাবি করিতেও ইতস্তত করেন নাই। যদি আমরা ধরিয়াই লই, ভর্মেণ্টের আর্থিক দুর্বলতার কারণে, অথবা ধনীদের মন্দশক্তিকে দাবাইয়া খিবার মত পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে তাঁহারা জোর করিতে পারিতেছেন না, রে এবং বাহিরে এত ভার একসঙ্গে সামলাইতে পারিতেছেন না, তাহা ইলেও তো অন্য একটি উপায় আছে।

মিল-মালিকেরা না হয় নাই দিল সস্তায় কাপড়; বাকি ভারতবর্ষের তো ত আছে এবং কাজের অভাবও দেশে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। আজ ই হাতে যদি চরকা চালাইয়া কাপড় গড়িয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দুঃখও ঘটে, মিল-মালিকদের প্রভুত্বও ভাঙে। বুদ্ধিমান লোককে বলিতে শুনিয়াছি, রকা কাটিয়া কি আমরা আবার গরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়া যাইব? গান্ধীজীর ত্তর ছিল, 'বেশি কাপড়ের লোভে যদি আমাদের পরাধীনতার খাতায় দাসখৎ খিয়া দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে চরকা কাটিয়া কিছু কম কাপড় রাও তো ভাল।'

'আর শুধু তাই নয়। পুরাতন ভারত চরকা কাটিয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্গে জ পরাধীনতার শৃঙ্খলও পায়ে পরিয়াছিল। আমরা চরকা কাটিব এবং ার জন্য নূতন সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিব। আমাদের সুতাকাটা াভের বা মজুরির জন্য নয়, মানুষের বস্ত্রাভাব মিটাইবার জন্য চলিবে। একা ু, গ্রামের সকলের বস্ত্রাভাব মোচনের জন্য চরকা আশ্রয় করিয়া আমরা তন সমবায় সমাজ গড়িয়া তুলিব, তবেই চেষ্টা সার্থক হইবে। সেই নূতন মাজিক আবেষ্টনে চরকা নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইবে। আমরা চাষের াপারে, বস্ত্রের ব্যাপারে, গো-পালনের ব্যাপারে সমবেত শক্তিকে জাগাইয়া লিব। একবার সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইলে, সেই মন ও বুদ্ধি ইয়া আমরা সমবেত অধিকারে উচ্চাঙ্গের কলকারখানা শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে শ্চয়ই চালাইতে পারি। শ্রমলাঘব শ্রেণীবিশেষের জন্য নয়, সর্বমানবের জন্যই মাদের কাম্য।'

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এমন আকাশকুসুম রচনার দরকার কি? তাহার চেয়ে সমাজের শক্তিকেন্দ্রস্বরূপ রাষ্ট্রকে আয়ত্ত করা যাক। আয়ত্তে আসিলে সেই শক্তির দ্রুত প্রয়োগের দ্বারা ধনতান্ত্রিকদের কলকারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া, এবং রাষ্ট্রের অর্থে তাহার চেয়ে উন্নততর কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করাই তো ভাল। মানুষকে আমূল নূতন শিক্ষা দিয়া ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হইতে সমাজের কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গের শিক্ষাও তো এইরূপ শক্তিশালী রাষ্ট্র করিতে পারে। এক-একজনকে ধরিয়া হৃদয়ের পরিবর্তনের পথে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে অনেক দিন লাগিবারই কথা।

গান্ধীজী বলিতেন, 'আমিও সমাজতন্ত্রের মত ব্যবস্থাই চাই, কিন্তু অহিংস সাধনার দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। আর সমাজে বিপ্লবসাধন সকল মানুষ করে না, যাহারা সত্যাগ্রহী, তাহারা করে এবং তাহারা সংখ্যায় অল্প অবশিষ্ট কোটি কোটি মানুষকে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে।' গান্ধীজীর গঠনকর্মের অন্তরের কথা ছিল, ইহার সহায়তায় তিনি মানুষকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, নূতন সমাজের নমুনা রচনায় অভ্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া মানুষকে ক্রোধের আশ্রয়ে জাগানো যায় বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে জড়তা দূর করিতে হইলে, গড়ার কাজই সর্বোত্তম উপায়—ইহাই গান্ধীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল।

শুধু তাহাই নহে। ছোট ছোট সমবায়-কেন্দ্র রচনার দ্বারা মানুষ নূতন তালে চলিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের দ্বারা সত্যাগ্রহের সংগ্রামও সহজে চলিতে পারে। সত্যাগ্রহে নীতি এক, কিন্তু পরিচালন কেন্দ্রগত না হইয়া বিকেন্দ্রীকৃত হয়। অর্থনৈতিক জীবনে যে আত্মপরিচালন-ক্ষমতা গড়িয়া উঠিবে, সত্যাগ্রহে তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হইবে। দেশব্যাপী সত্যাগ্রহে ফলে সাধারণ মানুষ যখন ধনতন্ত্রের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তখন তাহাদের পক্ষে সহযোগিতা ও সমবায়ের ইটের পরে ইট গাঁথিয়া মুক্তির নূতন সৌধরচনা করাও সম্ভবপর হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র বানরসেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, সেখানে কাঠবিড়ালীরও স্থান হইয়াছিল। বানরের স্বভাব ভাঙা ও নষ্ট করা, কিন্তু তাহা শক্তিও গড়ার কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল। আর কাঠবিড়ালী

রামচন্দ্রের নেতৃত্বে নির্ভর না করিয়া শুধু তাঁহার প্রতি প্রেমের বশে মুখে
লির দানা বহিয়া সেই সেতুরচনায় স্বীয় সাধ্যমত সহযোগিতা করিয়াছিল।

আজ দেশের গভর্মেণ্ট যখন ধনীকুলকে কাবু করিতে অসমর্থ, তখন
হাদের উচিত হইবে গান্ধীজীর শিক্ষানুযায়ী অর্থনীতি ও আত্মরক্ষার
মতাকে বিকীরণ করার ব্যাপারে সহায়তা করা। এই বিকীরণের জন্য
র্যকরী প্রস্তাব করা যায় যে, গভর্মেণ্টের পক্ষে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ
পেক্ষা সমবায় বিভাগের উপরেই জোর বেশি দেওয়া কর্তব্য। একটি উদাহরণ
তেছি। হুগলী জেলায় আরামবাগ মহাকুমায় স্থানে স্থানে বন্যা হয়, এবং
যেরও বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া, খাল কাটিয়া নদীকে
বশ্য বাগে আনা যায়। কিন্তু যতদিন গভর্মেণ্ট সে কার্য না করিতেছেন,
তক্ষণ কি প্রজা হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে? অতএব স্থানীয় কর্মীগণ
ষ্টা করিয়া কিছু চাঁদা তুলিলেন, নিজেরা খাটিলেন, গ্রামবাসীদের প্রাণে
ৎসাহের জোয়ার আসিল, তাহারাও খাটিল। এবং সকলের সমবেত চেষ্টায়
াঘ্রকালে নদীতে আড়াআড়ি কাঁচা বাঁধ বাঁধা হইল। ফলে যখন পাশের
মিতে জল উছলিয়া পড়িল, তখন চাষীরা দ্রুত বোরো ধানের চাষ করিয়া
থেষ্ট লাভবান হইতে পারিয়াছিল। অথচ বর্ষার মুখেই কাঁচা বাঁধটি মাঝখানে
াটিয়া দেওয়ার ফলে নদীর গতিরোধের দরুন কোনও ক্ষতি হয় নাই। এইরূপ
াট ছোট সমবেত চেষ্টার ফলে মানুষের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার হয়, তাহা
বিস্তৃতে কলকারখানার আশ্রয়ে সম্পদশালী ভারতবর্ষ গড়ার পক্ষেও অন্তরায়
বে না।

গত এক বৎসরের স্বাধীনতার মধ্যে দেখিয়াছি যেন এই-জাতীয়
সরকারী প্রচেষ্টায় মন্দা পড়িয়াছে। কোথায় উৎসাহ বাড়িবে, না, কমিয়া
ইতেছে। আগে খাদিকেন্দ্রেও ইংরেজ সরকারের আঘাতের অভাব
ল না, তাহা সত্ত্বেও খাদির কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু আজ খাদি-
ন্ত্রের বৃদ্ধি না হইয়া সবাই হাত-পা গুটাইয়া ভাবিতেছে, 'আর কি?
শকে তো খাটিয়া খুটিয়া স্বাধীন করিয়া দিলাম; এবার গভর্মেণ্ট সুব্যবস্থার
রা সকল অভাব দূর করিয়া দিক'। অর্থাৎ বহু গ্রামেই দেখিতেছি, মনের
তা যেন বেশ জাঁকিয়া আসিতেছে। তফাৎ এইটুকু, বিদেশী শাসনের
য়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যেমন পরের দ্বারা পরিচালিত হইত, আজও

সেই অভ্যাসের বশে আমরা চাহিতেছি, দেশীয় বা জাতীয় গভর্মেণ্ট আমাদের হাত ধরিয়া সুখের রাজ্যের দিকে লইয়া যান। অর্থাৎ মনে ম আমরা টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের কামনা করিতেছি। রাষ্ট্রের অপেক্ষা রাখিয়া মানুষ প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তুলুক, বহু নব নব সংস্থার সহায়ত জীবনের পরিচালনা করুক, ইহা যেন আমরা চাহিতেছি না। মনে করিতে অত খাটুনি আমাদের সহিবে না; আর দরকারই বা কি?

গভর্মেণ্ট যদি বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সত্যসত্যই চেষ্টাও করেন, অন্য ব ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ মানুষের মনে জড়তার এই বাধাই তাঁহাদের সম্মু বিপুলতম বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ সরবরাহ বিভাগের পরিবর্তে সমব বিভাগের বরাদ্দ বাড়াইলেই শুধু সমস্যার সমাধান হইবে না। মানুষে সঞ্চিত জড়তাকে বিপুল ধৈর্য এবং কর্মচেষ্টা সহকারে ভাঙিতে হইবে।

তাহার এক উপায় হইল, যোগ্য লোকের মারফৎ কয়েকটি জায়গা গান্ধীজীর আদর্শে অর্থনৈতিক সংগঠন করা। যাঁহারা গান্ধীজীর গঠনকে মূলনীতি স্বীকার করেন এবং তাহাকে কার্যকরী করিবার মত ভরসা বুদ্ধিকৌশল ধারণ করেন, তেমন লোককে দিয়া উৎপাদন এবং অর্থনৈতি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সাধনের প্রয়োজন। যদি সেরূপ চেষ্টা কেন্দ্রে কে সফল হয়, অবশিষ্ট মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইবে, এবং তাহা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া স্বীয় আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের শক্তি লাভ করিতে সম হইবে। গভর্মেণ্ট যদি এই কেন্দ্র গড়িবার সুযোগ দেন, অর্থাৎ প্রয়োজনম মালমসলা আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, অল্পস্বল্প টাকা কর্জ দিবার ব্যব করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার বেশি তাঁহারা পারিবেন ন রাষ্ট্রের পক্ষে করা উচিতও হইবে না।

গান্ধীজী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিতেন, রাষ্ট্র যত কম শাসন করে, সে রাষ্ট্র তত ভাল। এক বৎসরের অভিজ্ঞতা ফলে গভর্মেণ্ট হো বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের শক্তি কতটুকু, বা কোথায়, এবং কাহাদিগকেই বা আশ্রয় করিয়া শোষণবিহীন সমাজ গড় সত্বর হইবে। তাঁহাদের উচিত, গঠনকর্মের দ্বারা দেশের জড়তা-বন্ধনকে শিথিল করা। যে সকল কর্মী সেই কর্মচেষ্টার দ্বারা মানুষকে সত্যাগ্রহে বলে বলীয়ান করিবার তপস্যায় রত থাকিবেন, গভর্মেণ্ট জানেন, তাঁহারাই

ার ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি। তাঁহাদের সাধনার ফলে ধনতন্ত্রীদের শক্তি সময়ে খর্ব হইবে, নূতন সমাজরচনার পথে বৃহৎ বাধা বিদূরিত হইবে। মেণ্ট আজ যে ধনীকুলকে বাগে আনিতে পারিতেছেন না, তাহারা যাহাতে ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে, তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করুন। ারা শক্তি বিকীরণের সাধনা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে পোষণ য়া গভর্মেণ্ট প্রমাণ করুন যে, তাঁহারা গান্ধীজীর প্রদর্শিত উপায়ে শোষণ-ীন প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ রচনা করিতে চান।

আর জনসাধারণও যে সত্যসত্যই মুক্তির আলোয় উজ্জ্বল মনুষ্যসমাজ ড়তে চান, কাঠবিড়ালীর মত নিজের শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও শর প্রতি প্রকৃত প্রেমের বশে সেই শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বালির া বহিয়া আজিকার বিদ্বেষবিচ্ছিন্ন সংসারে মৈত্রী ও সাম্যের নব সেতুবন্ধনের ক যোগদান করুন; তবেই তাঁহাদের সমালোচনা এবং বর্তমান শাসনের কল্পে অতৃপ্তি গঠনের পথে সার্থকতা লাভ করিবে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সংবাদ-সাহিত্য

গান্ধীজী গত বৎসর আগস্ট মাসে যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ২৩ তারিখে আলিপুরে উডল্যাণ্ড্‌স্ ময়দানে প্রার্থনার পরে এক বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি আল্লা-হো-আকবর এবং বন্দেমাতরম্ সম্পর্কে স্বীয় ভিমত জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরে যখন বাংলা অনুবাদ চলিত, সে-ময়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব কর্মীদের কাজ লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং রিপোর্টারের বানিতে বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া দিতেন। গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিশ্রুতি নুসারে সেই লেখা খাতা হইতে বন্দেমাতরম্ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যটুকু হারই নিজের লিপিতে প্রকাশ করা হইল।—

Kelkar came
to Bande Mataram.
This was no religious
cry. It was purely
political cry. The
congress had to examine
it. A reference
was made Gurudev
about it. At which
both Hindu Muslim
members of
the congress had
had to come to the
conclusion that

the opening lines
were free from
any possible objection
and he to steer that
they should be sung
together by all on
the occasion. It
should never be
a chant to insult
or offend Muslims.
It was to be assured
it was the crystal
that first political
Bengal. many
Bengalis had given
up their lives
for political freedom
with Hindu cry on

their lips - so though
therefore he felt
strongly about
the Bande Mataram
as an ode to mother
India, he advised
his Bengal friends
to refer the matter
to the Congress high
command. We would
be surprised if in
view of the growing
friendliness between
~~the~~ Hindus
& Muslims the Congress
High Command ob-
jected to the proposed

lines of Bande Mataram
the National song
and national cry
of Bengal which
sustained her
when the rest of
India was almost
asleep & which was
so far as I am aware
was acclaimed by
both the Hindus &
muslims of Bengal.

[He then came to Bande Mataram. This was no religious cry. It was a purely political cry. The Congress had to examine it. A reference was made to Gurudev about it. And both Hindu and Muslim members of the Congress Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection. And he pleaded that they should be sung together by all on due occasion. It should never be a chant to insult or offend Muslims. It was to be remembered it was the cry that had fired political Bengal. Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry on their lips. Though therefore he felt strongly about Bande Mataram as an ode to Mother India, he advised his League friends to refer the matter to the League High Command. He would be surprised if in view of the growing friendliness between Hindus and Muslims the League High Command objected to the prescribed lines of Bande Mataram, the national song and national cry of Bengal which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was so far as I am (he was) aware acclaimed by both the Hindus and Muslims of Bengal.]

৺বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বসুর "আশা" পুনর্মুদ্রণ ও প্রচারের প্রধান কা
আজ আমরা মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত ভারতবর্ষের যাবৎ
হিন্দুরা ধর্মত এক এবং অভিন্ন হইয়া রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ভারতবর্ষে
মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্য সকল ধর্মাবলম্বীর সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ না হই
প্রতিবেশী বিরুদ্ধ শক্তির হাতে আমাদের পরাজয় ও বিলুপ্তি অনিবা
আমাদিগকে দুর্বল দেখিয়া ভারতবর্ষেরই এক রাষ্ট্রনৈতিক অঙ্গল ভারতবর্ষে
বুকের উপর বসিয়া দাড়ি উপড়াইতেছে। এই সকল দুর্গতি নিবারণের ৎ
বৃদ্ধ রাজনারায়ণের মহাহিন্দু-সমিতির মত একটা কিছু অবিলম্বে গড়িয়া তুলি
হইবে। যুগের প্রয়োজনে শর্তগুলির পরিবর্তন করিতে হইলেও বৃদ্ধ হি
মোদ্দা কথাটি আমরা যেমন করিয়া পারি অনুসরণ করিব। সেটি হইতেছে—

যতই দাইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।

* * * *

এই প্রস্তাবে প্রকাশিত দুইটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি
প্রথম—এই প্রস্তাব হইতে প্রমাণ হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গী
রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৮৮
খ্রীষ্টাব্দে যে ইহা জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত হইত, তাহার প্রমাণ এই প্রস্তা
আছে। আমরা এতদিন পর্যন্ত শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, "বন্দে মাতরম
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত হয়।

দ্বিতীয়—সমস্ত ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথিবার পক্ষে ভারতবর্ষের সম
প্রদেশের ভিন্নভাষাভাষী লোকেদের হিন্দী শিক্ষা ও প্রয়োগের কথা "বৃদ্ধ হিন্দ
কল্পনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে সমর্থ
করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার সাহিত্য ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ হইলেও, যে কারণে
হউক, হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইয়া বসিয়াছে। ইংরেজী
বদলে হিন্দী আমাদের শিখিতেই হইবে—অবশ্য যদি আমরা ভারতবর্ষকে এ
করিবার আশা করি। দেখিতে পাইতেছি, সত্তর বৎসর পূর্বে রাজনারায়
হিন্দীকে অর্থাৎ হিন্দীর দাবিকে স্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবে অন্যান্য বহু বিষয় লক্ষ্য করিবার ও অনুধাবন করিবার আছে
চিন্তাশীল পাঠকেরা তাহা নিশ্চয়ই করিবেন।

—

দৈনিক সংবাদ-পত্রে, সাময়িক-পত্রে এবং লোকের মুখে মুখে বিক্ষোভ-দ্যুত গভীর আর্তনাদের সঙ্গে একই প্রশ্ন শুনিতেছি—গত পনেরোই আগস্ট হইতে চোদ্দই আগস্ট (আজ ১৪ আগস্ট) পূর্ণ এক বৎসরে স্বাধীনতার নামে আমরা কি লাভ করিলাম? আমাদের দুঃখ বিন্দুমাত্র মোচন না হইয়া সকল দিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। কর্ণধার বদল হয়তো হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কর্ণের উপর অত্যাচারের মাত্রা তো বিন্দুমাত্র কমে নাই। স্বাধীনতা পাইয়া আমাদের হইল কি!

ঠিক। কিছুই হয় নাই বটে, কিন্তু হইবে যে সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কারণ, আমরা ইতিহাসে বিশ্বাস করি। এইচ. জি. ওয়েলসের বিখ্যাত 'পৃথিবীর ইতিহাসের রহিঃরেখা' পুস্তকে একটি সদ্যযুদ্ধমুক্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—

"রণাঙ্গন-প্রত্যাবৃত্ত বিজয়ী বীরেরা এমনই ক্ষমতামদমত্ত ও ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা আত্মপর ভেদ ভুলিয়া গেল, তাহাদের বীভৎস অভ্যাস তাহাদিগকে স্বজন ও স্বদেশের প্রতিও নির্মম করিয়া তুলিল। তাহারা নির্বিচারে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরহত্যা ও বলাৎকারে প্রবৃত্ত হইল, আত্মসুখপরায়ণ হইয়া পরস্বাপহরণ তাহাদের ধর্ম হইয়া উঠিল, দেশের শাসনভার নিতান্ত গায়ের জোরে তাহারা নিজেরাই গ্রহণ করিল। অরাজকতায় দেশ ছাইয়া গেল। পরে স্বভাবতই তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই আত্মঘাতী সংগ্রামের ফলে দেশের সমূহ সর্বনাশ ঘটিল। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া ইহারাই দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ যখন বিচার করিতে সক্ষম হইল, তখনই দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিল।"

আমাদের পুরাণেতিহাসেও এই নজির আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধজয়ের পর যদুবংশীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া যে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বলে তাহারা বলী ছিল তাঁহাকেই অস্বীকার ও অপমান করিয়া পারস্পরিক কলহে যে কি ভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল, সে কাহিনী আমরা সকলেই জানি। আমাদের দেশে বর্তমানে সেই ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটিতেছে মাত্র, নূতন কিছুই ঘটে নাই। যাঁহারা দীর্ঘকাল ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া ব্রিটিশ শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি এই মৌকায় নিজের নিজের কোলে ঝোল টানিয়া অপরের অসুবিধা ঘটাইতে থাকেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তবু

তো খুন-জখম-রাহাজানি-বলাৎকার পর্যন্ত ইহারা অবতরণ করেন নাই আপাতত চুটাইয়া বিজয়-গৌরব ভোগ করিতেছেন মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দা স্বার্থের সংঘাতও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আর ভয় নাই। আমাদে নিত্যকার মুক্তির দিন সমাগত। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির এই বাৎসরিক সমাবর্ত দিবসে এই মহা-আশ্বাসের সংবাদই আসল সংবাদ। তাঁহারা মদমত্তত মাতৃবন্দনা ভুলিয়া জনগণের মনস্তুষ্টির নামে আত্মোদরপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের বদহজম দেখা দিয়াছে। রোগ প্রকাশ পাইয়াছে, এইবার উপশম হইবে। তাঁহারা রোগমুক্ত হইলে আমরা অচিরাৎ স্বাধীন হইব।

গত বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে রাজকৃষ্ণ রায় সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"বাংলা নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষ ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথমে এই ছ 'হরধনুর্ভঙ্গ' নামে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন।" মনে রাখা দরকার, রাজকৃষ্ণে 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' উভয় নাটকই ভাঙা অমিত্রাক্ষর আভিনয়িক গৈরিশী ছন্দে রচিত হইয়া একই বৎসরে—১২৮৮ সালে প্রকাশি ও অল্প দিনের ব্যবধানে সাধারণ-রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গত আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশি "ভাঙা অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা কে?" প্রবন্ধে কিন্তু লিখিয়াছেন :—"গৈরি ছন্দ মোটেই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট নয়, তাঁর আগেই বাংলার তিন জ প্রতিভাধর অমর সাহিত্যিক ঐ ছন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে গিয়েছেন।" ইহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাজকৃষ্ণ রায়। ব্রজেন্দ্রবাবু "বাং নাটকে" ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের কথাই বলিয়াছেন; কালীপ্রসন্ন তাঁহা কোন নাটকে এই ছন্দ ব্যবহার করেন নাই। বাকি রহিলেন—মধুসূদন রাজকৃষ্ণ। হেমেন্দ্রবাবুর মতে মধুসূদনই সর্বপ্রথম 'পদ্মাবতী নাটকে' মাঝে মা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'পদ্মাব নাটক' হইতে চারিটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থে চৌ অক্ষরের অমিত্রাক্ষরই লিখিয়াছেন, হেমেন্দ্রবাবু নিজে তাহাকে ভাঙিয়া ভা অমিত্রাক্ষর করিয়াছেন। তাহাতেই গোল বাধিয়াছে।

হেমেন্দ্রবাবু প্রবন্ধটি লিখিবার সময় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখা একবার দেখিয়া লইলে বোধ হয় লিখিতেন না যে, "গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছে

কালীপ্রসন্ন সিংহই তাঁর পথপ্রদর্শক। কিন্তু রাজকৃষ্ণের সামনে কোন্ আদর্শ ছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। আমরা তাঁহার অবগতির জন্য হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অংশত উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে [বেঙ্গল থিয়েটারে] উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট-চূড়ামণি ৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐরূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, 'এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।'...শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল।..."

ভ্রম সংশোধন—এই সংখ্যায় ২৯৬ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির "মুহুর্মুহু" স্থলে "মুহুমুহু" পড়িতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
৭০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৫

গান্ধীচরিত

দিনচর্যা

প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় বেড়ানো গান্ধীজীর অভ্যাস ছিল। ১ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ধাতে যখন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই, তখন বিকা ভ্রমণে দুই দিন আমরা যোগ দিয়াছিলাম। তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ি পায়ে চামড়ার চপ্পল পরিয়াও খুব দ্রুত হাঁটিতে পারেন, এবং এক মাইল যা ও এক মাইল ফিরিয়া আসা তাঁহার নিয়ম। কিন্তু ১৯৪৮ সালের নে মাসে শ্রীরামপুরে থাকার সময়ে তিনি আধ মাইল যাতায়াত অর্থাৎ মাইলের মত প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন। প্রায় এক মাস পরে যখন তাঁহার শরী দুর্বলতা কাটিয়া গেল, তখন তিনি ভ্রমণের পরিমাণ বাড়াইলেন।

শ্রীরামপুরে আমরা যে বাড়িতে থাকিতাম, সেটি ছাড়িলেই দুই পাশে ধা ক্ষেত, এবং তাহার মাঝে মাঝে সুপারি-নারিকেলের গাছে ঘেরা এক-এক গৃহস্থের বাড়ি দেখা যাইত। ধানক্ষেতের আল ধরিয়া বা সরু পথে গান্ধী হাতে একটি পাঁচ ফুট আন্দাজ হালকা বাঁশের লাঠি লইয়া বেড়াইতে বা হইতেন। এই সকল পথে মাঝে মাঝে খাল বা নালা পড়িত। তাহার উ সুপারিগাছ পাতিয়া সাঁকো করাই নোয়াখালির রীতি। বড় হইলে বাঁ ধরনি ও কাঠের পুল থাকিত। বেড়াইবার সময়ে শ্রীরামপুরে প্রত্যহ গান্ধী এমনই একটি সাঁকোর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। সকালে শিশিরে ঘাস ও সাঁকোর কাঠ সবই সিক্ত থাকিত বলিয়া তাঁহার পক্ষে পা পিছলা যাইবার আশঙ্কায় আমরা তাঁহার হাত ধরিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি কি রোজই অপরের সাহায্য বিনা সাঁকোটি অতিক্রম করিতেন। প্রথম প্র দৌর্বল্যের জন্য পা ঠিকমত পড়িত না, এক-আধদিন পড়-পড় হওয়ায় শেষ মুহূ আমাদের কাঁধে ভর দিয়া সামলাইয়াও লইয়াছেন। বিহারের দা নিবারণকল্পে তিনি যে অর্ধাশন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জনিত দুর্বলতা অ ক্রমশ কাটিয়া গেল।

গান্ধীজীর শরীর আর একটু সুস্থ হওয়ার পর তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্ত পরিভ্রমণ শুরু করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসা প্রতিদিন ভোরে সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া আগামী গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকে

ফৎ সব পাঠাইয়া দেওয়া হইত, এবং তাহার পরে সকাল ৭॥০ টার সময়ে
ীজী যাত্রা আরম্ভ করিতেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের পরিবর্তে এক
া হইতে অন্য গ্রামে যাত্রার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সতীশবাবু এমন
বই সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যাহার ফলে দুই বা তিন মাইলের অধিক
ীজীকে হাঁটিতে হইত না, আমরা নূতন ডেরায় আসিয়া পৌছাইতাম।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে আমরা হামচাদি নামে একটি গ্রাম ছাড়িয়া
ফলাতলির অভিমুখে রওনা হইয়াছি। তখন শীতের শেষ, মাঠে ফসল নাই,
নর ক্ষেতের ভিতর দিয়া আমাদের পথ কিছুদূর গিয়াছে। একটি ক্ষেত
তে অপর একটি ক্ষেতে নামিবার সময়ে আল হইতে আমি লাফাইয়া
লাম। গান্ধীজীর অসুবিধা হইবে মনে করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম,
ং তিনি আসিলে সেইখানে নামাইবার জন্য তাঁহার দিকে হাত বাড়াইলাম।
ন্তু গান্ধীজী সাহায্য না লইয়া, নিজের লাঠির সহায়তায় বেশ সহজভাবে
সিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, এ কি শ্রীরামপুর পাইয়াছ? এখন বেশ জোর
সিয়া গিয়াছে। শরীরের দুর্বলতা স্বীকার করিতে গান্ধীজীর যেন লজ্জা বা
রক্তি আসিত। শরীরের ক্ষমতা না থাকিলে অপরের সাহায্য সহজভাবে গ্রহণ
রিতেন, কিন্তু শরীর যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহাকে ছুটি দিতে চাহিতেন না।

১৯৩৮ সালে ২৪এ অথবা ২৫এ ফেব্রুয়ারি হইবে, পুরী জেলায় গান্ধী-সেবা-
ঘের এক অধিবেশন হয়। গান্ধীজীর জন্য একটি উঁচু মঞ্চ তৈয়ারি করা হইয়া-
ল, তিনি জনসভায় তাহার উপর হইতে বক্তৃতা করেন। মঞ্চটিতে উঠিবার
ন্য বাঁশের সিঁড়ি ছিল। আমার মনে আছে, গান্ধীজী যখন সেই সিঁড়ি দিয়া
পরে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন, তখন পার্শ্ববর্তী কেহ তাঁহাকে সাহায্য
রার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন। গান্ধীজী যে ভাবে ঝটকা দিয়া সেই হাত
াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল, শারীরিক
র্বলতার ইঙ্গিত করিলেই তিনি যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেন।

সে কথা যাক্। এবার তাঁহার বেড়াইবার সম্বন্ধেই গল্প বলি। শ্রীরামপুর
ধমে শীত খুব বেশি না হইলেও নোয়াখালির সেঁত-সেঁতে আবহাওয়ায় কেমন
ন ভাল লাগিত না। আমরা গায়ে গরম একটি আলোয়ান লইয়া বাহির
ইতাম। গান্ধীজী ঘরের মধ্যে আলোয়ান ব্যবহার করিলেও প্রাতর্ভ্রমণের
ময়ে পাতলা একখানি খাদির চাদর মুড়িয়াই বাহির হইতেন। সূর্যের তাপ

এবং আলোর প্রতি তাঁহার বড় টান ছিল, সকালের আলো পরিপূর্ণ ধারায় গায়ের উপরে ঢালিয়া পড়ুক, ইহার জন্যই তিনি খালি গায়ে চলিতেই ভালবাসিতেন; কিন্তু ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় অস্বস্তি বোধ হওয়ার জন্যই যতটুকু না হইলে নয়, তেমনই একখানি চাদর দিয়া দেহকে মুড়িয়া রাখিতেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে অতি অল্পসংখ্যক সাথী তাঁহার সহিত থাকিতেন। হয়তো বা কাহারও বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে গান্ধীজীর সঙ্গে সে সময়ে কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কিন্তু সচরাচর তিনি এ সময়ে নীরবে চলাই ভালবাসিতেন। চলিতে চলিতে কখনও বা স্থানীয় চাষবাসের বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন, কখনও বা পথের পার্শ্ববর্তী ছোট ছেলেমেয়েরা পাঠশালার সামনে রৌদ্রে মাদুর পাতিয়া যেখানে সুর করিয়া পড়িতেছে তাহা দাঁড়াইয়া শুনিতেন, এবং আপন মনে ঈষৎ হাসিতেন। গান্ধীজীকে দেখিয়া বালকের দল পড়া বন্ধ করিলে আবার তাহাদের বলিতেন, 'পড়ো পড়ো'—পড়া বন্ধ করিও না।

শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজীর শরীরের দুর্বলতা যত কাটিয়া যাইতে লাগিল ততই তিনি ভ্রমণের পরিমাণ এবং সময় অল্পে অল্পে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। যে পথ ধরিয়া আমরা প্রত্যহ বাড়ি হইতে বাহির হইতাম, তাহার পাশে জনৈক মুসলমান চাষীর বাড়ি ছিল। তাঁহার নাম ইসমাইল খোন্দকার চৌধুরী। গান্ধীজী বেড়াইয়া ফিরিবার সময়ে মাঝে মাঝে এই সকল বাড়িতে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ গৃহস্থের সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া আসিতেন এবং তত্ত্ব তালাশ করিতেন। ২রা ডিসেম্বর ১৯৪৬ সোমবার সকালে ইসমাইল মিঞার বাড়ি গিয়া তিনি আমাদের মারফৎ শুনিলেন, একটি ছোট ছেলের জ্বর হইয়াছে এবং গৃহস্বামীরও শরীর ভাল নাই, কয়েক দিন ধরিয়া পেট পরিষ্কার হইতেছে না।

চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে গান্ধীজীর বড় আনন্দ হইত। রোগীর সেবাকার্যে তিনি বস্তুত অতিশয় দক্ষ ছিলেন। সেদিন মৌন দিবস, তাই হাতে ছোট্ট একটি কাগজে লিখিয়া জানাইলেন, ইসমাইল মিঞার চিকিৎসার আয়োজন তিনি করিবেন। বেড়ানো শেষ হইলে আমরা তাঁহার নির্দেশমত ইসমাইল চৌধুরীকে এক খোরাক ম্যাগ সাল্‌ফ দিয়া আসিলাম, এবং ছোট ছেলেটিকে এনিমা দিবার জন্য আমাদের শিবিরে পাঠাইতে বলিলাম। ইসমাইল কিন্তু

রাজী হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা, এনিমা বাড়িতেই দেওয়া হোক, কি জানি বিপদ-আপদের কথা তো কিছু বলা যায় না। গান্ধীজী শুনিয়া জানাইলেন, বেলা দুইটার সময়ে আমরা যেন গরম জল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখি, তিনি নিজে এনিমা দিতে আসিবেন।

কিন্তু ইহাতে আমাদের ঘোর আপত্তি ছিল। শ্রীযুক্ত পরশুরাম অথবা আমার কাজের চাপ যতই বেশি হোক না কেন, আমরা গান্ধীজীকে এইরূপ কাজের জন্য দুপুরের আধ মাইল দূরে দুর্বল শরীরে পাঠাইয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে লোকে বলিবে কি? এই জন্য জোর করায় তিনি ছোট ছোট কাগজের টুকরায় আমাদের খুঁটিনাটি নির্দেশ লিখিয়া দিলেন। আমরা দুপুরে সেই নির্দেশমত রোগীর পরিচর্যা করিয়া আসিলাম। ছোট লেখাগুলি পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে,—

১। You understand what is meant. Mag Sulph to one patient. enema to another. When he comes here I shall give the enema.

২। In the morning, i. e. now if he has not eaten anything, I shall bring the enema here and give it. The only thing is that there shd. be clean hot water.

৩। When will the child be ready?

Then we shall come here at 2 o'clock. If he prefers it can be given tomorrow morning.

৪। This old man requires an ointment for his skin-disease. The ointment will come.

৫। The water should be no warmer than the fingers can bear.

Take ten ounces of such water and mix in it 2 teaspoonfuls of clean salt, stir well. The enema shd. be gently administered so that the water may be retained for a while. When it has acted and the water is expelled, administer an equal quantity of cold water without salt or anything else. Examine the contents of the stool each time to see whether any worm is expelled. If the 2nd. quantity is not expelled in a few minutes you may leave the patient asking the people to examine the stool and report upon the condition of the stool.

The patient shd. be given every night till further instructions ½ a dram of অজবেণ (জোয়ান) seeds properly cleaned.

Smear the nozzle with vaseline to ensure easy insertion. Boil it after to sterilise it.

আমরা শ্রীরামপুরে যে বাড়িতে থাকিতাম, তাহারই নিকটে অপর এক গৃহস্থের আশ্রয়ে কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা পাঁচ-ছয় জন দুইখানি ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া কাজের চাপে সব সময়ে ঘরদোর, বিছানা বা টেবিলপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত না। মাদ্রাজের 'হিন্দু'-পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী বাংলার ভিজা আবহাওয়ায় আসিয়া সর্দিজ্বরে পড়িলেন। মাথা অত্যন্ত ধরায় সারা রাত ঘুমাইতে পারেন নাই। গান্ধীজী সংবাদ শুনিবার পরে সকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময়ে সাংবাদিকগণের শিবিরের দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গের বন্ধুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাসি বিছানা মশারি তুলিয়া, কাগজপত্র যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত করিয়া, মেঝেতে ছড়ানো কয়েক দিনের সঞ্চিত সিগারেটের গোড়া ঝাঁট দিয়া, ঘরের সব দরজা জানালা খুলিয়া কোন রকমে উহাকে গান্ধীজীর অভ্যর্থনার যোগ্য করিয়া তুলিলেন।

গান্ধীজী রোগীর দেহের তাপ পরীক্ষা করার পর মাথায় হাত বুলাইয়া, মাটির প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে প্রত্যহ দুপুরে পেটে মাটির মোটা প্রলেপ নিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতেন বলিয়া পরশুরাম ওই ব্যাপারে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। গান্ধীজীর নির্দেশমত রোগীর কপালে প্রলেপ দেওয়া হইল, অন্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইল। প্রলেপের ফলে মাথার যন্ত্রণার যথেষ্ট উপশম হইয়াছিল এবং রোগী নিদ্রালাভ করায় ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শত কাজের মধ্যেও চিকিৎসা বা সেবার ব্যাপারে গান্ধীজীর পরম উৎসাহ ছিল, এ বিষয়ে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতির সুযোগ পাইলে তাঁহার উৎসাহের অন্ত থাকিত না। যাঁহারা নোয়াখালিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা চরাচর অতি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই আসিতেন। তাঁহাদের অনেক সময়ে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যাইত না। সেরূপ অবস্থার মধ্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার দ্বারা নিজের একটি পুরাতন রোগের বিষয়ে উপদেশ লইতে আসিয়া একজন ভদ্রলোক আধ ঘণ্টারও বেশি সময় গান্ধীজীর কাছে পাইয়াছিলেন। অবশেষে তাগাদা দিয়া আমাদেরই জানাইতে হইল যে, অপরে অপেক্ষা করিয়া আছেন, অতএব বর্তমান রোগীকে উপস্থিত ছুটি দিতে হইবে।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, আমরা রাত্রে সাতঘরিয়া নামক একটি গ্রামে রাত্রিযাপন করি। যে গৃহস্থের বাড়িতে আমরা ছিলাম, সে পরিবারের মধ্যে জনৈক উন্মাদ রোগী ছিলেন। তিনি একান্তে একটি ঘরে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতেন। গান্ধীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পরদিন ৩রা তারিখে আমরা সাতঘরিয়া হইতে সাধুরখিল যাইবার পূর্বে সোমবার মৌনদিবসে তিনি একটি ছোট্ট কাগজের টুকরায় কিছু লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, তিনি লিখিতেছেন—

There is a lunatic here. Manu prescribed the right medicine. It is Ramnam. If a believer repeats it before him rhythmically long enough, he will surely get out of his insanity. Please tell the inmates this much. More from me later.

সকালের ভ্রমণ শেষ হইত। গান্ধীজী ফিরিয়া আসিয়া ঘরের বাহিরে চামড়ার স্যাণ্ডাল ছাড়িয়া খড়ম পরিতেন। বাড়িতে চলাফেরার জন্য তিনি সর্বদা খড়মই ব্যবহার করিতেন। বাহিরে যাইতে হইলে চামড়ার জুতা পরিয়া চলিতেন। সকালে ভিজা মাটিতে চলার ফলে জুতার তলায় কাদা ও ঘাসের চাবড়া জমিয়া থাকিত। আমরা একটি বাঁধারির টুকরা দিয়া তাহা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতাম এবং দাওয়ায় উল্টা করিয়া তাহা রোদে শুখাইতে দিতাম। কোন কোন দিন অসাবধানতা বশত বেশিক্ষণ রৌদ্রে থাকার ফলে চটিজোড়া শুকাইয়া বাঁকিয়া যাইত, তাহাকে আবার মোচড় দিয়া সিধা করিয়া বিকালে ব্যবহারের জন্য ঘরে তুলিয়া রাখিতাম।

সকালে বেড়ানো শেষ করিয়া গান্ধীজী শৌচাগারে যাইতেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁহার ব্যবহারের জন্য একটি কমোডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঘরের এক পাশে কাপড় দিয়া ঘেরা একটু জায়গায় কমোড রাখা থাকিত। ভ্রমণকালে কয়েকটি শিবিরে স্বতন্ত্র স্থানে কমোড বসানো হইত, কিন্তু শ্রীরামপুরে শুইবার ঘরের মধ্যেই আড়াল করিয়া তাহার অবস্থান ছিল। শৌচাগারে সাবান, গামছা প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি শেল্‌ফের ব্যবস্থা ছিল। গান্ধীজী শৌচাগারে প্রবেশ করিতেন, তখন অন্তরঙ্গ কেহ কেহ সে ঘরে যাইতে ইতস্তত করিতেন না। কমোডের উপরে গান্ধীজী, আমরা সাধারণভাবে যে রকম উবু হইয়া বসি, সেই ভাবে বসিতেন। পাশের তাকে গামছার পাশে বাংলা পড়ার বইও রাখিতেন, হয়তো বা কয়েক মিনিট সময় অপচয় না করিয়া কয়েক ছত্র তাহারই মধ্যে পড়িয়া লইলেন।

কমোড ইত্যাদি পরিষ্কার করার ভার সঙ্গীদের উপরে ছিল, বন্ধুবর পরন্তু এবং পরে রামচন্দ্রন্ নামে একটি যুবক এই ভার লইয়াছিলেন। একদিন অ একটি শিবিরে অতর্কিতে শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া গান্ধীজীকে দে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। তিনি পরে আমাকে বলিলেন, এ লজ্জা পাওয়ার আমার কোনও হেতু ছিল না। যাহা প্রকৃতিসিদ্ধ তাহা লজ্জা পাইবার কি আছে? গান্ধীজীর এই যুক্তি আমার মনে কোনও প্র বিস্তার করিয়াছিল কি না মনে নাই, কিন্তু একটি বিষয় আমার মনে ত যথেষ্ট রেখাপাত করিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, গান্ধীজীর শরীর স বোধ আমাদের শরীর-বোধ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নয় তিনি নগ্নতাকে পছন্দ করিতেন, বরং শরীর সম্বন্ধে তাঁহার একটা উপে ভাবই আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। কোনও অশোভন লক্ষণ তাঁহার ম প্রকাশিত হইতে দেখি নাই, সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত; কে ইহার ভিতরে দেখিতাম, তিনি আমাদের চলতি লজ্জা অথবা ঘৃণার উ রহিয়াছেন, উপেক্ষার ভাবই তাঁহার মধ্যে প্রবল।

গান্ধীজী শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, খড়মের শব্দ শু জানিতে পারিলেই তেল মাখাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতাম। ইতি রান্নাঘরের পাশে একটি চালায় বড় মাটির হাঁড়ি বা টিনের কানেস্তারায় তাঁ স্নানের জন্য গরম জল তৈয়ারি হইত।

তেল মাখার জন্য উঠানে একটু জায়গা চারিদিকে পর্দা দিয়া ঘিরিয়া হইত এবং তাহার মধ্যে প্রায় কোমরের সমান উঁচু একখানি বা দুই টেবিল জুড়িয়া শুইবার মত একটি উচ্চ আসন করা থাকিত। তাহার উ তেল মাখিবার জন্য একটি বিছানার মত পাতিয়া রাখা হইত। আ বেশি উঁচু হইলে একটি জলচৌকির সাহায্যে গান্ধীজী তাহার উপর উঠি নয়তো মাটি হইতেই একেবারে তাহাতে চড়িতেন। আসনটির দিকে পি ফিরিয়া তাহার কানায় হাতের ভর দিয়া তিনি একটু চাপের ফলেই উ পড়িতেন।

তেল মাখার সময়ে তাঁহার গায়ে আদৌ কোন কাপড় থাকিত না, উ খোলা রোদ সর্বাঙ্গে আসিয়া লাগিত। সকাল নয়টায় তেল মাখা আ করিয়া আমরা দশটায় শেষ করিতাম।

গান্ধীজীর একদিন অন্তর দাড়ি কামানো হইত, এবং ইহার জন্য সেফ্‌টি
র ব্যবহার করা হইত। কামানোর জন্য আলাদা সাবান বা বুরুশ ব্যবহার
করিয়া হাত ধুইবার সাবানটি আমরা হাতে লইয়া হাতের সাহায্যে ঘষিয়া
ধা দাড়ি নরম করিতাম। এক-একটি ব্লেড যতদিন সম্ভব গান্ধীজী ব্যবহার
তে বলিতেন। শেষের দিকে আর প্রায় যখন কামানো যায় না, তখনও
ণের মত তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। বলিতেন, আরও কিছুক্ষণ টান
, এমন তাড়াতাড়ি কিসের? এক-আধদিন কামানোর পর দেখিয়াছি,
ন উল্‌টা ঘসিয়া দেখিতেছেন, বেশ ভাল ভাবে কামানো হইয়াছে কি না।
নাই, এরূপ মনে হইলে ক্ষুর দিয়া নিজেই আবার টান দিতেন। ভোঁতা
র টানে এক-আধদিন একটি আঁচিল হইতে দু-এক ফোঁটা রক্তপাতও
াছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। স্নানের পরে সেখানে পরিষ্কৃত
র পুলটিস দিয়া দিতেন।

নূতন কলকৌশলের সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটা সন্দেহ ছিল। ইহা লইয়া
ন নিজে কখনও কখনও কৌতুক অনুভব করিতেন, আমরাও করিতাম।
সময়ে জনৈক আমেরিকান বন্ধু গান্ধীজীর শিবিরে কতকগুলি উপহার
শী পাঠাইয়া দেন। তাহার মধ্যে সাবানের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য
শেভিং ক্রীম আসিয়াছিল। একদিন অনুমতি লইয়া আমি তাহা
ইয়া কামাইবার চেষ্টা করিলাম। হয়তো মাখানোর পর পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘষা
াই বলিয়াই হোক বা ক্ষুর সেদিন ভোঁতা ছিল বলিয়াই হোক, কামানো
হইল না। কর্মশেষে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হইল? আমি
দিলাম, সুবিধা হইল না। কৌতুকের সুরে গান্ধীজী বলিলেন, "ওয়সা
ন হি চাহিয়ে। কাহাঁসে হোগা?" 'হবেই তো, ভাল কামানো কোথা
ও হইবে?'

তল মাখানোর সময়ে গান্ধীজী প্রথমে চিৎ হইয়া শুইতেন, আমরা পেটে
ল মাখাইতে আরম্ভ করিতাম। হেজেলিন স্নোর শিশিতে আধ শিশি
শর তেল ও বাকি অংশ পাতি লেবুর রস দিয়া খুব ঝাঁকানির সাহায্যে
য়া মিশাইয়া সারা গায়ে মাখানো হইত। পেটে যখন আমরা তেল
তাম, সে সময়ে তাঁহার হাতে কোনও বই থাকিত। শ্রীরামপুরে ওই
র জন্য হিন্দী ভাষায় লিখিত প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিধান সম্বন্ধে একখানি

বই নির্দিষ্ট ছিল। ঐ বইখানি তিনি আর অপর কোনও সময়ে পড়িতেন না প্রত্যহ হয়তো এক পৃষ্ঠা, দুই পৃষ্ঠা বা আর কিছু পড়িতে পড়িতে কয়ে সপ্তাহের পরে তবে তাহা শেষ হইল।

পেটে তেল মাখানোর পর বুক এবং বুকের পর হাত দুইটিতে মাখাইতাম তাহার পর পা। পায়ে মালিশ আরম্ভ হইলে গান্ধীজী চশমাটি খুলিয়া বই ব করিয়া ঘুমাইয়া লইতেন। অনেক দিন মুখে সকালের প্রখর রোদ পড়িত পাশের বেড়ার একটি ছাতা গুঁজিয়া আমরা মাথার উপরে ছায়া করিয়া দিতাম এইভাবে কুড়ি মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত গান্ধীজী ঘুমাইয়া লইতেন আমরাও অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে তেল মাখাইয়া যাইতাম। অবশে তাঁহার ঘুম ভাঙিলে তিনি উপুড় হইয়া শুইতেন এবং আমরা পিঠে ও মাথা ভাল করিয়া তেল মালিশ করিয়া কাজ শেষ করিতাম।

তেল মাখার পর্বে এক ঘণ্টা লাগিত। তাহার পর তিনি শৌচাগারে প্রবে করিয়া স্নানের জায়গায় যাইতেন। বড় টবে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে গরম জ মিশাইয়া দেওয়া হইত। তিনি হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া যখন বলিতেন, আ দরকার নাই, তখন আমরা গরম জল ঢালা বন্ধ করিতাম।

গান্ধীজী প্রথম-মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতে থাকিতে প্লুরিসি রোগে ভুগিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গরম জলেই স্নান করিতেন। শরীরের কাজ কাজ লইতে হইবে, অতএব তাহাকে ঠিকমত অবস্থায় রাখার জন্য তাঁহা চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

শ্রীরামপুরে স্নান তিনি নিজেই করিতেন। আমি জল ঢালিয়া দিতাম স্নানের জন্য দুইটি ছোট গামছা লাগিত, পায়ের তলা পরিষ্কার করিবার জন্য একটি ঝামার টুকরা ছিল। আমি লক্ষ্য করিতাম, তিনি প্রত্যহ ঠিক একই ভাবে ও একই পর্যায়ক্রমে হাত পা ইত্যাদি রগড়াইয়া তেল তুলিতেছেন স্নানের জন্য তিনি সাবান ব্যবহার করিতেন না।

স্নান শেষ হইলে শুকনা তোয়ালে দিয়া গা পরিষ্কার ভাবে মুছিয়া কাপড় পরিয়া বাহির হইতেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন বলিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া গায়ের তেল তুলিতে সময় যথেষ্ট লাগিত। কিন্তু এ ব্যাপারে কখনও তিনি তাড়াহুড়া করিতেন না। যে কাজটি যখন করিতেন, সে সময়ে সেই কাজটিকেই একান্ত ভাবে ভাল করিয়া করার বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

গান্ধীজী ২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ বৈকালে শ্রীরামপুর শিবিরে আগমন করেন। এ এবং ২২এ তিনি নিজেই তেল মাখিয়াছিলেন, ২৩ তারিখ হইতে ১৯-১২-৪৬ তারিখে মনু গান্ধী, শ্রীরামপুরে আসা পর্যন্ত আমি তেল মাখানোর কাজ করিতাম। মনু আসিলে পর তিনিই এ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

প্রথম প্রথম তেল মাখানোর সময়ে একটি লক্ষণ দেখিয়া আমার বিস্ময় উৎপাদন হইয়াছিল। গান্ধীজীর গায়ের রঙ বেশ ফরসা ছিল। কিন্তু যাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা হইল তাঁহার গলার নীচে হইতে বুকের উপর অংশ অনেকখানি ব্যাপিয়া বেশ লাল রঙের ছিল। মুখে রক্ত মিলে যেমন তাহা লাল হইয়া উঠে, তাঁহার বুকের উপরের অংশে যেন সর্বদাই এই রকম লক্ষণ প্রকাশ পাইত।

পরমহংসদেব যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান তখন জামা খুলিয়া বুক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং গায়ের উপরে সিঁদুর ছড়ানো রঙ দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, ইহা যোগীপুরুষের বিশেষ লক্ষণ। গান্ধীজীর দেহে প্রথম এই লক্ষণ দেখিবামাত্র আমার পরমহংসদেবের উক্তি স্মরণ হইয়াছিল।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট তাঁবুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে কবি আর বৈজ্ঞানিক ব'সে ছিলেন। নিমগাছের তলায় প্রকাণ্ড আয়নাটাও গাছপালা দিয়ে এমনভাবে রত্নপ্রভা রেখে দিয়েছিলেন যে, সেটাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে ব'সে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দোয়েলের আগমন-অপেক্ষায়। কবি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিলেন এক জোড়া শালিককে। সামনের চালাটার উপর ব'সে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কত কথাই বলছে যে! ওর রূপ রঙ গলার স্বর কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যহ দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে, মনে আর কোনও চমক লাগায় না। কেমন যেন একটা অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব। শালিকদের মধ্যেও পুরুষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু ওদের পুরুষ ব'লে মনেই হয় না। উৎক্রোশ

বা শিকরেজাতীয় পাখিদের তো কথাই নেই, পুরুষ-দোয়েল বা নীলক একটা পৌরুষ আছে যেন। শালিক পাখি কিন্তু অন্য রকম; অতিপা প্রতিবেশিনী যেন। বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্নিমেষে আয়নাটার দিকে খা চেয়ে থেকে তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে এবং কবির দিকে চুপিচুপি বললেন, আপনিও এমনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কতক্ষণ যে ও হবে ঠিক নেই।

কবি বললেন, আমার কষ্ট হচ্ছে না।

বৈজ্ঞানিক আর কোনও কথা বললেন না। গিরগিটির মত মাথা নিমগাছের পাতার আড়ালে ছোট্ট কি একটা পাখি চিকচিক ক'রে বেড় সেইটেকে দূরবীন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কবি অত দুরূহ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে শালিকটাকেই লক্ষ্য লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে কত কথাই বলছে! হঠাৎ মনে জেগে উঠল কবিতা।—

শালিকের সাথে মালিকের মিল যদিও আছে
কর্তার মতো হাবভাব তার মোটে নয়,
আলিসার 'পরে গোয়ালের ধারে কিংবা গাছে
এ যাবৎ তার মিলিয়াছে যত পরিচয়
সে যেন কেবল গিন্নি।
ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে
খড়কুটো তুলে বাসা বানায়
পাড়াপড়শীর সঙ্গেতে ব'সে
সুখ-দুঃখের কথা জানায়
সুবিধা মতন পোকা মাকড়টা যা পায় খোঁটে,
সইতে পারে না আদিখ্যেতা বা ঠ্যাকার মোটে,
বেরাল নেউল সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে,
হয়তো বা মানে সিন্নি।
সে যেন কেবল গিন্নী।

এসেছে এইবার।

ফসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। পিং শব্দ ক'রে শালিকটাও গল। তুড়ুক ক'রে কোথা থেকে নেমে এল একটা পুরুষ-দোয়েল। ছোট্ট একটা ফড়িং ধ'রে এক ঝটকায় সেটাকে মেরে গলাধঃকরণ ক'রে ল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল একটু। একটা ভাঙা ঘুঁটে ছিল, সেইটেকেই ঠোকরাতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবিটাকে পেলে আয়নায়। পাওয়ামাত্রই ল্যাজটা খাড়া হয়ে উঠল সোজা। ক ক'রে গলা থেকে শব্দের ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন দুটো। তারপর ফুলিয়ে তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে লাগল আয়নার ল্যাজটা ঠিক খাড়া আছে। ক্লিক ক'রে শব্দ হ'ল। বৈজ্ঞানিক নিলেন। দোয়েলটা তারপর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু য় প্রতিহত হয়ে উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে বসল পাশের াগাছের ডালে আর সেখানে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে সুরের শায়ক বর্ষণ লাগল সবেগে। তারপর হঠাৎ উড়ে গেল।

জ্ঞানিকের চোখ থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

খলেন ?

া, দেখলাম বইকি।

খিটার চোখ দুটো লক্ষ্য করেছিলেন কি ?

ক্ষ্য করবার ছিল নাকি কিছু ?

:, ছিল বইকি। চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল। ই তো আসল। যখন ওরা প্রণয় নিবেদন করে, তখনও ওরা অমনই তুড়ুক ক'রে নাচে, গানও গায়।

নে, রাগ আর অনুরাগের চেহারা প্রায় একই রকম ?—হেসে বললেন

, তফাত আছে একটু। চোখের ভাবটা তখন বদলে যায়। অন্যরকম হয়।

ন্যরকম মানে ?

ালায়েম। অনেকটা এইরকম গোছের।

জ্ঞানিক নিজের চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু ক'রে মোলায়েম দৃষ্টি বোঝাবার রলেন। কবি হেসে ফেলতেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়লেন একটু।

রপর বললেন, দোয়েলদের স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা দেখতে। কিন্তু

যেসব পাখির স্ত্রী পুরুষ এক রকম এবং তারা যখন হাজার হাজার
অতিক্রম ক'রে অন্য দেশে চ'লে যায়, তখন পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের
কি ক'রে? ওই ভাবভঙ্গী দেখে। ইংরেজীতে ওকে বলে 'পশ্চ
(posturing)। ওদের তাড়া ক'রে যাওয়া আর প্রণয় নিবেদন করার ধ
প্রায় একই রকমের। স্বজাতের যে কোনও পাখি দেখলেই পুরুষ-প
ওই রকম 'পশ্চার' করতে থাকে। অচেনা পাখিটা যদি চুপ ক'রে
কিংবা গুটিসুটি মেরে ব'সে পড়ে, তা হ'লে বোঝা যায় যে, সেটা স্ত্রী-প
কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় কিংবা তেড়ে আসে, তা হ'লে বোঝা
সেটা পুরুষ-পাখি। দোয়েলের বেলায় কিন্তু ঠিক এ কথা খাটে না।
স্ত্রী-দোয়েল দেখতে আলাদা। আমি দেখতে চাইছি, স্ত্রী-দোয়েলকে
ওরা যেমন গান গায়, যেমন ভঙ্গী করে, পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেও ঠি
রকম করে কি না। একটু আগেই যা দেখলাম— দেখুন দেখুন, দেখ
একটা ঘুঘু একটা হাঁড়িচাঁচার পিছনে পিছনে ছুটছে। দেখেছেন? ওই
দিয়ে গেল।

দেখেছি। ঘুঘুর এমন মিলিটারি ভাব কেন?

হাঁড়িচাঁচা ঘুঘুর ডিম খেয়ে ফেলে যে।

বলেন কি! পাখি পাখির ডিম খায়?

খায় বইকি। কোনও পাখিই নিরামিষাশী নয়। হাঁড়িচাঁচাগুলো কা
নিকট-আত্মীয় কিনা, সেইজন্যে আরও বেশি আমিষভক্ত।

কি বললেন নাম?

হাঁড়িচাঁচা, টাকাচোরও বলে কেউ কেউ। ইংরেজী নাম ট্রি
(Tree Pie), আর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওর—

বৈজ্ঞানিক নামে দরকার নেই। খুব শ্রুতিকটু হবে নিশ্চয়। হাঁড়িচ
নামটাও শ্রুতিকটু। টাকাচোরও সুবিধের নয়। পাখিটা দেখতে
বেশ। হিন্দি নাম নেই?

আছে। কোটি, মহোখা।

সেদিন যে মহোখা ব'লে একটা পাখি দেখালেন, যার বাংলা নাম 'কুকো'

হ্যাঁ, সেটাকেও মহোখা বলে—Centropus Sinensis—

ুকো নামটাও ভাল নয়। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো।
চাঁচাকেও নূতন নাম দিতে হবে একটা।
প্ চুপ, আর একটা দোয়েল এসেছে। ওই যে।
দোয়েলটা গাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলে।
নিক উদ্ভাসিত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কবিও মুগ্ধ হয়ে
ন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন দুজনে। পাখিটা গেয়েই চলেছে।
বৈজ্ঞানিক বললেন, চমৎকার! নয়?
কবি উত্তর দিলেন কবিতায়—

"সুরের আবেগে সুরের মেঘেতে সুরলোকে নাবে সুরের শ্রাবণ
সুরের ঝর্ণা, সুরের বন্যা, সুরের ফোয়ারা, সুরের প্লাবন।"

রত্নপ্রভা এসে হাজির হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।
ধরা-গলায় বললেন, সবজিবাগের বাড়িতে ভানা ব'লে যে মেয়েটি থাকেন,
ন এসেছেন।
তাই নাকি?
শশব্যস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক উঠে পড়লেন।
কবি কেবল বললেন, ও!
তাঁর চোখের দৃষ্টি কিন্তু অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

ভানা যদিও খুব সপ্রতিভভাবে ব'সে ছিল বাইরের ঘরটাতে, মনে মনে কিন্তু
কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কুণ্ঠার কারণ, অন্তরে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে
ড়িয়ে ছিল। অন্তরের ভিখারিণী-ভাবটাকে সে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে
ছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখবার প্রেরণাতেই এসেছিল সে; কিন্তু কামনা
ছিল, আহা, যদি অন্য রকম হয়ে যায়! গম্ভীরপ্রকৃতির রত্নপ্রভা তার সামনে
ারের থালা এবং চায়ের পেয়ালা ধ'রে দিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমসহকারেই
্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিপন্না
যী বিদেশিনীকে যতটা আপ্যায়িত করা উচিত, ততটা তিনি ঠিক পারছেন
কথা তিনি বেশি বলতে পারেন না। যার-তার সামনে মোটা ধরা-
ায় কথা বলতে তাঁর লজ্জাও করে। কালো-কোলো মুখখানিতে তাই একটা
ফুটে উঠেছিল তাঁর। অক্ষমতাজনিত লজ্জা, অভিজাতসুলভ

ভদ্রতা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মিশে এমন একটা জটিল ভাব হয়েছিল, পরিচয়ে যার মর্মোদ্ভেদ করা শক্ত। কখনও তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করছিলেন, হাস-চেষ্টা করছিলেন কখনও, ইতস্তত ক'রে দু-চারটি কথা ব'লে সহসা আবার বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন যে, ডানা ঠিক বুঝতে পারছিল না—ব্যক্তিটি রকম। রত্নপ্রভাকে দেখে ডানার প্রথম বাঙালী ব'লেই মনে হয় নি। ভেবেছি মাদ্রাজী কিংবা সাঁওতাল আয়া বোধ হয়, বাঙালীর পোশাক প'রে আ পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। এ রকম বলিষ্ঠগঠন বাঙালী মেয়ে যায় না বড়। ইনিই অমরেশবাবুর স্ত্রী? রত্নপ্রভাও তন্বী ডানার মা মুখশ্রীতে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, সপ্রতিভ স্বল্পভাষণে এমন একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না এবং যা তিনি ইতিপূর্বে আর দে নি। ভারি ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। কিন্তু এই ভাল-লাগাটাকে কিছুতে তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এই বিদুষীর সঙ্গে ঠিক ভাবে আলাপ করলে যে শোভন হবে, সে রকম আলাপ করবার যোগ্যতাও তঁ যে নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা করা উচিত—এই জাতীয় জা মনস্তত্ত্বের জালে জড়িয়ে প'ড়ে তাঁর আচরণ সহজ হচ্ছিল না কিছুতেই, এ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল তাঁর চোখে মুখে। আলাপ জমছিল না কিছুতে।

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বৈজ্ঞানিক ও কবির পদ বারান্দায় শোনা গেল। বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরও। কবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

পাখিদের গান নিয়ে আপনারা কবিতা লিখছেন লিখুন, কিন্তু ও নি বেশ ভাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লেখা যায়। বিদেশী লেখকরা লিখেওছে টার্নবুলের Bird Music বইখানা দেখেছেন আপনি? তাতে দেখবে পাখির সুরের বিশ্লেষণ করেছেন উনি। পাখিরা কেন গান গায়, সেই গানে মূল উপকরণ, মানে Component Elements কি কি—

তারপর হঠাৎ ডানার দিকে চেয়ে বললেন, ও, আপনি এসেছেন। নমস্ক নমস্কার। ভারি আনন্দিত হলাম, বসুন বসুন। আমরা দুজনে দোয়ে দেখছিলাম—

কবিও সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন ডানার দিকে। তাঁর মনে হ'ল, যদি প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যদি যেত বেশ হ'ত যে, দোয়েলের গান আর ও

নার রূপ আসলে এক জিনিস। একটা কান দিয়ে মর্মে পৌঁছোয়, আর একটা
খ দিয়ে। অমরবাবুকে বললে তিনি বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু
সলে কোনও তফাত নেই সত্যি।

ডানা বললে, আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম।

কি বলুন তো?

আমি ঠিক করেছি, কলকাতা যাব। ডানা ক্ষণকাল থেমে রইল কি যেন
টু প্রত্যাশা ক'রে। বৈজ্ঞানিক বললেন, ও, তাই নাকি? বেশ তো
ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে মনে যে রকম অবস্থা হয়, কবির মনের অবস্থা
ই রকম হ'ল অনেকটা। খবরটা শুনে বিবর্ণমুখে নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি।

না বললে, কলকাতায় আমার তেমন চেনাশোনা কেউ নেই তো।
পনার যদি কেউ চেনাশোনা থাকে আর তাদের নামে আপনি যদি দু-একটা
ঠি দিয়ে দেন, তা হ'লে আমার একটু সুবিধে হয়।

বেশ তো, দিয়ে দেব। কলকাতায় আপনি গিয়ে আমার বাড়িতেও উঠতে
রেন। বাড়িটা তো খালি আছে, নয়?

না। সেটা কালীবাবুরা নিয়েছেন।—গম্ভীরভাবে বললেন রত্নপ্রভা।
র চোখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না। আচ্ছা, আমি চিঠি দিয়ে দেব।

ডানা বললে, আর একটা কথা। আমি প্রায় দু মাস হ'ল আপনার বাড়িতে
ছি। তার ভাড়াটা কত?—চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

বাড়ি তো আমরা ভাড়া দিই নি।—ধরা-গলায় রত্নপ্রভাই আবার বললেন,
পনাকে থাকতে দিয়েছিলাম।

ডানা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, আবার
ত খরচ ক'রে সারাচ্ছেন—

আপনি না থাকলেও সারাতে হ'ত। বাড়ি থাকলেই সারাতে হয়।

কথা কটি ব'লে রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন, তিনি ওধারে
রে গিয়ে হেঁটে হয়ে শেল্‌ফে বই খুঁজেছেন। রত্নপ্রভার বড় বড় চোখ দুটি
ুর রসিকতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন কানায় কানায়। কিন্তু একটি
থা বললেন না তিনি। হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু স্বামীর দিকে।

(৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২

গ্রন্থাবলী : বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র "পত্র সূচনা"য় লিখিয়াছিলেন : "ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে সকল ইংরাজ ভিন্ন কখন ঐ বাঙ্গালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জনবন্ত বাঙ্গালি বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন তত দিন বাঙ্গালির উন্নতি কোন সম্ভাবনা নাই।" রামেন্দ্রসুন্দরের মনে সাহিত্য-সম্রাটের এই বাণী চিরজাগরূক ছিল। তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন ; মাতৃভাষাতেই তাঁহার গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। প্রকৃতি। আশ্বিন ১৩০৩ (৭ অক্টোবর ১৮৯৬)। পৃ. ১৬৭।

"গত কয়েক বৎসরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞানপ্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা, সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না। প্রবন্ধগুলি নবজীবন, সাধনা, সাহিত্য, দাসী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই কয়খানি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কোন প্রবন্ধের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি। প্রথম প্রস্তাবটি ব্যতীত অন্যত্র অধিক সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় নাই। ঐ প্রথম প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব্বে নবজীবনে সৃষ্টিতত্ত্ব নামে বাহির হইয়াছিল।

সূচী :—সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশ-তরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের সীমানা, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রকৃতির মূর্ত্তি, হর্ম্মান হেলমহোল্‌ৎজ, ক্লিফোর্ডের কীর্ত্তি, প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু, প্রাচীন জ্যোতিষীর প্রস্তাব, আর্য্যজাতি, প্রলয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ফাল্গুন ১৩১৫) "হর্ম্মান হেলমহোল্‌ৎজ" প্রবন্ধটি বর্জ্জিত হইয়া দুইটি নূতন প্রবন্ধ—"আলোকতত্ত্ব" ও "পরমাণু" সংযোজিত হইয়াছে।

২। পুণ্ড্রীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা (কতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত)। ভাদ্র ১৩০৭ ইং ১৯০০।

"পুণ্ড্রীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা একটি গৃহস্থবংশের ইতিবৃত্ত।...প্রকাশক পুণ্ড্রীককুলের সহিত চতুর্থ পুরুষ ব্যাপিয়া অচ্ছেদ্য আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ। এই পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া আমি আমার এক প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম মাত্র।"

৩। জিজ্ঞাসা। ফাল্গুন ১৩১০ (১৬ মার্চ ১৯০৪)। পৃ. ৩২৮।

"বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল।"

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১৩২১) প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ধরিয়া সাজ-

ছে, "প্রকৃতি-পূজা" প্রবন্ধটি বর্জিত, এবং তারকা-চিহ্নিত প্রবন্ধ চারিটি নূতন সন্নিবিষ্ট ছে; উহার সূচী এইরূপ :—সুখ বা দুঃখ ?, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, সৃষ্টি, তিপ্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব, অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড় ?, ারকর্ষণ, এক না দুই ?, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণ-তত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, *পঞ্চভূত, উত্তাপের চয়, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, *মায়া-পুরী, *বিজ্ঞানে পুতুলপূজা।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। চৈত্র ১৩১২, ইং ১৯০৬। পৃ. ১১।

"গত পৌষের বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুনর্মুদ্রিত হইল।"

মায়া-পুরী। ১৩১৭ সাল (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১)। পৃ. ৩৯।

ইহা 'জিজ্ঞাসা'র এক সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ১ আশ্বিন ১৩১৮, ইং ১৯১১। পৃ. ৭৫৪+৵০ শুদ্ধিপত্র।

"আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে সর্ব্বতোভাবে শের ব্যাখ্যার অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি।" বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ। ইহা সাহিত্য-পরিষৎ-ত্রিত "ভারত-শাস্ত্র-পিটক" নামে বৈদিক গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ।

। কর্ম্ম-কথা। ১ বৈশাখ ১৩২০, ইং ১৯১৩। পৃ. ২১২।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—এই বাক্যকে আমি ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া গুলি দাঁড় করাইয়াছি। কর্ম্ম পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতাও নাই এবং অধিকারও নাই, ই আমার মুখ্য বক্তব্য।...প্রকৃতিপূজা নামক প্রবন্ধটি আমার জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থের প্রথম রূপে দিয়াছিলাম। সেখান হইতে সরাইয়া এই গ্রন্থে স্থাপন করিলাম।"

সূচী :—মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, আচার, ধর্ম্মের ণ, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতি-পূজা, ধর্ম্মের জয়, যজ্ঞ।

চরিত-কথা। ৫ ভাদ্র ১৩২০ (৮ নবেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ১০৩।

সূচী :—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্মান হেলম্‌হোল্‌ৎজ্‌ম সংস্করণের 'প্রকৃতি' হইতে গৃহীত), আচার্য্য মক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত রজনীকান্ত গুপ্ত (২), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিচিত্র প্রসঙ্গ। ভাদ্র ১৩২১, ইং ১৯১৪। পৃ. ২২৪।

রামেন্দ্রসুন্দর কর্ত্তৃক বিবৃত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক নিজ ভাষায় লিখিত।

"দুই বৎসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে কথাগুলা প্রকাশ বার জন্য কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত সেগুলাকে বাহির করিয়া লন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না। আমার বিবেচনায় বেদপন্থার ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ misconception চলিত আছে; দ্বারা যদি তা'র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হইলেই প্রচুর পুরস্কার হইবে। আমি বেদপন্থার ত্ত নিরূপণে কতকটা প্রয়াস করিয়াছি, বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় পন্থার সহিত তাহার সম্পর্ক াইবারও কতকটা চেষ্টা করিয়াছি।"

১০। শব্দ-কথা। ১ বৈশাখ ১৩২৪, ইং ১৯১৭। পৃ. ২৪৭।

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।...শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি এক করিয়া প্রকাশ করিলাম। প্রায় সকল প্রবন্ধই সংশোধন করিয়াছি।"

সূচী :—ধ্বনি-বিচার, কারক-প্রকরণ, না, বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষা, বৈদ্যক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, বাঙ্গলার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১১। বিচিত্র জগৎ। ? (৮ আগস্ট ১৯২০)। পৃ. ৪৫৪।

"ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত"। সূচী :—বিজ্ঞান-বিভায় বাহ্যজগৎ, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, জড়-জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের কাহিনী প্রজ্ঞার জয়, চঞ্চল জগৎ।

১২। যজ্ঞ-কথা। ১০ ভাদ্র ১৩২৭ (৩০ অক্টোবর ১৯২০)। পৃ. ১৮৪।

"যজ্ঞকথার প্রবন্ধগুলি প্রথমে...বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে পঠিত হইয়াছিল, এবং পরে 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।"

সূচী :—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোম-যাগ, শ্রৌত-যাগ, পুরুষ-যজ্ঞ।

১৩। নানাকথা। আশ্বিন ১৩৩১, ইং ১৯২৪। পৃ. ২৪৪।

সূচী :—আনি বেসান্ত, ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম, সাহিত্য কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, পরাধীনতা শিক্ষাপ্রণালী, রাষ্ট্র ও মেশন, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, অরণ্যে রোদন, মহাকাব্যের লক্ষণ, আমিষ ভোজন, মাতৃমন্দির।

"এই সকল প্রবন্ধ আমাকে বহু পুরাতন ও লুপ্ত মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহু অনুসন্ধানে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে,...এই গ্রন্থের জন্য লেখকের নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বোধ হয় পুরাতন ভারতী পত্রে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ কি খ্রীষ্ট ?' নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের আজও পর্য্যন্ত কোন সন্ধান করিতে পারি নাই।...শ্রীশীতলচন্দ্র রায়।"

১৪। জগৎ-কথা। ইং ১৯২৬। পৃ. ৩৮৯।

১৫টি প্রবন্ধের সমষ্টি। "এই পুস্তকের কিয়দংশ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তা'র পরে রচনা শেষ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।"

পাঠ্য পুস্তক : রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ; সেগুলি—

Aids to Natural Philosophy. (14 Oct. 1891), pp. 128.

পদার্থবিদ্যা (সচিত্র)। (৩১ জুলাই ১৮৯৩)। পৃ. ১৩৯।
ভূগোল। চৈত্র ১৩০৪, ইং ১৮৯৮। পৃ. ১৭০।
বিজ্ঞান-পাঠ, ১ম ও ২য় মান। ১৩০৯ সাল (৩১ জুলাই ১৯০২)।
পৃ. ১৪০+।০ ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহযোগে লিখিত।
বিজ্ঞান-কথা।

রামেন্দ্রসুন্দর-লিখিত ভূমিকা : গুণগ্রাহী রামেন্দ্রসুন্দর কাহারও কিছু গুণের পরিচয় পাইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই গুণের উৎসাহ দিতেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :—"তিনিই নিঃস্বার্থভাবে আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কন করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন।" ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরস বেদান্ততত্ত্ব তাঁহারই অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি অনেক গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা-সহ যে-কয়খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা :—

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	বৈশাখ ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)
স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী*	...	১৩১৪ সাল
ছড়া ও গল্প : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৩১৭, কার্ত্তিক
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ) : রজনীকান্ত গুপ্ত	...	১৩১৮, বৈশাখ
কালের স্রোত : যোগেশচন্দ্র সিংহ০	...	১৩১৮ সাল
ব্রতকথা : শ্রীকিরণবালা দাসী	...	১৩১৯ সাল
অদ্ভুতের কথা ও ঠাকুরমার কথা : ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		১৩২২ সাল
সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, ৩য় খণ্ড	...	১৯২৩ সংবৎ (ইং ১৯১৬)
চণ্ডীদাস-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' : শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত		১৩২৩ সাল (ইং ১৯১৭)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : প্রধানতঃ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত বিবিধ বিষয়ের অনেকগুলি রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা দিতেছি :—

১৩০০, ভাদ্র	...	'জন্মভূমি'	... ফটোগ্রাফি
পৌষ	...	'সাহিত্য'	... বৈজ্ঞানিক সংবাদ

* এই দুইখানি গ্রন্থের ভূমিকা বা উপক্রমণিকা যথাক্রমে "বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামে 'চরিত-কথা'য় ও "যজ্ঞ" নামে 'কর্ম্ম-কথা'য় স্থান পাইয়াছে।

১৩০১, ভাদ্র ... 'সাহিত্য' ... 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ
১৩০২, ভাদ্র ... 'মুকুল' ... আমরা কি খাই? (শিশুপাঠ্য)
আশ্বিন ... ,, ... মেরু-প্রদেশ ,,
ফাল্গুন ... ,, ... নিউটনের কীর্ত্তি ,,
১৩০৩, ১ম সংখ্যা ... 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ... গৌরীমঙ্গল
১৩০৫, আশ্বিন ... 'মুকুল' ... গাছের আহার (শিশুপাঠ্য)
১৩০৬, ২য় সংখ্যা ... 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ... কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়
৩য় সংখ্যা ... ,, ... "অলঙ্কার শাস্ত্র" প্রবন্ধের আলোচনা
৪র্থ সংখ্যা ... ,, ... ভৌগোলিক পরিভাষা
... ,, ... একখানি প্রাচীন দলিল
১৩০৭, ১ম সংখ্যা ... ,, ... চম্পকলতিকা
৩য় সংখ্যা ... ,, ... ভাবাতত্ত্ব (আলোচনা)
৪র্থ সংখ্যা ... ,, ... "রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ" প্রবন্ধের আলোচ
১৩০৮, ১ম সংখ্যা ... ,, ... কাশীরাম দাস
... ,, ... আর একখানি প্রাচীন দলিল
আশ্বিন ... 'বঙ্গদর্শন' ... অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার (সচিত্র
মাঘ-ফাল্গুন ... 'প্রদীপ' ... জড় ও চৈতন্য
১৩১০, ১ম সংখ্যা ... 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ... ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চৈত্র ... 'বঙ্গদর্শন' ... রণেশপ্রসঙ্গ (আলোচনা)
১৩১২, বৈশাখ ... ,, ... রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ
... 'ভারতী' ... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
... 'ভাণ্ডার' (পৃ. ৩৩-৮) ... "আজকালকার পল্লিক উদ্যোগগু সঙ্গে প্রাকৃত-সাধারণের যোগরক্ষ উপায় কি?" প্রশ্নের উত্তর।
জ্যৈষ্ঠ ... ,, (পৃ. ৮৫-৭) ... "আমাদের দেশের শিক্ষার আ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরী কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ?" প্রে উত্তর।
... ,, (পৃ. ৯৬) ... প্রশ্ন।
অগ্রহায়ণ ... 'বঙ্গদর্শন' ... স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩১৪, ১ম সংখ্যা ... 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ... গ্রাম-দেবতা।

আশ্বিন	... 'প্রবাসী'	...	"ব্যাধি ও প্রতিকার" (আলোচনা)
১১৫, ১৮ মাঘ	... ২য় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ	...	রাজসাহী সম্মিলনে বক্তৃতা
১১৬, চৈত্র	... 'সাহিত্য'	...	রমেশ-ভবন।
১১৭, বৈশাখ	... 'প্রবাসী'	...	লোকশিক্ষা।
আশ্বিন	... 'মানসী'	...	বয়স্থ শিক্ষাপ্রণালী।
১১৮, মাঘ	... 'বঙ্গদর্শন'	...	অভিনন্দন।
১১৯, চৈত্র	... 'মানসী'	...	চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে নিবেদন।
১২১, বৈশাখ	... 'মানসী' ও 'সাহিত্য'	...	সভাপতির অভিভাষণ
আশ্বিন	... 'মানসী'	...	৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৩, বৈশাখ	... ,,	...	স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী
	... 'ভারতী'	...	অন্নময়ুর।

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী : ডক্টর শিশিরকুমার মৈত্র একটি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহা উদ্ধারযোগ্য :—

"সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গ-সাহিত্যে রামেন্দ্রবাবুর স্থান অতি উচ্চ, এ কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস-বিভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গালায় যে কত দূর উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ, এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ, বাঙ্গালাতে অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বে অনেক রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন, ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তিবলে ও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার গুণে তাহা অতি সরল বলিয়া প্রতিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মত নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক উচিত, এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে। আমার মতে, এ ত কোনও প্রমাণ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিকও ব Aristotle এই জন্য দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metap sics, অর্থাৎ—যাহা Physics-এর জ্ঞানলাভের পর, Physics-এর তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জর্ম্মান ভাষায়ও দার্শ চিন্তাকে Nachdenken বলে, (অর্থাৎ Denken বা বস্তু-চিন্তার যাহা উদিত হয়)। দার্শনিক চিন্তা সকল সময়েই Nachdenken, অ এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চি বিষয়ের পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রি মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউ ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর চিন্তা করিতে থা "কিরূপ পথ দিয়া এত দূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহু হইলে, আমার এ-পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য।' 'প্রকৃতি'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা বিজ্ঞানের পূরা জো দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে দুই জায়গায় যেন তাঁটার টা আভাস পাওয়া যায়। "জ্ঞানের সীমানা" ও "প্রকৃতির মূর্ত্তি"-নামক প্র গ্রন্থকারের যেন একটু খটকা উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি বা বিজ্ঞান চরম স কাইয়া যাইতে অক্ষম; বুঝি বা এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরা বিরাট্ শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়। এই খটকা হইতেই 'জিজ্ঞাসা'র উৎপ যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য না হয়, তাহা হইলে কোথায় সত খুঁজিতে হইবে? 'জিজ্ঞাসা'র প্রথম প্রবন্ধ "সত্য"তে এই বিষ আলোচনা আছে। বিজ্ঞান ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভূয়োদর্শ বাহিরে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শ অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যা দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃও নগণ্যমাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম ক ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটী বৎসর আগেও ছিল, মানিল

কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের সত্য কাজে কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে লইয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহারিক সত্য, জীবনযাপনের সুবিধার জন্য গৃহীত সত্য। "বিজ্ঞানে পুতুলপূজা"-শীর্ষক প্রবন্ধ এবং বিপন কলেজে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ অশাশ্বততা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। 'আমি আছি'—এ সত্য কিন্তু অন্য প্রকার সত্য। ইহা অপর কোন সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। ত্রিবেদী মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন—"আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমাদের অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।" ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে দুই প্রকার সত্যের নির্দ্দেশ করেন। এক হইতেছে ব্যাবহারিক বা Pragmatic সত্য, জীবনধারণের সুবিধার জন্য মানিয়া লওয়া সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য, Absolute Truth।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'আমি আছি' ইহাই চরম সত্য। কিন্তু এই আমি কি? আমি কখনও পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশৃঙ্গ অবলোকন ও নিম্নে বেগবতী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি নিভৃত কক্ষে শান্ত শুদ্ধভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেছি। এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও হাসিতেছি, কখনও কাঁদিতেছি, সর্ব্বদাই বিচলিত হইয়া আছি; আর এক আমি নির্ব্বিকার শান্ত শুদ্ধভাব। প্রথম 'আমি'কে জীবাত্মা বা phenomenal self এবং দ্বিতীয় 'আমি'কে পরমাত্মা বা transcendental self বলা যায়। এই দুই 'আমি' কিন্তু মূলতঃ একই। যে আমি পরমাত্মা, সে আমিও আবার জীবাত্মা; ইহা Kant-ও যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরাও সেইরূপ বা ততোধিক জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ও ইঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া এই বিরাট্ সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করেন।

আমি আপনাদিগকে এই সকল দার্শনিক technicalities বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু এই দুই প্রকার 'আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রি মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী চৈতন্য 'ত থাকিলেই তো হইত, এই দুই 'আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর আছে। 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'—অ মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের সৃষ্টি-হেতু। অর্থাৎ, ইহা ক করিলাম—সেই কামনা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমি কামনা ক নিজকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দরুণই অ সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন। এই নিক্ষে আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে। 'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্র 'যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ'—সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন ক যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সম্বন্ধ। এই জন্য ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই বিশ্বব্যাপার মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভ দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ ক জগতে উপস্থিত আছেন—সংসার করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত তখন যে-যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল।"

জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্য সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। ভোগ্য যখন ত্যাগের দ্বারা লভ্য, সমস্ত জগতের—এবং কাজে কাজেই ভোগ্য বস্তুরই—যখন ত্যাগেতে সৃষ্টি, তখন ত্যাগের সহিত ভে কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহা ত্রিবেদী মহাশয় ত 'কর্ম্ম-কথা'র "যজ্ঞ"-শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। 'ত্যা সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। 'ভোগের বিষয় এ পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ।"

পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞ, অর্থাৎ ত্যাগাত্মক—ইহা দেখান ও বোঝানই ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্ম্ম-কথা' গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথার ঠিক মানে কি, একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ, অর্থাৎ, তাহা ethical, আবার কর্ম্মমাত্রই ঋত; অর্থাৎ—Cosmic process. কাজেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারই নৈতিক (Ethical), অথবা সমস্ত নৈতিক ব্যাপারই জাগতিক। সুতরাং Cosmic process এবং Ethical process মূলতঃ এক। "ধর্ম্মের জয়"-শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঐক্যটি ত্রিবেদী মহাশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"যে নিয়তি সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন-রাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝা-বায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎ কর্ম্মে ও অসৎ কর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে।"

এইখানে একটু খট্‌কা বাধে। নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিলে, নৈতিক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা ঘটিতেছে, এবং যাহা ঘটা উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, 'উচিত' শব্দের আর কোনও অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু morality লোপ করা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান যে, এই সাংসারিক বা ব্যাবহারিক জীবনে Morals-এর কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্ম্মের জয় হয় না, নিয়তির জয় হয়। ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভাসিক জগতে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজের নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অনুভূতি ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হই। ধর্ম্ম এই প্রাতিভাসিক বা intuitive রাজ্যে বিচরণ করে। ইহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব সামগ্রী। আমার সহিত অনন্তের সম্বন্ধ, প্রতি দিনের মেশামেশি, প্রতি দিনের মাখামাখির সম্বন্ধ।

দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিবেদী মহাশয় প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা পরিষ্কা নির্দ্দেশ করিবার পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন।...

কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতি তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'-নামক পুস্তক তাহার দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির Culture-history অন্বেষণ কা চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা নূতন। আমাদের Culture-history এ লেখা হয় নাই। কিরূপে যে হিন্দুর আচার-ব্যবহার কালের সহিত ধীরে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার পরিষ্কার ছবি 'বিচিত্র প্র দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয় তন্মধ্যে বাক্ শব্দের ঐতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের ভা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক্ শব্দের আলোচনায় ত্রিবেদী ম দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে বাক্‌দেবীর অর্চ্চনা ও শব্দব্রহ্মবাদ যাহা তাহার সহিত গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় Doctrine of Logos-এর মৌলিক বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যটি রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, এবং হইতে এই অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দ-ব্রহ্মবাদ গ্রীকরা হিন্দু নিকট হইতে পাইয়াছিল, এবং পরে তাহা প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টানদিগকে এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের করিয়াছেন, যাহা খ্রীষ্টানরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ত্রি মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন তাহা, এবং খ্রীষ্টানদিগের Eucharist ভক্ষণ একই জিনিস। গোপালত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। এদিকে সোমক্রয়ের যে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তা বাগ্‌দেবীকে গাভী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক নৈ কাণ্ডে গো-শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন, যথা—ধেনু, শব্দ, বাণী, ভারতী প্রভৃতি এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, 'এতে একবিংশতির্বাঙ্‌নাম এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাক্—গো- এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে গাভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে গোপাল কল্পনা করা হইয়াছে।

অনেক প্রসঙ্গ এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে।...যে দুইটির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কিরূপ গভীর ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। বাস্তবিক, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় কেন, কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। কোনও কোনও বিষয়ে Houston Stewart Chamberlain এর 'Foundations of the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। Chamberlain-এর পুস্তকে ইউরোপের Culture-history দিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী Dogmatic, গায়ের জোরে Chamberlain তাঁহার প্রিয় মতটি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু Dogmatic ভাবের লেশমাত্র নাই।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব লিখিবার চেষ্টা ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন। তাঁহার "ধ্বনি-বিচার" নামক প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা শব্দের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার কেহ কখনও এ-পর্য্যন্ত করিতে সাহস করেন নাই। ('সাহিত্য,' শ্রাবণ ১৩২৬)

পত্রাবলী: রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত কয়েকখানি পত্রের সন্ধান পাওয়া ছে। ইহার দুইখানি মাত্র মুদ্রিত হইল; এগুলি পাঠে তাঁহার পাণ্ডিত্য স্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে:—

জেমো, কান্দি ১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,—আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে ঐ সকল দুরূহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানব জাতির অগ্রণীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্ব্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন,

আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাই
কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন সে আমার প্রতি আ
নিরতিশয় শ্রদ্ধার ফল।

খুব সম্ভব আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দূর হইতে ব
পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দে
পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও ক্ষী
জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জী
সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার দ
ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মী
পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি তাহা ন
মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের চেয়ে একটু
মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে,
একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব?

আমি যত দূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, তত
মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—তত দিন religiousness-ই এক
উপায়;—এই religiousness এর মোটামুটি দুইটা লক্ষণ, এ
optimistic.—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ
নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের
আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে? এ
attitude কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর ক
যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে সে-ই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্যের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার
হইবে—হয়ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধ
উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Desponde
আনে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slo
of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ স
acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খৃষ্টানদের

n Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্য-
র পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অনুচিত হইবে—এখানে
হর যাতনা—প্রাণস্বরূপের সহিত বিরহ সম্ভাবনায় তিনি কেবলই
া করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্তি অনুভব করেন নাই।
কে যদি ভগবান্ বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা
ন দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার
পথিক তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।
ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন
বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের
য় ব্যাকুল।
মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ-ভয় হইতে
য় তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার
ব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ-ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো
নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ
ই আমার লীলাভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার
না সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া
ারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।
আমার রচনার মধ্যে, 'জিজ্ঞাসা'র ও 'কর্ম্ম-কথা'র শেষ দিকে—এই কথাটি
ইবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য
াই, তাহাতে আমার মত কীট কত দূর করিবে!
যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে
কখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন,
তে পারেন। বাঙ্গলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'অভয়ের কথা'
ানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর *Varieties of*
ligious Experience (Clifford Lectures) খানি পড়িতে পারেন।
ন religiousness-এর যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা আপনি ঐ পুস্তকে
বেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত
ার মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি।
এ ক্ষুদ্র পত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনব্যাপী

চেষ্টার ফল—এখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন-সমস্যার সম্বন্ধে আ আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কির সেই attitude-এ আনিব?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যে কাতর—সকল সময়ে চি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এ জন্য আমাকে ক্ষ করিবেন।

পত্রদ্বারা এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার শারীরি অবস্থা মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। 'ভারতব পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত দুই বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে, উহ শেষ ভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার নমস্কা লইবেন। ('সবুজ পত্র,' আষাঢ় ১৩২৬)

এপ্রিল ১৯১৮

পরম কল্যাণবরেষু,—একাদশী-তত্ত্ববিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমার ম ইংরাজীনবিশ অধ্যাপকের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছ, ই বিস্ময়ের বিষয়, এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমার ধৃষ্টতা।

একাদশীতে বিধবাগণের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মে বাঙ্গালা দেশের কিয়দংশে চলিত আছে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এ ব্যবস্থা চলিত নাই বাঙ্গালার বাহিরেও এই নিরম্বু উপবাস সর্ব্বত্র চলে না, ইহাই আমি জানি।

যখন ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুসমাজে ইহা প্রচলিত নাই, তখন ই সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরে শাস্ত্র পণ্ডিতের অভাব নাই। তৎসত্ত্বেও অন্যত্র যখন নিরম্বু উপবাস চলে না তখন শাস্ত্রের বিধিসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে রঘুনন্দনাদি ব্যবস্থাদাতারা শাস্ত্রকার নহেন, শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদাতা মাত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র।

যে কোন ব্রাহ্মণের স্বাধীনভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবা অধিকার আছে। রঘুনন্দনের সহিত অন্য ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। তবে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহ

ok of reference-রূপে অসামান্য। তদবধি বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরা গ্রন্থখানি পঠন পাঠন করিয়াই সহজে ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী হইতেছেন। মূল শাস্ত্র গৃহ্যসূত্র এবং মনুসংহিতাদি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কেহই আবশ্যক ধ করেন না। কাজেই অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ রঘুনন্দনের শিষ্যপরম্পরা ক বাঙ্গালাদেশে তাঁহারই মত চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে অন্য মত লিয়াছে। ফলে প্রকৃত তত্ত্বটি এই—

বেদগ্রাহী সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতি অর্থে বেদের ক্ষণবাক্য। বেদের ব্রাহ্মণবাক্যের সহিত বিরোধী হইলে কোন স্মৃতিই মাণিক নহে। এমন কি ঋষিপ্রণীত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থের এবং মন্বাদিপ্রণীত হিতা গ্রন্থের উপদেশও অগ্রাহ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অধিকাংশ লুপ্ত য়া গিয়াছে। একাদশী-তত্ত্ববিষয়ে বেদের ব্রাহ্মণবাক্যে কিছুই পাওয়া যায় বলিলেই হয়। যে সকল বিধিনিষেধ গৃহ্যসূত্রাদি এবং মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্রে াছে, অথচ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই, তাহা লুপ্ত বেদের অনুযায়ী বলিয়া ধরিতে হয়। হস্থের দৈনন্দিন আচার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এই শেষোক্ত গ্রন্থমধ্যেও সমুদায় াওয়া যায় না। তজ্জন্য পুরাণাদির আশ্রয় লইতে হয়। পুরাণ গ্রন্থগুলিকেও ই জন্য লুপ্ত বেদানুযায়ী স্মৃতি বলিয়া মান্য করা হইয়া থাকে। আধুনিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ যে সকল বিধিনিষেধের সমর্থন গৃহ্যসূত্রে বা মন্বাদি সংহিতায় ান নাই, তাহার জন্য পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের আশ্রয় ইয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে এই জন্য বহু স্থানে পুরাণের প্রমাণ দিতে ইয়াছে। কিন্তু পুরাণ গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা লইয়া নানা গণ্ডগোল আছে। করাচার্য্যের মত মনীষী মহাভারতের প্রমাণ অসঙ্কোচে আশ্রয় করিয়াছেন, কন্তু পুরাণের আশ্রয় লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন।

প্রচলিত পুরাণ মধ্যে কোন্‌খানা খাঁটি, কোন্‌খানা জাল, কোন্‌খানায় কতটা প্রক্ষিপ্ত আছে, ইহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন, শৈবেরা শৈব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন; কাজেই পুরাণের প্রমাণ আশ্রয়ে যে সকল ব্যবস্থা, তাহাতে দেশভেদে ও কালভেদে নানা মুনির নানা মত দাঁড়াইয়াছে। কাজেই কোন ব্যবস্থাদাতা যদি রঘুনন্দনের দত্ত পৌরাণিক প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া অন্য প্রমাণ দেখান, তাহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার হেতু নাই।

ফলে বাঙ্গালা দেশে বিধবার নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা ঘটনাচক্রে চা গিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন ব্যক্তি যদি সরলচিত্তে অন্য দেশাচ চলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিবে, তাহা আমি মনে না। তবে মোটের উপর সংযমের পক্ষে ব্যবস্থাই সমাজরক্ষার অনুকূল।

রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ সংসারে নাই। ব্রাহ্ম আচার শূদ্রেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ভালই, না করিলে দোষ দেখি

(শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী : 'রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ৩০০-৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্

রাজা

অসম্ভব বৃষ্টি নামল হঠাৎ।

অসময়ে। ঠিক ব্যবসা-কাজের সন্ধানে বেরুচ্ছিল রাজা, বাধা পড় আর বৃষ্টি ব'লে বৃষ্টি, একেবারে মুষলধারে নামল। মোটা মোটা দড়ির ধারা, এক মুহূর্ত্তে ঝাপসা ক'রে তুলল চতুর্দিক। জল পড়ার নলটা বেয়ে প্র বেগে জল নেমে আসছে, চারপাশে ছিটকোচ্ছে জল। দরজার পাশ থে স'রে আসে রাজা, কদর্য একটা ভঙ্গী ক'রে বলে, শা—লা!

রাজা কবি। রাজা পকেটমার। অর্থাৎ কবি ও পকেটমার একাধারে। এ বিচিত্র, তবে অসম্ভব নয়। শুধু কবি নয়, কাব্য-পাঠক সে। লেখার বি বস্তুও একেবারে নব্য। আর পকেটমারই নয় কেবল, মাতালও বটে। ম পয়সা জোটাতে পকেট কাটে, কি পকেট-কাটার টাকাটা ওড়ানোর জন্য খায়, ঠিক বলা যায় না।

সব লোকেরই অতীত একটা থাকে। বিশেষ হ'লেই সেটা ইতিহ হয়ে ওঠে। রাজা সেদিক দিয়ে দীন। অতি সাধারণ অতীত তা ভদ্রসন্তান, বি.এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। কারণ, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার ক'রে বসে, পড়াটা কিছু না, অর্থোপার্জনই সব। অতএব কলেজে খাতা থেকে নামটা খারিজ ক'রে নেয়। মা-বাবা গত হয়েছিলেন আগেই সংসারে দায় নেই কোন। বাড়ি ছিল একটা, সেটা বেচে দিয়ে কিছু নগ পকেটে ক'রে রাজা বিশাল ধরিত্রীতে স্থান অন্বেষণে বেরুল। আপাত কলকাতাই তার কাছে বিশাল ধরিত্রী হয়ে উঠল।

তার পরের কথাটা খুব সোজা। কবি সে, কাজেই জীবন দেখতে হবে, জীবনটা হোটেলের মদের পাত্রে এবং বেশ্যার ঘরে আবদ্ধ আছে, এ তার ধারণা হ'ল। যথোপযুক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ জুটতে দেরি হ'ল না। রাজা আমাদের বন দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে বিলিতী মালের বদলে ধেনো মদের পাঁট ও এবং বাঁচবার সহজ উপায়টাও বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে সেই দা, কলেজ-জীবনের রাজা অতীত আশ্রয় করল; সরু দক্ষ হাতওয়ালা রাজার ত্ব শুরু হ'ল।

প্রায় পাঁচ বছরের কথা এ সমস্ত।

চন্দ্র-সূর্যের এক আকাশে ঠেলাঠেলির মত দুই রাজার এক দেহের অধিকার য়ে ঝগড়া মিটে গেছে বহুকাল। আছে একমাত্র ঐ কাব্য-প্রীতিটুকু, মদ লেই ওড়েন, স্পেন্সার, লরেন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট পড়ে আর আওড়ায়।

মোটামুটি এই হ'ল আমাদের রাজা।

সকালবেলাতেই এত ঘনঘটা ক'রে বৃষ্টি আসায় ওর সমস্ত মনটা খিঁচড়ে ল। সাড়ে-আটটা বাজে। বড় রাস্তায় ট্রাম ধরতে হবে গিয়ে, দশটার র অফিসের ভিড় আবার কমবে। ভেজা অবস্থায় অফিসপাড়ায় সারা দিনটা ারাও অসম্ভব। আর পারা যায় না। আবার স্বগতোক্তি করে, শালার ষ্টি—

নাঃ, কমবার কোন লক্ষণই নেই। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিরলভাবে। াস্তায় একহাঁটু জল জ'মে গেছে। সঙ্গীহীন গাড়িগুলো সশব্দে জলের মধ্য য়ে চ'লে যায়। ঢেউ ওঠে। গলির মোড়ে বড় রাস্তার ধারটায় নর্দমার াংরা জল কাঁপতে থাকে। সামনে মল্লিকবাবুদের তেতলার কার্নিসে ভিজে াক ব'সে ডানা ঝাপটায় আর আওয়াজ করে। তারও মনের অসুখ।

রাজা মাদুরে আধশোয়া হয়ে চোখ বোজে। কাল রাত একটা অবধি হৈ-চ গেছে, শরীরটা নরম। বেশ লাগছে, এমনই স্থাণুর মতন প'ড়ে থেকে বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ যদি শোনা যেত! রাজা হাই তোলে।

…রাজা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। কতক্ষণ কেটে গেছে? ঘড়িটার দিকে য়ে ও, দশটা বেজে কয়েক মিনিট। মেজাজ ভয়ানক বিশ্রী হয়ে গেল। ভাল লাগছে না কিছু।

…বৃষ্টি ছেড়েছে। রাস্তার জল ক'মে এসেছে, লোকজন বেরিয়েছে পথে।

প্যাচ্‌পেচে কাদা, চোখ দুটো জ্বালা করছে। রাজা চোখে মুখে জল দি চুল আঁচড়ায়।

কড়াটা ন'ড়ে উঠল সশব্দে। দরজা খুলে দিলে রাজা, ডাকপিওন একটা চি হাতে গুঁজে দিয়ে বিদেয় নিলে।

চিঠি?—অত্যাশ্চর্য ঘটনা! একখানা মোটা পুরু কাগজের লেফাফা, তা উপর সুন্দর মার্জিত হাতে লেখা রয়েছে ওর নাম। ব্যাপারটা কি?

না, বেরুনো হ'ল না। ঘরে ঢুকল রাজা। ভয় ভয় করছে এক সাধারণত যা ঘ'টে থাকে, এ তো ঠিক তার মধ্যে পড়ে না। চিঠি?—সত্যিই কিন্তু ওকে কে লিখবে?

সবল হাতে ছিঁড়ে ফেলে খামটা। নীল কাগজে সোনালী জলে ছাপানো আমন্ত্রণ-লিপি। 'বহ্নি-চক্র' সংঘের বার্ষিক ঘরোয়া পুনর্মিলনী। কালকে তারিখ দেওয়া।—উল্টো পিঠে টানা-টানা হাতের লেখায় ছোট চিঠি।—

এ চিঠি পাবি কি না জানি না। পেলে নিশ্চয়ই আসবি খুব আশা ক'রে থাকলাম। —সুনীল

'বহ্নি-চক্র'। ওর কলেজ-জীবনের সহপাঠী আরও আটটি ছেলের সঙ্গে মিলে এই ঘরোয়া সংঘটা গ'ড়ে তুলেছিল। কত কথাই মনে পড়ে! তখনকা শত আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে ওই নামটার সঙ্গে। ওরই দেওয়া নাম বুদ্ধদেব, ওর বন্ধু বুদ্ধ, এঁকে দিয়েছিল সাইন-বোর্ডটা। সুনীলদের ঘরে ওদে সেই আড্ডা। কত অধিবেশন, উৎসব! কলকাতা থেকে গাইয়ে আর নাম-কর লেখকদের ধ'রে নিয়ে যাওয়া, টো-টো ক'রে ঘুরে চাঁদা আদায় করা দুপুরের কড় রোদে, মাঝরাতে ঘাড়ে মই নিয়ে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টা সাঁটা।

'বহ্নি-চক্র'। নামটা সঙ্গে ক'রে আনল যেন তার গোটা কলেজ জীবনটাকে। 'গৌরবময় দৃপ্ত প্রথম যৌবন, ক্রিকেট-ফীল্ড, ডিবেটিং সোসাইটি সোশ্যাল, সাহিত্য-পরিষৎ···। গৌরী, স্নিগ্ধা, মায়া,—কি যেন তার নাম, রোল সাতষট্টি, ঠিক মনে পড়ছে না, সহপাঠিনীর দল সার বেঁধে দাঁড়াল। বুদ্ধ, সুনীল, আনন্দ, বিমল—দলের ছেলেগুলো। এ ছেলেমেয়েরা কোনদিন মরবে না, বুড়ো হবে না ওর কাছে, চিরটা কাল ওর মনে তাজা জীবন্ত থেকে যাবে। ···বহ্নি-চক্রের সাইনবোর্ডের জ্বলজ্বলে লাল শিখাওয়ালা চাকাটা বোঁ-বোঁ ক'রে

রয়েছে, মধ্যের সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে উদয়গিরির প্রান্তসীমায় অর্ধলুক্কায়িতদেহ ত্রাধারী সূর্যদেব হাসিমুখে চেয়ে আছেন।···

ইতিহাসের সামগ্রী জীবনের স্পর্শ পাচ্ছে।

কিন্তু এ ঠিকানা ওরা পেল কোথা থেকে? ওর এ আড্ডা তো কেউ জানে না। ও আবার তলার সইটা পড়ে। সুনীল। ওই তা হ'লে এখনও সম্পাদক। ওরা কেউ আজও ছাড়ে নি সংঘকে।—কিন্তু ঠিকানা পেল কেমন ক'রে?

কিন্তু ও কথাটাই কি বড় কথা? যেখান থেকেই পাক, ওরা ওকে ডেকেছে, বহ্নি চক্রের অধিবেশনে ওকে ডেকেছে। ও যাবে, হ্যাঁ, ও যাবেই। সুনীল ডাকছে, বৃদ্ধ ডাকছে, পাঠ্যজীবন-সঞ্চারা ডাকছে, ওর ফেলে-আসা অতীতটা তার ভালবাসা-ঝগড়া-হাসি-কান্না সমেত ডাকছে। যাবে ও।

যাবে?—আয়নায় মুখটা দেখে ও। গত পাঁচ বছরের জীবন তার চোখকে ঠেলে দিয়েছে কালিময় গর্তে, সেখান থেকে সেই রাগেই বোধ হয় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে শ্বাপদের চোখের মতন। মুখের দু পাশে দুটো কদর্য রেখা। হাসলে কালো ঠোঁটের ওপর সাদা ছাতার পেছনে কালচে মাড়ি আর নষ্ট দাঁতের সারি দেখা যায়। চুলে তেল পড়ে নি কতকাল, লম্বা-লম্বা চুল। খাওয়া কি উচিত হবে?

তা ছাড়া, আর এক কথা। ওরাও কি এখনও তেমনই আছে? সংসারের চাপে প'ড়ে সজীবত্ব তাদের কি অটুট আছে? হয়তো রাজা তাদের দেখবে একেবারে অন্যরকম। সে সরল উচ্ছলতা ওদের মধ্যে থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর মনে ওদের যে রূপ, সে তো অবিনশ্বর, সেখানে রাজা সে ছেলেগুলিকে ধ'রে রেখে দিয়েছে আজও।

ঠিক দুপুরবেলায় হতাশভাবে রাজা মদের বোতল খোলে।

ওর অনিশ্চয়তা আর দ্বিধার বোধ হয় এর থেকে ভাল ওষুধ আর ছিল না। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে, উন্মত্ত মস্তিষ্ক জ্বলতে থাকে, থুঁতনিটা থরথর ক'রে কাঁপছে, গলা দিয়ে কি ঠেলে উঠছে!—মাতাল হয়ে রাজা কাঁদছে।

কিন্তু সঙ্কল্প তার স্থির হয়ে গেছে। পরদিন ভোরে তার গাড়ি, পৌঁছবে বিকেলে, রওনা হবে আবার ভোরে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

বিকেলবেলায় রাজা নামল মফস্বল স্টেশনটাতে। আকাশ ঢেকে আছে

দ্রুত-ধাবমান নীচু মেঘে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের সিঁড়িটায় কা এসে দাঁড়াতেই পুরনো জায়গাটা যেন তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানা হাওয়ায় একটা পরিচিত গন্ধ। তাজা সবুজ ভেজা গাছেরা, লম্বা লম্বা ঘাসে রাস্তার কাদা মিলে পাঠাচ্ছে গন্ধটাকে। একেবারে প্রাণের মধ্যে গি অনুরণন তোলে। কতকাল পায় নি এ মিশ্র গন্ধের আভাস! আশ্চর্য, কাদা এখানে বিরক্তিকর তো বোধ হয় না!

রাজা খুশি হয়ে হাঁটতে থাকে। ট্রেনে সমস্ত দুপুরটা প্রায় জেগে জানল ব'সে কাটিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে একটা ঘুমের ঝোঁকে এক স্বপ্ন তা চমকিত ক'রে তুলেছিল।

…তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আবার সেই পুরনো জীবন। ও যে আবার তার সেকেণ্ড ইয়ারে ফিরে গিয়েছিল।

পরিষ্কার ও দেখতে পেলে, ভাত বেড়ে মা ডাকছেন।

খোকা, অ খোকা, আয়। কতক্ষণ ভাত নিয়ে ব'সে থাকব?

ও যেন লাফাতে লাফাতে ঢুকল, কি, বুড়ীয়া মাই! হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ক আর বলতে? কি মাছ, ইলিস? গুড, মেটার, দিয়ে ফেল চটপট, স হয়ে গেছে।

মা পাখা হাতে বসলেন। গরম ভাতে হাওয়া করতে করতে বললে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসবি বাবা।

ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। গালাগালিটায় বেশি অভ্যস্ত সে, এত আদরে সুরে কথা বলাটা ঠিক সুবিধেজনক ঠেকল না তার কাছে। খুব আস্তে আ বলে, কি ব্যাপার?

কাল ষষ্ঠী। তাই বিকেলে একটু কলা-টলা এনে দিবি আর কি। অ দিকে তাকিয়ে থাকেন মা।

জল খেয়ে ঝনাৎ ক'রে গেলাসটা রাখে রাজা, তারপর তড়বড় ক'রে উ পড়ে। বলে, তখনই বুঝেছি। ওসব হবে না। অন্য কেউ যাবে, আমার খে আছে।

তাড়াতাড়ি পালতে চায় ও।

মা বলেন, আহা, ওরে বাঁদর, অম্বল খেয়ে গেলি নে?

দাও, হাতে দাও।—রাজা হাত পাতে।…

মার হাসমুখটা তার পরই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে মিলিয়ে যায়। ওর ঘুম ভেঙে গেছে। গায়ে একটু ঘাম, চোখে একটু জল। আর ঘুম হয় নি।

মা তার কিছুদিন পরেই হাঁপানি-জ্বরে মারা গেছেন। ভাল ক'রে চিকিৎসা য় নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিই ওদের সংসারটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। ারা জীবনটা এক হাতে দশজনের কাজ ক'রে যেতেন। আর সবাইয়েরই ত অতি সাধারণ মা।

রাজা ভাবে, মার মত লোক মরতে পারেন না। ওর মনের মধ্যে চিরকাল স্নেহময়ী তিনি, তার শত উচ্ছৃঙ্খলতা স'য়ে যাবেন, সান্ত্বনা দেবেন থাকে।

শুধু মা কেন, ওর তখনকার আত্মীয়ের দল সবাই তার মনে আজও বেঁচে আছে, কোনদিন মরবে না। আর বাড়বেও না কোনদিন সেসব বন্ধু। চিরকাল কিশোর বয়সের উদ্দাম পড়ুয়া থেকে যাবে। অস্ফুট স্বরে সে বলে, তদিন—যতদিন আমি বাঁচব।

চির-পরিচিত আবেষ্টনী, প্রতিনিয়ত দেখা খুঁটিনাটি, ওকে আনন্দে উচ্ছল ক'রে তোলে। মেঘের ফাঁক থেকে সূর্যটা হঠাৎ বেরিয়ে এসে কড়া রোদ দিতে াকে। ঘাসে পাতায় জল চকচক করতে আরম্ভ করল।...

মনে প'ড়ে যায়, ও বর্ষার পরম ভক্ত ছিল। মেঘ দেখলে ওর মন কারণ খুশি হয়ে উঠত। কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য তাকে প্রায় াগল ক'রে তুলত। আশ্চর্য, এতদিন এ সমস্ত ভুলে সে ছিল কোথা? এই গার জানা প্রিয় যথার্থ স্থান। ওই তো দেখা যায় বনমালী কবরেজের বঠকখানা, তারপর থেকে সার দিয়ে ওদের পাড়ার বাড়িগুলো। ওই উঁচু তলাটায় থাকত গৌরীরা, এখনও কি আছে?

গৌরী ওর সহপাঠিনী। নম্র সংযত, ফর্সা মেয়েটি, কটা চোখ। দেখতে নিশ্চিতভাবেই সুন্দর নয়। ও কিন্তু তার মধ্যে কোথায় লাবণ্য বের ক'রে নিয়েছিল খুঁজে। দোহারা ছোটখাটো মেয়েটির সলজ্জ কথা তার কানে ধ্বনিত হত সেকালে। হয় নি হয়তো কিছুই, কিন্তু কলেজের দেওয়াল-কবিদের সমর্থন পেয়ে বেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের বন্ধুত্বের কথা। এ ভাল াগার মূল্য হয়তো নেই কিছুই, কিন্তু আজও নিষ্পাপ পবিত্রতার কথা শুনলে গৌরীর কথাই মনে প'ড়ে যায় তার। কেমন আছে সে, কোথায় আছে?

আবেগভরে ভাবে সে, ভাল থাকুক, সুখে থাকুক গৌরী, নিষ্পাপ কুমারী যে কল্যাণ হয় যেন তার।

মোড়টা ঘুরতেই পাড়ায় এসে পড়ে রাজা। ওদের পুরনো বাড়ি, ও এখান থেকে চ'লে যাবার সময় বেচে দিয়েছিল, সেটা পার হয়ে যায়। ছোট ছেলে খেলা করছে সেই উঠনে; ওপাশ থেকে একটি কমবয়সী একটি বছর বারো-তেরো বয়সের ছেলেকে উৎসাহিত করছে কোণের থেকে পেয়ারা পাড়তে। ওদের সেই পেয়ারা গাছ। ওরা এখন ও-থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নতুন বাসিন্দা, নতুন মুখ সব।

...সন্ধ্যের আলো জ্ব'লে উঠল রাস্তায়। বড় রাস্তার মুখে সুনীলদের উজ্জ্বল আলোর ফালি তির্যকভাবে এসে পড়েছে রাস্তায়। ভেতর অট্টহাস্য ঝলকে ঝলকে মেদিনী কম্পিত করছে।

সারাটা বিকেল কাঁদায় কাদায় ঘুরেছে রাজা। চেনা শহরটাকে আ দেখেছে ঘুরে, চেনা মুখ বহু দেখেছে, আলাপ করেছে অনেকের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে রাজা সোজা ঘরে ঢুকে গেল।—সেই ফরাশটা, দেওয়ালে পুরনো সাইনবোর্ড, রঙ কিছু জ্ব'লে গেছে, তবু ঝকমক করছে। ভে দরজার মাথায় ওর লেখা কবিতাটা, বহ্নি-চক্রের জন্মের সময় লেখা। আছে সুনীল, ব'সে আছে আনন্দ, কোণ ঘেঁষে ব'সে বুদ্ধ; ফরাশের মাঝে বিমল, তার পাশে ছোট খোকা, অমর, প্রবীর, জিতেন—। দাঁড়িয়ে দাঁ রাজা এক এক ক'রে চোখ বুলিয়ে গেল, ওরা কেউই বিশেষ বদলায় নি।

পরমুহূর্তে একটা গগনবিদারী শোরগোল। বহুদিনের অদেখা অপ্রত্য পরম বন্ধুর দর্শনে উল্লসিত আট জোড়া সবল ফুস্‌ফুসের স্বাগত হুঙ্কার।

আরে, কে ও? রাজা বটেক?

আজু মরু গেহে শ্যাম আওল।

হু-রা—চালাও পান্‌সি। রাজা আ গয়া।

কেয়াবাৎ। Colin Clouts come home again!

এখানে ব'স্—O Mary, go and put the kettle on. A little is indicated.

তারপর, রাজা, চিঠি পেয়েছিলি তবে?

রাজা, একটা নতুন কবিতা লিখলাম আজ। শুনতে হবে কিন্তু।
বুদ্ধদেবই প্রথম অনুভব করলে, ব্যাপারটা বড় ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে।
থাম্ তো তোরা। সবে ট্রেন থেকে নেমেছে, একটু জিরুতে দে।
জিরনো হ'ল। অমরের কবিতা শুনল রাজা। আনন্দ পেটুক মানুষ, অথচ
াগত অজীর্ণে ভোগে, পেটে টোকা মারে আর খায়। তার পেটের অবস্থা
তে হ'ল। সকলের খোঁজখবর নিলে। জিতেন নতুন ডেপুটি হয়েছে, ছোট
কা প্রফেসর। আনন্দের ব্যবসা ফুলে উঠেছে, অমর ওকালতি ফেঁদেছে
নেই। সুনীল কোন্ ছাত্র-সংহতির সম্পাদক, বেশ নাম করেছে। বুদ্ধ
য়মান কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, কাজকর্ম ভালই করছে। অন্যান্য সহপাঠীদের
। পেল, জীবিকার্জন ক'রে চলেছে নানা জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে। গৌরীর
ও পেল, বিয়ে হয়ে গেছে তার।
চোখ বুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে থাকল ও। এই তো সে, স্বপ্নে নয়,
বে, সব-চেনা জগতে বন্ধুদের মধ্যে ব'সে নিশ্চিন্তে। ওদিকটায় বুদ্ধ আর
রে ঝগড়া লেগেছে। হাসি এল ওর। খুব চেনা ঝগড়াটা, প্রায়
তনিয়তের ঘটনা। কবিতা নিয়ে অমরকে খ্যাপাচ্ছে বুদ্ধ। এরা সবাই
খনই আছে।
সুনীল ব'লে চলেছে, ওরা প্রতি বছর এ দিনটিতে এখানে এসে জমে,
ানেই যে থাকুক না কেন। শুধু ওরা আটজন, আর কেউ না। রাজার
া তো এতদিন পাওয়া যায় নি—
রাজা চোখ খুলে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোথা থেকে পেলি আমার ঠিকানা?
কেন? কদিন আগে যে বড়দার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হয়েছিল!
রাজার মনে প'ড়ে যায়। মাসখানেক আগে ট্রামের মধ্যে দু মিনিটের দেখা
ছিল বটে সরোজদার সঙ্গে। ঠিকানাও বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি,
। যে ও সত্যি কথাটা বলেছিল, তা ও জানে না। তিনি তবে ভোলেন নি
টা!
সুনীল বলে, ওসব যাক। তুই কি করছিস, বল্? আমাদের মধ্যে সব-
তে ওস্তাদ ছিলি তুই—
রাজা বলে। অনর্গল মিথ্যা কথা বলে। এত সুন্দর ক'রে গল্পটা জমিয়ে
ন যে, নিজেরই ভাল লাগে। মধ্যপ্রদেশে কোন্ স্টেটে ও মাইনিং

অফিসার। মাইনে? মোটামুটি আর কি। স্ত্রী কোয়ার্টার, তা ছাড়া এটা ওটা হ্যাঁ, তবে হঠাৎ বিয়ে করেছে, তাই খবর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। ছেলে হয়েছে একটা। ছেলের নাম? ভাল নাম তো রাখা হয় নি, রাজা ডাকে মুন্না বলে ও খোকন ব'লে ডাকে। হুঁ, সুন্দরী। আছে ভালই, পাহাড়ে জায়গা খাওয়াটা ভাল। মাস দুয়েকের ছুটি পেয়েছে, কলকাতায় এসে আছে। হ্যাঁ নিয়ে আসবে বউকে, তবে দুদিন বাদে। কাল আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে ওদের কার বিয়ে।

রাজা কথা বলছে। রাজা, বহ্নি-চক্রের রাজা, কলেজের দলের নেতা বন্ধুদের ভালবাসা আর গর্বের বস্তু। কতদিন পরে দেখা!

তারপর হাসি, গান, তবলা-হারমেনিয়ামের আওয়াজ। রাত বাড়ে খাবার ডাক আসে। খাওয়া। একসঙ্গে সারি দিয়ে তুমুল হট্টগোলের সঙ্গে নয়টি ছেলে খাচ্ছে। অনেকদিন পরে কত আনন্দের সঙ্গে খেল রাজা।

অনেক রাতে আর সবাই চ'লে গেল, আনন্দ আর বুদ্ধ থেকে যায় এখানে বাইরের ঘরে ফরাশের উপর শুয়ে পড়ে ওরা তিনজন। সুনীল আলো নিবিয়ে ভেতরে চ'লে গেল।

মধুর, জীবনটা মধুর। দুঃখ মধুর, আনন্দের স্মৃতি মধুর। অজানা কারো একা একা ব'সে দীর্ঘশ্বাস ফেলা মধুর। নিজের অদেখা রহস্যময়ী পৃথিবী সম্বন্ধে অন্যের ভ্রমণকাহিনী পড়া, সেও মধুর।

আজ থেকে হোক তার নতুন পথে যাত্রা। মদ সে আর খাবে না, ক্লেদাক্ত সঙ্গ ছাড়বে। কালকাতাতেই আর ফিরবে না কোনদিন। একটা চাকরি জুটবে না তার এখানে? থাকবে, এখানেই থাকবে।—মা, গৌরী, বুদ্ধ, সুনীল, আনন্দ, কলেজ, প্রিন্সিপালের ভুঁড়িওয়ালা চেহারা, ইংরেজীর নতুন অধ্যাপকের লাজুক মুখ, মা, গৌরী, গৌরী, মা···সব কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে তারপরে কুয়াশা···ঘাস থেকে সুগন্ধ উত্থিত হচ্ছে। জলভরা মেঘের ফাঁক দিয়ে দিগন্তে হলদে চাঁদের দুরন্ত যাত্রা;···রামগিরি পাহাড়, উত্তরীয়-সম্বল কঙ্কালসার মূর্তি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, মণিবন্ধ তার কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত···

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ॥

যক্ষের শাপবর্ষ অতিক্রান্ত···উড়ে চলেছে কামনার মোক্ষধামে···স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেখানে অনন্ত সৌন্দর্যের চিরনিকেতন···

পাশ ফিরে শুল রাজা। বুদ্ধের নাক ডাকছে।

···ভোর পাঁচটায় ওর গাড়ি। সাড়ে চারটেতে সুনীল ওকে তুলে দিলে। শান্ত তপোসমাহিত ব্রাহ্মমুহূর্ত। রাজা বুক ভ'রে নিশ্বাস নেয়। পরিষ্কার, ঠাণ্ডা বাতাস। মেঘ জ'মে আছে আকাশে। বৃষ্টি নামে নি এখনও। রাজা মুখ ধুতে গেল।

মাসীমা রাত থাকতে উঠে চা-জলখাবার ক'রে ব'সে আছেন। মায়ের হাত। মাসীমার সঙ্গে খানিক গল্প করে রাজা। বড় আনন্দ পেলে মনে ও। কয়েক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু সুধায় রইল ভ'রে একেবারে। ওকে আসতেই হবে বলে, ও বুঝতে পারে।

সময় হয়ে যায়। বাইরের ঘরে গিয়ে ও কাপড় পরতে আরম্ভ করে। বুদ্ধেরা ঘুমোচ্ছে গভীরভাবে। ও ডাকবে না ওদের। বেচারারা বড় ক্লান্ত হয়ে রয়েছে। গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে ভাবে, ওদের সঙ্গে দেখা করতে আবার আসবে ও। ফিরে আসবে। নিজে নিজেকে বোঝানোর জন্যই যেন মাপন মনে বলে, ফিরে আসব। আবার ফিরে আসব।

পাঞ্জাবিটা পাচ্ছে না রাজা। আলনার অন্য কাপড়ের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে বোধ হয়। খুঁজতে থাকে।

সুনীল এসে ব'লে গেল একটু দাঁড়াতে। মাসীমা আমসত্ত্ব দেবেন, সেটা নিয়ে আসছে। সঙ্গে যাবে স্টেশনে।

ঐ পাঞ্জাবিটা, ঐ নীল শার্টের তলায়। শার্টটা তোলে ও, কি একটা প'ড়ে গেল বুকপকেট থেকে ওর পায়ের ওপর।

মানিব্যাগ। একটা মোটা বোঝাই মানিব্যাগ। সরু দক্ষ আঙুলগুলো শিরশির ক'রে ওঠে, কি করছে বোঝবার আগেই ব্যাগটা তুলে নেয় রাজা। বুকটা একটু কাঁপে। ঘুমন্ত বন্ধুদের দিকে একটা চাহনি হেনে ও ব্যাগটা খুলে ফেলে। একতাড়া নোট। নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাগ, দোকানের ক্যাশ হবে। ব্যাগটা রেখেই দেয় ও নীল শার্টের পকেটে। তারপর পাঞ্জাবিটা পরে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জিভটা মোটা হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। —এর মানে ওর অতীতকে, সুধাময় অতীতকে একেবারে মুছে ফেলা।

কুয়াশাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।—বহ্নি-চক্রের সূর্যসারথী এক হাতে খ'রে, আর এক হাতে কশা অর্ধোত্থিত। চোখ দুটো নাচছে আনন্দে, উদ্ভাসদীপ্ত মুখ, কবাটবক্ষের পাশ দিয়ে কুয়াশা ঘৃণ্য বিসর্পিল গতিতে উঠে উঠছে! ঢেকে গেল, ছেয়ে গেল মিত্রদেবের মুখ।···মা, গৌরী, মা—মেঘ আনন্দ···সবাই সেই কুয়াশার আবরণের ওপারে চ'লে গেল। রাজা দু তোলে তাদের সরানোর জন্য।

অন্য দরজা দিয়ে সুনীল বেরিয়ে ডাকছে। ট্রেনের সময় হ'ল। হাতে এ কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা আমসত্ত্ব।

কই, রাজা, দেরি করিস না, যদি যেতে হয়। সময় হয়ে এল।

এই যাই।—রাজার চমক ভাঙে। একটা ঢোঁক গেলে সে। বের আগে আনন্দের দিকে সচকিত কটাক্ষে চায়, তারপর পটু আর্টিস্টিক সরু আ নির্বিকারভাবে ব্যাগটা তুলে নেয় নীল শার্টের পকেট থেকে।

শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক

পাগলা-গারদের কবিতা

চিচিং ফাঁক

চুরি-চৌকস চল্লিশ চোর সুদূর পথের বাঁকে
অদৃশ্য হয়ে যায়। আলিবাবা চুপি চুপি সেই ফাঁকে
গুহার সুমুখে রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে হাঁকে
অতি সাবধানী অতি মৃদু সেই ডাক,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

* * *

আশেপাশে কেহ আছে নাকি? কেহ শুনিছে কি সেই স্বর?
নাই, কেহ নাই। পাতায় পাতায় আছে শুধু মর্মর,
উদাসী হাওয়ার না-দেখা পরশে একান্ত নির্ভর,
ঝোপের আড়ালে আছে ঝিঁ ঝিদের ঝাঁক।
যেন কানে-কানে আলিবাবা কহে, "খোল দ্বার সত্বর,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

* * *

গাছের আড়ালে অতি সাবধানে গোপনে রয়েছে বাঁধা
পিঠে ঝুলি-সহ অতি প্রশান্ত বিশ্বাসী দুটি গাধা,
একজন হ'ল কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বাকিটি তাহার দাদা,
শোনে দুই ভাই বিস্ময়ে হতবাক্
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

* * *

হতে বহু দূর ভেসে আসে সুর, বাঁশি বাজে মাঠ-পারী,
কে যেন কোথায় ঘাট-পারে ব'সে গায় গান ঘাট-পারী,
আলিবাবা আজ চোরের ওপর করবেই বাটপাড়ি
ইন্‌শা-আল্লা, বরাতে যা থাকে থাক্
বন্ধ দ্বারের সম্মুখে তাই ডাকে মৃদু হাঁক ছাড়ি
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

* * *

হায় দুনিয়ার দৌলত্, তুমি জান যে জবর যাদু,
সাধুরে বানাও চোর তুমি ভাই, চোরেরে বানাও সাধু,
কত ফাঁদারে যে চালাক বানাও, চালাকেরে কর ফাঁদু,
শাক দিয়ে মাছ, মাছ দিয়ে ঢাকো শাক,
আলিরে ডাকাও মৃদু স্বরে, যেন নাভিয়ে ডাকিছে দাদু,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

* * *

ঘায়েল হয়েছে অনেক বছর, খেয়ে অতীতের থাবা,
মহাবিশ্বের সাথে মহাকাল অনেক খেলেছে দাবা,
কত বাপ হ'ল ঠাকুরদা, আর কত ছেলে হ'ল বাবা,
কত না পদ্মে হেসেছে কত না পাঁক।
আজ কোথা সেই চল্লিশ চোর? কোথা সেই আলিবাবা?
তবু মনে হয় আজো শুনি তার ডাক,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

ফাঁকি

যারে ফাঁকি দিতে করিনু চেষ্টা
ফাঁকি দিয়ে গেল সেই যে শেষটা
পকেট-কাটার পকেট গেল সে কেটে!

তারি কথা ভেবে উদাসী চিত্ত
থেকে থেকে করে করুণ নৃত্য,
সে নাচের জের সহজে কভু কি মেটে ?

যে-ই শোনে সে-ই কহে সহাস্য
"এ যেন গীতার নূতন ভাষ্য,
সেয়ানার সাথে সেয়ানার কোলাকুলি।
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
সরিষার বীজ করিলে বপন
সরিষার ফুলে ভরিতেই হবে ঝুলি।"

রামেরে খাওয়ালে শ্যামের ভেটুকি
ফাঁপিতে পারে না শ্যামের পেট কি ?
উদোর পিণ্ডি পড়ে না বুদোর ঘাড়ে ?
নিজে নেব যদি নিজেরি ঝুঁকি
বেঁচে তবে আর জগতে সুখ কি ?—
'চুত্তোর' ব'লে ভাবি আমি বারে বারে।

চাঁদ ও তুমি

চাঁদ ডুবে গেছে মেঘের আড়ালে
তবু আমি চেয়ে আছি।
মনে মনে ভাবি, তুমি কোথা আজ ?
আমি তো রয়েছি বাঁচি।
স্বাধীন রয়েছি গণ্ডির মাঝে,
কাটে রাত দিন কাজে ও অকাজে,
হাসি পেলে হেথা হাসি হি-হি ক'রে
নাচ পেলে পরে নাচি।

তুমি একবার ঢেকেছিলে মুখ
সুন্দর কালো চুলে

হয়তো সে কথা তুমি ভুলে গেছ,
আমি তো যাই নি ভুলে
আর ভোলে নাই জানি মহাকাল,
আজো মনে করে সকাল বিকাল,
কচ্ কচাকচ্ কাটে সে সময়
হাতে অনন্ত কাঁচি।
তুমি কোথা আছ নাহি জানি আজ
আমি তো রয়েছি বাঁচি।

গহীন রাতে

আজি এই গহীন রাতে
শূন্য হাতে
গাইব যে গান আপন মনে
সঙ্গোপনে বিজন ছাতে
যদি তা হাওয়ায় ভেসে
চ'লে যায় তোমার দেশে,
দু কানের ভেতর দিয়ে
মরমে পৌঁছে শেষে
তোমায় করে আনমনা—
হয়তো আমি জানব না গো
জানব না গো জানব না।

নিরালায় তাই তো ডাকি
তোমার দাবি,
কেনই বা আর দিয়ে ফাঁকি
লুকিয়ে রাখি মনের চাবি?
আমি যে আপন-ভোলা,
রেখে দিই দুয়ার খোলা,
তুমি সেই সুযোগ নিয়ে
যদি দাও দোদুল-দোলা।

আমায় ক'রে আনমনা
তখন আমি কোনই মানা
মানব না গো মানব না।

তারার প্রতি

ওগো অগুনতি তারা,
জানি নে তোমরা কারা,
কে আমি তোমরা জান নাকো নিশ্চয়,
তবু আমাদের হোক দেখাদেখি, না-ই হ'ল পরিচয়।

চাঁদের প্রতি

"বন্ধু হে চাঁদ, পিছন ফিরিয়া বারেক দাঁড়াও ভাই,
পৃষ্ঠে তোমার কৃষ্ণ পাহাড় দেখিব আছে কি নাই,
সমুখে যেমন দেখি।
ক্ষণিকের তরে অনুরোধ রাখিবে কি ?"
অনুরোধ চাঁদ রাখিত হয়তো, কিন্তু দেখিল ককি
উজল আলোকে সারাটা আকাশ ভরিয়া দিয়াছে রবি।

অদার্শনিক

কোথা হতে আসি, কোথা চ'লে যাই,
আমি নাহি চাই জানতে
মাস-কাবারেতে যদি পারি ভাই
মোটা টাকা ঘরে আনতে
জীবাত্মা আর পরমাত্মায়
কোথা মিল আর তফাত কোথায়,
ভেবে হেন যা-তা ঘামাই নে মাথা
মনে মনে বলি "বেশ তো
মিল থাকে ভাল, না থাকে না থাক্,
দুয়ে যেথা খুশি যাক্ বা না যাক্,"
আমি শুধু দেখি পকেটে আমার
আছে কি না আছে রেস্তো।

* * *

"চিরদিন জয়ী ধর্মের আলো"
এই কথা শুনি বার বার,
আমি তো দেখছি বেশ আছে ভাল
যারা করে চোরা-কারবার।
গৌর, মহাত্মা এবং বুদ্ধ
গিয়েছেন ব'লে তাঁহারা স্তব্ধ
প্রেম-হাতিয়ারে করিতে যুদ্ধ
ল'য়ে অহিংসা-ডাণ্ডা,
আমি তো দেখছি, প্রেম দিতে গেলে
প্রেম-পাত্রেরা ঠেলে দেয় ফেলে,
ঠাণ্ডার প্রতি গরম সবাই
গরমের প্রতি ঠাণ্ডা।

* * *

শুনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আসন
পেল যে ভারতবর্ষ,
তার নাকি একমাত্র কারণ
ত্যাগের মহা আদর্শ।
না জুটলে পরে ভোগের খরচা
আপনি আসবে ত্যাগের চর্চা,
হাতের পাঁচ তো রয়েছেই ত্যাগ,
ভোগ করি তাই দিলখুল্
কি সত্য আর কি যে অসত্য
বুঝি নাকো অত তত্ত্ব-ফত্ত
খাও দাও আর ফুর্তি উড়াও
এই বুঝি ভাই বিলকুল্।

আগুন

ওরে ভাই, আগুন লেগেছে মোর মনে
কেমনে লাগাল কে যে
একদম জানি নে যে
কেন বা লাগাল কোন্ ক্ষণে!

কোথায় বা দমকল।
কোথা পাইপের জল?
আগুন নিভাতে ডাকি কাহারে?
নদীরা যদিও জানি
সাগরেতে ঢালে পানি
উৎপাত করে আগে পাহাড়ে।
দুটি চোখ জুড়ে মোর
নেমেছিল ঘুম-ঘোর
সহসা জাগিনু এ লগনে
জেগে দেখি, হায় হায়,
করি আমি কি উপায়?
আগুন লেগেছে মোর মনে।

একটি কথা

তুমি আমায় বলেছিলে—হয়তো তোমার নেই মনে—
"আমার মনের ফুল-বাগানে রাখব তোমায় মালী।
তুমি আমার বাগান সেঁচে
সেরা সেরা কুসুম বেছে
যেমন খুশি তেমন ক'রে গাঁথবে মালা খালি।"
আজকে মনে পড়ল তোমার শেষ-না-করা সেই কথা।
মালী আমায় কর নি তো, হয় নি গাঁথা মালা।
তবুও আমি আপন মনে
হেথায় ব'সে সঙ্গোপনে
তোমার তরেই সাজিয়ে রাখি আমার বরণ-ডালা।

খবরদার

দুই চোখে মোর দূরবীন আছে,
রসনায় আছে ক্ষুরধার।
আমার সামনে প'ড়ো না কেউ
খবরদার।

শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৩

সচিবের শালা, লাটের বেহাই
মোর কাছে কারো নেই কো রেহাই,—
খুঁত পেলে আমি ভূত ছাড়াবই
ঝাড় ফুঁক দিয়ে জোরদার
আমার সামনে প'ড়ো না কেউ
খবরদার!

ঘুঘু দেখেছ কি? দেখ নাই ফাঁদ?
দেখাব আস্তে আস্তে।
ভেবেছ কি হবে আকাশের চাঁদ
কাস্তে?
অচেনার মত চলি চুপি চুপি
বহুরূপ ধ'রে আমি বহুরূপী,
পণ্ডিত দেখি পণ্ডিতি করে
সর্দারি করে সর্দার
ভাব দেখি যেন পানের সঙ্গে
জর্দার।

এমনিতে আমি নিরীহ নেহাৎ
সহজে যাই নে লাগতে,
ক্ষেপে গেলে তবু সময় পাবে না
ভাগতে।
বাঘের পেছনে লাগে যথা ফেউ
আমার পেছনে লেগো নাকো কেউ,
মাথা চ'ড়ে গেলে দেখি নে তফাত
ছোড়দার সাথে বড়দার
আমার পেছনে লেগো না কেউ
খবরদার!

অ. কৃ. ব.

নিজের কথা

ছেলেবেলা

বয়স তখন দশ কি বারো, দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মামার যতাম। উৎসব সমারোহেই হ'ত। কলকাতা থেকে সেরা বাইজীর থুর সার যাত্রা, থিয়েটার বায়স্কোপ, ব্ল্যাক আর্টের ম্যাজিক ইত্যাদি ৫য়দিন অষ্টপ্রহর ধ'রে চলত। তার সঙ্গে লাখ লাখ লোকের ভিড়। াজসাহী ডিভিশন থেকে লোক যেন ভেঙে পড়ত তাজহাটের রাজবাটি াত্মীয় বা অপরিচিতের পার্থক্য ছিল না, উপর-ক্লাসের টিকিট কিনে ৫সে পড়তে পারলেই হ'ল। বাড়তি লোকের থাকবার স্থান হ'ত শি ড়ে বড় শৌখিন তাঁবুতে।

আমার কাজ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে প্রতিমা গড়া দেখা। সেবার প্তাহ খানেক আগে এসে পড়েছিলাম। ঠাকুরের উপর লাল মাটি গয়েছে, বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে গঠনের উপর পালিশ চলেছে; রঙ আর ঘা াড়তে দিন কতক বাকি।

রংপুর বালির দেশ, লাল মাটি আসত বাইরে থেকে, তৈরি হ'তে খানেক সময় লাগত। তৈরি এঁটেল মাটি টেপাটেপি করলেই একটা একটা রূপ বেরিয়ে আসত। আমি মাটি নিয়ে সাপ ব্যাঙ গড়তাম, বড় াগত। মাটির মধ্যে কত রকমই অস্পষ্ট রূপ দেখতাম, কিন্তু কিছুতেই ফ'রে আনতে পারতাম না। মানুষের চেহারার প্রতিই ছিল আমার আকর্ষণ। চেহারা নিজে গড়তে না পারলেও মাটির ভিতর দৃষ্টি আমার যত, ওদের দেখতাম আমি ঠিক। মানুষ গড়ায় নাজেহাল হয়ে গেলে প লতাম আমার দুঃখের কথা। পটুয়া ছিল আমার দরদী, সময় নষ্ট ব'লে কখনও কড়া কথা বলে নি, বরং অবসর পেলে ভোজবাজির খেলা কয়েকটা আঙুলের টিপনিতেই চমৎকার মানুষের মুখ গ'ড়ে দিত। কখন গোটা মানুষটাই তৈরি ক'রে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার কা দেখতাম। কত সময় অবনতমস্তকে বলতে চাইতাম, তোমার বিদ্যা অ কিছুটা দিয়ে দাও। কিন্তু বলা আর হ'ত না। ভদ্রলোকের ছেলের পটুয়ার মারার মতলব শুনলে তখনকার দিনে জাতপাতের প্রশ্ন উঠে পড়ত। নিন্দার ভয়ে লুকিয়ে প'টোকে শ্রদ্ধা করতাম।

একদিন বড়সড় কিছু গড়বার ইচ্ছে হ'ল, তার সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধিও

খেলছিল। রীতিমত প্রকাণ্ড সাপ গড়লাম, গোক্ষুরো সাপ। ফণা ধরিয়ে কার্তিকের পিছন থেকে ময়ূরের পায়ের তলায় মাথা থাড়া করিয়ে দিলাম।

আহারান্তে দিবানিদ্রা শেষ ক'রে, পটুয়া কাজে লাগতে যাচ্ছিল। প্রতিমার কাছে আসতেই 'বাপ রে' ক'রে উঠল। পরক্ষণেই চণ্ডীমণ্ডপে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড। লাঠিসোঁটা নিয়ে লোকজন ছুটে এল। প'টো দূর থেকে দেখিয়ে দিলে, ভয়ঙ্কর ফণাধরা বিষধর। ধপাধপ লাঠি পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত কে একজন ব'লে বসল, আরে, চ্যাঃ! এ যে মাটি! আশ্চর্যজনক আবিষ্কৃতিতে, একদিনেই আমার নাম বেরিয়ে গেল, ছেলেটা গড়ে ভাল। সেই দিন থেকেই বাহবার উৎসাহে গড়ার দীক্ষা পেলাম। আমার মূর্তিগঠনশিক্ষার প্রথম গুরু পটুয়া। পটুয়াকে আজও গুরু ব'লেই মানি, শ্রদ্ধেয়কে স্মরণ ক'রে মাথা নত করি।

লেখাপড়ায় আর মন বসে না। ক্লাসের ভিতরেই নিরিবিলি কোণের বেঞ্চে পুতুল-গড়া শুরু ক'রে দিলাম। বয়েসের পক্ষে ষণ্ডামার্ক ছিলাম, ছেলেরা ভয় পেত, কেউ ধরিয়ে দিত না। ধরা পড়লাম স্বভাবদোষে গড়তে গড়তে একদিন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। রূপ ধরার ঝোঁক আমাকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, হাতের নাগালে কি ঘটছে জানবার অবকাশ ছিল না।

গোঁফওয়ালা মানুষের মুখ গ'ড়ে চলেছি, বেপরোয়া মর্দানা গোঁফে তখন চাড়া দিয়ে দিয়েছি, এমনি সময় মাথার উপর দারুণ গাঁট্টা পড়ল। কার এত বড় স্পর্ধা! মুখ তুলতেই দেখি, একজোড়া জীবন্ত গোঁফ, আমাদের জুনিয়ার মাস্টার আয়নায় মুখ দেখার মত পুতুলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পুতুলের গোঁফের সহিত মাস্টার মশাইয়ের তা দেওয়ার ভঙ্গীতে বেশ মিল ছিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইঙ্গিতকে অর্থপূর্ণ ক'রে নিলেন, অকস্মাৎ কানে টান পড়ল। কান টানলেই মাথা আসে, উঠতে হ'ল।

বড় রকমের চরিত্রশুদ্ধির ব্যবস্থা হ'ত হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। জরুরী কেস স্থগিত রাখতে হ'ল। জুনিয়ার মাস্টারকে মুখ ভ্যাংচানির নথি হাজতে র'য়ে গেল, পুতুল আলমারিতে বন্ধ হ'ল, বিচারের সময় এক্সিবিট হিসাবে ব্যবহৃত হবে ব'লে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারের আগেই সাজা প্রস্তুত থাকে। আমার সম্বন্ধেও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

আমি জামিনে খালাস পেলেও কুকীর্তির বিশদ বিবরণ সহ রেজিস্টারি পত্র গেল বাবুজীর—আমার পিতার—কাছে। চিঠি প'ড়ে তিনি কিছুই বললেন না। দিন কতক কথা বলা বন্ধ ক'রে দিলেন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান আদুরে ছিলাম; বাবুজীর ব্যবহারে মনে ব্যথা পেলাম।

ক্লাসে আর পুতুল গড়া চলে না। স্কুল পালাতে আরম্ভ করলাম। স্কুলের সামনেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার, তারই একটা ঝোপে বাঁদর পাখি গড়তাম সময়টা কাটছিল ভাল, কিন্তু সুখ বেশিদিন সইল না।

ক্লাসে অনুপস্থিতির খবর হাত-ফেরতা হতে হতে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল। তলব পড়ল খাস-কামরায়। তখন আমি তারিফে লোভে সদ্য-গড়া বাঁদর-ছেলেদের দেখাচ্ছিলাম, রসভঙ্গ হয়ে গেল। হুকুমের পিছনে তাড়া ছিল, পুতুলটা গুছিয়ে লুকোবারও সময় পেলাম না, তাড়াতাড়ি কোঁচায় ঢেকে কাঠগড়ার দিকে চলতে লাগলাম।

হেডমাস্টার বেজায় রাশভারী মানুষ। আচকান জোব্বা শামলা প'রে স্কুলে আসতেন। চশমার উপর দিয়ে দূরের মানুষ দেখতেন। ঐ চাহনির খপ্পরে প'ড়ে গেলে ছেলেদের একটা না একটা সাজা সুনিশ্চিত ছিল। শাসন করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ, আমি মহৎ কর্তব্য-সাধনে সহায় হয়ে দাঁড়ালাম।

স্কুল পালানোর খবর দিয়েছিল গেটের বুড়ো দরোয়ান। আমাকে নাকি কিছুতেই আটকানো যায় না, পাঁচিল টপকানো আমার নিত্য পেশা। দরোয়ানে পাওনা ঘুষ সেই দিনই কেবল দিতে পারি নি। প'টোপাড়ায় মাটির ফরমা দিতে টিফিনের সব পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা কি ভাহা মিথ্যাবাদী সোজা গেট দিয়ে ওরই ইশারায় বেরিয়ে যাই, আর ব'লে দিলে কিনা পাঁচি টপকাই!

নিমকহারামের উপর রীতিমত চ'টে গিয়েছিলাম। রাগে দাঁত কড়মড় করছিল। শব্দটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। শাস্তিদাতা মুখের সামনে বেত ধ'রে বললেন, এতবড় স্পর্ধা, দুষ্কর্ম ক'রে আবার দাঁত কড়মড়ানি?

চরিত্রশুদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্রকে বেকার বসিয়ে রাখা গেল না। সপাং ক'রে বেত এসে পড়ল আমার পিঠের উপর। মারের পরেই শুদ্ধির দক্ষিণা চেয়ে বসলেন অর্থাৎ আমাকে ভাল ছেলের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। প্রমাদ গুনলাম

থকস্মাৎ এমন একটি প্রতিশ্রুতির চাহিদা আসবে কল্পনাও করতে পারি নি। সতি প্রথায় শাস্তির পর আসামী কয়েদখানা থেকে খালাস পেয়ে থাকে। স্কুল-ানায় এ সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত হলাম।

ইতিমধ্যে হেডমাস্টার মশাই হলফ শোনবার জন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, াতের বেত থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। বিচার ক'রে দেখলাম, বরং আর এক া বেত পিঠে সওয়া চলে, কিন্তু ভাল ছেলে হওয়া ধাতে সইবে না. বিশেষ ক'রে ধদের দৃষ্টান্ত আমার সামনে ধরেছেন তারা আমার চক্ষুশূল। কোন উত্তর া দিয়ে নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অপর দিকে শুদ্ধির লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে ায়, শাস্তিদাতার ধৈর্য শেষ সীমানায় এসে ঠেকেছে, অচিরাৎ একটা কিছু হেস্ত-নস্ত না হ'লেই নয়। 'কি হে বাছাধন!' ব'লেই মাস্টার মশাই সর্ব শক্তি ায়োগে আমার কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দিলেন। এইরূপ ঘনিষ্ঠতার জন্ত প্রস্তুত ছলাম না। ঝাঁকুনিতে পিচ্ছিল মাটি হাত ফসকে পড়ল ঝকঝকে পরিষ্কার মঞ্চের উপর। একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

প্রত্যক্ষ বাঁদর আত্মকথা কবুল করতেই একটি বিরাট হুঙ্কার শুনলাম, তার রে আদেশ পেলাম, গাধার টুপি প'রে গেটের সামনে বেঞ্চির উপর এক পায়ে াড়িয়ে থাকতে হবে. ছুটির পরেও আধ ঘণ্টা। অসম্ভব প্রত্যাশা, যে সুবোধ ালক স্কুলে ঢোকবার আগে থেকেই ছুটির ব্যবস্থা নিজে ক'রে নেয়, তারই পর বন্দী হবার আদেশ! আদেশ মানা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মহামান্ত ফুট প'রে অভিষেকের স্থানে উপস্থিত হলাম। আমাদের জুনিয়ার মাস্টার ামাকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

তখন টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে, ছেলেরা খাবার-মুখে আমার চারপাশে রছে। ক্ষিধেয় ভিতরে রায়টের সূচনা হয়েই ছিল, গাল-ফোলা ছেলেদের খে উত্তেজনা বেড়ে উঠতে লাগল। ভিতরের গোলমালের শব্দ বাইরে থেকে শানা যায়, অথচ শান্তি-স্থাপনের কোনরূপ উপায় নেই।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল, পা বদলে কোন প্রকারে শাস্তির সম্মানকে ঠেকা য়ে খাড়া রেখেছি। ক্লাসে ফেরার ঘণ্টা পড়ল, ছেলেদের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টির হন থেকে রেহাই পেলাম।

দাঁড়িয়েই আছি, যে নালিশ করেছে সে-ই আমার পাহারায়। দরোয়ান বরদস্ত তামাকখোর। ছিলিমে টিকের আগুন তার কখনও নেবে না।

লোকটা নতুন ক'রে তামাক সাজার জন্যে ঘরে ঢুকল, পোড়া তামাক ও বালতিটার ভিতর ফেলে দিয়ে। জলন্ত অগ্নির আধার আমার দৃষ্টিকে ক্ষণে টেনে নিতে লাগল। কে যেন কানের পাশে চুপিচুপি ব'লে গেল, তো উদ্ধারের ব্যবস্থা ওই বালতির ভিতর লুকানো আছে।

মরচে-ধরা ভাঙা বালতি, বয়েসের দোষে বাতিল হওয়ায় দরোয়া ডাস্টবিন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দরোয়া জঞ্জাল সে ওর ভিতরেই গুঁ রাখে। আমি দেখলাম, ওই বালতির তোবড়ানো কাঠামোর সঙ্গে আ গাধার টুপির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। ভাবলাম, দরোয়ানকেও আমার সম্মানিত করলে দোষটা কি হয়? চিন্তার সঙ্গে কাজ আমার দ্রুত হয়ে থা কর্তব্য সম্বন্ধে প্রস্তুত হতে সময় লাগল না।

দরোয়ান ফিরে এসে মাঘের রোদ পোয়াবার ব্যবস্থা ক'রে নিলে অ দিকে পিছন ফিরে। বালতি আমার বেঞ্চির কাছেই। ধীরে—অতি বেঞ্চি থেকে নামলাম, অতি সন্তর্পণে বালতিটা তুলে নিয়েই খপ দরোয়ানের মাথায় চেপে বসিয়ে দিলাম; তারপরই রাস্তার দিকে দৌড়। স একটা বন্ধ ভাড়াটে-গাড়ি যাচ্ছিল, পিছনে উঠে বসলাম। প্রকাণ্ড গেট খে বালতি মাথায় দরোয়ান সেখানে, হাত প্রসারিত ক'রে কানা-মাছি খেল তার সঙ্গে বিকট চীৎকার। নিশ্চয় টিকের আগুন টেকো মাথায় কাজ শুরু দিয়েছিল। তা পুড়ুক, লোকটার দিশাহারা অবস্থা আমাকে আনন্দে ম ক'রে তুলেছিল। ইতিমধ্যে স্কুলের এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা এসে প হঠাৎ ছাদের উপর থেকে চাবুকের ডগা আমার মাথার কাছে এসে প লাগল, গাড়োয়ান নিশ্চয় টের পেয়েছে, বিনা ভাড়ায় চলেছি। বো উৎপাত সহ্য করা চলল না, একটু একটু ক'রে আন্দাজি মারের চাবুক কাছে এগিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ান ছাদের উপর উঠে নাকি? চুরি ক'রে আরাম ভোগ পরিত্যাগ করতে হ'ল, গাড়ি থেকে পড়লাম।

কলকাতায় মামার বাড়ি চৌরঙ্গীতে ঠিক যাদুঘরের পিছনে। ছুটির ওখানে যেতে সাহস পেলাম না। আমার সম্বন্ধে সন্দেহ-বাতিক লেগেই থাকে। অসময়ে বাড়ি ফিরলেই চার ধার থেকে প্রশ্ন শুরু হয়ে ছুটির আগে এলি কেন? নিশ্চয় কোন দুষ্টুমি করেছিস, ইত্যাদি। অপর

দয় নাড়ী ওলট-পালট খাচ্ছে। ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি যাওয়াই সঙ্গত মনে হ'ল ; সেখানে আমার খোঁজখবর কেউ রাখে না।

খেলাতচন্দ্র স্কুল থেকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট মাইল তিন-চার হবে। একটা পথ হেঁটেই পাড়ি দিতে হ'ল।

মাঝ-পথে গোরার সঙ্গে গণ্ডগোল না বাধলে এরূপটি হ'ত না। লোকটা য যাকে পাচ্ছিল তারই উপর ছিপটি চালাচ্ছিল। টাম ভর্তি লোক, জনও কিছু বলে না। এগিয়ে গেলাম প্রতিবাদের জন্যে, এই সময় সাহেবের ার থলি থেকে টাকা প'ড়ে গেল, নীচু হয়ে কুড়ুনো শুরু করতেই পাশ ক জাপটে ধ'রে নাকের ডগা কামড়ে ধরলাম। আমার কীর্তি দেখে শর দুজন লোকও সাহেবকে চেপে ধরলে, এর ভিতর নাকের ডগা সাহেবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার মুখের ভিতর চ'লে এসেছে, তার সঙ্গে চাঁদার ও বেধড়কা চলেছে। নাক ফেলতেও পারি না, গেলাও যায় না। মুহূর্তে া প'ড়ে লোকগুলোর পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে গাম, তখনও রক্তাক্ত মুখের ভিতর জ্যান্ত মানুষের নাক গাল ফুলিয়ে থছে। দৌড়তে দৌড়তে মনে হ'ল, নাকটা স্পিরিটে রাখতে হ'লে টে পুরে ফেলা ভাল। যাদুঘরের কাছাকাছি ঘটনাটি ঘটেছিল। মাঠের শ গাছের আড়ালে কাজটা সেরে ফেললাম। চলতি ট্রাম ইতিমধ্যে াকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা চ'লে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই, গায় মুখ মুছে সদর স্ট্রীটে ঢুকে পড়লাম। তারপর এ-গলি সে-গলি ক'রে মুখো পথ ধরলাম।

যখন বাড়ি এসে পৌছলাম, তখন বেলা পাঁচটার কাছাকাছি, আমার রদার আহারের সময়। রাত্রের ভোজন এই সময় তিনি সারতেন। সময়টি ার ইষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ব্রাহ্মমুহূর্ত। তাঁর আহার্য সব নীচের তলায় ত তাঁর নিজের হেঁসেলে। সেখানে চাকরবাকর তো দূরের কথা, গরী রাঁধুনী-বামুনদেরও ঢোকবার অধিকার ছিল না। পাচকের দল ত জানত না ব'লে ঠাকুরদা তাদের অব্রাহ্মণ বলতেন।

এ বাড়িতে কেউ 'বাছা রে' ব'লে খেতে দিতে আসবে না জানতাম, কারণ মামার বাড়িতে। ঠাকুরদা আমাকে কেওড়া-বাগদীর স্তরে ফেলে ছিলেন, কারণ ছিল যথেষ্ট, সাহেবী ম্লেচ্ছাহারে আমি আসক্ত ছিলাম, তাক

উপর দেহবর্ণ ছিল কালোর দিকে। পরিবারভুক্ত প্রায় সকলেই দুধে-আলতা গোলা রঙ না হ'লেও, বেজায় ফরসা। ক্ষত্রিয়কুলে অনার্যের দেহবর্ণ আসায় ছে জাতে নেমে গিয়েছিলাম। এই সুযোগে ঠাকুরদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দি নিই :—নাম, হরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রায় আশি বৎসরের পুরাতন মানুষ জমিদারি ছিল প্রধান পেশা, দ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের প্রচার, আধাত্মিক জ্ঞা বিতরণের আড়ালে আত্মবিজ্ঞপ্তি। আশির ঘরে পা দিলেও একটিও দাঁ পড়ে নি, মাথায় চুল কাঁচায় পাকায়। বাড়া ছ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি ল ছিলেন, মাপের জুতো বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না।

ভবানীপুরে তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তি। খেলাতচন্দ্র স্কুলের হেডমাস্ট অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত মানুষ। হেডমাস্টার মশাই কেবল ছেলে পড়িয়েই সং থাকতেন, ঠাকুরদা মাস্টার পড়িয়ে ছাড়তেন। দার্শনিক কূটতত্ত্বের বিচারে জন্য বিখ্যাত পণ্ডিতদের তাঁর দ্বারস্থ হতে দেখেছি। এদিক দিয়েও আ দাদার চক্ষুশূল ছিলাম, সংস্কৃত না জানার জন্য। শুধু আমি নই, চাক বাকরদেরও অনেক সময় তিরস্কৃত হতে দেখেছি, মোট কথা পাণ্ডিত্যের বো তাঁর উপর ভর করেছিল, নিজের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে খেয়াল রাখার অব পেতেন না।

এইবার কাজের কথায় নামি। ক্ষিধের কথা। বাড়ি ঢুকে বিপদসঙ্কুল কে গুলি নিরাপদ ব'লেই মনে হ'ল। সোজা চ'লে গেলাম ঠাকুরদার খাস হেঁসেলে দিকে, পথ খোলা, কেউ কোথাও নেই। যথাস্থানে পৌঁছে দেখি, বড় হালুইকে চ্যাপটা কড়াইতে একরাশ সদ্য-প্রস্তুত ক্ষীরের পানতুয়া রাখা আছে। উনুনে পাশেই মিষ্টি তোলার বৃহৎ হাতা, তুলে নিলাম এক হাতা। ব্যস্ততায় কত গুলো উনানের ভিতর প'ড়ে গেল। বেজায় গরম খাদ্য, মুখে পোরা যায় : কলতলায় গেলাম ঠাণ্ডা ক'রে নেবার জন্যে। তখন আস্বাদের কথা ভুলে কোন প্রকারে কিছু ভিতরে পুরে দেওয়াই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রথায় এক হাতা, দু হাতা, তিন হাতা ক'রে কড়াইয়ের ভার কমতে লাগল পোড়া ক্ষীর যে বেতারে এস. ও. এস.-এর বার্তা পাঠাতে পারে—এ ক একবারও মনে আসে নি। কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ হয়। দুর্ভাগ্য পিছু নিয়েছিল, এস. ও. এস. ফলপ্রদ হয়ে উঠল।

আমি যখন কলে পানতুয়া ঠাণ্ডা করছি; সেই সময় পিসীমা হেঁসেলে ঢুকে

ৎকার ক'রে উঠলেন, সব গেল, বাবুজীর পানতুয়া সব কে তুলে নিয়েছে। ক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চোর ধরতে; আমাকে বামাল সমেত মনেই পাওয়া গেল। আমাকে দেখেই বললেন, এ যে দেবী! এমন হপূর্ণ আহ্বান জীবনে কখনও শুনি নি, কথাটা শেষ ক'রেই রাইট অ্যাবাউট র্নের সঙ্গে কুইক মার্চের অনুকরণে ঠাকুরদাকে খবর দিতে চ'লে গেলেন।

ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠল, স'রে পড়াই তখন ঘটনাটিকে লঘু করার কমাত্র পথ। বাকি পানতুয়াগুলো গলাধঃকরণ ক'রে এগুতে লাগলাম বাইরের কে। খুড়ীমার ঘর, পড়বার ঘর পার হয়ে, সিঁড়ি-বারান্দায় আসতেই নলাম, উপর থেকে ঠাকুরদা হুকুম দিচ্ছেন, উসকো পাকড় লে আও। থমকে ড়িয়ে গেলাম, দপ ক'রে মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠল, চাকরে আমার গায়ে ত দেবে! ফিরে গেলাম সরকারী হেঁসেলের দিকে। হেঁসেলের রোয়াকে শ রাশ চেলাকাঠ চারটি বৃহৎ উনুনের রসদ যোগাবার জন্ত সাজানো থাকত। কটি মোটা কাঠ বেছে নিয়ে ফিরে এলাম বারান্দায়। এই সময় হুকুম তামিলের ন্য, দাদার খাস খানসামার দল লাইনবন্দী হয়ে নীচে নামতে শুরু করেছে। ছাকাছি এসে পড়তেই কাঠ তুলে জানিয়ে দিলাম, আর এক পা এগুলেই থা ফাটবে।

এসব বিষয়ে আমি যে সত্যবদ্ধ মানুষ, তা পুরাতন ভৃত্যেরা জানত। শেষ য়সে অঙ্গহানি করার মত প্রভুভক্তি তাদের ছিল না, পিছিয়ে পড়ল। ছুটি তুন-বাহাল ছোকরা সাহস দেখানোর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। তাদের ীত বক্ষ দেখে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম, সময় থাকতে কাউকেও কাবু া করতে পারলে চাকরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হবে, এটা বাড়াবাড়ি। নিব ও নফরে তখনকার দিনে এইরূপ ঘনিষ্ঠতার প্রচলন ছিল না। সামনের ছোকরা এগিয়ে আসতে তার কব্জির উপর এক ঘা চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে তার গতি থেমে গেল। এমন একটি দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখেও পিছনের দ্বিতীয় ছোকরার বেপরোয়া ভাব কাটে নি। তাকে আর নামতে দিলাম না, নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার মাথার উপরই দিলাম বাকি কর্তব্যের সমাধা ক'রে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কপাল চোখ নাক রক্তে চুপচুপে হয়ে উঠল। বাড়িতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। লোক ছুটল বাবুজীকে খবর দিতে।

তাঁকে রাত আটটার আগে যে পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত

ছিলাম। মামার সঙ্গে রেসে গিয়েছিলেন, রেসে হার-জিত যাই হোক, ব
ফিরে যে তর্ক চলবে, তাতে দশটা এগারোটা কাবার হয়ে যাওয়া কিছু
বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়তে পারলে রাতটা অ
নির্বিঘ্নে কেটে যাবে। কালকের কথা কাল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা ঘামা
আমার ধর্মের বাইরে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি, এ
সময় দেখি, উপর থেকে স্বয়ং পিসীমা নেমে আসছেন—করালমূর্তি, মাঝ
থেকেই হুকুম দিলেন, দাঁড়া। কি উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে বললেন, বোঝা গেল
নীচে এসেই খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে পড়ার ঘরের দিকে টানতে লাগলে
পিসীমার উপর চেলাকাঠ চালানো যায় না, পিছু নিতে হ'ল। ঘরের ভি
ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পর বাইরে গোথ
সাপের ছোবল-মারার মত আওয়াজ উঠতে লাগল। জানলার ক
এসে দেখি, পিসীমা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছেন। কাজ হাঁসি
খবর ঠাকুরদাকে জানানো দরকার ছিল, হাঁপানি সত্ত্বেও উপরে উ
গেলেন।

ঘরে তখন আলো-আঁধারি জমকে বসেছে। দাঁড়িয়ে ছিলাম জানল
পাশে। ভাবতে লাগলাম, এত দেরিতেও বাড়ি না ফিরলে, বাবুজী যে কাণ্ড
খাকুন অস্থির হয়ে উঠবেন, চারধারে লোক ছোটাবেন আমাকে খুঁজতে, হয়
নিজেও বেরিয়ে পড়তে পারেন। বাবুজীর উৎকণ্ঠিত মুখ চোখের সা
দেখছিলাম। যে কোন প্রকারে হোক, এখান থেকে বেরুনো দরকার।
ইঞ্চি গোল লোহার গরাদে চাড় দিতে লাগলাম, তিন চার বার চেষ্টা করতে
গরাদ বেঁকে গেল, পথ খোলা, বেরিয়ে পড়লাম রাস্তার দিকে। ঠিক সময়
মামার বাড়িতে পৌঁছতে না পারলেও রাত্রের মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক
নিতে পেরেছিলাম।

পরের দিন সকালেই বাবুজী আমাকে ডেকে পাঠালেন। সামনে এ
দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কি কাণ্ড ক'রে এসেছিস? কাজ নে
কর্ম নেই, একটা মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিলি? কথাটা শেষ হবার আগে
দেখলাম, খেলাত স্কুলের ছাপ-মারা খাম বাবুজীর হাতে। ওর ভিতর
থাকতে পারে অনুমান করা শক্ত নয়, বিপদের উপর বিপদ ঘনিয়ে উঠছি
একটা যা হোক কিছু হয়ে গেলে বাঁচি, বাবুজী চিঠিটা মোচড়াতে মোচড়া

ধীরে বললেন, এ রকম ছেলে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল, তোমার পড়াও আর চলবে না, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিপদের পিছনে এইরূপ একটি আশীর্বাণী লুকিয়ে ছিল জানতাম না, ন্দের উচ্ছ্বাসে আপন মনে বলেছিলাম, ভালই হয়েছে। বাবুজী কথাটা লেন, তারপর আমাকে একলা ফেলে চ'লে গেলেন।

দশ-বারো দিন কথা বন্ধ, বাবুজী ভুলেও আমাকে কাছে ডাকেন না। বেশি এইরূপ ব্যবহার সহ্য করতে পারলাম না, অন্য কোন স্কুলে ভর্তি ক'রে ার জন্যে নিজেই আবেদন জানালাম। ভদ্রলোকের মান রক্ষা হ'ল, ছেলের তি দেখে বাবুজী হৃষ্টচিত্ত হয়ে উঠলেন।

ভবানীপুরে সাউথ সুবারবান স্কুলে ভর্তি হলাম। করকরে নতুন বই পেয়ে বিক পড়াশুনার ঝোঁক চেপে গেল। ইতিহাস ও ইংরেজীতে ভাল সদের সঙ্গে টক্কর চলল, কিন্তু অঙ্কের মাস্টার আমাকে কুনজরে দেখেছিলেন, তেই শূন্যের বেশি দিতেন না। ভিন্ন ক্লাসে পরীক্ষক বদলাল, কিন্তু শূন্য ার কপালে ঠিক টিকে গেল। প্রতি বৎসর অঙ্কে ফেল মারতাম, তথাপি -প্রোমোশন জুটে যেত অন্য বিষয় ভাল করতাম ব'লে।

শেষ পর্যন্ত ক্লাসে ওঠা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল। পড়ার আর শেষ নেই। া ও সেকেণ্ড ধ'রে জ্ঞান-চর্চায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। স্কুল-পালানো অনেক ছেড়ে দিয়েছিলাম, পুনরায় নেশা ফিরে আসতে লাগল। সৎ উদ্দেশ্যে াগ যেন আমার জন্যে ওত পেতে থাকত। স্কুলের পিছনেই প'ড়ো বাগানে র খুঁজে পেলাম। মজার জায়গা, চারধারে ফল-ভর্তি টোপাকুলের গাছ, দেরই ছায়ায় ছোট্ট একটি ডোবা। কুল খাওয়া, মাছ ধরা এবং হেলে সাপ ছড়ে মারা,—দিন কতক আরামে চলল। কিন্তু একই স্থানে আটক পড়ায় উসখুস করতে লাগল নতুন কাজের জন্য।

স্থান পরিবর্তনের সুবিধা পেলাম, সার্কাস পার্টিতে। গৃহস্থ চালের ব্যাপার, া আনার বেশি টিকিটের দাম নেই। অধিকারীর সঙ্গে দেখা ক'রে জানালাম, মি সাইকেলের খেলা দেখাতে পারি। পরীক্ষায় পাস হতে ক্লাউনের খেলা খাবার ভার পেলাম, মাইনে ভালই, মাসে তিরিশ টাকা। সার্কাসে খেলা খিয়ে যখন নাম কিনছি, বাহবার তাড়ায় বুক ফুলিয়ে চলি, তখন ক্লাসের শাল বেঞ্চে আমার অনুপস্থিতির সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। ক্লাউনের খেলায়

একদিন ধরা প'ড়ে গেলাম। ক্লাসময় র'টে গেল, আমি সার্কাস তারপরই পাসের চাহিদা এমনই বেড়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত নাজেহাল সার্কাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

স্কুলে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একদিন তর্কের মাঝে একজন ব'লে বসল, ভারি তো বুক ফুলিয়ে চলিস, অপশনাল ক্লাসের ভাঙতে পারিস? সকলেই জানত, গায়ের জোর বা সাহস দেখানোর পেলে সহজে পিছপাও হতাম না। আসল কথা, কোণের বেঞ্চি আমার ঝিমিয়ে এসেছিল, একটা নতুন কিছু না হ'লে চলছিল না।

ঠিক হয়ে গেল, তিনতলার জ্ঞান মাস্টারের ঘর হাঁ করিয়ে রাখতে তিনি আবার দরজা বন্ধ ক'রে ছেলে পড়াতেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে একটি সম্মোহন-শক্তি ছিল যে, ভাল পড়ুয়ারাও কাট-ছাঁট টীকার সংস্কৃ আসক্ত হয়ে পড়ত। জ্ঞানবাবুর ক্লাসের ছেলেরা যে কখনও ফেল কে এ খ্যাতি সর্বজ্ঞাত। এমনই একটি জাঁদরেল মাস্টারের ক্লাসে ডাকাতির পড়ল আমার উপর।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই সদলবলে উপরে উঠে গেলাম। মহড়ায় ম ঘাঁটি আগলাবার জন্যে বিশ্বস্ত ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেল, কিছুমাত্র বিপদের সম্ভ থাকলেই হাত-ফিরতি খবর কাজের জায়গায় এসে পৌঁছবে।

মোটা কব্জাওয়ালা প্রকাণ্ড দরজা, কুস্তির প্যাঁচে ধ'রে পায়ে ঠেকার চাড় দিতে লাগলাম। অল্পক্ষণের ভিতরই ফল পাওয়া গেল, বুক চি পিছনের ভক্তদের দিকে ফিরতে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বুঝলাম, বিনা-নোটিসে কাছে এসে পড়েছে, কোন দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে নীচে আসছিলাম। মাঝপথে সাক্ষাৎ যম শ্যামবাবুর (সহকারী প্রধান-শি সঙ্গে প্রায় থাকা লোগ যাবার যোগাড়। টিফিনের সময় মাস্টারও ক করে, শ্যামবাবু বেরুলেন রেঁদে। আমার চলার ভঙ্গীতে নিশ্চয় সন্দেহ কিছু ছিল, জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, এই রকম ক'রে নামছ কেন? ভ্যাবা খেয়ে গিয়েছিলাম, উত্তরটা গুছিয়ে দিতে পারলাম না, ব'লে ফেললাম রকম ক'রেই তো নাবি। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে তখনকার মত দিলেন বটে, কিন্তু ঠিক বুঝলাম, ও-ছাড়া ছাড়াই নয়, চাহনির ভিতর কি অভিসন্ধি র'য়ে গিয়েছে।

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হতেই দেখি, অঙ্কশাস্ত্রের বিখ্যাত মাস্টার শ্যাম বোস আমাদের সংস্কৃত ক্লাসে ঢুকছেন। জ্ঞানবাবু হ'লে ট্রেসপাসের নালিশ ঠুকে দিতেন, আমাদের পণ্ডিত মশাই একেবারে নিরীহ ব্যক্তি, মঞ্চ থেকে নেমে এসে কাঁচুমাচু ক'রে দাঁড়ালেন। যেন তিনিই একটা কিছু দোষ ক'রে ফেলছেন। শ্যামবাবু ধীর পদবিক্ষেপে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সামনে এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, হিষ্ট্রির ক্লাসের দরজা ভাঙল কে? অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, খবরটি যেন এমনই অসম্ভব যে, স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করবার উপায় নেই। শ্যামবাবু উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে ভোলবার পাত্র নন। একটি জবরদস্ত 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ ক'রে আমাকে লাইব্রেরিতে আসতে বললেন।

লাইব্রেরিতে মাস্টাররা গিজ্‌গিজ করছেন। এই ঘণ্টায় ছেলেরা আবার বই নিতে আসে। সকলের সামনেই শ্যামবাবু বেয়ারাকে বেত নিয়ে আসতে বললেন।

খোকার দলে ফেলার মত বয়স তখন আমার ছিল না। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। ভিড়ের মাঝে শাসনের ব্যবস্থায় শ্যামবাবুকে অভদ্র ভাবতে কিছুমাত্র বাধা এল না।

বেত হাতে আসতেই দেখি, তাঁর মুখের রেখাগুলো ক্ষণিকের মধ্যে শীতের চামড়ার মত হয়ে গেল। আমাকে কোন প্রশ্ন না ক'রেই হাত পাততে বললেন। বিনা আপত্তিতে আজ্ঞা পালন করলাম। বেত কশানোকে শ্যামবাবু ইন আর্টের পর্যায়ে তুলে ফেলেছিলেন, সাহেবী চালে ওস্তাদ মুষ্টিযোদ্ধার মত ঊর্ধ্বে চার-পাঁচ ঘা একই জায়গায় বসিয়ে দিলেন। তারপর জানালেন, ওই জায়গা তুই ছাড়া স্কুলে আর কেউ ভাঙতে পারে না। শাস্তিদানের এইরূপ কৌশল মিডিভ্যাল যুগেও প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ। ওস্তাদী মারের কেরামতিতে হাতের তালু কেটে গিয়েছে, রক্তের ধারায় মেঝে লাল হয়ে উঠেছে, আমি স্থির হয়ে হাত পেতেই দাঁড়িয়ে আছি। কিছুমাত্র কাতরধ্বনি না শুনে শ্যামবাবুও কেমনতর হয়ে গিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর মারবেন? ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। আস্তে না' ব'লে, বেয়ারাকে ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম আনতে বললেন। মহান কৃপা ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁর আদেশের উপর রীতিমত গলা চড়িয়ে

বেয়ারাকে হুকুম করলাম, আমার বইগুলো ওপর থেকে নিয়ে আসবার জন্যে বকশিশখোর বেয়ারা কার আদেশ পালন করবে, ঠিক করতে পারছিল হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছিল। কথা না শুনলে হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া আমার অভ্যাস আছে, সে খবর সে রাখত।

লাইব্রেরিতে সকলে তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। শ্যামবাবুর আদেশ ওপর হুকুম চালনায় অশুভ ঘটনার আশঙ্কায় সকলেই আতঙ্কিত। শ্যাম তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসেছেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, কি লেগেছে? হেসে উত্তর দিলাম, আপনার কৃপায় কয়েদখানা থেকে অব্যাহ পেলাম। আর বেশি কিছু বলবার ছিল না, নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরি পড়লাম।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধু

শক্তি প্রার্থনা

অন্ত নাহিক—নাহিক অন্ত যন্ত্রণার,
দুর্বহ লাগে অতি অথর্ব জীবন-ভার,
জবাব চাহিছে আমার নিকট লক্ষ দিন,
দিনে দিনে বাড়ে অতি দুর্বহ অন্নঋণ।
ক্লেদশয্যায় লজ্জিত হয় জীবনবোধ,
সমস্ত ঋণ করিতে হইবে—হইবে শোধ।
অক্ষি খুলিতে আজিকে সাহস নাহি যে হয়,
অপকীর্তির আক্ষর লেখা বিশ্বময়।
ম'রে যেতে চায় জীবনানন্দ ছন্দময়,
লক্ষ লোকের দীর্ঘশ্বাস মোর মলয়।
চিত্তে চেতনা চাবুক চালায় বারংবার,
জ'মে ওঠে গ্লানি নিত্য আত্মবঞ্চনার,
লক্ষ্যবিহীন লাগিছে চিত্তে লক্ষ ভার—
প্রতি মুহূর্ত করিছে তিক্ত বিষস্রাব।
বুকে এসে বাজে ব্যঙ্গমুখর বিশ্বলোক,

বলে, এ ক্লিন্ন ছলনা কুয়াশা ছিন্ন হোক।
অসাড় সত্তা নীরবে মানিছে এ পরাজয়,
শম্বুক সম চাহে যে হইতে সে অক্ষয়।
হে উদ্দীপ্ত রক্তনেত্র বজ্রধর,
কাঙালের মত প্রার্থনা করি শক্তি দাও
যৌবন মোরে লাঞ্ছনা করে নিরন্তর
অতি নির্মম বিদ্রূপ করে জীবনটাও।
ধ্বস্তচেতন ভীরু দুর্বল সত্তা মোর,
কিছুতে ভাঙিতে পারে না মিথ্যা কুয়াশা-ডোর,
রুদ্ধ গুহায় ফুঁসিছে চিত্ত ক্ষুব্ধকাম
অশ্রু-আসার হতেছে নিত্য অবিশ্রাম।
উৎকেন্দ্রিত হতে পারি সেই শক্তি কই?
আত্মরতির গ্লানি হতে মোর মুক্তি কই?
সত্য বরণ করিতে চিত্তে জাগিছে ত্রাস,
ক্লৈব্য করাল করেছে কঠিন সর্বনাশ,
হর্ষ আকুল হাওয়ায় স্পর্শহীন দিন
তমিস্রলোকে শূন্যগর্ভে হয়েছে লীন।
গজমতি লোক ভেঙেছে মিনার ধসেছে আজ,
ব্যাজস্তুতির সুরে হাওয়া বয় বিশ্বমাঝ।
কান্না, কান্না, তার তরে শুধু কান্না হায়,
ভেঙে পড়ে মন অন্তবিহীন যন্ত্রণায়।
হে উদ্দীপ্ত রক্তনেত্র বজ্রধর,
বারে বারে শুধু প্রার্থনা করি শক্তি দাও,
যৌবন মোরে লাঞ্ছনা করে নিরন্তর,
আমায় এবার সত্যসুদ্ধ মুক্তি দাও।
সহে নাকো আর নিত্য আত্মসঙ্কোচন,
কণায় কণায় জাগাও চণ্ড বিস্ফোরণ,
চুরমার কর কুয়াশাগ্লানির অন্ধকার,
সাহসে সমুখে দাঁড়াইতে পারি প্রাপ্যটার।

তা যদি না পারি তা হ'লে আমায় মৃত্যু দাও—
চরম মৃত্যু—পরম মৃত্যু—চিহ্নহীন।
সস্তারে মোর শূন্য মূল্যে কিনিয়া নাও,
পরশ আমার নাহি বয় যেন আগামী দিন।
নিদারুণ ভয় করিতেছে গ্রাস আজ আমায়,
ভেঙে পড়ে মন প্রচণ্ড এই প্রার্থনায়।
তবুও আমার তবুও আজিকে সত্য চাই
রজ্জুর মত ধরিয়াছে চিপে বিশ্বটাই।
হায় রে! কি লাভ হৃদয়বিলাসী প্রার্থনায়,
সান্ত্বনা খোঁজা সুলভ আত্মবঞ্চনায়।
নিষ্ঠুর হয়ে আজি উল্লাসে সত্যটাই—
বক্ষে আমার নাই নাই হায় শক্তি নাই।
তাই বার বার প্রার্থনা করি বজ্রধর,
আমারে তোমার দারুণ দহন-বজ্র দাও,
ভেঙে ফেলি এই নগ্ন লোভের সূত্র সব
নয় ভেঙে দিই অর্থবিহীন জীবনটাও।

অসিতকুমার

ডানা

(৪০০ পৃষ্ঠার পর)

ডানা বললে, আমার আর কিছু বলবার নেই তা হ'লে। আপনাদের এ অকৃত্রিম ভদ্রতার মূল্য দিতে যাওয়া বর্বরতা, কিন্তু কি ক'রে যে এর প্রতিদান দেব বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ ডানা থেমে গেল। তার নীচের ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল যেন কিন্তু তা এত ঈষৎ যে, কারও চোখে পড়ল না।

কবি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। জীবনটা যে স্বপ্ন, যা দেখছি সব মায়া—এ ধরনের কোনও বৈদান্তিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধ'রে তিনি সান্ত্ব পাবার চেষ্টা করছিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখটাকেই তিনি উপভোগ করবা চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—

মলয় হাওয়া চলিয়া গেল
আসিল ছুটে আঁধি
তবু যে লাগে ভালো,
তোমারি তরে বিজন ঘরে
বসিয়া একা কাঁদি
জ্বালি আশার আলো।
কাননে পথে মেতেছে ঝড় কি গরজন তুলি
শিহরি ভাবি বুকেতে যারে ধরিয়াছিল ধূলি
মুছিয়া গেল বুঝি রে সেই চরণরেখাগুলি
ঘনাল ঘন কালো,
তবুও লাগে ভালো।

ডানা থেমে যেতেই তাঁর ঘোরটা কেটে গেল যেন সহসা। ডানার দিকে য়ে তিনি বললেন, আপনি স্কুলে যে চাকরি নেবেন কথা হচ্ছিল, তার কি ন?

সেটা না নেওয়াই ঠিক করলাম। মাস্টারি তো কখনও করি নি, ও ামি পারব না।

বিবর্ণমুখে কবি উত্তর দিলেন, ও। যা বলছেন তা এক হিসেবে অবশ্য , কিন্তু আবার আরম্ভ করলে দেখতেন হয়তো অন্যরকম।

ও আমার ভালও লাগে না।

চলুন, আমরা ভিতরে যাই।—রত্নপ্রভা ডানার দিকে চেয়ে বললেন। রপর কবির দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের আরও চা চাই নিশ্চয়?

বৈজ্ঞানিক বই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, চা নয়, কফি।

আচ্ছা।

ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রত্নপ্রভা ভিতরে চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা পাতলা গোছের বই শেল্‌ফ থেকে বার ক'রে সেটার া ঝাড়লেন।

টার্নবুলের বইখানা পেয়েছি। পাখির গান আর ভাষা নিয়ে অনেক লোচনা করেছেন ভদ্রলোক। পাখিরা কেন গান গায়, তার কারণ নির্ণয়

করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর মতে বসন্তঋতুই পাখিদের গান গাইবা একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় দিয়েছেন প্রণয়লীলা—মানে Nuptial Display.।

তাড়াতাড়ি বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

এই যে, তৃতীয় কারণ দিচ্ছেন Rivalry—মানে, প্রতিযোগিতা Defiance, অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি ভাব এবং Assertion of Rights—মানে নিজের অধিকার জাহির করা। আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে, Joy and hig spirits—মানে, আনন্দ স্ফূর্তি। আমরা এখনই যে দোয়েলটাকে লক্ষ্য করলা এর সবগুলোই তার মধ্যে পাওয়া গেল, কি বলেন? কিন্তু দাঁড়ান—

আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

এই যে।

কি?

পাখির ডাককে ইনি বারো দফায় ভাগ করেছেন। দেখা যাক, দোয়েলে মধ্যে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না। Song Proper—মানে, রীতিমত গা শুনেছি; Little Song—মানে, ছোটখাট গান, শুনেছি; Phrases—মা এমনই ডাক, শুনেছি; Chirrups, নিজেদের মধ্যে আলাপ, শুনি নি; Ca Notes—আহ্বান, শুনি নি; Flight Notes—মানে ওড়বার ডাক, শুনি নি Alarm Notes—ভয়ের ডাক, শুনি নি; Love Notes—প্রণয়-সম্ভাষ শুনেছি; Imprecations—অভিশাপ, শুনেছি; Cradle Notes—বাচ্চাদে সঙ্গে ওরা যে সব কথা বলে, শুনি নি; Grief Notes—ব্যথা পেলে যে ডা ডাকে, বোধ হয় শুনি নি। Drumming of woodpecker—এ অ আলাদা জিনিস—

কবি যদিও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন একটু, তবু জিজ্ঞেস করলেন, এত র ডাক আছে? একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন তো। প্রথমটা কি হ'ল?

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

প্রথমটা হ'ল Song Proper—মানে, পুরোদস্তুর পাবলিক গান। দো যে গানটা কোনও উঁচু ডালে ব'সে একটানা গেয়ে যায়, তার ইচ্ছেটা, যেন সব এ গান শুনুক। Little Song হচ্ছে ওরই ছোট সংস্করণ। আর Chirru হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, চড়ুই বা ছাতারে যা ক্রমাগত করে

য়েলের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করি নি কখনও। দোয়েল গম্ভীর পাখি, বাজে করক করতে শুনি নি। Phrases—মানে, এমনই একটানা ডাক, কাক যেমন া-কা করে বা ঘুঘু যেমন একটানা ডেকে যায়, দোয়েলের শিসটা এই ধরনের গতে পারেন। Call Notes হচ্ছে যখন একটা পাখি আর একটা পাখিকে াকে কিংবা একদল পাখি যখন আর একদল পাখিকে ডাকে, তখন সেই ডাককে all Note বলে। একদল বক বা হাঁস যখন উড়ে যায়, দেখবেন, একটা বা টা ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। দোয়েলের শিসটাকে Call Noteও বলা াতে পারে। শিস দিয়ে অনেক সময় সঙ্গিনীকে ডাকে ওরা, আলাদা কোনও all Note শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না। Flight Notes হচ্ছে ঠিক ড়বার সময় অনেক পাখি একটা ডাক দিয়ে তবে ওড়ে। শালিক পিং ক'রে কটা শব্দ করে, কোকিল খুব তাড়াতাড়ি কু-কু-কু-কু ক'রে উড়ে যায়। দোয়েল শেষে ওড়ে, ওর, Flight Note শুনি নি, Alarm Noteও শুনি নি। য় পেলে কিংবা উত্তেজিত হ'লে Alarm Note শোনা যায়। সাপ বা বেড়াল খলে শালিকরা যে ভাবে ডাকে, তাই হচ্ছে Alarm Note। Love otes মানে ভালবাসার ডাক; দোয়েলের Love Notes ভারি মিষ্টি। ানাব একদিন আপনাকে। Imprecation হচ্ছে গালাগালি, ক্রিকেটের খে প্রায় শুনবেন। দোয়েলরা একটা মৃদু কেরর্‌র্‌ গোছের শব্দ করে। radle Notes, শালিক-চড়ুইয়ের শোনা যায়, যখন তারা বাচ্চাদের-খাওয়ায়। য়েলের শুনি নি, এবার শুনতে হবে, বুঝলেন। আমার গোয়াল আর াস্তাবলের কার্নিসে ওরা বোধ হয় বাসা করবে, তখন শোনা যাবে। Grief otes দোয়েলের কখনও শুনি নি, তবে শীতের সময় ওরা যে করুণ ডাক াকে, তাকে Grief Notes বলা যায়। সাধারণত কষ্ট পেলেই—

মুন্সিকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

হুজুর, পাখিগুলো বড্ড বেশি ডাকছে আজ সকাল থেকে।

তাই না কি! খেতে দিয়েছিলি তো?

হাঁ হুজুর। খাবার তো আজকাল কষ্ট নেই। মল্লিকবাবু আজকাল রোজ নেক ফড়িং পাঠিয়ে দেন।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ পাখিগুলো?

সেই রেডস্টার্টগুলো, যাদের নাম দিয়েছেন আপনি ফুলকি। এই

সময় ওরা ফিরে যায় কিনা, তাই ছটফট করছে বোধ হয়। চলুন, যে গিয়ে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির সরঞ্জাম নিয়ে এক চাকর এসে হাজির হ'ল।

কফিটা খেয়েই যাওয়া যাক তা হ'লে, কি বলেন? মুন্সি, তুই এ আমরা আসছি।

কবির কিছুই ভাল লাগছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি কফির এক পেয়ালা তুলে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক কফি খেতে খেতে আড়চোখে কবির দিকে একবার চে দুষ্টু ছেলের মত একটু হেসে বললেন, আজ কিন্তু আবার এমন একটা ক করতে হবে, যা হয়তো আপনার মনঃপূত হবে না ঠিক।

কি?

আরও কয়েকটা রেডস্টার্ট ডিসেক্ট করতে হবে। দেখতে হবে, ও ওভারি (ovary) আর টেস্‌টিস্‌(testes)গুলোর অবস্থা কি এখন।

কবি কফিতে চুমুক লাগিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হ না, রত্নপ্রভা এসে পড়লেন। রত্নপ্রভা এসে এমন একটা কথা বললেন, অপ্রত্যাশিত, যা শোনামাত্র কবির অসাড় মন সজাগ হয়ে উঠল নিমেষে।

রত্নপ্রভা বললেন, আচ্ছা, তুমি তো একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জ বিজ্ঞাপন দিয়েছ, তোমার ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে, তোমার প্রবন্ধ টা করবার জন্যে। এঁকেই সেই কাজটা দাও না। উনি বি. এ. পাস, শর্টহ টাইপ-রাইটিং জানেন। উনি মাস্টারি করতে চান না, এই ধরনের ক খুঁজতেই উনি কলকাতা যাচ্ছেন।

বেশ তো। উনি যদি থাকতে রাজী হন, আমার কিছু আপত্তি নেই।

উনি রাজী আছেন। তবে উনি আলাদা থাকতে চাইছেন, এক বাড়ি থাকতে একটু ইতস্তত করছেন। রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে একটা হাসির আ ফুটে উঠল।

যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে পারেন। আমার কাজের সময় পে হ'ল।

অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কবি ব'লে উঠলেন, সে তো চমৎকার হবে।

চলুন, রেডস্টার্টগুলো দেখি গিয়ে, ডাকছে কেন। বেরিয়ে পড়লেন। কবি াৎসাহে বললেন, দেখুন, যদিও প্রথম প্রথম আপনার ওই ডিসেক্‌শন াপারটায় আমার খুব খারাপ লাগত, এখন কিন্তু ভেবে দেখছি, ও রকম ারাপ লাগার কোনও মানে নেই। যা কর্তব্য তা করতে হবে।

খারাপ-লাগা ভাল-লাগাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম ামারও খারাপ লাগত, এখন কিন্তু বেশ লাগে।

ঠিক।

দুজনে হন হন ক'রে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

রোগ

কানাকড়ি দাম নেই, এ জীবন তবু ভাল লাগে,
সমুদ্র করে না মধু, মধু নয় পৃথিবীর ধূলি,
অমৃতের পুত্রদের শিয়রে অমোঘ মৃত্যু জাগে,
সব জানি, তবু আমি মুহূর্তে মুহূর্তে সব ভুলি।

সত্যকে দেখি নি চোখে, যে দেখেছে দেখি নাই তাকে—
দর্শনের কাঁটাতার জীবনের ফুলের বাগানে;
দ্বারপাল ঋষিবৃন্দ পাহারায় পালা ক'রে হাঁকে,
'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

অনেক সুন্দর মুখ আর্ষবাক্যে হয়েছে পাষাণ,
অনেক প্রাণের তৃষ্ণা শেষ হ'ল মৃগতৃষ্ণিকায়;
জীবনের মাঝে আছে জীবনের মুক্তির আসান,
কী আশায় ঊর্ধ্ববাহু মহর্ষিরা আকাশে তাকায়।

সাগরে জন্মলে রবে পৃথিবীর পুত্রেরা—মানুষ
অনন্তের অন্ধকারে ফেটে যাবে নিষ্ফল ফানুষ।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আবোল-তাবোল

শুষ্কং কাষ্ঠং

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন প্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবি বররুচি ও উদীয়মান নব্য-কবি কালিদাস।

ভবভূতি ভারি রাশভারী লোক ছিলেন, এদের মত বাজারে বাজারে বেড়াতেন না। দণ্ডকারণ্যের গুরুগম্ভীর বর্ণনা শুনে মহারাজ পর্যন্ত ভয় ক'রে চলতেন।

পথে যেতে যেতে সামনে দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড একখণ্ড শুকনো ক মহারাজের কাব্যপিপাসা জেগে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, কিমে অর্থাৎ, পদ্য ক'রে বল, ওটা কি?

অনুষ্টুপের একটি চরণ রচনা ক'রে বররুচি বললেন, শুষ্কং ক তিষ্ঠত্যগ্রে।

মহারাজ মুচকে হেসে কালিদাসের পানে চাইলেন, সেকালে 'স্মিতহাস্য' বলত। কালিদাস বললেন, নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি। ছ আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শার্দূলবিক্রীড়িত। বাংলা ছন্দে তারে এক চাকার সাইকেল চড়া, শূন্যে ঝোলা, ঘোড়দৌড় এবং ঘোড়ার পিঠে চড়া প্রভৃতি সব রকমের কশরৎ থাকলেও বাঘের খেলা নাই। অবিলম্বে অভাব-পূরণ করা উচিত। আগেরটিও অনুষ্টুপ্ কিনা ছন্দঃশাস্ত্র না ঠিক ক'রে বলতে পারি না।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্য গলা থেকে মুক্তার মালা খুলে কালিদাসের পরিয়ে দিলেন। সেকালের রাজারা এক ডজন ক'রে মুক্তার মালা সব নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, কখন কি কাজে লাগে। বিদ্যোৎসাহী

আমার মনে হয়, বিক্রমাদিত্য নব্য-কবির প্রতি অন্ধ স্নেহের বশবর্তী বৃদ্ধ কবির প্রতি অবিচার করেছিলেন। ললিতলবঙ্গলতা নয়, প'ড়ে ছিল খানা শুকনো কাঠ—অমসৃণ, কদাকৃতি। ওর যোগ্য কবিতা ছিল ঐ কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'। যেমন বিষয়, তেমনই তার কাঠখোট্টাই ভাষা। বররুচি রাজার খাতিরে তিন-তিনটে অনুপ্রাস যোজনা করেছিলেন।

নীরস তরুবর বলতে বড় জোর একটা মস্ত বড় মরা গাছ বুঝায়। মানে সম্মুখে, মেনে নিলাম। স্বর্ণ, রৌপ্য, এমন কি কাঁচ প্রভৃতি

র্থ ভাতি—'আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশি' সূর্যকিরণোজ্জ্বল সমুদ্রতীরের
জ্জ্বল বর্ণনা, স্বীকার করি; কিন্তু রোদে পুড়লে কাঠের রঙ আরও কালো
, চকচক করা তো দূরের কথা। লালিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কালিদাস
বয়-বস্তুকে বিকৃত করেছিলেন।

আমি হ'লে, উজ্জয়িনীর বাজার থেকে বুড়ো বররুচিকে দু আনার বাদাম-
াজা আর কালিদাসকে দু পয়সার কাঁচা কদমা কিনে দিতাম। তাতে
ররুচির রুচি খুলত, কালিদাসের হ'ত বস্তুজ্ঞান।

প্রগতি

যৌবনের জোয়ার ক'মে এলেই স্বাস্থ্য নিয়ে একটা ম্যানিয়া জন্মে সবারই
ন। বন্ধুরও তাই হয়েছিল।

তিনি যখন মটরশুঁটি দেওয়া বাঁধাকপির তরকারি খেতেন, তার আস্বাদের
থা তাঁর মনেই আসত না; শুধু ভাবতেন, কি খেলেন, ভিটামিন-এ, না,
টামিন-বি?

শাঁখআলুর রস নিংড়ে চুমুক দিতেই ভিটামিন-বি'র কার্যকলাপ স্মরণ
রে পুলকিত হতেন। চিবিয়ে খাওয়ার উপায় ছিল না।

কমলালেবু, ডাবের জল আর টম্যাটো খাবার সময় মানসনয়নে ভিটামিন-
'র দিব্যমূর্তি ধ্যান করতেন।

বিস্বাদ এবং অখাদ্য কুঁড়া-মাখা চালের ভাত ভিটামিনের খাতিরে অম্লান-
নে গলাধঃ করতেন। এমন কি, কড্‌লিভার অয়েলের দুর্গন্ধও তাঁর নাকে
ত না।

কিন্তু এত ক'রেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। অথচ,
ই প্রসাদভোজী উৎকলীয় পাচকের নধরকান্তি তাঁর মনে ঈর্ষার উদ্রেক
ত।

সহজ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্য চাই যৌবনের ক্ষুধা, রসনাতৃপ্তির উগ্র
না। ভিটামিন নিয়ে যিনি যত বেশি মাথা ঘামাবেন, তাঁর স্বাস্থ্য সেই
মাণে ক্ষুণ্ণ হবে।

মনে হয়, প্রগতি-সম্বন্ধে যে সাহিত্য যত অধিক সজাগ, তার গতি তত
। চাই যৌবন, চাই ক্ষুধা, চাই তৃপ্তি, তবেই সে পাবে স্বাস্থ্য, সুন্দর
র সরল গতি।

ব্যস্ত কেন ?—শুক্‌নো পাতা ঝরবেই,
নূতনকে জায়গা দিতে পুরাতন সে সরবেই।

জনমত

পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একখানা হারানো খাতা খুঁজে পেল যৌবনে লেখা গান, কবিতা, গল্প—এই সব। কতকগুলো তার ভাল লা পাঠিয়ে দিলাম ভিন্ন ভিন্ন মাসিক-পত্রিকায়।

মাসিক-পত্রিকার নিয়ম এই যে, ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনী রচনা ফেরত পাঠানো হয় না। ভাবলাম, আমি তো আর ডাকটিকিট দি না, অতএব পাত্রপক্ষের যদি মেয়ে পছন্দ না হয়, লজ্জার কোন কারণ থা না।

লেখাগুলোর কতক করলে নিরুদ্দেশ যাত্রা, বাকি কয়েকটা আসরে ঠি জায়গা পেলে।

আমার দুর্ভাগ্য, অনেক সম্পাদক ভদ্রতা ক'রে ডাকটিকিট না থাকা স কতকগুলি কবিতা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। দুঃখপ্রকাশ ক'রে চিঠিও দিয়ে একটা। ভরসা দিয়েছেন, আমার (বর্তমানে ৬০-এর কাছাকাছি) ভবি উজ্জ্বল, তবে ভবিষ্যতে তাঁর পত্রিকায় কবিতা পাঠাবার আগে, আমি একটা প্রাথমিক জনমত সংগ্রহ করি।

সম্পাদক দুঃখিত হ'লেও, আমার কোন দুঃখের কারণ ছিল না; বেশ ম আছে, কবিতাগুলি ডাকবাক্সে ফেলেই আমি অনুতপ্ত হয়েছিলাম।

আমার আসল দুঃখের কথাটা মন দিয়ে শুনুন—

ডাকপিয়ন যখন প্যাকেটটি দিয়ে যায়, আমি তখন বাড়িতে ছিলাম ন পড়ে তো পড়ে, অমনোনীত কবিতা সব একেবারে নাতি-নাতনীদের হাতে ঘরে ফিরে আসতেই তারা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের নিজের ক একটি উৎকৃষ্ট কবিতা আওড়াতে লাগল—

পদ্য লেখে লুকিয়ে গো,
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

ব'সে পড়লাম। সবচেয়ে ছোট নাতনীটি আমার কোলে ব'সে আমা সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সস্নেহ হাস্যে বললে, ঘাবে লো।

ক্রমে তাদের তৈরি ছড়াটা পাড়ায় পাড়ায় র'টে গেল। আমাকে দেখে

লেই সকল পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়ায় আর সমস্বরে ওটা আউড়ে য়।

বিস্কুট লেবেনচুস ঘুষ দিলাম। কিন্তু ফল হ'ল উল্‌টো। ক্রমেই আমার বিষয় সকল পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল।

এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে, আমার পিছনে জনমত নাই।

শ্রীভোলা সেন

এদেশ-ওদেশ

পশ্চিম-বাংলার জেলা। জেলার শেষপ্রান্তে গিয়ে মোটর-বাস থামে, আরম্ভ হয় রেল-লাইন—পাকিস্তানে। রেল-লাইনের পাশে খোয়া-বাঁধানো রাস্তার শেষে মোড় ঘুরতেই পশ্চিম-বাংলার পিচ-বাঁধানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি মোটর-বাস, যাত্রী নিয়ে সদরে যাতায়াত করে। রেল-লাইন বরাবর কিছুদূর পর্যন্ত এপারে ভারত-ডোমিনিয়ন, অধিকাংশ লোক বলে হিন্দুস্থান; ওপারে পাকিস্তান। এপারের বাড়ি, ঘর-দোর, চালের কলকে ঘেঁষে রেল-সীমানার তার চ'লে গিয়েছে। এপার ওপারের ছেলেরা তারের বেড়ার ওপর দিয়ে লাফ দেয় আর বলে, এই গেলাম হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে, পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে; এপারের বাড়ির পেছনের দরজা খুলে নির্দিষ্ট সময়ে ঝি-চাকর বড়ি ক'রে কি সব ফেলে দেয় তারের বেড়ার ওপারে। লোকে বলে, ওর মধ্যে নতুন কাপড়, আরও কত কি থাকে। ঠিক বলতে পারে, যারা আগে থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে ওগুলো কুড়োবার জন্যে।

সীমানা দিয়ে হাঁটবার সময় এপারের কুলী বন্‌শিয়ার মাথা থেকে সরষের বস্তা পিছলে পড়ে ওপারে। আবার কখনও ও বিশ্রাম করতে ব'সে যায় চিনির বস্তা মাটিতে রেখে গুমটি-ঘরের পাশে। বিশ্রামান্তে আবার বস্তা মাথায় নিতে এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে হয়। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে লোক-দেখানো অনিচ্ছায় হেলে পড়ে ও-রাজ্যের দিকে। বস্তা প'ড়ে যায়। বন্‌শিয়া হা-হুতাশ করতে থাকে, যেন সত্যিই ও বিপন্ন বোধ করছে। বস্তা উঠে যায় কাছের গরুর গাড়িতে। বন্‌শিয়াও চ'ড়ে বসে; বস্তা তুলে নেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে ক্ষীণভাবে, ওকে নিয়েই রওনা হয় গাড়ি ওপারের রাস্তা দিয়ে। মণ্ডল

সাহেব বিড়ি এগিয়ে দেয় বনশিয়াকে। ওরটা ধরিয়ে দেয়, কাঠি শেষ আগে নিজেরটাও ধরিয়ে নেয়।

টিউবওয়েলে জল নিতে আসে ছোট ছোট বালতি নিয়ে ওপার এপারে। ওদের কল নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জল নিয়ে যায় দুর্গা পোদ্দ দোকান হয়ে, বালতি ঘরের মধ্যে রেখে একটু এগিয়ে যায় পান খে পোদ্দার জিজ্ঞেস করে, ক পয়সার পান খেতে যাচ্ছ? কেউ বলে এক কেউ বলে দু পয়সা, কেউ-বা আরও বেশি। এগিয়ে যায় আর বলতে থ বালতিটা রইল ভাই, ফিরে এসেই নিয়ে যাব। একটু পরে ফিরে অ ততক্ষণে য পয়সার পান খাবে বলেছিল তত সের চিনি বালতিতে দেওয়া গিয়েছে। এপার পেরিয়ে যাবার সময় লোক দেখলেই শোনাতে থাকে, কি টিউবওয়েল, রড্ড বাড়ি উঠছে আজকাল। নতুন কোন উপায় আবিষ্ক আগে ধরা না পড়া পর্যন্ত চলতে থাকে ওপারের লোকদের এপার থেকে নেবার ফন্দি।

পচা গুঁইয়ের শ্বশুরবাড়ি ওপারে। সপ্তাহে তিন দিন ওর স্ত্রীকে বেঁধে বাবার অসুখ দেখতে। রোজই প'রে যায় নতুন শাড়ি, ফেরবার সময় কে দেখে, ছেঁড়া কাপড় প'রে ফিরছে।

মুক্তালাল সরাওগীর ট্রাকে ওড়ে জাতীয়-পতাকা। সীমানার ধারে ট্রাক ব্যাক্ ক'রে চ'লে যায় এপারের এলাকা ছাড়িয়ে। পেছনের কবাট যায়, নেমে পড়ে কেরোসিন, কাপড়ের গাঁট আর করোগেটেড টিন।

ঈশ্বরমলের দোকানে সাওন্থ বর্ষা কাপড় নিতে আসে। হাটে বেতের আর পাটের দড়ি বিক্রি ক'রে যা পেয়েছে ওতেই কেনা চলবে হয়তো।

কত দিব্যার হোবে?

ঈশ্বরমল তখন ব্যস্ত ওপারের ওর আত্মীয় কোন শেঠজীর সঙ্গে গো কথা নিয়ে। সাওন্থ শোনে, কিছু বোঝেও বা।

বুলেক না ভাই, কত দাম?—আবার জিজ্ঞেস করে সাওন্থ।

দশ টাকা।—ঈশ্বরমলের বেশি কথা বলবার সময় নেই।

ই ধুতি এক বছর আগেও কনটোলে তিন টাকায় পাছি। এখন অত দ

ঈশ্বরমল রহস্য করে, বাড়ি চলিয়ে যা, যো কাপড় বাড়িমে আছে, উতে লাগাইয়া লে, নয়তো কলাপাতা পিন্ধিয়ে থাক্।

সাওন্থ ভাবে স্ত্রীর কথা। হাটে আসবার সময় বলেছিল একটা ধুতি কিনে াতে, দুজনাই পরতে পারবে। আর সাওন্থরই বেশি দরকার। এর পর রে বের হওয়া ভার হবে।

বেরিয়ে আসে সাওন্থ দোকান থেকে। আজ আর হ'ল না, সামনের হাটে হয়।

শশী হালদারকে ঘিরে ধরেছে অনেকে, মাছের চুবড়ি নিয়ে নাকি ওপার ক এপারে আসছিল।

তোর বাড়ি এদিকে, তুই ওদিকে যাস কেন রে ছালা?—সমবেত কণ্ঠস্বরে ত উচ্চারণসম্পন্ন আত্মীয়তা।

দাম বেশি ছাছে যে উধার।—শশী বলে।

ছালা, এদিকে বাড়ি ক'রে, ওপারে মাছ বেচে বড়লোক হতে চাইছ? ছাহেবি তোমার দেখাচ্ছি। এগিয়ে আসে ওরা, হট্টগোলের মাঝে চুবড়ি প'ড়ে, মাছগুলো ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক, তুলে নেয় আশেপাশের লোক গস্ট দাদায় ছেটানো লুটের মালের মত। ভিড়ের মাঝে ভাল বোঝা যায় না, কী পোশাক পরা লোকটাও একটা মাছ তুলে নিল কি না।

শশী হালদার কেঁদে ওঠে। লছমন সিং আর আবদুল্লা বিড়ি ধরায় ক-প্যাণ্টের পকেট থেকে বার ক'রে।...

দুপুর-রাতে ছুটে আসে জমিরুদ্দিন এপারের ডাক্তারের কাছে।—বাবু, এই জাকশনটা দাও, ছাওয়াল আমার বাঁচে না বুঝি। মফিজ ডাক্তার বলছে, ধটা পালেই নাকি ভাল হয়্যা যাবি।

নেবে কেমন ক'রে? ধ'রে ফেলবে যে।

যেমন কর্য়া হয় দেন বাবু, আমি লিয়া যামু।—অনুনয় করতে থাকে জমির।

দাম এনেছিস?

এই তিন টাকা তুমি নেন বাবু; ছাওয়াল ভাল হ'লি আরও দিমু, অখুশি বার লোক হ্যা

ওর দেরি সয় না।

বাড়ি যা, হোমিওপ্যাথিক জল নিয়ে যা পঞ্চাশ শিশি, ও টাকাতেই হবে। তো-তোর মফিজ ডাক্তারের কাছে যা তোর 'ইন্‌জাকশন' নিতে।—ডাক্তার -কষাকষি করতে চায়।

মোর গাঁয়ের ডাক্তারের কাছে থাকলি কি আর তুমার কাছে আ
দেন বাবু, ছুটা পায়ে পড়ি।—শেষ চেষ্টা করে জমির।

হবে না, বেরিয়ে যাও।

জমির চ'লে আসে।

এপারে থেকে পাহারাদার হাঁকে, কে যায়?

জমির বলে না কিছু। ছুটে আসে কজন, খুঁজে দেখে কিছু নিয়ে যা
কি না, না পেয়ে ফিরে যায়।

ওপারের সিপাই ডাকে, কোথায় বাড়ি?

এপারেই।—এগিয়ে চলে জমির।

সুরথ সিং হাঁকে, কোই বিড়ি-উড়ি হ্যায়?

হ্যায় জরুর। আইয়ে দোস্ত্।

জ্ব'লে ওঠে দেশলাইয়ের কাঠি, দুজনের মুখের আভাস শুধু পাওয়া যা
সিগারেট ধরিয়ে ফেরে উল্টো দিকে। ভারী জুতোর শব্দ শোনা যায়।

বাড়ি ফেরে জমির। দরজার কাছে আসতেই শোনে কান্নার রো
বুঝতে পারে সবই। সাদা কাপড়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তিন টাকাতে যত
পাওয়া যায়।

* * *

একদল সীমান্তরক্ষী পাঠশালাকে ঘিরে বসিয়েছে আস্তানা। আশপাশে
পুকুরের মাছের নাকি হিসেব নেওয়া হয়ে গিয়েছে। রোজ মাতব্বর প্রধানে
খাসী, হাঁস, মুরগীর হিসেব আসছে। রক্ষীদের জন্তে রোজ নিয়মিতভাবে এক
না একটা আহার্য পাঠাতে হবে। বক-রাক্ষসের দোসর। সীমান্তরক্ষী
অধিনায়ককে মাস্টার সাহেব বলে, হুজুর, আপনাদের দেখে ছেলেমেয়েরা ভ
পায়; স্কুল-ঘরের পাশ ছেড়ে সেক্রেটারি সাহেবের বৈঠকখানার কাছে যা
আস্তানা নেন তবে বেশ হয়।

উত্তর পায়, দেশের স্বাধীনতা কেবল আরম্ভ হ'ল। কত কাজ
জিনিসপত্র চালান হয়ে গেলে তোমাদেরই তো অসুবিধে। এ বোঝ না মাস্টা
সাহেব? তোমার বর্ণবোধ শিক্ষা দেওয়া আর আলেমগিরি ছুদিন বন্ধ থাকে
কোন দোষ নেই। জান, গত যুদ্ধের সময় শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় ব'লে ধ
হয় নি। সে সংকট কালের জের চলেছে আজও, তোমার পাঠশালার অসুবিধে
করতে তাই বাধে নি।

সাপ্তাহিক কোন এক পত্রিকা আর লোকমুখ থেকে যা জানতে বা শুনতে
, মাস্টার তার বেশি কোন খবর পায় না। এবার হুজুরের কথায় বুঝতে
করে, সত্যিই কি লেখাপড়া শেখানোর দরকার তেমন কিছুই নেই?
া কি অপেক্ষা করতে পারে দেশের সুদিনের জন্যে? ভাবতে বসে
ার, হুজুরের এই চাকরি যোগাড় করতে কি লেখাপড়া শিখতে হয় নি?
ঁ যাঁরা শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বাদ দিলেন, তাঁদের "বাদ দেওয়া
" এই ফতোয়া লিখতে লেখাপড়া শিখতে হয় নি? এত বড় যুদ্ধটা হ'ল,
পত্র, খবরাখবর পাঠানোতে কি লেখাপড়ার সাহায্য নিতে হয় নি? সাপ্তাহিক
াজে সে দেখেছে, যুদ্ধের সময় বিলেতে লেখাপড়া বন্ধ রাখা হয় নি। কেমন
র এ জায়গা থেকে ও-জায়গায় ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে
াদও তার মনে আছে। তেমন যুদ্ধে তো আমাদের দেশ জড়িয়ে পড়ে নি?
ভাবতে ভাবতে মাস্টার খেই হারিয়ে ফেলে। পাঠশালা বসবার সময়
া গিয়েছে, এসেছে মাত্র দুজন ছাত্র। হাজিরা-খাতায় দুজন ছাত্র উপস্থিত
কলে বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। কি করবে মাস্টার?
এক রাজ্য পার হয়ে এসেছে ছুটো গাড়ি। ছুটে যায় দুজন রক্ষী। তারপর
হয় ভাল বোঝা যায় না। তবু মাস্টার দেখে, গাড়ি রেখে গাড়োয়ানেরা
দের সঙ্গে কি সব ফিস্‌ফিস করে।
ছাত্র আর আসবে না, মাস্টার বেরিয়ে পড়ে।
গাড়ি ততক্ষণ রওনা হয়েছে। পেছনের গাড়োয়ান দেখে মাস্টারকে।
আরে মাস্টার সাহেব, তোমার ইস্কুল-ফিস্কুল আর হবি না। এখন ওসব
দ দিয়্যা—
তোমার ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাও না কেন?—মাস্টার জিজ্ঞেস করে।
উ এতখন শীতলাপুরের হাটে কাপড় ব্যাচছে। আজ আবার লিয়া যাচ্ছি,
বার তুমাদের আর কাপড়ের চিন্তা থাকবি না। গাড়োয়ান যেন কণ্ট্রোলারের
মিকায় অভিনয় করে।
কাপড় নিয়ে আসছ ভিন দেশ থেকে, ওরা কিছু বলে না?
আরে, বুলে তো সবাই, আবার বুলেও না। দৌলতরামের দোকানে কিনলে
ই সব ঠিক করি ছাছে। তবে মাস্টার, তুমি যদি এ ব্যাবসা কর, মোকে
াথে লিও—দৌলতরামকে কিছু বেশি দিব্যার হবি, তা হোক—দেখো কি

লাভ! এপারে মাল আন্তা ক্যালছ, কি বাস্, টাকা সুদে আসলে উঠ্যা আসি হাতে তালি দিয়ে ওঠে গাড়োয়ান।

প্রলোভন। সর্পের প্রলোভন চিরকাল চলছে এমনই ক'রে নানা ভাবে পরাজয় হয় সুনীতির, বিচ্যুতি হয় আদর্শের। কিন্তু এ কোন্ স্বাধীনতা জনগণকে বঞ্চিত করবার স্বাধীনতা, অর্থলোলুপতাকে বে-আব্রু রেহায়াসি টেনে আনবার স্বাধীনতা, মনুষ্যত্বকে পশুত্বের ধাপে নামিয়ে আনবার অক স্বাধীনতাই কি দেখা দিল দুশো বছরের পরাধীনতার পর? আত্মার মুক্তি চিন্তা পড়ল পেছিয়ে, লোকে দাস হয়ে পড়ল অর্থের, পিশাচ-মনোবৃত্তির অ তথাকথিত আভিজাত্যের।

মাস্টার ভাবে, তবে কি পরাধীনতা ঘুচল না তাদের, যারা নানা নির্যাতনে মাঝেও ভেবেছিল, একদিন এর শেষ হবে, অমারাত্রির শেষে সুদিন আসবে ভুলে যাবে সবাই দুঃখ-দুর্দশার বিভীষিকা?

মাস্টার ভোলে নাই আজও—যুদ্ধের বাজারে ফুড-কমিটি পরিদর্শনে এ হ্যাজাকের আলোর নীচে ব'সে ভূরিভোজের পর কণ্ট্রোলার সাহেব বাড়ি দিয়েছিলেন সেক্রেটারি সাহেবের চিনি আর কেরোসিনের বরাদ্দ। মংলু মাঝি পাঁকাঠির বোঝা জ্বালিয়ে আসছিল সাহেবের কাছে আবেদন করতে, এ ছটাক কেরোসিনে কুলোয় না, একটু বাড়িয়ে দিতে। দূর রাস্তা, আগুন নিতে গিয়েছিল কিছুদূর আসতেই। গুগরী বিলের পাশ কাটবার সময় কোন্ এ বিষাক্ত সাপের কামড়ে মংলু ম'রে প'ড়ে ছিল বিলের ধারে। এই বিলেরই পাশে কবর দেওয়া হয়েছিল মকবুল শেখের নাতনীকে। ডাক্তার বলে, অতব অসুখে দিনের পর দিন গুড় মিশিয়ে পথ্য দেওয়াতেই নাকি মেয়েটা মারা গেল এক কণা চিনির জন্যে মকবুল কতদিন ঘুরেছে সেক্রেটারি সাহেবের বাড়ি ওর সেই এক কথা—কতবার বলেছি কণ্ট্রোলার সাহেবকে চিনির বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে, তা উনি বলেন—উপায় নেই। আমি কি করব ভাই? কিন্ত সবাই তো দেখেছে, বিশেষ বিশেষ সময়ে কিছুরই অভাব হয় না। দিনের মত আলো জ্ব'লে থাকে সারারাত, মাতব্বর প্রধানদের ভূরি-ভোজও বাদ থাকে না। শুধু নিজেরা বলাবলি করেছে, সেক্রেটারি সাহেব আর মণ্ডলদের গোপন আলোচনা চলেছে সুযোগমত সারারাত। সোজাসুজি বলতে সাহস হয় নি আধ পোয়া চিনি আর এক ছটাক কেরোসিনের বরাদ্দও যদি ঘুচে যায়!

দেখেছে এ সবই।

দেখছে আজও। এস. ডি. ও. আর কণ্ট্রোলার, সার্কেল অফিসার আর রাগা সবাইকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সেলাম ঠুকে চলত যারা খদ্দরের ল পাতলা ধুতি পাঞ্জাবি প'রে, কংগ্রেসের ছায়া মাড়াতেও যারা ভয় পেত, ব্ব তারা হয়েছে মস্ত দেশকর্মী, মিটিংকা কাপড়া পরছে, ওদের কারের টে উড়ছে জাতীয়-পতাকা, খবরের কাগজ পড়ছে আর জয়গান করছে হরলালের, রাজেন্দ্রপ্রসাদের, আর সবারই। এদেরই এক দলের মধ্যে সোনা দর দর আর শেয়ারের বাজারের খবর জানবার জন্তে খবরের কাগজ নিয়ে ড়াকাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে।...

আর এক সীমান্তে। জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে গরুর গাড়ি। ভরতের পুলিস-ঘাঁটিতে পেল বাধা।

কি আছে?

কিছু না।—উত্তর আসে ভেতর থেকে।

জরুর, দেখেগা হামলোক। সিপাই বেরিয়ে আসে। বের হয় এক বস্তা নি, কয়েক গ্রোস দেশলাই, কাপড় কয়েক জোড়া। টান দিয়ে নামাতেই মে আসে তোষক। দুদিক ধ'রে উঁচু করতেই ভারী হয়ে পড়ে নীচের দিক। তোষকের মুখ খুলে ফেলতেই দেখা যায় কয়েক থান কাপড়।

বেপরোয়া গাড়ির মালিক জিনিস রেখেই চ'লে যায় গাড়ি হাঁকিয়ে। পারের রাজ্যে ঢুকেই গাড়ি থামায়।—তুমাদের বড় রাস্তা দিয়্যা নাই বা লাম। কত্ত জায়গায় পাহারা দিবা? চকহলুদের মাঠ বা চালাইভিটার উনিয়ন বোডের রাস্তা দিয়্যা গেলে ঠেকায় কোন্ শালা? সাটরাগাঁয়ের লা রাস্তা দিয়্যা গেলে ধরবি কে? আশু বাগদী, অর্জুন মালো, না, তামাদের রাজ্যের পিলেওয়ালা মুচকুন্দ রাজবংশীর দল?

গাড়োয়ানও সায় দেয়—আশু, অর্জুন কিছুই বুলবে না। জানের ডর াই? মাথা কাটি ফেলি, মোর রাজ্যে চলি গেলে, ধরে কোন্ সম্বন্ধীর ্যাটা?

সত্যিই তো। অর্জুনের বাড়ির মেয়েরা রোজ ভোর না হতে মাঠ ফিরে আসে, আশুর গরু ছাগল জমির আল পার হয়ে পাতা ঘাস খেতে যায় ওপারে। বটগাছের ছায়ায় এপার ওপারের লোক ব'সে জটলা করে, তামাক

যায়। ঝগড়া লাগাতে কতক্ষণ, দেরিও হবে না হয়তো মাথা-ফাটাফাটি ও খুনজখমের মহড়া শুরু হতে।...

খড়ের গাড়ি আটকে দিয়েছে অদূরে।

দে বাবা, ছাড়ি দে, দু পয়সা বেশি পালি হামাগের রাজ্যেরই তো টা বেশি হবি।

চাঁদা দিয়ে যা চ্যারিটি ফাণ্ডে।

চারদিক ফাঁদে তো দিব্যারই হবিই হামাগের লাগি, ই তো।—বের ক' দেয় যথোচিত দক্ষিণা। গাড়ি রওনা হয়।

এপারে পড়ে এদিকের রক্ষীদের হাতে। নিয়ে আসে শুল্ক-বিভাগের লোকে কাছে—উনি এদিকেই আসছিলেন। বই খুলে ভদ্রলোক দেখতে থাকেন, ক ট্যাক্স দিতে হবে।

বাবু, ই রামেন্দির বাবুর খেড়। ঘর ছাওয়াবার হবি, তাই নিয়্যা যাচ্ছি। স করেন, বাবুকে নিয়্যা আসি।—গাড়ি রেখে গাড়োয়ান বাবুকে ডাকতে যায়।

রামেন্দ্রবাবু। বছর পেরোয় নি, কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছেন। গাঁয়ে মা না আপনি মোড়ল গোছের, তবুও সাধারণ লোকের মাঝে ইতিমধ্যে এ প্রতিপত্তি হয়েছে। জওহর-কোট গা থেকে খোলেন না কোন কালে গান্ধীটুপির এক দিকে 'জয় হিন্দ' ও অন্য দিকে অশোকচক্রের ছাপ।

ছুটে আসেন জওহর-কোটের বোতাম খুলে। কোন্ আইনে আটকেছে —জিজ্ঞেস করেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে।

বই খুলে আইন দেখিয়ে দেন ল্যাণ্ড কাস্টমসের লোক।

ফেলে দিন ওসব। নিজের জমির ধানের খড় নিতে ট্যাক্স লাগবে, মগে মুলুক, না?—রামেন্দ্রবাবুর রাগ কমে না।

আজ্ঞে, এ তো কংগ্রেসী মুলুক, মগের কেন হবে?—কর্মচারীটি সবিন উত্তর দেন।

সে তোমার কাছে জানতে হবে না ছোকরা, গাড়ি ছেড়ে দাও।

স্বাধীন দেশের আইনে বাধা আছে ছেড়ে দেবার।—উত্তর আসে।

আচ্ছা, দাঁড়াও।—লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে, মাতব্বরি ফলানোর এ সুযোগ ছাড়বেন না রামেন্দ্রবাবু।—যাচ্ছি এবার কংগ্রেসের সেক্রেটারি সুবো বাবুর কাছে। জওহর-কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে রওনা হন।

দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক জনতার মাঝে, আর. এস. পি. আই.-এর রামরাজ্যে ডুবে, ফরোয়ার্ড ব্লকের কেষ্ট সেন। পরখ করে, সরকারী লোক কংগ্রেসের ভয়ে খড়ের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন কি না।

'৪২-এর বিখ্যাত নেতা শতদলবাবু এলেন। সত্যিকারের নেতা, দুর্দশার মাঝে লোকে সান্ত্বনা খোঁজে ওঁর কাছে, পায়ও। রামেন্দ্রবাবু মানিব্যাগ বের ক'রে ফেলেন, সরকারের প্রাপ্য দিতেই হবে। শতদলবাবু, সুবোধবাবু তাই পরামর্শ দিয়েছেন। হৈ-চৈ ওঁরা পছন্দ করেন না।

তবুও কি হৈ-চৈয়ের জায়গা এটা! দিনে লক্ষ গুজব ছড়িয়ে যায়, শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। পানের দোকান, চায়ের স্টল আর মোটর অফিসে ছোট ছোট দল আলোচনা করে,—ও রাজ্যের রেল-স্টেশনের কাছেই এ রাজ্যের সীমানা আরম্ভ ব'লে গাড়ি নাকি আর থামবে না; জেলার সদর নাকি বদলি হয়ে সত্তর আশি মাইল দূরে কোথায় হবে, তারই তোড়জোড় চলছে সরকারী মহলে; '৪২-এর আন্দোলনে নাম করেছিল ব'লেই নাকি জায়গা ভারত ইউনিয়নে পড়েছে।

খবরের কাগজের ওপরে লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টার এঁটে দেওয়া হ এখানে সেখানে, ওতে থাকে সর্বহারাদের নেতাদের বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে আবেদন, আরও কত কি। কারবালা মাঠে হয় বামপন্থীদের স কংগ্রেস-ময়দানে বসে প্রবীণ জননায়কের সভাপতিত্বে বিরাট সভা। সভা পেছনের লোকেরা ঘুরে বেড়ায় এ সভা থেকে ও সভা, আর যতক্ষণ থা কেবলই আলোচনা করে বক্তাদের বিষয়ে। চিনাবাদামের খোসা কট ক'রে ভাঙে, আলগোছে বাদামগুলো মুখের ভেতর দেয় আর জাবর কাটতে থাকে কথার ফাঁকে ফাঁকে। বক্তৃতামঞ্চে হয়তো ততক্ষণ হরিপদবাবু গান্ধীজী নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হু-হু ক'রে কেঁদে উঠেছেন, অভিভূত হয়ে গিয়ে সভার আদ্ধেক লোক, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে। ওদিকে আরম্ভ হয়ে যায় গান্ধী আর নেতাজীর তুলনা কারবালা মাঠে।

সভার শেষে বসে সুবোধবাবুর বাসায় বৈঠক। শুরু হয় শান্তবা ডাক্তারখানায় বামপন্থীদের সচীৎকার আলোচনা। এমনিই হয় প্রায়ই।...

বাড়ি ফিরছেন শতদলবাবু। জীপ থামিয়ে এক হোমরা-চোমরা সাহে

বেরিয়ে এলেন ওঁর কাছে। সেপাই ঠুকল সেলাম, বছর কয়েক আগে ঠুকে চেয়েছিল ব্যাটন ঐ শতদলবাবুর মাথায়।

নমস্কার। সাহেবের মুখে খোশামুদি ফুটে ওঠে, একটু আলাপ আপনার সঙ্গে—কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল।

আসুন।—শতদলবাবু ও সাহেব এগিয়ে যান। লোকে-ভাবে, কি পরিবর্তই হজরতের কাছে যাচ্ছে আজকাল!

আলোচনায় বসেছেন শতদলবাবু ও সাহেবটি। গোপন আলোচনা।

গোপন আলোচনা এখনও হয়তো চলছে ঈশ্বরমল মাড়োয়ারীর গুদাম ঠিক হয়ে গিয়েছে, দুপুর রাতে ট্রাক আসবে, তারপর…

আলোচনা চলছে সুবোধবাবুর বাসায়। গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী মনোনিবেশ করতে হবে। খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে আছেন রামেন্দ্র তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছেন বামাকান্ত পাট্টাদার, হরিপদ ঘোষ, রাজেন্দ্র কাগজ কলম নিয়ে লিখছেন সুবোধবাবু। সিদ্ধান্ত হ'ল, শহরের ধারে কা গ্রামে বামাকান্তবাবুরাই যাবেন। শতদলবাবুকে অনুরোধ করা হবে গ্রামে যেতে, সঙ্গে থাকবে চিরকাল যারা ভলান্টিয়ারি ক'রে এসেছে, নে পদে উন্নীত হতে যাদের হয়তো জীবনই কেটে যাবে।

কথাবার্তা শেষ হয় নি এখনও সাহেব আর শতদলবাবুর, সেদিন বে-আইনী ব্যাপার নিয়ে—কাপড়ের গাঁট রাতারাতি উধাও হয়েছে মে স্টেশন থেকে। সংখ্যালঘুদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কংগ্রে কাছে ওরা নালিশ জানিয়েছে পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে, ওদের কাগজে রিপো চ'লে গিয়েছে।

বড় দারোগা ছুটতে ছুটতে এলেন খবর নিয়ে। বেরিয়ে এলেন সা উৎসুক হয়ে উঠলেন রাজেন্দ্রবাবুরা।

পাওয়া গিয়েছে, স্যার! গোটা গাঁটটাই জমির নীচে পুঁতে ফেলে ওপর পাট বুনে দিয়েছিল, সরাবার সময় পায় নি।—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দারোগা।

সাহেব ব'লে ওঠেন, দেখলেন শতদলবাবু, যুদ্ধের মরশুমে ব্ল্যাকমার্কেট অভিনব মতলববাজির যে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে

মুসলমান সবাই, এদেশ ওদেশ হ'লে কি হবে? সারা পৃথিবীর লোক যেন এই ধর্মে দীক্ষিত হতে চলল।

শতদলবাবু হেসে ওঠেন। হেসে উঠলেন রাজেন্দ্রবাবু আর সকলে। হেসে উঠেছে নিশ্চয়ই তৃপ্তির হাসি, শান্তবাবুর ভাণ্ডারখানায় জমায়েৎ বামপন্থীর ইলেকশনে দক্ষিণপন্থী প্রার্থীর স্বভাব-চরিত্র নিয়ে প্রাচীরপত্র দেবার সিদ্ধান্তে।... হেসে উঠেছে হয়তো ঈশ্বরমল হাতে মালপত্র চালান দেবার চুক্তি অন্তে, নোটের তাড়া পেয়ে।...

কিন্তু কাঁদে কারা?

কাঁদে শশী হালদার, সাণ্ডু আর জমিরউদ্দিনের দল, যারা আজও বুঝতে পারে নি, দেশ স্বাধীন হয়ে ওদের কতটুকু লাভ হ'ল। শিউরে ওঠে আজও মংলু মাঝির দলের লোক, যাদের চোখে ভেসে ওঠে গুগরী বিলের পাশে দর্পদষ্ট মংলুর পাণ্ডুর মুখ, আজও যারা সভয়ে চোখ বোজে কবরের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মকবুলের নাতনীর মৃত্যুকাতর মুখ স্মরণ ক'রে।

শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তী

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার

ভারতে বনিয়াদী শিক্ষার জনক মহাত্মা গান্ধী পল্লীবাসীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাস্তব-জীবনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা-সমাধানকারী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, গ্রামবাসীর শিক্ষা। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল আরণ্যক সভ্যতা, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের আমলে নগর শহর গড়িয়া উঠিলেও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭·১ জনই এখনও গ্রামে বাস করে, শহরে বাস করে মাত্র ১২·৯ জন। গ্রামকে শহরে পরিণত করা চলিবে না, কেন না ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ইংলণ্ডের মত শিল্পপ্রধান নয়। কাজেই গ্রামবাসীকে গ্রামে রাখিয়াই স্বাস্থ্যকর রুচিসম্মত জীবনযাপনে শিক্ষিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও কুটীরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়াই বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। গান্ধীজী চান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কর্মমুখর গ্রামে নাগরিকের কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানে সক্ষম সুস্থ সবল পল্লীবাসী। স্বরাজ-সাধনার ক্ষেত্রে যেমন

মহাত্মাজী সংগঠন এবং প্রতিটি মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের চেষ্টা করিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনই তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া পল্লীর পুনরুজ্জীবন ও গ্রামবাসীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

কোন কাজের মধ্যে দিয়া শিক্ষাদান শিশুর মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী, যে বয়সে বালকবালিকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসঞ্চালনকারী কর্মে আনন্দ লাভ করে, সে সময়ে তাহাদিগকে নীরস পুথি মুখস্থ করাইয়া যে নির্জীব শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা তাহাদের মানসিক বা দৈহিক কোন দিকেরই মঙ্গল সাধন করে না বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী তাই অবৈজ্ঞানিক ও প্রাণহীন।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান সমালোচ্য বিষয় এই যে, নিম্ন হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত একটি সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গহিসাবে ইহা প্রথম হইতেই পরিকল্পিত হয় নাই। গান্ধীজী বলিয়াছেন,—ভারতের সাত লক্ষ পল্লীতে ভারতের আত্মা বাস করিতেছে; কাজেই পল্লীর শিক্ষার চিন্তাই তাঁহার কাছে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

পল্লীর সংখ্যা বেশি হইলেও শহরেও বালকবালিকা রহিয়াছে। তাহাদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে? তাহা ছাড়া, পল্লীর বালক হইলেই যে সকলেই কৃষি অথবা অন্য কোন বৃত্তিমূলক কুটীরশিল্প শিখিয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সের পরেই অর্থোপার্জনে ব্রতী হইতে হইবে তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? পল্লীর বালক-বালিকাকে যদি আবশ্যিকভাবে বনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাত বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তবে তাহার ফলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হইতে সক্ষম ভাবী প্রতিভাকে আমরা পাকা কারিগরে পরিণত করিয়া তাহার বৃহত্তর প্রতিভার বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারি। দেশে কৃষিশিল্প ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই বিশ্বের সভ্যসমাজে স্থান লাভের যোগ্য উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, সাহিত্যিক প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। দেশে দেশে স্বাধীন ভারতের সাম্য-মৈত্রী-মুক্তির বাণী উন্নতশিরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার যোগ্য ভারতবাসীর যেমন প্রয়োজন হইবে, বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে দানের উপযুক্ত গৌরবময় সংস্কৃতি-সভ্যতা ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোন জাতির সাংস্কৃতিক মৃত্যু (cultura

ath) ঘটিলে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা তাহার গৌরববৃদ্ধি করিতে পারে । বস্তুত সুস্থ সবল জীবন যাপন ও জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের জন্যই ধীনতার প্রয়োজন।

বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রণয়নকারী জাকির হোসেন কমিটি লোচনার উত্তরে বলিয়াছেন—

"এই পরিকল্পনার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার কোন উল্লেখ না ায় অনেকে শঙ্কান্বিত হইয়াছেন যে, হয়তো আমরা উচ্চশিক্ষার সংকোচ ন করিতে চাহিতেছি; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা শুধু ত বৎসরের জন্য বনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে নিজেদের াবদ্ধ রাখিয়াছি। এই পরিকল্পনা সর্বজনীন আবশ্যিক বনিয়াদী শিক্ষা র্তনের জন্য। এই নূতন প্রণালী অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার য় এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যাহাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্য ছাত্রগণ হাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়।"

অর্থাৎ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং সেখান হইতে শ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিবার স্বাভাবিক সোপান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে রাখিতে হইবে। চমবঙ্গ-সরকারের উদ্যমের উত্তাপে বহুদিনের সঞ্চিত উদাসীনতার বরফস্তূপ লিতে আরম্ভ করিয়াছে। বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রাথমিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষকের নূতন শিক্ষা-প্রণালী-শিক্ষাকাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আশার শ সন্দেহ নাই। নূতন ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার পরই ইহার সঙ্গে শ খাওয়াইয়া মাধ্যমিক শিক্ষাকেও ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কিন্তু মাধ্যমিক ক্ষাক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কোন কর্মচাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ, গৌরবময় ইহার ঐতিহ্য। জ্ঞানে গরিমায়, সম্পদে ক্তিতে একদা এই পুণ্যভূমি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। ইহার তীর্থপীঠ দেশদেশান্তরের বিদ্যার্থীকে আকর্ষণ করিয়াছিল। দুর্গম দুরূহ পথ ব্রজে অতিক্রম করিয়া তাহারা ভারতের আলোকতীর্থে উপনীত হইত। রতীয় সভ্যতার শান্তশ্রী, ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা ও ভারতবাসীর জীবনে গতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সমন্বয়ে যে পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ ফুটিয়া ঠিয়াছিল, তাহার মূল এ দেশের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে নিহিত। কালচক্রের বর্তনে ভারতের সে শান্ত তপোবনের যুগ চলিয়া গিয়াছে; ভারতের নির্মল

আকাশে ধূলিঝঞ্ঝার কালবৈশাখী বহুবার তাণ্ডব নৃত্য করিয়া গিয়াছে। অনেক যুগ পরে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে ভারতীয় গৌরবের পুনরভ্যুদয়ের যুগ আসিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি, শক্তি ও শান্তির জন্য দেশবাসীকে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিবার সময় শিক্ষাবিদ্‌দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

সার্জেণ্ট-শিক্ষা-পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা চালু করিতে যে পরিমাণ টাকার হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহা বহন করা বর্তমান ভারতের পক্ষে অসাধ্য। পল্লীবাসী অধিকাংশ বালকবালিকার জন্য গান্ধীজী যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে উৎকৃষ্ট, শুধু সকল ছাত্রকেই বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ধরিয়া না রাখিয়া প্রতিভাবান কতককে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় যে সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বনিয়াদী বিদ্যালয়কে নিম্ন বনিয়াদী ও উচ্চ বনিয়াদী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিম্ন বনিয়াদীর শিক্ষাশেষে অর্থাৎ ১১+ বয়সে ছাত্রদের একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য, রুচি, গৃহের পরিবেশ, বংশের ধারা প্রভৃতি বিচার করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে তাহাদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অন্য ছাত্রেরা উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেও সাধারণ বিদ্যাভবন (Academic School) ও শিল্পবিদ্যাভবন (Technical School)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রদিগকে শিল্পবিদ্যা-ভবনে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে, যাহাতে সেখান হইতে তাহারা উচ্চতর শিল্পশিক্ষার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, আইন, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রগণ সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যাভবন হইতে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। কোন ছাত্রের প্রতিভা কিন্তু দেরিতে বিকাশ হইয়াছে দেখা গেলে, তাহাকে উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার সুযোগ থাকিবে।

বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্বাচনকালে সর্বদা স্মরণ
াখিতে হইবে যে, ছাত্রসমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, তাহার বুদ্ধি ও
তিভার বিকাশ ঘটিলে তাহা দ্বারা যদি দেশের যে কোন দিকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির
ভাবনা বোঝা যায়, তবে তাহার আত্মোন্নতির সুযোগ দিতে হইবে। তাহা
রিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যমিক শিক্ষার
স্কারও অবশ্যকর্তব্য হইয়া উঠিবে। মাধ্যমিক শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে
শ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনও করিতে হইবে। শিক্ষাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা
ontinuous process) বলিয়া গণ্য করিয়া প্রাথমিক উচ্চতম স্তর পর্যন্ত
ত্রদের বিভিন্ন রুচি, সামর্থ্য ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের
তীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার কোন একটি পর্যায়কে
ক করিয়া এককভাবে তাহার প্রণালী নির্ধারণ করিতে গেলে সমগ্র সমস্যার
ধ্য সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দিতে পারে। ইহা দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ
বে না।

দ্বিতীয়ত, শুধু কুটীরশিল্পের প্রসার হইলে এবং পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব
টিলেই দেশে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সংঘটিত হইবে না। বর্তমানে
জ্ঞানের যুগ চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিবিধ যন্ত্রশিল্পের প্রসার
তীয় সম্পদবৃদ্ধির জন্যই করিতে হইবে। কুটীরশিল্পকে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক
াবে গ্রহণ করিয়া সমাজ-জীবনে পল্লী ও শহরের মধ্যে সহযোগিতার সেতু
পন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, স্বাধীন ভারতের জন্য শিক্ষার সংস্কার পরিকল্পনা করিবার সময়
রতের মূল প্রাণশক্তির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। সাত্ত্বিক ভাবের
ধ্যাত্ম ও অধ্যাত্ম শক্তিই ভারতীয় আর্যসভ্যতার শক্তিকেন্দ্র। এই আধ্যাত্মিক
ক্তির জন্যই পরাধীনতার নিষ্পেষণে ভারতবাসী তাহার সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন
া মানসিক শক্তির দিক হইতে একেবারে দেউলিয়া হইয়া যায় নাই। প্রায়
শ বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকায় "আমাদের আশা" শীর্ষক
ন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন স্মরণ করিবার, মনন করিবার এবং
নুযায়ী কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি।
বার ভারতবাসীর বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা

ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্র-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃ করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যু শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।...ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে, যখন আ বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অ স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।"

বহুদিনের রুদ্ধ অন্তর্মুখী শক্তি আজ বহির্মুখী হইতে চলিয়াছে। বিকাশের পথ, দেশের এবং মানবের কল্যাণে ইহাকে নিয়োগের পথ চিন্তানা দিগকে রচনা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কারে শিক্ষাবিদ্ এই বহির্মুখী শক্তির বহুমুখিতা স্মরণ রাখিয়া, বর্তমানকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য র করিয়া বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে হইবে জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়, বহুবিচিত্র সমৃদ্ধি ও শক্তি, আধ্যাত্মিক ও জাগতি জীবনের পরিপূর্ণতা ও সুসমঞ্জস মিলন—ইহাই হইবে নব ভারতের আদর্শ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সংবাদ-সাহিত্য

কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেবের দেহান্ত ঘটিয়াছে। যে পাকিস্তান ক তাঁহার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ করিল, তাহা আজ শোক মুসলমান। ভারতবর্ষেরও সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পক্ষ হইতে তাঁহার জন্য শোক জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিদেশী রাষ্ট্র ও রা নেতাগণ জিন্নাহ সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কিছুকাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছিল বলিয়া জনঃ শোনা গিয়াছিল। বিগত ১৫ই আগস্ট তিনি স্বাধীনতার বার্ষিক উৎস যোগদান করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আকস্মিক হইলে নিতান্ত অপ্রত্যা ত বলিয়া মনে হয় নাই। আমরা ১৯৪৮ সালের মে এক দিকে জিন্না াহেবকে, অপর দিকে গান্ধীজীকে হারাইলাম। একজনে স্বাভাবিক ভাবে, অপরজনকে অস্বাভাবিক ভাবে।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, জিন্নাহ সাহেব একদিন ভারতবর্ষে

তাবাদী মুসলমানগণের অগ্রণী ছিলেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজী যখন
ীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন, তখন তিনিই ভারতবাসীর
ধি হইয়া গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অথচ অবশেষে একদিন
সাহেব এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইলেন, যখন তিনি বলিলেন,
এবং মুসলমানের পক্ষে স্বাধীনভাবে একই রাষ্ট্রে বাস করা সম্ভব নয়,
তাহাদের জাতি, ধর্ম, আচার সবই পরস্পরবিরোধী। উভয়ের স্বার্থের
। কোনও সমতার স্থান নাই। ইহা হইতেই অবশেষে পাকিস্তানের
ব্ব।

কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পরেই জিন্নাহ সাহেব সেই রাষ্ট্রে যে বিভিন্ন ভাষা
ধর্মানুসরণকারী মানুষ বাস করিবে, ইহা স্বীকার করিলেন। এমন কি
লঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় স্বীয় স্বার্থ বলি
া, তাহাও ঘোষণা করিলেন। অর্থাৎ যে টু-নেশন থিওরির তিনি প্রবর্তক
ন, পরোক্ষভাবে সেই থিওরি তাঁহারই নিকট প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইল।
জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক
য় করা সম্ভব নয়, হয়তো বা শোভনও হইবে না। এ কথা অস্বীকার
ার উপায় নাই যে, তাঁহার প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের জন্য বহু মুসলমান
বলি দিয়াছে ও আজও দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি যাহা
ম সমাজের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কোনও ধন
া মানের প্রলোভনে সে পথ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করার কথা স্বপ্নেও
ভাবিতে পারিত না। কিন্তু ভক্তদলের আনুগত্য বা ব্যক্তিবিশেষের
রিকতা সত্যের প্রমাণ নহে। সত্যের প্রমাণ কালের দেবতা ইতিহাসের
য় লিখিয়া যান।

আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ান, হিটলার বা মুসোলিনিরও ভক্তের অভাব
না। তাঁহারাও মানুষের মানদণ্ডে ক্ষুদ্র ছিলেন না, জীবিতকালে এবং
র পরেও তাঁহাদের ভক্তের অভাব ঘটে নাই। কিন্তু নেপোলিয়নকে আমরা
য়ের সহিত স্মরণ করি, মানুষের ইতিহাসে আকস্মিক প্রতিভার মত
পা করিয়া থাকি। তাঁহারা ভাঙিয়া গিয়াছেন এবং ভাঙার ভিতর দিয়া
তা বা কিছু গড়িয়াও গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গড়ার কাজের দ্বারা
াদের স্বার্থপুষ্টি হইয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় অনেক হইলেও শোষিত ও

অবহেলায় পঙ্গু জনসমূহ হইতে ভিন্ন। যে মহাপুরুষগণ ভাঙা অপেক্ষা গড়া কাজে প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র আকস্মিকতার লক্ষে বিস্ময়কর না হইলেও কালের দেবতা অবশেষে তাঁহাদের ললাটে জয়তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সাধারণ মানুষের অন্তরলোকে তাঁহারাই স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কায়েদে আজম জিন্নাহ মানুষের অন্তরে যদি সেই আসনের অধিকারী হন তবেই আমরা ভারতবাসী হিসাবে নিজেদের ধন্য বলিয়া মনে করিব, কেন না তিনিও শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীই ছিলেন। কি জানি, মহাকাল কাহার জন্য কোথায় কোন্ আসন রচনা করিয়া রাখিয়াছেন!

—

হায়দ্রাবাদে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহারা প্রত্যহ রাজাকার সম্প্রদায়ের অত্যাচারের জন্য কাহিনী শুনিয়া অসহায় অবস্থায় অন্তর্দাহে কষ্ট পাইতেছিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে এবং নিজামের আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে তাঁহাদের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়াছে। আজ সরদার প্যাটেল গৌরবের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দু এবং মুসলমান জনগণ উভয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন, ও সমগ্র ভারতবর্ষে হায়দ্রাবাদ-সমস্যাকে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা হিসাবে কেহ দেখে নাই। ভারতীয় ইউনিয়নে কোথাও হায়দ্রাবাদকে উপলক্ষ্য করিয়া সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে নাই। অর্থাৎ সমগ্র ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান আজ যে নিরপেক্ষভাবে আচরণ করিতেছে। ইহা স্বস্তির সংবাদও বটে, আশা এ আনন্দের সংবাদও বটে। আচম্বিতে প্রহারের ফলে যদি হায়দ্রাবাদে মানুষে শুভবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তাহাও অবহেলার বস্তু হয় না।

কিন্তু বিষয়টির সম্বন্ধে ভাবিয়া আজ অন্য একটি কথা মনে হইতেছে। গান্ধীজী জাতীয় ঐক্যবোধের জন্য যে সাধনপদ্ধতি আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ও অস্পৃশ্যতাবর্জন দুইটি প্রধান সাধন ছিল। আমরা যে তাহার জন্য কিছু করি নাই এমন নহে। অত্যন্ত আন্তরিকতা সহিত আমরা একদিন খিলাফৎ-আন্দোলন সমর্থন করিয়াছিলাম। কি ভারতের বাহিরে একটি রাষ্ট্রের সুখদুঃখের সহিত ভারতীয় মুসলমানের অ

নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, ইহা স্বীকার করার ফলে একদিন মুসলমান-সমাজ
দের ভারতীয়ত্বকেই খোয়াইয়া বসিয়াছিল। যাহারা খোয়ায় নাই,
াদের সংখ্যা অথবা প্রভাব একদা নগণ্য ছিল, আজ ঘটনাচক্রে বৃদ্ধি
তেছে। কিন্তু মুসলমানের মনে স্বতন্ত্র-জাতীয়তার বীজ প্রচ্ছন্নভাবে
পত হওয়ার কারণে অবশেষে সেই বিষবৃক্ষের ফলস্বরূপ যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা
ি ভারতে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এক একধর্মকে আমরা অস্পৃশ্যতাবর্জনের
ও সাময়িকভাকে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি। 'হিন্দুমুসলমান এক হো'
বা 'অস্পৃশ্যতা নিপাত যাক' ইত্যাদি শ্লোগানের পিছনে আমাদের
রিকতার অভাব ছিল তাহা নয়। তাহা কেবল স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন
নে সমর্থ হয় নাই।

গান্ধীজী যেমন অস্পৃশ্যের মন্দির-প্রবেশের অধিকারে বিশ্বাস করিতেন,
র ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধান করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে
ও বলিতেন যে, যতদিন অর্থ নৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন
বসমাজের স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। তাই আমাদের হৃদয়াবেগকে
র্নি করিলেও তিনি উপদেশ দিতেন যেন আমরা সাময়িক ভাবকে স্থায়িত্ব
র জন্য জীবনের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় চেষ্টায় বিপ্লব সাধন করিতে পারি।
টি হইলে তবে স্বাধীন ভারতের জীবনরথ সুপথে চলিতে সমর্থ হইবে।

কেরোসিন বা পেট্রোলে আগুন না দিলে তাহাতে আঁচ হয় না, কিন্তু
রে খোলা জায়গায় আগুন দিলে বিস্তর ধোঁয়া হয়, ঘরবাড়ি পুড়িয়াও
। কিন্তু মোটরের ইঞ্জিনের মধ্যে বাঁধিয়া যদি পেট্রোলে আগুন ধরানো যায়,
ন তাহার জোরে মোটরকার চলিতে থাকে।

আজ হায়দ্রাবাদকে উপলক্ষ্য করিয়া সরদার প্যাটেলের মুখে আমরা সাধারণ
ও সাধারণ মুসলমান প্রজার মধ্যে যে অভেদের সংবাদ পাইতেছি, হয়তো
যে বুদ্ধি প্রহারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া ভাববিলাসীর মত
লাদ করিবার সময় আমাদের নাই। যদি উহাকে সার্থক করিতে চাই,
। সমাজে সার্থক পরিবর্তন করিয়া যেখানে যেখানে অসমতা বা শোষণ
গাছে, তাহার স্থায়ী সংশোধনের দ্বারা মজবুত ইঞ্জিনের মত দৃঢ় সমাজ গড়িয়া
র অভ্যন্তরে হিন্দু ও মুসলমানের এই নবজাগ্রত ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য-
কে বাঁধিয়া স্বাধীন ভারতের রথকে চালু করিতে হইবে।

হইতে কিছু টাকা প্রাদেশিক শিক্ষা-তহবিলে পৌঁছাইয়াও যাইতে অবশ্য বুনিয়াদী কথাটা তো গান্ধীজীর পেটেণ্ট করা ছিল না। অপরে শিল্পসংযুক্ত শিক্ষাকেও 'বুনিয়াদী' নাম দিয়া চালাইতে পারেন, গভর্মেণ্টের প্রসাদবর্ষণে পুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু এরূপ আচরণে অভাবরূপ দোষ জন্মায়। আর যে শিক্ষাপদ্ধতির মূলেই সততা নাই 'শিক্ষা' কেমন করিয়া হয়, সেই কথাটি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য যদি দেশপালকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তবে ভারতমাতা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করিবেন না। আর যদি আমাদের না-ই থাকে, তবে সততার সহিত খাঁটি বুনিয়াদী শিক্ষা অনুসরণ করিয়া দেখাই যাক না, তাহার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিতে সাধন করা যায় কি না, আত্মমর্যাদাযুক্ত, স্বীয়-পরিশ্রমপুষ্ট ছাত্রদ নিবেদিতাত্মা শিক্ষকের চেষ্টায় নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় কি

—

ব্যবসায়-ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রেও দেখিতেছি চোরা-কার হইয়া গিয়াছে। 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলা সংবাদপত্র হইতে অক্লান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি সঙ্কলন করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক পূর্বে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে একখানি আকর-গ্রন্থ প্রকাশ ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমরা 'প্রবাসী'তে (পৌষ ১৩৩৯) লিখিয়াছিল "ভবিষ্যতে যাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার লিখিতে বসিবেন ব্রজেন্দ্রবাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত উপক তাঁহাদের এতই নিতান্ত আপনার মনে হইবে যে, ব্রজেন্দ্রবাবু হিসাব হই পড়িবেন।"

আমাদের কথাগুলি এত অল্প দিনের মধ্যেই যে এমন বর্ণে বর্ণে যাইবে তাহা অবশ্য কল্পনা করিতে পারি নাই। আজকাল অনেকেই স্বীকৃতিতে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে অনেক সংবাদ পুস্ত পত্রিকায় বেমালুম আত্মসাৎ করিতেছেন—ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ এই সকল লেখক—পাছে নিজেদের গবেষণার গুরুত্বের হানি হয়, এই ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্কলন-গ্রন্থখানির নামোল্লেখ না করিয়া সংবাদগুলি যে 'সমাচার দর্পণ' হইতে গৃহীত, এইরূপ জাহির করিতেছেন; শতাধিক ব

কাশিত 'সমাচার দর্পণে'র জীর্ণ সংখ্যাগুলি যে তাঁহারা কখনও চর্মচক্ষে দেখেন ই, ইহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। দুইটি নমুনা দিতেছি :—

গত শ্রাবণ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে সম্পাদক মহাশয় "কাশীধাম" প্রবন্ধে কালের সংবাদপত্র হইতে" কয়েকটি সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। ান্ সংবাদপত্র হইতে গৃহীত, তাড়াতাড়িতে তাহার উল্লেখ করিতে ভুল য়া গিয়াছে, কিন্তু যে-যে তারিখে সংবাদগুলি প্রকাশিত তাহার নজীর মুদ্রিত য়াছে। সংবাদপত্রখানি যে সেকালের 'সমাচার দর্পণ', এবং সংবাদগুলি যে ংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে হুবহু উদ্ধৃত, তাহা না বলিলেও চলিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু-লাহিড়ী-গবেষক, অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার ন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই একই পথের পথিক। তিনি স্বকীয় 'বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তেও বটে) লিখিতেছেন :— "...প্রথম ান্ত পাই ১৮২১ সালে—'সমাচার দর্পণে' 'বাবু' চরিত্র আলোচনায়। সম্পাদক াহার কাগজের দুইটি সংখ্যায়—২৪শে ফেব্রুয়ারি ও ৯ই জুন, ১৮২১— ুলোকের আদুরে গোপাল শিক্ষা-চরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির কটি সংক্ষিপ্ত, ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন।" পড়িলেই মনে হইবে, শ্রীকুমার-বু বুঝি বা 'সমাচার দর্পণ' পত্রের সংখ্যাগুলি পাঠ করিয়াই এইরূপ মন্তব্য রিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার গুপ্ত মূলধন—ব্রজেন্দ্রবাবুর 'সংবাদপত্রে কালের কথা'। ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির নামোল্লেখ করিলে পাছে গবেষণার iginality কর্পূরের মত উবিয়া যায়, এই জন্যই এরূপ সতর্কতা।

—

সংযোজন :—৪০৪ পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থের যে ালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, অনবধানতাবশত তাহাতে এই পুস্তকখানির নাম বাদ ড়িয়াছে :—খুকুমণির ছড়া : যোগীন্দ্রনাথ সরকার ... ১৩০৬, আষাঢ়।

—

আগামী আশ্বিন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' পূজা-সংখ্যারূপে মহালয়ার র্বেই বাহির হইবে। মূল্য প্রতি বৎসরের ন্যায় বারো আনা ধার্য হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
প্রিন্টিং প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এ কাজ ব্যক্তিবিশেষের নয়, মিলিটারির নয়; রাষ্ট্রের একারই বা সাধ্য যে, এই মৌলিক আর্থিক ও সামাজিক রিপ্লবসাধন করে। আমরা সকলে চাই, সকলে নিজের মনকে প্রস্তুত করি এবং পরিবর্তনের অনুকূলে ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হই, তবেই স্বাধীন ভারত ধন্য হইবে। নয়তো হাউই বা মত ক্ষণিকের জন্য আলোর খেলা দেখাইয়া, অবশেষে ফাঁকা হাউইয়ের মত তাহা পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিবে।

সেই অপঘাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য চাই স্থায়ী উৎসাহ, ও সাধু লক্ষ্য এবং নূতন ভারত গড়িবার জন্য সংকল্প, পরিশ্রম এবং ত্যাগ দিবার উৎসাহের প্রাচুর্য।

—

এতদিন জানিতাম, যাহার আর কিছু হয় না, সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শেখে, নয়তো ইস্কুলের মাস্টারি করে। আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিক্ষক উন্নত অবস্থা দেখিয়া ইস্কুলগুলি সংস্কারের দিকে আমাদেরও মন গিয়া যাঁহারা অবহেলিত শিক্ষককুলের দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা বলিতেছেন, শিক্ষক নিম্নতম বেতনের হার বৃদ্ধি করা হোক, কেন না, যুদ্ধের কল্যাণে কুলি শিক্ষকের চেয়ে আজ বেশি রোজগার করিয়া থাকে।

বেতনের হার বৃদ্ধি করা যে উচিত, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই কেবল বাধা হইল, ট্যাঁকে পয়সা নাই। গভর্মেণ্টের সমালোচকগণ বলিতেছে কংগ্রেসের এক সময়ে আদর্শ ছিল, দেশের উর্ধ্বতম মাহিয়ানা ৫০০৲-র বেশি হইবে না। আজ মুদ্রাস্ফীতির দরুন না হয় তাহা তিন গুণই হইল, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রগৌরবের অজুহাতে ঋষিতুল্য, এক সময়ে শাকান্নভুক লাটসাহেবকে এত অধিক বেতন দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? সমালোচকগণের এই আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব না। কেবল এইটুকু বলা রাষ্ট্রের গৌরবার্থে রাষ্ট্রপালকে যদি আধিক মর্যাদা বেশি দিতে হয়, তবে সমাজের কল্যাণার্থে শিশু-পাল শিক্ষকদিগকে আমরা ৩৪৲ নিম্নতম বেতন দিয়া অমর্যাদা করিব কেন?

আমাদের ভাঁড়ে যে টাকা নাই, তাহা গান্ধীজী জানিতেন। এবং ইহা হয়তো তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি আমরা অস্ত্রবলের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, তবে আশু ভবিষ্যতে চার আনার জমিদারি রক্ষার

বারো আনা দিয়া পাইক পেয়াদা পুষিতে হইবে। অর্থাৎ দরিদ্র ভারতবর্ষকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর খরচ বৃদ্ধি পাইলে জাতির গঠনমূলক কাজে ভাঁটায় টান পড়িবে।

তাই তিনি অন্য পথ ধরিয়াছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল একটি লক্ষ্য হইল যে, সাত বছর শিক্ষাকালের মধ্যে ছাত্র যে-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া লেখাপড়া শিখিবে, সেই শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের দ্বারা তাহার পড়ার চালু খরচ উঠিয়া যাইবে। সরঞ্জামী খরচ অন্য ভাবে সংগৃহীত হইবে, কিন্তু ছাত্রদল সাত বছরে শিক্ষকের মাহিয়ানা নীয় পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারাই পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। তিনি মনে করিতেন, এ নীতি ব্যতিরেকে দরিদ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার বিপুল বিস্তার কখনও সম্ভব হইবে না।

গান্ধীজীর নীতি, আমরা যতদূর জানি, বাংলা গভর্মেণ্ট মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা 'বুনিয়াদী' নামক এক শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প করিয়াছেন, কিন্তু সে বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র। সেখানেও শিল্পকে আশ্রয় করা হইবে, কিন্তু শিল্পটির লক্ষ্য থাকিবে ছাত্রের সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ সাধন করা, রোজগারের চেষ্টা করিলেই নাকি ছাত্রের সৃজনী-প্রতিভা নষ্ট হইয়া যাইবে! অর্থাৎ লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর সংযোগ ঘটিলেই নাকি শিক্ষার জাত হারাইয়া যাইবে! ইহার অর্থ দাঁড়ায়, আমাদের ছাত্রেরা পরিশ্রমলব্ধ অর্থের উপর নির্ভর না করিয়া পরশ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারাই পুষ্ট হওয়াকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবে। যাহার দ্বারা রোজগার সম্ভব, সেরূপ শিল্প শেখার বিরুদ্ধে এই শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাবের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যাহাই হউক, ইহার ফলে যে শিক্ষাপদ্ধতি গভর্মেণ্টের প্রসাদে বুনিয়াদী নাম লইয়া অবতীর্ণ হইতে চলিয়াছে, তাহার সকল ব্যয়ভার গভর্মেণ্টকেই বহন করিতে হইবে এবং ছাত্রের শ্রমলব্ধ অর্থ রাষ্ট্রের আর্থিক দায়কে হালকা করিতে পারিবে না।

এদিকে আবার গভর্মেণ্টের টাকা নাই, তাই শিক্ষকদের মাহিয়ানার হারও বাড়াইবার উপায় নাই।

এক উপায় আছে। শোনা যায়, কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের অনেক টাকা। অতএব প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি গান্ধীজী-প্রদত্ত 'বুনিয়াদী' নাম দেওয়া যায়, তবে হয়তো গান্ধীভক্তির হাতীর পিঠে চড়িয়া দিল্লী

গান্ধী-চরিত

দিনচর্যা

স্নানের পরেই খাওয়ার পালা। গান্ধীজীর খাওয়ার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি দিনে ছয় পয়সার বেশি খান না। কথাটির মূলে কোন্ উৎপত্তি হইয়াছিল, জানি না; কিন্তু ইহার জন্য গান্ধীজীকে মাঝে মাঝে অকারণ তিরস্কার শুনিতে হইয়াছিল। গান্ধীজী খাওয়ার সম্বন্ধে এই নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন যে, শরীরকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তা দিতেই হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বভাবতই আহারের পরিমাণ এবং অর্থব্যয় বিভিন্ন হইবে। প্রয়োজনকে তিনি যেমন স্বীকার করিতেন, তেমনি এক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন, যেন শুধু স্বাদের লোভে আমরা কোনও খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট না হই। অস্বাদব্রতকে দেশসেবকের পক্ষে পালনীয় ব্রত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন; তাঁহার মতে উহা ব্রহ্মচর্যের সহায়। কিন্তু শুধু অভিমানবশত কঠোরী ব্রতের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহাদেব দেশাই লিখিয়া গিয়াছেন:

Whilst Gandhiji insists, as we have seen, on a village worker living on villager's diet not costing say three annas a day, he is far from insisting on starvation or mortification of the flesh. To a worker who has imposed on himself a strict regimen involving only one meal a day, consisting generally of 15 tolas of rice boiled, *amti* (made of vegetables and *dal*) and butter milk all costing only one anna per day, Gandhiji wrote:

'Your meal is very meagre, it is starvation diet. In my opinion, you are not making full use of the instrument that God has put at your disposal. Do you know the story of the talents that were taken away from him who did not know how to use them, or having known would not use them?

'Mortification of the flesh is a necessity when the flesh rebels against one; it is a sin when the flesh has come under subjection and can be used as an instrument of service. In other words, there is no inherent merit in mortification of the flesh.'—(*Selections from Gandhi*, No. 609)

১৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী যখন বাংলা পরিভ্রমণে আসেন, তখনকার তাঁহার দৈনিক আহারের ফর্দ দিবার পরে আমি নোয়াখালিতে তাঁহার দিনচর্যার বিষয়ে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিব।—

ভোর ৫৷৷০টা—মোসম্বি বা কমলার রস ১৬ আউন্স।
সকাল ৭টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্স ও ফলের রস ৮ আউন্স।
বেলা ১২টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্সকে ফুটাইয়া ৪ আউন্স করা। সিদ্ধ তরকারি ৮ আউন্স। কাঁচা তরকারি ৮ আউন্স, যথা—গাজর, মূলা, টমেটো। কাঁচা পাতা ২ আউন্স, যথা—ধনেপাতা, পালং শাক।
বেলা ২৷৷০টা—ডাবের জল।
বিকাল ৫টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্সকে ফুটাইয়া ৪ আউন্স করা। দুধে সিদ্ধ খেজুর ১০ আউন্স। সামান্য ফল, নারিকেল।

শ্রীরামপুর-নোয়াখালিতে যখন গান্ধীজী অবস্থান করিতেছিলেন, তখনকার আহার কিন্তু অন্য রকম ছিল। ভোরের মধু, গরম জল এবং ফলের রসের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্নানের পর দুপুরে তিনি যাহা খাইতেন, এবার তাহা বর্ণনা করিতেছি।

গান্ধীজীর জন্য রান্না একটি ছোট কুকারে হইত। কুকারটির মধ্যে তিনটি বাটি। একটিতে প্রায় এক পোয়া আন্দাজ তরকারি বাটিয়া তাল করিয়া রাখা হইত, আর একটিতে এক পোয়া বা ৮ আউন্স ছাগলের দুধ। তরকারির মধ্যে ঝিঙে হইতে আরম্ভ করিয়া পালং শাক পর্যন্ত থাকিত। সব জিনিস প্রথমে কুরানি দিয়া কুরাইয়া পরে শিলে বাটিয়া একটি ডেলায় পরিণত করিয়া সিদ্ধ করা হইত। তাহাতে নূন, মশলা অথবা তেল কিছুই থাকিত না; গান্ধীজী তেল আদৌ খাইতেন না।—

ইহা ছাড়া রান্না জিনিসের মধ্যে খাকড়া নামে এক প্রকার কড়কড়ে গুজরাটী রুটি গান্ধীজী নিত্য আহার করিতেন। পাঁচ আউন্স আটাতে পাঁচ গ্রেন খাইবার সোডা ও আড়াই গ্রেন নুন মিশাইয়া ছাগ-ঘৃতের ময়ান ও একটু জল দিয়া খুব কড়া করিয়া মাখা হইত। তাহার পর তাহা বেলিয়া শুধু তাওয়ার উপর শক্ত করিয়া শুকনা সেঁকা হইত। জিনিসটি কড়কড়ে পাঁপরের মত হইলেও ময়ানের গুণে খাস্তা হইত। প্রথম আমরা যখন শ্রীরামপুরে পৌঁছাই, তখন মৌখিক উপদেশ শুনিয়া পরশুরাম ভাল খাকড়া করিতে পারেন নাই। খুব পাতলা করিয়া না বেলার ফলে ভাল সেঁকা হয় নাই। ২৬এ নভেম্বর ১৯৪৬, গান্ধীজী সবে স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া শুনিলেন যে, রান্না

হইয়া গিয়াছে, খাকড়ার আয়োজন হইতেছে। শুনিয়াই পূর্বদিনের খাকড় অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, তিনি খড়ম পরিয়া খটখট শব্দ করিয়া রান্না ঘরে উপস্থিত হইলেন, এবং চাকি-বেলুন লইয়া পরিপাটিভাবে খাকড়া বেলিতে শুরু করিয়া দিলেন। আমরাও শিখিয়া লইলাম এবং ইহার পর আর খাকড়া সম্বন্ধে কোনদিন কোন অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। গান্ধীজীর নানা ছবি তোলা হইয়াছে, কিন্তু রান্নাঘরের মধ্যে তিনি রুটি বেলিতেছেন, এমন ছবি কোথাও দেখি নাই।

খাকড়া ভিন্ন অপর যাহা যাহা গান্ধীজী খাইতেন, এবার তাহার তালিকা দিতেছি।

৮ আউন্স ছাগদুগ্ধের সঙ্গে ১ আউন্স পাতিলেবুর রস। সিদ্ধ তরকারি সঙ্গে তিন চামচ ঈস্ট পাউডার (Yeast)। একটি বাতাবিলেবুর মত বা গ্রেপ ফ্রুট নামক টক লেবুতে দুই চামচ গ্লুকোস মিশাইয়া খাইতেন। কিছু কাঁচা তরকারি, যথা—মূলা, গাজর, ফালি করিয়া কাটা। ইহার পর বেল একটায় একটি ডাব ও তাহার শাঁস খাইতেন। বিকালবেলায় প্রার্থনা-সভায় যাইবার পূর্বে ৪৷৷০টার সময়ে গান্ধীজী আহার করিতেন। তখন আট আউন্স দুধ লেবুর রস না দিয়া, পেঁপে প্রভৃতি ফল ও সকালের মত সিদ্ধ তরকারি। ইহার পর আর তিনি রাত্রে কিছু খাইতেন না।

গান্ধীজীর খাওয়ার মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাইতেন—সময় প্রায় ৪০ মিনিট বা তাহার বেশি লাগিত। তবে ঐ সময়ের মধ্যে তিনি চিঠিপত্রের কাজ অথবা খবরের কাগজ শুনিয়া লইতেন। খাইবার জন্য কাঁটা এবং চামচ ব্যবহার করিতেন। চামচটি সেবাগ্রামে কেহ কাঠের তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন। পান করিবার জন্য, বিশেষত ডাবের জল খাইবার জন্য কাঁচের ছোট একটি নল ছিল, ব্যবহারের পর তাহা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া রাখা হইত। স্বাদের দিকে গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সিদ্ধ তরকারি যাহা খাইতেন, তাহাতে নুন মশলা তো আদৌ থাকিত না। উপরন্তু দুর্গন্ধ ঈস্ট পাউডার মিশাইয়া চামচ দিয়া তৃপ্তিসহকারে তিনি তাহা খাইতেন। এমনও কোন কোন দিন দেখিয়াছি, দুধের সঙ্গে ঐ পদার্থটিকে মিশাইয়া তিনি আহার করিতেছেন।

এক-আধ দিন তরকারি বেশি মনে হইলে প্রয়োজনের মত লইয়া বাকিটা

আমাদের জন্ত রাখিয়া দিতেন। আমরা লবণ, মশলা ও কিঞ্চিৎ ঘৃত সহযোগে তাহাকে গলাধঃকরণের যোগ্য করিয়া তাঁহার অন্তরালে খাইতাম।

চিবাইয়া খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া গান্ধীজীর বাঁধানো দাঁত ছিল। সে দাঁতগুলি খাবার সময়ে পরিলে মুখের গড়ন যেন বদলাইয়া যাইত এবং কথা বলিলে আমাদেরও একটু কান পাতিয়া শুনিতে হইত, কারণ উচ্চারণের কিছু প্রভেদ মনে হইত। খাইবার সময় ছাড়া গান্ধীজী বাঁধানো দাঁত কখনও ব্যবহার করিতেন না। প্রত্যহ বুরুশ দিয়া সেটিকে মাজিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। জিনিসপত্রে গান্ধীজীর বড় যত্ন ছিল। কিন্তু হারাইয়া বা ভাঙিয়া গেলে, যদি সোজাসুজি দোষ স্বীকার করা হইত, তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইতে দেখি নাই।

বিগত আগস্ট (১৯৪৭) মাসে যখন তিনি শেষবার পাটনা হইতে কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার দাঁতের পাটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পাটনায় খবর পাঠানো হইল, শ্রীযুক্তা মৃদুলা সারাভাই সংবাদ দিলেন যে উহা পাটনায় নাই। আমরা প্রস্তাব করিলাম, যে নূতন এক জোড়া এখানে করাইয়া লওয়া হউক। গান্ধীজী কিছুতেই রাজি হইলেন না। বলিলেন, নিশ্চয়ই জিনিসপত্রের মধ্যে কোথাও ঢুকিয়া গিয়াছে। অনেক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন আমার জনৈক ডাক্তার বন্ধুকে সংবাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করিলাম। গান্ধীজী বলিলেন, দাঁতের যে রকম দাম, তাহাতে নতুন করানোর প্রয়োজন নাই। তর্ক-বিতর্কের পর বলিলেন, আচ্ছা, যদি দামের মধ্যে মজুরি বেশি হয়, তাহা হইলে তোমার বন্ধুকে বলিতে পার, আর যদি দাঁত কিনিতে তাঁহার খরচ বেশি হয় তবে সে বেচারাকে লোকসানে ফেলিও না। যখন বলিলাম, ডাক্তার আমার বিশেষ বন্ধু, তখন হাসিয়া লিখিলেন, সেজন্ত তোমার বন্ধুকে সাজা দিও না। সোমবার ছিল বলিয়া লিখিয়াই কথাবার্তা চলিতেছিল। যাহা যাহা সেদিন (বেলেঘাটা, ২৫-৮-১৯৪৭) লিখিয়া দিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতি ও কৌতুকের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

১। Then the set is lying buried somewhere in the luggage. It cannot be lost. I am in no hurry. Do not want to spend money.

২। We must now know what the intrinsic value is. If it is anything approaching what the dentists charge, I wd. love to go without a set. If it

is largely the labour then you may trouble the dentist and see what he can
৬। Who is the man who will do it ?
৪ Don't think of punishing [him] like that. Let us wait and h
from Mridula. I am in no hurry.

যাহাই হোক, অবশেষে গান্ধীজী রাজি হইলেন, এবং সারারাত জাগি বন্ধুবর দাঁত বেলেঘাটাতে বসিয়াই পড়িয়া দিলেন, কারণ পরের দিনই আমাে সকালে নোয়াখালি চলিয়া যাইবার কথা। অবশ্য ঘটনাচক্রে তাহা আর ঘটি উঠে নাই।

খরচের বিষয়ে গান্ধীজী অতি সতর্ক হইলেও, কৃপণ কখনও ছিলেন ন কারণ, আমার মনে আছে, পণ্ডিত জওহরলালকে একবার অত্যন্ত প্রয়োজন চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন হয়। চিঠিখানি যাহাতে গভর্মেণ্টের হাতে না প অথচ অত্যন্ত দ্রুত পৌঁছায়, সেজন্য নোয়াখালি হইতে কুমিল্লা এবং কুমি হইতে বিশেষ পত্রবাহক এরোপ্লেনের সাহায্যে উহা দিল্লী পর্যন্ত লইয়া যা বোধ হয়, একখানি চিঠির ডাক-খরচ কয়েক হাজার টাকা পড়িয়া গে খরচাদির সম্পর্কে গান্ধীজী যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা এক পুরানো লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Because an institution happens to have plenty of funds it does not me that it should anyhow spend away every pice that it possesses. The gold rule is not to hesitate to ask for or spend even a crore when it is absolut necessary and when it is not, to hoard up every pie although one may h a crore of rupees at one's disposal.—(*Selections from Gandhi*, No. 741).

বহুদিন পূর্বে রিচার্ড গ্রেগ নামক জনৈক আমেরিকান, গান্ধীজীকে এ করেন যে তিনি অপরিগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই পুস্তকপাঠ পুস্তকসংগ্রহের বিলাসকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। গান্ধীজী তাঁহা স্বীয় মতামত জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃ করিতেছি।—

As long as you derive inner help and comfort from anything you shou keep it. If you were to give it up in a mood of self-sacrifice or out of stern sense of duty, you would continue to want it back, and th unsatisfied want would make trouble for you. Only give up a thing wh you want some other condition so much that the thing no longer has a attraction for you, or when it seems to interfere with that which is m greatly desired—(*Selections from Gandhi*, No. 150).

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, খাইবার সময়ে গান্ধীজী কিছু কিছু কাজ করিতেন। চিঠিপত্র শুনিতেন বা চিঠি কম থাকিলে তাঁহার নিকট খবরের কাগজ পড়া হইত। নোয়াখালিতে নিয়ম ছিল, খাইবার সময় চিঠি এবং বেলা এগারটায় চরকা কাটার সময়ে খবরের কাগজ পড়া।

খাইবার পরে লোহার গামলাটিতে মুখ ধুইয়া হাত মুখ মুছিয়া গান্ধীজী বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামের সময়ে তিনি শুইয়া থাকিতেন, এবং আমরা তাঁহার পায়ে ঘি মালিশ করিয়া দিতাম। পা জানালার সামনে মেলিয়া তিনি শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেন, আমরা মালিশ করিয়া যাইতাম। গান্ধীজীর পায়ের তলা খুব পরিষ্কার ছিল, এবং ক্রমাগত বগুসা-যুক্ত খড়ম পরার কারণে বড়ো আঙুলের নীচে ও আঙুলের মাঝখানে এবং উপরিভাগে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বয়সের জন্যই বোধ হয়, পা প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত, অর্থাৎ রক্ত চলাচল আমাদের মত অত সহজভাবে হইত না। সেইজন্য ঘি দিয়া ঘষার ব্যবস্থা ছিল। পরে অবশ্য একটি ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া মোছানো হইত।

প্রথম প্রথম আমি যখন মালিশ করিতাম, তখন একদিন ঘুমাইয়া পড়ার পরে মোছানোর সময়ে আঙুলগুলি টানাটানি করিয়া ফাঁক করিয়া মোছাই নাই। ফলে সামান্য তেলা তেলা ভাব থাকিয়া গিয়াছিল। গান্ধীজী ঘুম ভাঙার পর তাহা লক্ষ্য করিয়া ন্যাকড়া দিয়া তাহা পরিপাটিভাবে মুছিতে লাগিলেন এবং আমাকে বলিলেন, তাঁহার ঘুমের কারণেও যেন আমি পা মুছিয়া দেওয়ায় অবহেলা না করি।

বিশ্রামের পর গান্ধীজী চিঠিপত্র লইয়া বসিতেন। যে-সকল চিঠি নিজের উত্তর দিবার প্রয়োজন আছে, সেগুলির উত্তর লিখিয়া নকল করিবার পর বিশেষে ডাকে দিবার জন্য আমাদিগকে দিতেন। চিঠি লেখার মধ্যে একটি কায়দা ছিল। যে-সকল চিঠি আসিত তাহার প্রত্যেক খামখানির প্রান্ত কাঁচি দিয়া কাটা হইত—খামটি ভাল হইলে অর্থাৎ তাহার কাগজ পুরু হইলে, তাহা কাটিয়া একটু ছোট খামে পরিণত করার ব্যবস্থা ছিল। লেখা অংশের উপরে সাদা কাগজ মারিয়া গান্ধীজী পুনরায় উহা ব্যবহার করিতেন। সাথীদের মধ্যে কাহারও উপর ভার থাকিত, সে যেন প্রত্যহ ছয়খানি খাম এইরূপে পুনরায় ব্যবহারের যোগ্য করিয়া দেয়। যে-খাম অচল তাহা কাটিয়া ভিতর পিঠের সাদা

অংশ প্রবন্ধ লেখার জন্য বা অন্য কোনও নির্দেশ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত টেলিগ্রামের উল্টা পিঠ, কোনও চিঠির শেষে অব্যবহৃত সাদা অংশ—কিছু নষ্ট হইত না। গান্ধীজীর কাছে তাহার পুরা ব্যবহার হইত।

চিঠি লেখার কাজ কিছু হইলে বেলা একটায় গান্ধীজী ডাবের জ খাইতেন। এবং কিছুক্ষণের জন্য পেটে, এবং কখনও কখনও কপাল ও চোখে উপরেও মাটির প্রলেপ দিয়া শুইয়া থাকিতেন। মাথার শির তাঁহার ফোলা থাকিত, তাহা ছাড়া ক্রনিক এমিবিয়েসিস (amoebiasis) রোগ তো তাঁহা ছিলই। তিনি বলিতেন, রোগ হইয়াছে বলিয়া নয়, রোগ যাহাতে না হ সেইজন্য প্রত্যহ তিনি মাটির ঠাণ্ডা পটি ব্যবহার করিতেন। শরীর যাহাতে কর্মঠ অবস্থায় থাকে তাহার জন্য যত্ন বা চেষ্টার তাঁহার অভাব ছিল না।

মাটির পটি প্রায় আধ ঘণ্টা থাকিত। সে সময়টুকুর মধ্যেও কিছু কি কাজ হইয়া যাইত। একদিন জনৈক ফরাসী সাংবাদিক ওই সময়ে তাঁহা সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া গেলেন। কিন্তু সচরাচর তখন কথাবার্তার সময় ছি না। বেলা তিনটা নাগাদ গান্ধীজী সূতা কাটিতে বসিতেন। সেই সম কেহ না থাকিলে খবরের কাগজ পড়া হইত। জরুরী সাক্ষাৎকারের প্রয়োজ থাকিলে ঐ সময় হইতে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষা করিবার সময় ধার্য করা হইত। সে বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করি

গান্ধীজী একটি বিষয়ে বড় বিরক্ত হইতেন। ঘরের বাহির হইতে কে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, অথবা জানালার খড়খড়ি তুলিয়া তিনি কি করিতেছেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে, ইহা জানিতে পারিলে তিনি ডাকি বলিতেন, ভাই, যদি কোনও দরকার থাকে ভিতরে আসিয়া ব'স। এমন হইয়াছে যে, কেহ কেহ শুধু তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। আম তাঁহাদের সুযোগ বুঝিয়া ঘরে বসাইতাম, তাঁহারা কিছুক্ষণ কর্মরত গান্ধীজীকে দর্শন করিয়া দূর হইতে প্রণাম জানাইয়া চলিয়া যাইতেন। গান্ধীজীও হা তুলিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেন, এবং খুশিমনে আপন কাজে লি থাকিতেন। এক-আধদিন খাঁর কাজে ব্যস্ত আছেন, প্রণাম লক্ষ্য করেন না সে জন্য কাহাকেও কাহাকেও বিরক্ত হইতে দেখিয়াছি। আবার প্রা মেয়েদের দেখিতাম, তাঁহারা বাহির হইতে শুধু দর্শন করিয়া উঠানে দাঁড়াইয় দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীরামপুরে একদিন কাজের তাড়াহুড়ায় ব্যস্ত রহিয়াছি, কয়েকজন গ্রাম্য-ক গান্ধীজীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলেন। ন্ধীজী তাঁহাদিগকে হিন্দীতে কিছু বলেন, সম্ভবত বসিতেই বলিয়াছিলেন, হারা বুঝিতে পারেন নাই এবং যেমন ভাবে ছিলেন, তেমন ভাবেই রহিয়া লেন। অল্পক্ষণ পরে আমি আসিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, Are ey observing my asinine qualities? বুঝিলাম, গান্ধীজী বিরক্ত য়াছেন। আগন্তুক বন্ধুদের বুঝাইলাম, তাঁহারা যদি দর্শন করিতে চান রের মধ্যে আসুন। তাঁহারা কথাটা বুঝিয়া ঘরে মাদুরের উপরে কিছুক্ষণ ীরবে থাকিয়া দণ্ডবৎ করার পর প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

বিষামৃত

কারো বা আকাশে গ্রীষ্ম ; স্মরভস্ম হর-কোপানলে—
সূর্য যেন শংকরের ক্রোধোদ্দীপ্ত তৃতীয় নয়ন ;
কারো বা বিরহ নামে আষাঢ়ের দুরন্ত বাদলে—
শূন্য মন্দিরের বুকে নিদ্রাহারা কণ্টক-শয়ন।
কারো ভাগ্যে বর্ষা-রাতে প্রেয়সীর অভিসার চলে,
রতিরঙ্গ প্রজাপতি ব'চে যেন বাসর-মিলন ;
আষাঢ়ের বিভাবরী ঘন হয় বরমাল্য-গলে,—
পুষ্প আর পুষ্পতন্ধু,—স্পর্শরসে একই আস্বাদন !

সমুদ্র মন্থন ক'রে উঠেছিল কমলা-বসুধা,
মৃণ্ময় রসের ভাণ্ডে জমা তার অমিয়-গরল ;
সম্ভোগের শেষ নেই, যত তৃপ্তি তত বাড়ে ক্ষুধা,
বিরহ-মিলন-চক্রে মর্ত্যলীলা চলে অবিরল :
কারো বা কপাল-গুণে কণ্ঠ জুড়ে শুধু হলাহল,
কেহ বা জীবনভরে অবহেলে পান করে সুধা।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

৪

মন্দাকিনী খুব ভোরেই উঠেছেন সেদিন। উঠেই প্রথমে তিনি গে খুঁটেগুলো দেখতে। কাল রাত্রে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, খুঁটেগুলো কি গোবর হয়ে গেল বোধ হয়। গিয়ে দেখেন, খুঁটেগুলো ভিজে তো গে একপাল গোশালিক এসে তছনছ করছে সেগুলোকে। ঠুকরে মাড়িয়ে চীৎ চেঁচামেচি ক'রে কি কাণ্ডই যে বাধিয়েছে মুখপোড়ারা। নিরুপায় ক্ষোভে চোখে জল এসে গেল যেন। একে আজকাল কয়লা কাঠ কিছুই পাওয়া না, চাকর-বাকর নেই, ঠিকে ঝি এবেলা ওবেলা কোন রকমে বাসনটা মে দিয়েই পালায়, নিজের হাতেই কাল খুঁটে দিয়েছিলেন। সমস্ত ভিজে গে গোশালিকগুলো নিমগাছটার উপর ব'সে কলরব করছিল, সেদিকে এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গেলেন তিনি সুন্দরীর গোয়ালে। গোয়ালেও দেখলেন, তা আনন্দজনক নয়। গোয়ালের চাল ছাওয়ানো নেই ভাল, ক' সুন্দরী সমস্ত রাত ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাছুরটার সারা গায়ে গোবর। সুন্দ পিছনের পা দুটোও গোবরে মাখা। সব পরিষ্কার করতে হবে নিজেকে। হ যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চারিত হ'ল তাঁর; উৎসাহের উৎ অবারিত হ'ল সহসা; নিজের অজ্ঞাতসারেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে পুলকি হয়ে উঠলেন তিনি। খাদ্য পেলে পুলকিত হয় যেমন ক্ষুধার্ত, কাজ পেলে তেম আনন্দিত হন মন্দাকিনী। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তিনি বাছুরটাকে সরি বাঁধলেন, সুন্দরীকে বাইরে বার ক'রে দিলেন। আমগাছটার দিকে এক চাইলেন, খুব মুকুল এসেছিল, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল সব। ক্ষণকাল ধৌত-প মুকুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, পাপে ভ'রে রে পৃথিবী, তাই এই সব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। গরুর দুধ নেই, খেজুরগুড়ে গন্ধ বে অসময়ে বৃষ্টি। সুন্দরীকে বেঁধে গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। রান্নাঘরের একটা উ পরিষ্কার ক'রে নিকিয়ে কাঠের জ্বালে চা করতে হবে। নিজের জন্যে নয়— জন্যে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে উনুনে ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে চান কর যাবেন তিনি। ততক্ষণ ঠিকে ঝিটা এসে যাবে, বাজার ক'রে আনবে, তাক বাসন মাজবে, জল তুলবে, ঘরদোর পরিষ্কার করবে। ততক্ষণ মন্দাকিনীর স সারা হয়ে যাবে, পুজোও সারা হয়ে যাবে। তারপর পাথরের গ্লাসে ক'রে এ পুরো গ্লাস চা খাবেন তিনি। চা খেয়ে তারপর বাকি রান্নাটা করবেন।

ল যাবে। আনন্দবাবু তো চা খাবার পরই রোজ বেরিয়ে যান বাইনাকুলার তে ক'রে পাখি দেখতে। বারোটার আগে কোনও দিন ফেরেন না। এই য়টুকুর মধ্যে মন্দাকিনী টুকিটাকি নানা কাজে করেন। সুন্দরীর তদারক রন, খাবার করেন, বিকেলের জন্য পরোটা তরকারি করতে হয়, মাঝে মাঝে একটা শৌখিন খাবারও করেন জিনিসপত্র ফেলে। কাল গোয়ালার কাছ কে দুধ কিনে ক্ষীর ক'রে রেখেছেন রাত্রে, আজ মালপোয়া করার ইচ্ছে ছে। সোৎসাহে তিনি উনুন পরিষ্কার করতে লাগলেন। পরিষ্কার ক'রে ঠের ঘরে গেলেন কাঠ আনতে। কাঠের ঘরের চালাটাও শত-ছিদ্র, জল ড়ে সব কাঠ ভিজে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু কাঠ নিয়ে লন তিনি, পুরোনো খবরের কাগজ আর সামান্য কেরোসিন তেল দিয়ে লেন সেগুলো। একটু ধ'রেই নিবে গেল আবার। বেশি কেরোসিন দিলে র যেত। কিন্তু উনুন ধরাবার জন্যে বেশি কেরোসিন আজকাল খরচ করা ণ না। পয়সা ফেললে বাজারে মিলবে না। রাত্রে পড়াশোনা করবার রার জন্যে ওঁর তেল চাই। শুয়ে শুয়ে না পড়লে ঘুমই হয় না। যত সব অভ্যাস! ঘরে আলো জ্বললে তাঁর তো ঘুমই আসে না। এই দুঃখে ওঁর ছে শোওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি আজকাল। পাশের ঘরে শোন। উনি া ঘরে পড়েন শুয়ে শুয়ে। কখনও বা উঠে লিখতে ব'সে যান। অদ্ভুত ুষ! না, কেরোসিন আর খরচ করা চলবে না। হেঁট হয়ে উনুনে ফুঁ তে লাগলেন আর গজগজ ক'রে গাল পাড়তে লাগলেন। আনন্দমোহনকে নিজের অদৃষ্টকেও নয়, বিধাতাকে। মন্দাকিনীর ধারণা, ওই মুখপোড়াই মি ক'রে মাঝে মাঝে গোলমাল ক'রে দেয় সব। খোকনের প্রতি তাঁর যে নাভাব, বিধাতার প্রতিও তেমনই। এও তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস, শত মি সত্ত্বেও খোকনকে যেমন শেষকালে হার মানতে হয় তাঁর কাছে, ধাতাকেও তেমনই হবে। সেই ছেলেবেলায় পুণ্যি-পুকুর থেকে শুরু ক'রে জ পর্যন্ত তিনি যে পথে নিষ্ঠাভরে চ'লে এসেছেন, সেই পথেই তিনি লক্ষ্যে ীছে যাবেন। বিধাতার সাধ্য নেই, তাঁকে আটকায়। মাঝে মাঝে তিনি মি ক'রে পথের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন—মনের জোর আছে কি না ীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু ওসবে দমবার লোক মন্দাকিনী নন। কিন্তু মি করার তো একটা সীমা থাকা উচিত, অসময়ে বৃষ্টি ক'রে শুকনো

কাঠগুলো তিজিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের চোখকে ধোঁয়ায় জ্বালিয়ে দেওয়ার মা হয় কোনও? মন্দাকিনী হেঁট হয়ে হয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগলেন।

কবি সকালে উঠে মুখ-ধুয়েই গিয়েছিলেন ছাতে। মনটা খুব প্রসন্ন ছি অকারণ পুলকে ঝলমল করছিল সমস্ত অন্তঃকরণ। মোটা মোটা ঠোঁট দুটো কুঁচকে শিস দেবার চেষ্টা করলেন একটু। রাত্রের বৃষ্টিতে সব মলিনতা ধু গেছে যেন। গাছপালার শ্যামশোভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দো পাখিটা ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে ব'সে ডেকে চলেছে অবিরাম। কি একটা ব'সে আছে টেলিগ্রাফের তারে। নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসল একট কালো কালো দুর্গাটুনটুনিরা ডাকছে ক্রমাগত। হঠাৎ চোখে পড়ল, উত্ত দিকে ক্ষান্ত-বর্ষণ একটা মেঘ লম্বিত রয়েছে, তাতে রোদের আভা লেগেছে, ম হচ্ছে একটা অপরূপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। মনে পড়ল কুমারসম্ভবে শ্লোক—

বত্রাংশুকাক্ষেপ বিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্
দরীগৃহদ্বার বিসর্পিবিদ্যুদ্ভিরুরিণ্যো জলদা ভবন্তী।

কল্পনায় জেগে উঠল, হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে নগ্না কিন্নরীকুলের লজ্জা-নিবারণে জন্য মেঘ যবনিকার মত ঢেকে দিয়েছে গুহামুখ। অদ্ভুত কল্পনা কালিদাসের স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেদিকে। গিটকিরিভরা এক ঝাঁ সুর আছড়ে পড়ল সহসা তাঁর চেতনায়। উজ্জয়িনী থেকে ফিরে আসতে হ' নেমে পড়তে হ'ল হিমালয় থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন, নিমগাছে উপর একঝাঁক পাখি ডাকছে। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন নিজের তেতলা ঘরটিতে। দূরবীনটা নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। জানলা ভিতর দিয়ে নিমগাছটা স্পষ্ট দেখা যায় আরও। বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে গোশালিকের ঝাঁক। গোশালিকের এত রূপ! এত সুর তার কণ্ঠে! গোশালিকের দল একটু আগে মন্দাকিনীর ক্রোধের কারণ হয়েছিল, তারা আগাল কবির মনে কবিতা।—

রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা
ও গোশালিক, দেখতে পেলাম
তুচ্ছ তো নও, রূপান্বিতা।

দেখতে পেলাম ভোরের আলোয়
মানিয়েছে বেশ সাদায় কালোয়
ঠোঁটে তোমার রঙ মেহেদি
চোখ মেলে তো দেখিই নি তা।

দোয়েল শ্যামা বুলবুলিরা
সুর-গরবে অহঙ্কারী
শুনুক তারা কণ্ঠে তোমার
উঠছে সুরের কি ঝঙ্কারই

অতি-চেনার বোরখা প'রে
দাঁড়িয়েছিলে ঘরের দোরে
বেরিয়ে এলে বোরখা খুলে
অর্থ টা তার বলবে কি তা?
রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন। ক'রেই বললেন, তোমার ভীমরতি ধরেছে নাকি! রাঁধুনী বামুন রাখতে চাইছ, টাকা কোথায় ত?

রাঁধুনী বামুন!

স্বপ্নলোক থেকে নেবে এলেন কবি এবং নেমে এসেই সচেতন হলেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে।

একটা মৈথিল বামুন এসেছে। বলছে, তুমি নাকি রূপচাঁদবাবুকে লেছিলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই খরচই কুলোতে পারছি না, আবার মুন কেন?

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন কবি।

বললেন, হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে রূপচাঁদকে। এসেছে বামুন? রাখ না। খেটে খেটে মরবার যোগাড় হয়েছে যে।

মন্দাকিনী মনে মনে প্রীত হলেন একটু। মুখে কিন্তু বললেন, খাটলে বার মানুষে মরে নাকি? কাজকর্ম না থাকলে সমস্ত দিন করবই বা কি?

কাজের ভাবনা কি ? এস না, দুজনে মিলে পাখি দেখি। কি অদ্ভুত হয়েছে।—হেসে ফেললেন মন্দাকিনী। নাও, চা-টা খেয়ে নাও; পেয়ালা নিয়েই যাই।

কবি ডিশে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। চলকে খানিকটা চা গেল কাপড়ে।

ধমকার দিয়ে উঠলেন মন্দাকিনী, আবার কাপড়ে চা ফেললে তো! কাপড়গুলোতে দাগ হয়ে গেছে। চায়ের দাগ সহজে কি উঠতে চায় ?

কবি হেসে বললেন, ওঠাবার দরকার কি, থাক্ না।

ওসব নোংরামি আমি দেখতে পারি না।

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। গোশালিকের কলরব আরো উদ্দাম হয়ে উঠল, নিমগাছে। কবির চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমস্ত চা-টা ডিশে ঢেলে এক নিমিষেই পান ক'রে ফেললেন সবটা।

বামুনটাকে রাখ, বুঝলে ? পাখি যদি একবার দেখতে আরম্ভ কর, হ'লে বুঝবে, কি চমৎকার জিনিস ও। এই গোশালিকই এতদিন অচেনা আমার কাছে।

কবি হঠাৎ একটা প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তুলে চাইলেন তাঁর দিকে। মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগল, গোশালিকের মধ্যে তিনি যে অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন রূপ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর প্রৌঢ়া গৃহিণীর মধ্যে হয়তো তিনি আজ তেমনই আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন সঙ্গিনীকে, যে শুধু সন্তানের জননী নয়, সংসারের কর্ত্রী নয়, যে তাঁর কবি-মানসের বিবিধ কি খেয়ালের সহচরী। মন্দাকিনীর উত্তর শুনে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হ'ল তাঁকে।

ঝ্যাঁটা মারি আমি গোশালিকের মুখে। সমস্ত মুঁটেগুলোকে ঠোঁট ঠুকরে, নখ দিয়ে খুঁড়ে তছনছ করেছে একেবারে।

ও বেচারাদের চ'রে খেতে হবে তো। ওদের তো আর পেনশন আমার মত।

এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না মন্দাকিনী। যে কোণে যে ফুল-ঝাড়ুটা রাখা ছিল, সেটা নিয়ে তিনি কবির বই-রাখা শে

(৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩

ত্রিবেদের কর্মক্ষেত্রে

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। হরপ্রসাদ ত্রী এক স্থলে বলিয়াছেন :—"রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান য়া গিয়াছেন, একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি হত্য-পরিষদের মন্দির।" কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

"১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ [১৮৯৩, ২৩এ জুলাই] তারিখে শোভাবাজারের ক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে ও আশ্রয়ে বীম্‌স্ হবের প্রস্তাব [১২৭৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' দ্রষ্টব্য] কার্য্যে পরিণত বার জন্য 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেঞ্চ ডেমি ইহার আদর্শ ছিল, এবং শ্রীযুক্ত লিওটার্ড নামক একজন ফরাসী লোক এই সভা-স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহারাজ-কুমার য়কৃষ্ণ বাহাদুর এই সভার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদক লন।...

"একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য লয়ন পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ।...সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল াডেমি অব লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ াজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ াজিবহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-হত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি লিটারেচার এই নাম-সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র-বটব্যাল এম. এ., সি. এস মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে াডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম গৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব ারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির ত থাকে। ফল কথা, ইংরেজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে ায়, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির

উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন।...সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থা ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ [২৯ এপ্রিল ১৮৯৪] রবিবার অপরাহ্ণে পূর্বোল্লিখি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন।...ফলতঃ ওই ১৭ই বৈশাখে অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে (১৫শ ও ১ম বার্ষিক বিবরণী)

বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরি হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৪ই শ্রাবণ (২৯ জুলাই ১৮৯৪) তারিখে রামেন্দ্র সুন্দর পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। পরবর্তী ২৪এ অগ্রহায়ণ অন্যত সম্পাদক-রূপে তিনি পরিষদের কর্মে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরিষদে আকৃষ্ট করেন তাঁহার বন্ধু ও প্রতিবেশী রজনীকান্ত গুপ্ত; তিনি তখ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন :—"ছয় বৎস পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম তদবধি পরিষদের সম্পর্কীয় সকল কার্য্যসম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলা ('সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭)।

"দিনে দিনে পরিবর্ধমান শিশু পরিষৎকে ধাত্রীক্রোড় হইতে বাহির করি মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত," এই চিন্তা রবীন্দ্রনা রামেন্দ্রসুন্দর, সমাজপতি প্রমুখ অনেকেরই মনে উদয় হইতেছিল। ইহার ফ ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০) তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন হইতে ১৩৭।১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে ভাড়াটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থান পরিবর্তনের ফলে পরিষদের সভ্য-সংখ্য আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভাড়াটিয়া বাড়ীর কয়েকখানি সংকীর্ণ ঘরে স্থা সঙ্কুলান হইবার কথা নয়। কি করিয়া পরিষৎকে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত কর যায়, এই চিন্তাই তখন প্রবল হইল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পরিষদের কয়েকজন বন্ধু কাশীম বাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর শরণাপন্ন হইলেন মহারাজও তাঁহাদের বিমুখ করিলেন না, হালদীবাগানে আপার সারকুলা রোডের উপর প্রায় ৭ কাঠা জমি দান করিলেন। মন্দির নির্মাণের আয়োজ চলিতে লাগিল। পরিষদের অক্লান্ত কর্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী একদিন রামেন্দ্র

বুকে বলিলেন, আপনার কল্পনা-মত পরিষদ্-ভবন নির্মাণ করিবার মত টাকা থায় ? উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠেন, দেশের কাজে যদি কা না পাওয়া যায়, তা হ'লে চলুন, সব বন্ধ ক'রে আমরা বাড়ী গিয়ে ব'সে কি। অর্থাভাবে পরিষদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে, এ চিন্তা রামেন্দ্রসুন্দরের কট অসহ্য ছিল। টাকা সংগ্রহ হইতে লাগিল, এজন্য রামেন্দ্রসুন্দর ভিক্ষাপাত্র ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেও সংকোচবোধ করেন নাই। একমাত্র তাঁহারই ষ্টায় লালগোলা-নিবাসী রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মন্দিরের দ্বিতল নির্মাণের দ্বয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (৬ ডিসেম্বর ১৯০৮) নবনির্মিত মন্দিরে রিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন রামেন্দ্রসুন্দরের আনন্দ-ছল মূর্তি ভুলিবার নহে ; তিনি প্রাণের কামনা ব্যক্ত করিয়া ওই বৎসরের র্ষবিবরণীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের সম্মিলনকেন্দ্র-রূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের রতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ বার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন, এবং দেশ মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা দশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীত কালের মহাপুরুষগণের স্মরণ-দর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত বে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ বে, পরিষৎ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য বর্ত্তমান কালে াতীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধারসাধন হয়, াহা সাহিত্যের বলেই হইবে, এ কথা ধ্রুব সত্য।" (১৫শ সাংবৎসরিক র্ষবিবরণী)

রামেন্দ্রসুন্দর যখন পরিষদে যোগদান করেন, তখন উহার শৈশবাবস্থা। ছই দিন গিয়াছে, তিনি উহাকে বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যুকাল র্যন্ত পরিষদ্ই তাঁহার ধ্যান-ধারণা ছিল। তাঁহার একখানি পত্রে আছে :— ামি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের কাঙ্ক্ষা।" পরিষদে তাঁহার কার্যকালের হিসাব এইরূপ :—

১৩০১, ২৪ অগ্রহায়ণ	...	অন্যতর সম্পাদক
১৩০২-৩	...	কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য
১৩০৪-৫	...	আয়ব্যয়-পরীক্ষক
১৩০৬-১০	...	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩১১-১৮	...	সম্পাদক
১৩১৯	...	অসুস্থতাবশত সাময়িকভাবে অবসর গ্রহ
১৩২০-২১	...	কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য
১৩২২	...	সহকারী সম্পাদক
১৩২২, ৩১ ভাদ্র—১৩২৩	...	সহকারী সভাপতি
১৩২৪-২৫	...	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩২৬, ১৮-২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ দিন)		সভাপতি

পরিষদের অনুষ্ঠিত প্রায় সকল সৎকর্মের মূলেই রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রবর্তনে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্ণয়ে পরিষদের যে চে সে চেষ্টা প্রধানত রামেন্দ্রসুন্দরেরই চেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্যের আলোচনার প্রবর্তনে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ যে সাফল্য লা করিয়াছিলেন, সে সফলতার মূলেও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব বিদ্যমান ছিল এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"সাহিত্য-পরিষদের জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যাল আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় সে আবেদন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বাঙ্গালা সাহিত্য যে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, তাহা স্বীকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দ বা পরীক্ষা গ্রহণ প্রকৃষ্টভাবে চলিতে পারে, এ কথাও তখন অনেকের নিব উপহাস্য হইয়াছিল। উক্ত আবেদনে কেবল এইটুকু ফল হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছিলেন, ফাষ্ট আর্টস ও বি-এ পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন সম্প্রতি নব সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য-পরিষদের তাৎকালিক প্রার্থনা প্র সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। সম্প্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মের ফলে মধ্যপরীক্ষায় ও বি-এ পরীক্ষ বাঙ্গালা সাহিত্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ও অবশ্য শিক্ষণীয় বলি

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে, বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই উত্তর লিখিতে পারিবেন, ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।...সাহিত্য-পরিষৎ আশা করেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সহিত এমন দিন আসিবে যে, উচ্চশিক্ষার বিষয়ীভূত যাবতীয় শাস্ত্র, যাহা এখন ইংরাজীতে অধীত ও অধ্যাপিত হয়, তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং পরীক্ষা গ্রহণ সমস্তই আমাদিগের মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হইবে।" (১৫শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী)

মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ও অবিচলিত শ্রদ্ধা-বুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে যে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এ কথা রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন আর এই জন্যই তিনি পরিষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছিলেন—

"রামেন্দ্রবাবুর অনুবাদিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, এই বিশাল বিচিত্র সৃষ্টি প্রজাপতির বিরাট্ আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাপতি আত্মবলি দিয়াছিলেন বলিয়াই এই সৃষ্টি সম্ভাবিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবেদী-মহাশয়ের জীবন-ব্রতের মধ্যেও ঐ জাতীয় আত্মত্যাগের আমরা নিদর্শন পাই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষদের জন্য নিজেকে বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিশাল আত্মত্যাগের উপরই পরিষদের অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠিত। রামেন্দ্রসুন্দর যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া, একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পরিষদের সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষদের এত সমৃদ্ধি ও সার্থকতা, এত প্রসার ও প্রতিপত্তি, ইহার মূলে রামেন্দ্রসুন্দরের বিপুল আত্মত্যাগ।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

১৩১২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গব্যবচ্ছেদের সংবাদ ঘোষিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর তখন পরিষদের সম্পাদক। তিনি মাঝে মাঝে সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া পরিষদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানাইলেন, "বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি

সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বাপ কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এ কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙলা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙালী জাতিকে যথাসভ জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষি অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠি করিলে কার্য্যটার সুসনা হইতে পারে।"* প্রস্তাবটি রামেন্দ্রসুন্দরের মো জন্মাইয়াছিল। তিনি পরিষদের ১৩১২ সালের কার্য্যবিবরণে এই প্রসঙ্গে যা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্ব্বোৎক উপায়। বঙ্গবিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্টভা উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভি নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-সেবীদিগের মিলন-সাধ এবং বাঙলার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবি তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গ ভাদ্র মাসে টাউনহলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রন ঠাকুর মহাশয় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন প্রস্তাবকর্ত্তার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝা গিয়াছিল যে, বিলাতের British Association for the Advancement of Science তাঁহার প্রস্তাবে আদর্শ ছিল। ঐ সমাজ কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করেন; পরিষ এই উপলক্ষে বঙ্গের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা করিবেন, এ মাত্র প্রভেদ ছিল।"

রামেন্দ্রসুন্দর একবার যে কাজের ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্প না করিয়া ছাড়িতেন না, কোন বাধা-বিঘ্নই তাঁহার সঙ্কল্পকে টলাইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লোকবল ও ধনবল আম অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণ শক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠা প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহুরাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে।"

* অভিভাষণ: 'মানসী', বৈশাখ ১৩২১, পৃ. ৪২০।

রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সাহিত্যবান্ধব কাশীমবাজারাধিপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে ১৩১৪ সালের ১৭ই-১৮ই কার্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন—রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির অভিভাষণের পর পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অপূর্ব রচনাটি পাঠ করিয়াছিলেন, স্থানাভাবে তাহার কিয়দংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল-বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল-বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন।...সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি দল বাঁধিতে চান, আমরাই বা দল না বাঁধিব কেন?...আমাদের বন্ধুগণ, যাঁহারা নানা স্থানে নানারূপ দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন।...আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা দল বাঁধিয়া কি করিব? আমরা কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় পাইব? আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে?

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য আছে। কোন শরীরী জড়পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাব-পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। আমরা ভবের হাটে বেচা-কেনা লেনা-দেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহার মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধুঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া আমরা বিচরণ করি না; আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়া বেড়াই। এই উড্ডয়ন-কার্য্যে আমাদের আর কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য, এই পরিশ্রম-স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কেন না, এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য।...

বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর

পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি, সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন; রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্য-স্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।

বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন্ পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি?...জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালী ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা, যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্ত্তিকথা লইয়া জগতে সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না। নাই বা হইলাম তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গালার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ সুরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।...

বিধাতা কি মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নূতন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার

গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে।...

"বন্দে মাতরম" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই।... সে মূর্ত্তি মায়ের ষোড়শী মূর্ত্তি, মা যাহা ছিলেন, অথবা কমলা মূর্ত্তি, মা যাহা হইবেন। এই মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তি-বিহ্বল-স্বরে ডাকিয়াছিলেন,—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্য-সেবীমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে।...

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিতে পারে। এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা এই সাহিত্য-সম্মিলনকে বঙ্গের দুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিবেন; কেহ বা ইহাকে সাহিত্যিকগণের স্বার্থরক্ষিণী সভায় পরিণত করিতে চাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গালা সাহিত্যের আবর্জ্জনা অপসারণের জন্য সম্মার্জ্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অপভাষা নির্ব্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের সহিতই আমার সহানুভূতি

আছে। এ সকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আমরণ সকলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।...

যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।...কিন্তু আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চ্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।"

জাতীয় চিত্রশালা: রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধে একটি সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সাহিত্য-পরিষদের সম্প্রতি একটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, সে আকাঙ্ক্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে জানাইতে চাহি।...সাহিত্য-পরিষৎ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, সেইখানে বসিয়া আমরা রঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপ আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে, বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতেলেখা প্রাচীন-পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে।...

মন্দিরের অন্য স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব।...

আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইবে।...

আর এক স্থানে বাঙ্গলার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্ম্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে।...

বাঙ্গলার বিখ্যাত জমিদার-বংশের ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে পারিব। বাঙ্গলার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব।...

এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি।"

রামেন্দ্রসুন্দর কেবলমাত্র এই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইয়াই নিবৃত্ত নাই; তিনি অনতিবিলম্বে—১৩১৬ সালে নবনির্ম্মিত পরিষদ্-মন্দিরের টি প্রকোষ্ঠে ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য চিত্রশালার সূচনা য়াছিলেন। বাঙালীর নিজস্ব চিত্রশালা স্থাপনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। দরিদ্র সাহিত্যসেবী লোকবল জোগাইতে পারে,—ধনবল তাহাদের থায়? এই জন্য ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে (২ ফাল্গুন ১৬) পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর 'সারস্বত-ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পুনরায় পন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন যখন কাশীমবাজারে আহূত হয়, সেই অধিবেশনের প্রথম দিনে আমি সেই সমবেত সাহিত্য-সেবকগণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম।...তার পর দুই বৎসর গত হইল, কিন্তু আমাদের সেই মানস-স্বপ্ন, বঙ্গের সেই সারস্বত-

ভবন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু যে সারস্বত-ভবনে যে সকল উপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহার সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।...

কাশীমবাজার-সম্মিলনে যে সংকল্প হইয়াছিল, আপনারা সে সংকল্প-সমাধানে সাহায্য করুন। সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সে সঙ্কল্পিত সারস্বত-ভবন রমেশ-ভবন নামে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিনিদর্শনরূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান রমেশচন্দ্র যে দিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষপাতী বন্ধুগণ সেই দিনকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের সূচনার দিন মনে করিয়া শ্লাঘাবোধ করেন।...আমি সাহিত্য-পরিষদের আদেশক্রমে রমেশচন্দ্রের স্মৃতিবিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সারস্বত-ভবন অপেক্ষা যোগ্যতর স্মৃতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না।...রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত-ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতীভবন,—সেই রমাভবন সেই রমেশভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, অট্টালিকা নির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর-নির্ম্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব। বঙ্গের সরস্বতী কুটীরমধ্যেই চিরকাল অর্চ্চনা পাইয়াছেন; বঙ্গলক্ষ্মী কুটীরসঞ্চিত শস্যসম্ভারের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন; বঙ্গসন্তান রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কুটীর-কল্পনাও অযুক্ত হইবে না।" ("রমেশ-ভবন" 'সাহিত্য,' চৈত্র ১৩১৬)

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণের কামনা ব্যর্থ হয় নাই। ১৩২১ বঙ্গাব্দে কাশীম-

গারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রমেশ-ভবন নির্মাণের জন্য পরিষদের ৭৫ সাত কাঠা ভূমি দান করেন। অনেকের নিকট হইতে অর্থসাহায্যও ওয়া গিয়াছিল। কিন্তু মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দরের ডাক য়াছিল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের একতল ও ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তলের নির্মাণকার্য সমাধা হইয়াছে।

সম্মিলনে সভাপতিত্ব ঃ ১৩২০ সালের ২৭-২৯ চৈত্র কলিকাতা টাউন-ল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সম্মিলনে ন্তান-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অভিভাষণে তিনি যে-সকল য়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও সেগুলি সমানভাবে যোজ্য। আমরা তাঁহার ভাষণ হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দেশের মধ্যে যে একটা নূতন হাওয়া বহিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই এ দেশের কতিপয় বিজ্ঞানসেবী যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এত কাল আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। দূরদেশে কে কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, গলা বাড়াইয়া দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতাম; কে কি নূতন কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকিতাম। যাহা দেখিতাম এবং শুনিতাম; তাহাই প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কর্তব্য শেষ হইল, ইহাই আমরা জানিতাম। এইরূপে দেখিয়া এবং শুনিয়াই আমাদের জীবন ধন্য হইল মনে করিতাম। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার আমাদের দ্বারা যে হইতে পারে, সে ক্ষমতা যে আমাদের থাকিতে পারে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। বোধ করি এখনও বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, Asiatic Society-র তাৎকালিক সভাপতি Sir Alexander Pedler কতকটা ক্ষোভের এবং কতকটা তিরস্কারের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, Asiatic Society-র কাগজপত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এদেশের লোক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একান্ত অক্ষম। বিশ বৎসর একটা জাতির জীবনে অধিক দিন নহে, কিন্তু Asiatic Society-র এখনকার সভাপতি বোধ হয় সেইরূপ

মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। Asiatic Society-র পত্রি
বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রমাণ পাওয়া যাইত না, পাশ্চাত্য দেশের বি
বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকা উদ্ঘাটন করিলেই আজকাল তাহার প্রচুর প্র
পাওয়া যাইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য উপা
নাই, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমুদীতে এই সভা প্রদীপ্ত হইতেছে। সভায়
আর যে সকল নমস্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণকে সমবেত দেখিতেছি, তাহাতে কে
এই সাহিত্য-সম্মিলনী যে দীপ্তি লাভ করিয়াছে, এমন নয়, বঙ্গদেশের
সাহিত্য-কেন্দ্র হইতে যে আলোকের বিকিরণ আরম্ভ হইয়াছে, এবং য
ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া দেশ বিদেশে প্রতিফলিত হইবে, তাহা
করিয়াই আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গের এই ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানি
মণ্ডলীকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গজননীর আশীব
তাঁহাদের মস্তকের উপরে মঙ্গল-পুষ্পের ন্যায় বর্ষিত হউক। যে আশ
আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছি, তাহা আ
জীবনের এই অপরাহ্ণ কালে ভগ্নদেহে সামর্থ্য দান করিবে। পৃথি
নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অধঃশয্যায় শয়ানা আমার প্রাচীনা জননী ধূলি
পরিত্যাগ করিয়া গৌরবের মুকুট পরিয়া জগতের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়
হইবেন, এই আশা অন্তিম দিনে আমার বলাধান করিবে।...

বিজ্ঞানমন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, ত
অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জ
নিকট তাঁহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ ক
করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অস
নরনারী মন্দিরের বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ত
তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকে
যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী
ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বস্তুতই নিষ্কাম ধর্ম্ম। ফ
তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই।
কিন্তু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বি
করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্ব্বাচন চলিবে না
বিজ্ঞানবিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না,

চেষ্টায় কোন লাভ আছে কি না, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে Scienceকে popularise করা চলে কি না এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও Lord Kelvin অথবা P. G. Tait Herman Helmholtz, William Kingdom, Clifford প্রভৃতির মত ভাস্বরদ্যুতি জ্যোতিষ্ককে আলোক বিতরণ করিয়া ধরাধামের অজ্ঞান-তিমির অপসারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কয়টা নাম উল্লেখের পর বোধ করি আর কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্মুখে বিজ্ঞান প্রচারে নিযুক্ত হওয়ায় কোনরূপ লজ্জা বা অগৌরবের হেতু আছে।... ...

বাঙলা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙলা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান-বিস্তার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে। এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কালেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙলার ব্যবহার বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিতেন। এখনও সর্ব্বত্র সেই ভাব চলিত আছে কি না জানি না। ক্লাসে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙলার ব্যবহার বোধ হয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন-বিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই জন্য অন্ততঃ জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ

বিজ্ঞান আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আ
বসিয়া বাঙলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য ক
তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসঙ্ঘ
খুঁজিয়া মিলিবে না।" ('মানসী,' বৈশাখ ১৩২১)

পরিষদের গুণগ্রাহিতা: পরিষৎ চিরদিনই গুণের সমাদর কা
আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার
বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ্য করিয়া পরিষৎ টাউন-হলের এক বি
সভায় কবির দীর্ঘায়ু কামনা করেন (১৪ মাঘ ১৩১৮)। এই উপলে
রামেন্দ্রসুন্দরই পরিষৎ-সম্পাদকরূপে কবিকে (স্বরচিত) অভিনন্দন-পত্র প্র
করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও সমুদ্রপার হইতে সম্মান লাভ করেন না
এই প্রসঙ্গে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত (৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০) রামেন্দ্রসুন্দ
একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্দ্ধনা করা না হইত, এবং আ
বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতা
তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এ
বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না; আর আজ সাহে
সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হই
বাংলা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একই তো কথা আছে, বিলা
প্রশংসা-পত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহা
পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদার
লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি তো বোধ করি বিলাত যাইবা
পূর্ব্বে যে কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখা
হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে...৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২০।
('সাহিত্য,' শ্রাবণ ১৩২৭)

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও পরিষদের চিরসুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি
কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পরিষৎ তাঁহাকে
'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন:—

"আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে
পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিয়া পরিষৎ

নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে সাহিত্য-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে পরিষৎ নানা উপায়ে সম্মানিত করিতে পারেন এবং এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে বিশিষ্ট সমস্ত নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রধান। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিদ্যা ও মনীষা সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অনাবশ্যক। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। এই মাতৃপূজার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য তিনি দেশীয় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশেষতঃ তিনি অদ্যাপি অসুস্থ শরীরে পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার নিকট যথোপযুক্তভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অসম্ভব।" (একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ)

ইহার দুই মাস পরে পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এক বরাট্ সান্ধ্য-সম্মিলনে তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন (৫ ভাদ্র ১৩২১)। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষদের পক্ষ হইতে রূপার পাতে খোদিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা ও গুণবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ্ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য-মণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।

তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।

বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ষাধিক কাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে

উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাদরি এন্‌ড্রুস বোলপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন দান করি স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত যে অভিনন্দন-পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন, ত উদ্ধারযোগ্য :—

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ আমি তোমাকে সা অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাই বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলে আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনত অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আ তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষি করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হা সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধ সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জ করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র ১৩২১

পরিষৎ-প্রদত্ত সম্মানের উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর বিনয়নম্র বচনে স্বল্প কথায় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র এইরূপ :—

"আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান বা সংবর্দ্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের সহিত আমার সেব্য-সেবক-সম্পর্ক। এত কাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্য্যা করিয়াছি—একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্যা করিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে করিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘা মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।"* ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩২২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বালু

নির্মাণ করিতে গৃহ বালু লাগে পাঁচ হাজার মণ,
বালুকা-ভিত্তির পরে আমাদের বৃথা আয়োজন
মনে হতে পারে, কিন্তু গুপ্ত কথা গুণীজন জানে—
দেড় টাকা মণ বালি যদি তা মগরা হ'তে আনে।
বঁইচি-পাতুয়া হতে মোটা-দানা আনা যদি হয়
এক শত বাট টাকা শত মণে পড়িবে নিশ্চয়।
বালুর মাহাত্ম্য-কথা এতদিনে রে গৃহস্থ শোন্—
সিমেন্টের সহযোগে বালু হয় ইম্পেটেন্ট-ষ্টোন।

* গত মাসে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার যে তালিকা দিয়াছি, তাহাতে ১৩০৪।০৫ সালের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত "বেদ-কথা" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটির নাম বাদ পড়িয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি রচনারও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, উহা "ধূলি" নামে একটি প্রবন্ধ, মানকুমারী বসুর 'শুভ-সাধনা' পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ রামেন্দ্র-সুন্দরের 'বিজ্ঞানকথা' হইতে গৃহীত। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ইতিহাস-রচনার প্রণালী ও ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব

১

এই যে দেশময় ইতিহাস-চর্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়াছে, এই ৫ কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছোটগল্পকে বাংল মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে' এ সু-খবর যদি সত্য হয়, তবে জাতীয় মনের এই বিকাশ সম্বন্ধে সাহিত্য-নেতা ও পরিষৎগুলির এক গুরুত কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বেশি দিন অবহেলা করিলে চলিবে না আমাদের কর্তব্য, এই নবজাগ্রত ইতিহাস-সেবার চেষ্টাকে সমবায়-সূত্রে বাঁধি এই উদ্যমকে উপদেশ দ্বারা সংযত ও উচিত পথে চালিত করি, যেন বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যয় না হয়, যেন শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হয়, যেন যন্ত্রে বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক কারিগরের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভঙ্গু আকার ধারণ না করে। সুধীমণ্ডলীই এই কাজ করিতে পারেন। ব্যক্তি বিশেষ একাকী এই কাজ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার অধিকারও সাধারণে স্বীকার না করিতে পারে। সকলেই জানেন যে, কারিগর যেরূপ যন্ত্র হাতে পায় এবং যেরূপ প্রণালীতে কাজ করে, তাহার প্রস্তুত দ্রব্যও তেমনি হয় মহামেধাবীর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফলও যন্ত্রের দোষে বিশ্রী ও অকার্যকর হয় আর উচিত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।*

ইতিহাস-চর্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকালভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্যকর, এবং সর্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া থাকিব; আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে;

* ইতিহাস-রচনার প্রণালী সম্বন্ধে গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পড়া উচিত—(১) *Historical Evidence* by George, (Oxford University Press, (২) *History and Historians in the 19th Century* by Gooch (Longman), (৩) *Cambridge Ancient History* (chapters on the Gr. & Roman Historians.)

এবং বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরনের ঐতিহাসিক জল্পনা-কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে। কারণ, ঋষিবাক্য মনে রাখিবেন—"সত্যই জয় লাভ করে, অসত্য করে না।"

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সামনে উপস্থিত করে; আমরা যেন সেই সুদূর কালের লোকদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাবে ভাবি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভয় আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। এইরূপে অতীতকাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সেই সত্য নির্ধারিত না হইল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে তো কল্পনার জগতেই থাকিলাম। তারপর সে বিষয়ে যাহাই লিখি বা বিশ্বাস করি তাহা বালুকার ভিত্তির উপর তেতলা বাড়ি নির্মাণের চেষ্টা মাত্র।

সত্য-নির্ধারণের প্রণালী কি? সর্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন বা প্রতিপত্তি-লাভের লালসা দূর করিয়া, নিজের অন্তরের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্ব-সংস্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে;—

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা। ভারতের অতি প্রাচীনকালের কথা, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির

রাজকাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া ধরি, তবে হিন্দুধর্মের গ্লানি হইবে, এই যে আমাদের একটি স্বাভাবিক ধারণা আছে, তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পুরাতন মত, পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্মমভাবে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত কিছু পরে দিতেছি।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্বপ্রথম কার্য। এই মূল মন্ত্রটি এত সহজ, আপনারা প্রত্যহ আদালতে, সাংসারিক কাজে, ইহার এত ব্যবহার করেন যে, ইহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন—

(১) সর্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information-এর নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে তো? পুলিস ডায়েরির গোপনীয় নকল কি করিয়া পাওয়া যায়?

(২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না, পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে?

(৩) মোকদ্দমার কোনও পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস-লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়।

ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহা ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্বপ্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অব্যবহিত সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশ ভাষায় লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

অথচ আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিকের নিকট মুড়ি মুড়কি এবং সীতাভোগের একই দর। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারাই দু কথা লিখিয়া গিয়াছে, সকলেই সমান বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমরা মানিয়া লই; বিচার করি না, সমালোচনা করি না, সত্যের আদি উৎসে পৌঁছিতে চেষ্টা করি না। এই দেখুন, পাঠান যুগের ভারত-ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমরা ফিরিস্তা এবং আল্‌বাদায়ুনীর উপর, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল-সম্রাটগণ সম্বন্ধে খাফি খাঁর উপর অন্ধ ভক্তি করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করি। অথচ এই তিন লেখকই বর্ণিত ঘটনার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওই ওই যুগের সমসাময়িক বিবরণ হইতে শুধু সংকলন করেন। আমরা সেই সব সমসাময়িক বিবরণ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি না; তাহা গ্রহণের উপযোগী এ কথাও মনে মনে বিশ্বাস করি না। একজন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে হাজার জন পরবর্তী যুগের নকলনবিস খাড়া হইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই; তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে,—এই সত্যটি কার্যত মানিয়া লই না।

আবার, সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। এই যেমন, শাহজাহানের পুত্র শুজা আরাকানে মারা যান; সেখানে হিন্দু-মুসলমানের যাতায়াত নিষেধ ছিল, মগরাজা ও ওলন্দাজ পর্তুগীজ ভিন্ন অন্য বিদেশীকে তাঁহার রাজ্যে ঢুকিতে দিতেন; এই ইউরোপীয় বণিকগণ শুজার শেষ দশা সম্বন্ধে যে সংবাদ ভারতে তাহাদের কুঠীতে প্রেরণ করে, তাহা

বর্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কিছু কিছু, এবং আর্ভিন-অনূদিত মানুচীর আত্ম-জীবনীতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের লেখকেরা অন্য সব স্থান হইতে নানা গুজব সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ পূরণ করেন, এই দুই গ্রন্থ দেখেন না, দেখিলেও ইহাদের উক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় পরিবর্তন হইতেছে, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চার শত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডরাজ ৩য় রিচার্ড ইতিহাসে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা সার্ ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম্ এই বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে, স্পেনের ভিসিগথ বংশীয় শেষ রাজা রডেরিক্ তাঁহার সেনাপতি জুলিয়ানের কন্যার প্রতি অত্যাচার করায় জুলিয়ান মুসলমানদের ডাকিয়া রাজাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু ডোজি প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে, এই বিবরণটি উপন্যাস মাত্র; রমণীর প্রতি অত্যাচারের গল্প ঘটনার ছয় শত বৎসর পরে একজন ইটালীয় সন্ন্যাসী প্রথম রচনা করে; জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না; যে স্পেনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ লয়, তাহার নাম আর্বান; রডেরিক স্পেনরাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন না, ইত্যাদি। ফলত আরবদের স্পেন-বিজয়-কাহিনী একেবারে নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে; পুরুষগণের নাম ও চরিত্র, ঘটনাপরম্পরা, ঘটনার কারণ পর্যন্ত বদলাইয়া দিতে হইতেছে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তিয়র্ (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত অ্যাবটের নেপোলিয়ন-চরিতের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজপত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ এই নব অনুসন্ধানের ফল যেখানে একত্রীভূত করা হইয়াছে সেই Holland Rose's *Life of Napoleon I.*-এর নাম পর্যন্ত আমরা অনেকে শুনি নাই। সেই অ্যাবট্ লইয়াই আমরা নেপোলিয়ান জোসেফিন প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিতেছি। আমাদের দ্বিতীয় নীলমণি টডের "রাজস্থান"ও যে অনেক স্থলে অবিশ্বাসযোগ্য উপন্যাস মাত্র, এ কথা আমরা ভাবি না।

আসল গ্রন্থ বর্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যাণ্ট ডফের 'মারাঠা জাতির ইতিহাস' এক

উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডফ সাহেবের পণ্ডিত ভুল করায় এই গ্রন্থে আফজল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত, তবে সে বিশ্বাস-ঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ওই কাজ তত দূর নীতি-গর্হিত নহে। সেই মত, Dow's *History of Hindostan* নামক একখানা ইংরেজী গ্রন্থ অনেকে মুঘল-সম্রাটের অতি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস মনে করিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত করেন; অথচ ডাও সাহেব সমসাময়িক ও প্রামাণিক কোন ফার্সী গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই, এবং যে সব নব্য ফার্সী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন, তাহারও বিশুদ্ধ বা অবিকল অনুবাদ দেন নাই; অধিকাংশ স্থলেই নিজের কল্পনাবলে সুরঞ্জিত কাহিনী লিখিয়াছেন। ডাও সাহেবের জীবনকালেই সার্ উইলিয়ম জোন্স্ এবং বিখ্যাত গীবন্ তাঁহার লেখা অসত্য ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া গিয়াছেন। এখন পণ্ডিত সমাজে কেহই ডাও-এর গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া মানেন না। সমসাময়িক লেখককে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া পূর্বে গ্রীস দেশের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন প্রস্তর-ফলক, মুদ্রা, প্রভৃতির সাহায্যে এবং যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার ফলে গ্রীস ইতিহাসে যে কি মহাপরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বিউরী (Bury) প্রণীত *History of Greece* পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ, ইসলামের অভ্যুদয় ও আদি যুগের বিশুদ্ধ ইতিহাস *Cambridge Medieval History*-তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভ্রম দূর করে।

অতএব যদি মারাঠা ভাষাবিদ্ লেখক শুধু গ্র্যাণ্ট ডফ্ অবলম্বনে এবং ফার্সী-জানা লেখক ডাও অবলম্বনে ইতিহাস লেখেন, তবে সে পুস্তকের মূল্য কি? তাহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে না। এরূপ গ্রন্থের আমরা কেন আদর করিব? এরূপ উপগ্রন্থ, মহাগ্রন্থের গায়ে পরগাছা গ্রন্থকে বিলাতে rechauffee বলে, অর্থাৎ বাসি চপ্ কটলেট্ পরদিন গরম করিয়া টাট্‌কা জিনিস বলিয়া বেচিবার চেষ্টা করা হইতেছে, এরূপ মাল। বাংলা সাহিত্যে যদি এইরূপ গরম-করা বাসি ইতিহাসের বেশি কাটতি হইতে দেওয়া যায়, তবে সাহিত্য-ভোক্তাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হইতে হইবে। এরূপ গ্রন্থের নির্মম সমালোচনা করা একটি অবশ্যকর্তব্য কার্য, যদিও ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ কাজ ব্যক্তিবিশেষ না করিয়া সুধীমণ্ডলী করিলে ভাল দেখায়, এবং তাহাতে বেশি ফল হয়।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্বশেষে রচি অথবা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে। এই দেখুন, সম্র জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর ইংরেজী দুই অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভা প্রাইস্ ও অ্যাণ্ডারসন্ নামক দুই জন সাহেব বাহির করেন; তাহা কোন অং ফার্সী পুঁথি অবলম্বনে লিখিত, এবং অনুবাদকেরাও অনেক স্থলে অর্থ বুঝিয়াছেন। ওই পুস্তকের বিশুদ্ধ ফার্সী পাঠ অবলম্বন করিয়া রজার্স সা যে ইংরেজী অনুবাদ রচনা করেন, তাহাতে মূল্যবান ভৌগোলিক টীকা সংশোধনী যোগ করিয়া দিয়া বেভ রিজ সাহেব তাহা কয়েক বৎসর হইল প্রক করিয়াছেন। যদি আমরা প্রথমোক্ত অশুদ্ধ ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনু করি, রজার্সের অনুবাদ দেখা আবশ্যক বিবেচনা না করি, তবে এরূপ অনুবা বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্ট হইল, এ কথা বলা যায় না। সেই মত, চীন পর্যটকদি ভ্রমণকাহিনীর, মাহুয়ীর গ্রন্থের এবং অশোকের অনুশাসনের একাধিক ইংরে অনুবাদ আছে। তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদটিই বাংলা লেখকেরা ব্যব করুন, এই বলিয়া জেদ করা সুধীমণ্ডলীর কর্তব্য।

কখন কখন বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। ফ্রেঞ্চ কোটেসনের কোটেসন তপ্ত কোটেসন কেন ব্যবহার করিব? ইংরেজী একটি বড় কাজের কথা আছে, "Always verify your reference অর্থাৎ যাঁহার মত উল্লেখ করিলে, তিনি ঠিক সেই কথাগুলি বলিয়াছেন কি তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, ত কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্দেশ না করিলে সাহিত্যি অসাধুতা হয়, এবং ভ্রম-সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাস-লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দিতে বাধ্য। আই পুস্তক যেমন গুঁড়ি গুঁড়ি অক্ষরে ছাপা নজিরের উল্লেখে পূর্ণ না হইলে চলে তেমনি ইতিহাসও বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে। ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহ প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খ পুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আম বড় দোষ যে আমরা অনেকেই নিজের রচিত ইতিহাস বা প্রবন্ধে এ

দি-বৃত্তান্তের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার পরিশ্রমটুকু সহিতে চাহি না ; তো প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিই। ইহাতে মাদের জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভ্রমগুলি সংশোধন করিবার উপায় থাকে এবং জ্ঞানপিপাসু পাঠকও নিজে আদিবৃত্তান্ত পড়িয়া কোন বিষয়ে বেশি নিবার পথ দেখিতে পান না।

এই যে-সব প্রণালী এ পর্যন্ত নির্দেশ করিলাম, তাহা হিসাব রাখার মত শুধু রিশ্রমের কাজ, ইহাতে বিশেষ মেধার আবশ্যক নাই। আমরা যদি এই কাজ শুকর্তব্য বলিয়া মনে করি এবং আলস্য ত্যাগ করি, তবে আমাদের মধ্যে লেই এ কাজ করিতে পারেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস-খক ব্যক্তিগত ভ্রম-সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ; একই ঘটনার উপর র দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ া বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ ক্য দিয়াছে—এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি াসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত নার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তরফা ক্রী পান, তবে তাহা একদিন আপসেট্ হইবেই হইবে, কারণ জগতের নের আদালতে আপীল কখনও তমেয়াদি-দোষে বারিত হয় না ; শত শত সর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে ; আপীলের চূড়ান্ত সীমা য় নির্ধারণ পর্যন্ত গিয়া তবে থামে। যদি মার্জনা করেন, তবে আমার নিজের ভজতা হইতে দুটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আমি এখন মিরজুমলার আসাম ও বিহার জয়ের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত আছি ; এজন্য এক পক্ষে মুঘল াদদাতার ফার্সী গ্রন্থ ও বাদশাহী ফার্সী ইতিহাস, অপর পক্ষে আসামীদের খত বুরঞ্জী এবং একজন ডাচ্ জাহাজী সৈন্যের কাহিনী ব্যবহার করিতে তছে। সেই মত, শিবাজীর ও শম্ভাজীর কার্যকলাপের জন্য মুঘল বাদশাহ-গর পক্ষে লিখিত ফার্সী ইতিহাস, দুই জন সমসাময়িক নিরপেক্ষ হিন্দুর লিখিত ী ইতিহাস, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের জন্য লিখিত ফার্সী তিহাস, মারাঠী ভাষায় লিখিত বখর ও পত্রাদি, এবং ইউরোপীয় (ইংরেজী, সী ও পর্তুগীজ) বণিকদের সাক্ষ্য,—এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন উপাদান হ করিতে হইয়াছে।

ঘটনার সত্য নির্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ,—তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায় কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজ্যপরিবর্তন, যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ লেখক ক্ষণজন্মা পুরুষ, আমাদের পরিষৎ বা সম্মিলন তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর চেষ্টায় এ মহাকার্যের যতদূর সাহায্য হইতে পারে, কেবল তাহা বিষয়েই আমি বলিব।

(১) প্রত্যেক বিভাগের প্রধান-প্রধান বিষয়ে ও শাখায় যে কয়খানি বই হইতে নূতনতম ও সর্বাধিক মূল্যবান জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহার তালিকা প্রকাশ। সেই বিষয়ে দেশী বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী এ পর্যন্ত কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ঠিক বিবরণ এই সব বই হইতেই আমরা পাইব পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সিঁড়ির উপর না দাঁড়াইলে আমরা বিদ্যা-বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় চড়িতে পারি না।

(২) পরিষৎ ও অন্য সুধীমণ্ডলী অথবা মহানুভব জমিদারগণ এই সব সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, প্রাচীন মুদ্রার সচিত্র তালিকা, লণ্ডন ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিদ্বয়ের গত ৩০ বৎসরের পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়েরি, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, সার্ভেয়ার-জেনেরালের আপিস হইতে প্রকাশিত ১ ইঞ্চ = ৪ মাইল স্কেলের ভারতবর্ষের ম্যাপ, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক উপরকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। সেগুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এক-এক বাক্স গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে সমস্ত শাখা-পরিষৎ ও মফস্বলের বিশ্বাসযোগ্য পুস্তকালয় ঘুরিয়া আসিবে আমাদের গবর্মেণ্ট চিকিৎসা-বিভাগে এইরূপ ভ্রাম্যমাণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া মফস্বলের ছোট ছোট শহরের ডাক্তারদের জ্ঞানের বিস্তার ও নবীনতার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

(৩) মূল পরিষদের এক বিভাগ খুলিতে হইবে, যাহার নিকট আবেদন করিলে জিজ্ঞাসু নিজের চর্চার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত প্রমাণ-পঞ্জী পাইবেন। পরিষৎ বাছিয়া ইতিহাসের প্রতি শাখার জন্য এক বা দুই জন বিশেষজ্ঞ স্থির করিবেন, এবং জিজ্ঞাসুর পত্রখানি উপযুক্ত শাখার বিশেষজ্ঞের

কট পাঠাইয়া দিবেন, তিনি তাহার উত্তর দিবেন। এই সব বিশেষজ্ঞের নাম ঠিকানা পরিষৎ-পত্রিকায় সর্বদা ছাপা থাকিবে, এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসুদের কট যে-সব সমালোচনাপূর্ণ প্রমাণ-পঞ্জী (critical bibliography) ঠাইবেন, তাহাও প্রকাশিত হইবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিউ'য়ে খ ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। তাহাতে এখন াগ দেওয়া আবশ্যক।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের। সুতরাং ইতিহাস-চর্চার ত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাংলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে ামাদের কর্তব্যে ত্রুটি হইবে। এই দেখুন, প্রতি বৎসর শত শত বঙ্গভাষী ংস্কৃত পরীক্ষা দেয়; তাহারা ইংরেজী জানে না, এবং অসংখ্য বাংলা মাসিকের ঠায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি খুঁজিয়া পড়িবার অবসর এবং সুযোগও তাঁহাদের াই। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে সব নব নব ত্য ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই সব ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তাহারা প্রত্নতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও মধ্যযুগে বাস করিতেছে, মানবজ্ঞান যে এতদিনে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার কিছুই জানে না, অথচ তাহাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও মৌলিকতাসম্পন্ন ছাত্র আছে; দেশ ম্বন্ধে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে, নিজ ধর্ম জাতি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইতে শুধু দ্বিভাষী নয় বলিয়া ইহারা যে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে, ইহা কি রিতাপের কথা নয়? প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থাকারে একত্র াপা হইয়াছে; বাংলায় হয় নাই। (নবপ্রকাশিত গৌড়লেখমালা াংশিক গ্রন্থ।) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করা হয় নাই, ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতী ভাষা বাংলার চেয়ে কত কম লোকে বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ, শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাত ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মৌলিকতার গর্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি। লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই, অথচ এই লোকশিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ক্রমে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সাধারণের জ্ঞানের সীমা বঙ্গের লোকসমষ্টির জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিবে। তখন

বাঙালীর মানসিক প্রাধান্য কোথায় থাকিবে? পুনা ও বরোডা ভ্রমণ তথাকার স্কুলগুলি দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আর বিশ বৎ মধ্যে মারাঠাগণ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে বাঙালীদিগকে পিছু ফেলিয়া যাইবে।

ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে-পরিমাণে জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিব, যে-পরিমাণে অতীতের উপলে বর্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিত ধাবিত হইবে, আমাদের সমবেত শক্তি ফল প্রসব করিবে। আর, যে পরি আমরা অসত্য বা অর্ধসত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, সেই পরি আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে, জনসমষ্টির শ্রম বিফল হইবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবে ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, রাষ্ট্রে সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক, মহাবন্ধু। ইতি সাহায্যে অতীত কালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানে প্রয়োগ ক হইবে। দূরবর্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙিল, সেই বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাসচর্চার চরম লাভ।

মহাকবিদের সম্বন্ধে সত্যই বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা অমরধামে করিবার পরও পৃথিবীতে নিজ নিজ আত্মা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা আমরা শিখি—

ব্যক্তিগত গৌরব কি? লজ্জার বিষয় কি?

লোকে কিসে বল লাভ করে, কিসে পঙ্গু হয়?—(কীট্‌স্।)

সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে, প্রকৃত ঐতিহাসিক জনস ব্যক্তিসমষ্টিকে শিখান, কিসে জাতীয় উত্থান পতন, রোগ স্বাস্থ্য, নবজীবন ও মৃত্যু ঘটে। এই মহাশিবতন্ত্র, এই জাতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র সাধনা সত্যনিষ্ঠা বিনা, ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা, লাভ করা সম্ভব নহে।—(সালের চৈত্র মাসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ)

ামি প্রবাসে গিয়া প্রথমেই ইতিহাস-চর্চা আমার জীবনের ব্রত বলিয়া চন করি, আর নানা প্রবাসভূমিতে থাকিয়া ইতিহাসরচনা, ঐতিহাসিক ংগ্রহ ও তদুপযোগী নূতন ভাষাশিক্ষা এই সব কাজ আরম্ভ করি এবং শেষ া-বাস পর্যন্ত তাহারই অনুসরণ করি। এই বহুবর্ষব্যাপী কাজের মধ্যে কথা সত্যই আমার মনে জাগিত যে, ভারতের ইতিহাস লিখিতে হইলে ীর পক্ষে পর-প্রদেশে বাস এবং দীর্ঘভ্রমণ যেমন উপকারী, এমন আর নহে। এ কথা যে দিল্লী বা আগ্রা, রাজস্থান বা মহারাষ্ট্র প্রদেশের াসরচনার ক্ষেত্রে সত্য, তাহা আপনারা সহজেই মানিয়া লইবেন। কিন্তু নিজ র ইতিহাস লিখিতে যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষেও বাহিরে প্রবাস মণ অত্যাবশ্যক। কারণ একে তো দেবভাষা ও আর্যধর্ম, সাহিত্য ও তর বন্ধনে সব ভারতীয় প্রদেশগুলি পরস্পরের সহিত জড়িত, তাহার অতীত যুগে কত বঙ্গাধীপ বঙ্গের বাহিরে নিজ নিজ বিজয়বাহিনী লইয়া ছিলেন, আর পর-প্রদেশীয় কত রাজা আমাদের এই বঙ্গভূমিতে নিজ ান প্রেরণ করেন। আমাদের ধর্মপ্রচারকের ও আমাদের দিগ্বিজয়-আকাঙ্ক্ষী ছদের চক্ষে নিখিল-ভারত একই দেশ ছিল, তাঁহারা প্রাদেশিক সীমানার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লঙ্ঘন করিতেন। ভারতের ভিতর আচার-ব্যবহার ও সাহিত্য, ধর্ম ও কলার এত আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে যে, বঙ্গের রর ভারত না জানিলে বঙ্গের সভ্যতার ধারাও বুঝা যায় না, বঙ্গদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস পর্যন্ত লেখা যায় না।

তেরাং তুলনামূলক ঐতিহাসিক চর্চা অত্যাবশ্যক। এই কাজে প্রবাসী ীরা একটি বড় সহজ স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করিতেছেন। পুরাতন তর নানা বিভাগের নিদর্শন তাঁহাদের চারিদিকে। তাঁহারা শুধু চোখ ি দেখিবেন, এগুলি হইতে ঐতিহাসিক সত্য বাহির করিবেন, আর গুলি সমবেত করিয়া অতীতের অবিকল ছবি অঙ্কিত করিবেন। বঙ্গে এই নগুলি নাই, বঙ্গে থাকিয়া আমরা এ সুযোগ পাই না।

াহার পর ভাষার কথা। প্রাচীন ভারতের, এমন কি, মধ্যযুগীয় ভারতের অবস্থা জানিতে হইলে, শুধু বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অভ্যাস করিলেই র না। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অথচ এখন পর্যন্ত জীবিত কত কত

প্রাদেশিক ভাষা ভারতে প্রাচীন শিলালেখা ও গ্রন্থের অর্থবোধ অনেক যে সাহায্য করে, তাহা বিশুদ্ধ কালীদাসী সংস্কৃত হইতে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের ভারতকে জানিতে হইলে হিন্দী ফারসী ও মারাঠী ভাষায় ন হইলে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রবাসে কার্য উপলক্ষে আ সকলেই এসব প্রাদেশিক ভাষাগুলির দুই-একটি শিখিতে বাধ্য হন, সু ঐতিহাসিক উপকরণসংগ্রহ এবং তাহার অর্থগ্রহণ আপনাদের পক্ষে কি কষ্টসাধ্য নহে, যেন দৈনিক কাজের মধ্যে।

তাহার উপর প্রবাসের চারিদিকে কত কত অ-বাঙালীর জাতি অ ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় গীতি ও কথা শুনিয়া আমার মনের মধ্যে একটি অপরিচিত নববাজ্যের দ্বার খুলিয়া যায়—সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা যায়—সত্য সন্ধানের প্রধান যন্ত্র দুইটি, অর্থাৎ উদারতা ও দীর্ঘদৃষ্টি লাভ এ সুযোগগুলির বঙ্গে আবদ্ধ বাঙালীর পক্ষে দুঃসাধ্য।

তাই আমি প্রার্থনা করি, প্রবাসী বাঙালীরা এই পরম সুযোগগুলির সদ্ব্য করুন—তাঁহাদের মধ্যে ভারতের পুরাতত্ত্ব, তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান প্র ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করিবার জন্য শত শত প্রবীণ তাঁহাদের কষ্টলব্ধ অ শত শত যুবক তাঁহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম নিবেদিত করুন, আমাদের মত বৃদ্ধদের তিরোধানের পর ইতিহাস-চর্চার এবং ইতিহাস-রচ ধারা সদানীরা জাহ্নবীর মত প্রবাহিত হইতে থাকে, যেন ঐতিহাসিক স সন্ধানীরা "যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী"র হইয়া জ্ঞানের পথ অবিরাম মুখরিত কর থাকেন।

এই শাখায় আগত আপনারা সকলেই ইতিহাস-সাহিত্যিক, অ ইতিহাসপ্রেমী। তাই অতি বৃদ্ধ কারিগরের মত আমি আমাদের কারখা দুটি মূলমন্ত্র আপনাদের নিকট বলা উচিত মনে করি। প্রথমটি এই বর্তমান যুগে সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে এবং বিজ্ঞানের শক্তি সর্বত্র প্রবা হইবার ফলে ইতিহাস এক দিক থেকে বিজ্ঞানের শাখাবিশেষে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ ইতিহাসের আদি উপকরণগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া, ধুইয়া, গলাই বিশ্লেষণ করিয়া তবে আমরা তাহাকে কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হই প্রকৃত তথ্য বাহির করিতে পারি। আর এ-যুগের নিয়মই এই যে, আমা নিজ নিজ চর্চার বিশেষ বিষয়টির উপর যথাসম্ভব সব দিক হইতে আলোকপ

ত হইবে, সমস্ত বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ একত্র করিতে । ইহা অতি কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ইহার ফলে ইউরোপ আর একজন সার্বভৌম পণ্ডিত কোন গ্রন্থ সমগ্র একা লেখেন না, বিশেষজ্ঞ তদের সমষ্টি করিয়া তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে সেই বিষয়টির জ্ঞানের সম্পূর্ণরূপে কর্ষণ করা হয়। এক-একজন বিশেষজ্ঞ এক-একটি অধ্যায় । এক-এক খণ্ড গ্রন্থমাত্র রচনা করেন। ইহাই বর্তমানে অনুসৃত াপীয় রচনাপদ্ধতি; পণ্ডিতমণ্ডলীর পরস্পর সহযোগ বিনা রচনায় এত উৎকর্ষ সাধিত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে। ইতিহাস প্রণালীতে বিজ্ঞান ণও বাহ্যকলেবরে এবং অন্তরের উদ্দেশ্যে সাহিত্যকলা। এই সত্য না লে মহা ক্ষতি হয়, ঐতিহাসিকের জীবনব্যাপী শ্রম পণ্ড হয়। ইতিহাসকে াশ্চাত্যগণ ইতিকাব্য নাম দেন, সেটা বিদ্রূপের বিষয় নহে, এই নামের মধ্যে ট নিগূঢ় মানব-সত্য নিহিত আছে। ব্যক্তিবিশেষকে ঘিরিয়া কাল্পনিক করণ লইয়া কাব্য রচিত হয়, অথচ ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় জনসমষ্টির নপতন, দেশের উপর, দশের উপর জননায়কের প্রভাব এবং ইহার উপকরণ —মানবের চেষ্টায় যতটুকু সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহাই। ে যে আকারে ইতিহাস গ্রন্থটিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার যে নিহিত মন্ত্রটিকে বাক্যে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে, তাহার কথা বলে ইতিহাস ও কাব্যকে একই শ্রেণীর সাহিত্য বলা উচিত। একজন রজ লেখক নেপোলিয়নের যুদ্ধবর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সর্বোচ্চ তভাশালী সেনাপতি ও চিত্রকরের প্রতিভা একই প্রণালীতে একই পথ দিয়া ণ, একটি বিখ্যাত অভিযান (ক্যাম্পেন) যেন একটি অতুলনীয় তৈলচিত্র। ে সেইরূপ সর্বোচ্চ ইতিহাস-লেখকও প্রকৃতই চিত্রকর, তিনি চিত্র আঁকেন ধার তুলি দিয়া—প্রকৃত মানব-মানবীর ভাব ও কর্ম তাঁহার রঙের মসলা। চিত্ররচনার দ্বারাই ইতিহাসের অন্তরের সার পাঠককে দেখানো যায়, তহাস গ্রন্থ চূড়ান্ত সফলতা লাভ করে।

কারণ ইতিহাসের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা নহে যে, কোন্ কোন্ ঘটনা টিয়াছিল এবং কখন ঘটিয়াছিল। ইতিহাস দেখাইবে যে, অতীত ঘটনাগুলি ন ঘটিয়াছিল, কিরূপে ঘটিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডিতে যেমন অদৃষ্টের

অনিবার্য প্রতাপ প্রমাণ করা হইত, আমাদের ইতিহাসও তেমনই সত্যকে জগতের কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়—মানব-সঙ্ঘের চিত্তের ভ ও উদ্যম কোন্ পথে চলিয়াছিল, জাতীয় জীবনে পূর্বপুরুষদের দত্ত মনোবৃ ও সভ্যতার প্রভাব কতদূর গিয়া দাঁড়ায়, মহাপুরুষ জননেতারা কিরূপে দেশমে বিপ্লবের সমান পরিবর্তন সংঘটিত করেন, নূতনকে ঝড়ের মত আনিয়া কি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া জাতিকে নবীন পথে প্রচলিত করেন, এই সব মনস্তত্ত্বে কথা কাব্যের তুলিতে ইতিহাসে প্রকাশ করিতে পারিলে তবে সে ইতিহাসও প্রকৃত ফলবান হইবে, অমর হইয়া থাকিবে—নচেৎ নহে।

এইজন্য ঐতিহাসিকের পক্ষেও কল্পনাশক্তির আবশ্যক। সত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র তথ্যের সমাবেশের ফলে গঠিত, সংযত নিয়ন্ত্রিত কল্পনার সাহায্যে অগ্রসর, কবির মহান্ গঠনশক্তিতে রচিত, ভাষা ও ভাবে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে পুটপাক ঔষধের মত যে ইতিকাব্য, তাহাই প্রকৃত ইতিহাসের নামের যোগ্য। জাতিবিশেষের দেশবিশেষের অদৃশ্য জীবনধারা এ ইতিকাব্যের ভাষায় ফুটিয়া উঠিবে, তাহার প্রাণের প্রক্রিয়াগুলি আর অতীতে সমাধিগর্ভে নিশ্চল হইয়া থাকিবে না, চলচ্চিত্রের মত পাঠকের সম্মুখে জীবন্ত দৃশ্য মান হইবে। ইহাই ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব। (১৩৪১ সালে কলিকাতা অনুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণ)।

শ্রীযদুনাথ সরকার

স্বাধীনতা-সঙ্গীত

নবীন সূর্য উঠিয়াছে ওই
পূর্ব অচল পারে,
পবিত্র আজি, নির্মল তনু
স্নিগ্ধ কিরণধারে।
বল জয়! বল জয়! বল জয়!
নূতন অভ্যুদয়!
নূতন যুগের যাত্রা হ'ল রে শুরু
দূর হয়ে গেল হৃদয়ের দুরু-দুরু,
অশোকচক্র-লাঞ্ছিত পতাকায়
নব-জীবনের নবীন দীপ্তি ভায়,
নির্ভয়ে এস ত্রিবর্ণ-ধ্বজতলে
নব-প্রভাতের দ্বারে।
বল জয়! বল জয়! বল জয়!
নূতন অভ্যুদয়!
দুর্যোগভরা রাত্রির অবশেষ
জয়ধ্বনিতে ভ'রে যাক সারা দেশ,
স্বর্গ হইতে পুণ্য এসেছে নামি
স্বাধীন ভারতে পথিক অগ্রগামী;
ভাসাও তরণী দিগ্‌দিগন্তে আজি—
শান্তির পারাবারে।

শ্রীশান্তি পা

স্বাধীনতা-দিবস

১৯৪৭ সাল—১৫ই আগস্ট

প্রভাত-ফেরীর গানের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। শহরের ছেলেমেয়েরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—

"ছিঁড়িল বন্ধন, টুটিল শৃঙ্খল
নূতন প্রভাতে কে তোরা যাবি চল্—"

স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রভাত। দেশের নেতৃবৃন্দের হাতে শাসন-রশ্মি দিয়া বিদেশী-রাজ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা। বহুজনের বহুদিনের স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে। বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, শৃঙ্খল টুটিয়াছে। বাঁকিয়া-পড়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া, জীবন-যাত্রার পথে চলিবার অধিকার পাইয়াছে ভারতবাসীরা। জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় দিন আজ।

অতএব আর বিছানায় পড়িয়া থাকা ঠিক নয়; উঠিয়া শুদ্ধ-শান্ত চিত্তে আজিকার প্রভাতকে অভিবাদন করা উচিত।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা দেখিলাম আমার আগেই উঠিয়াছেন। অন্য দিন গৃহিণী বেলা আটটা পর্যন্ত শয্যালগ্না হইয়া থাকেন। ছেলেমেয়েগুলি চা না খাওয়া পর্যন্ত চাঙ্গা হইয়া উঠে না। আজ সকলের মনেই একটি নব-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে; ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। স্বাধীন জীবনের প্রথম প্রভাতে আশাপ্রদ লক্ষণ।

ছাদের উপর হইতে ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহারা। তিন টাকা খরচ করিয়া একটি খদ্দরের জাতীয়-পতাকা কিনিয়া আনা হইয়াছে। মশারির ডাণ্ডায় বাঁধিয়া সেটিকে ওড়ানো হইবে। পতাকা-উত্তোলনের সম্মান বাড়ির কাহার হাতে দেওয়া হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য কাল একটি পারিবারিক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি আমি স্বয়ং। বড় মেয়েটি আমার নাম, বড় ছেলেটি আমার স্ত্রীর নাম প্রস্তাব করে। সংখ্যাধিক্যের উপরে আমার নাম বাতিল হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর পক্ষে ভোট দিয়াছিলাম। কাজেই পতাকা-উত্তোলনের ভার গৃহিণীর উপরে পড়িয়াছে। কথা আছে, উৎসব-সভায় তাঁহাকে একটি বক্তৃতা করিতে হইবে। বক্তৃতা আমি লিখিয়া দিয়াছি। তিনি কাল রাত্রি জাগিয়া সেটি মুখস্থ করিয়াছেন।

যাহাদের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নাই তাহারা জানে, বক্তৃতা দেওয়ার আগে সময়টা কি সাংঘাতিক। মুখে আহার রোচে না, চোখে ঘুম আসে না, সারাক্ষণ মনে দারুণ অস্বস্তি। গৃহিণীর সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙার ইহা কারণ হইতে পারে।

ছাদে উঠিতেই সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল, বাঃ রে! এত দেরি! হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে আসুন। বাড়ির পতাকা তুলতে দেরি হ'লে আমরা শহরে যাব কখন?

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। মাথার উপর মেঘহীন আকাশ; পূর্বাকাশে নবীন সূর্য প্রসন্ন হাস্যে দীপ্তিমান। এই ভারত হইতেই প্রথম স্তুতিগান উঠিয়াছিল তাঁহার; শ্রদ্ধানতচিত্তে তাঁহার মহিমা-কীর্তন করিয়াছিল এই ভারতের ঋষিবৃন্দ। ভারতের কত উত্থান, কত পতন, প্রতিভার চরমতম বিকাশ, মোহাচ্ছন্নতার চরমতম গ্লানি, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠা দুর্ভাগ্যের গভীরতম গহ্বরে অবলুণ্ঠন, চোখ মেলিয়া দেখিয়াছেন। আজ ভারত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সৌভাগ্য-সৌধের প্রথম সোপানে পা দিয়াছে। প্রসন্ন হাস্যে আশীর্বাদ করিতেছেন তিনি।

প্রতি বাড়িতে জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে—কোনটি খদ্দরের, কোনটি সিল্কের। সারা পাড়াটিতে আনন্দ-চাঞ্চল্য। বাড়িতে বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, মাঝে মাঝে পটকার শব্দ। দূরে একটা বাড়িতে রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে।

নীচে নামিলাম। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, গৃহিণী খাবার তৈয়ারি করিতেছেন। পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানটিকে শুধু মনের পক্ষে নয়, রসনা পক্ষেও তৃপ্তিকর করিয়া তুলিবেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিলেন, যাও তৈরি হয়ে এস, তোমাদের আবার পাড়ায় একবার যেতে হবে তো!

পাড়ার ছেলেরা পাড়ায় পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে সকলকেই চাঁদা দিতে হইয়াছে, যাহার যেমন সাধ্য। জেলা-কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন। পাড়ার মাঝখানে কতকটা পড়ো জমি আছে। সেইখানেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে পাড়ার ছেলেদের উৎসাহের সীমা নাই। নিজেরাই ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া জমিটি পরিষ্কার করিয়াছে। সামনে দেবদারুপাতা দিয়া গেট তৈয়ারি করিয়াছে

রিধারে খুঁটি পুঁতিয়া আম্রপল্লব টাঙাইয়াছে। স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েরা ড-কাওয়াজ-শিখিতেছে, সামরিক কায়দায় পতাকা-অভিবাদন-প্রণালী রপ্ত রিতেছে। পাণ্ডা-ছেলেরা কাল সারারাত্রি ঘুমায় নাই, হৈ-হৈ করিয়াছে। হার একটা গ্রামোফোন সংগ্রহ করিয়া স্বদেশী-গান বাজাইয়াছে ও পটকা টাইয়াছে।

পাড়ার একটি ছেলে আসিয়া বেলা আটটায় সভাস্থানে উপস্থিত হইবার স্য বলিয়া গেল।

স্ত্রীকে কহিলাম, হরিসাধনবাবুর ছেলেমেয়েদের ব'লে পাঠালে না কেন?

স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, খুব তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিয়েছ তো! লেই গিয়েছিলাম।

গৃহকর্তা-সুলভ গাম্ভীর্যের সহিত কহিলাম, তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দাও। াড়িতে অসুখ; আজকার দিনেও ছেলেমেয়ে দুটো মুখ চুন ক'রে ঘুরে বড়াবে। আসুক, একটু আনন্দ করুক—

স্ত্রী কহিলেন, খবর কালই দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো এসে গেছে ারা। উপরে গিয়ে ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাবে। একটু প করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা ছাড়া আজ দুপুরেও এখানে খাবার জন্যে নমন্ত্রণ করেছি ওদের।

অপ্রতিভভাবে কহিলাম, তাই নাকি! বেশ বেশ।—বলিয়া সরিয়া ড়িলাম।

যথাসময়ে ছাদে আসিয়া দেখিলাম, সব প্রস্তুত। গৃহিণী একটি লালপাড় রের শাড়ি পরিয়াছেন। মুখে গাম্ভীর্য। একটি শতরঞ্জি পাতা হইয়াছে। ক দিকে একখানি ছোট চৌকির উপর মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ছেলেমেয়েরা কলে দাঁড়াইয়া আছে। বড় মেয়ের হাতে শাঁখ। হরিসাধনবাবুর ছেলে-য়ে দুটিও আসিয়াছে দেখিলাম। মেয়েটির পরনে মলিন ফ্রক, মাথায় াঁকড়া চুল রুক্ষ বিশৃঙ্খল। ছেলেটির পরনে ছেঁড়া এখানে-ওখানে-তালি-মারা াফ-প্যাণ্ট, পা খালি। দুইজনে লজ্জিত মুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। য়েটির নাম টুনু। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কেমন আছেন? নু ম্লান মুখে জবাব দিল, ভাল নাই। আপনাকে যেতে বললেন একবার।

গৃহিণীকে কহিলাম, আরম্ভ হোক এবার।

ছেলেমেয়েরা 'বন্দে মাতরম্' গান শুরু করিয়া দিল।

গান শেষ হইল। মশারির ডাণ্ডা একটি ছাদের আলিসার সঙ্গে দড়ি দি বাঁধা হইয়াছিল। গৃহিণী একটি টুলে চড়িয়া পতাকাটি ডাণ্ডার মাথায় পরাই দিলেন। মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাইতে লাগিল। বাকি ছেলেমেয়ে বন্দে মাতরম্ হাঁকিল। সকলে জাতীয়-পতাকাকে অভিবাদন করিলাম।

তারপর গৃহিণী মুখস্থ-করা বক্তৃতা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলে আমাকেও কিছু বলিতে হইল। বলিলাম, আজ যে পতাকা দেশের বু তোলা হ'ল, আমরা যেন তার উপযুক্ত হতে পারি।

তারপর চা ও খাবার আসিল। খাওয়া-দাওয়ার পরে টুনুকে বলিলা আমি একটু পরে যাচ্ছি, তোমার বাবাকে বল গিয়ে।

গৃহিণী কহিলেন, স্নান ক'রেই তোমরা দুজনে চ'লে এস, বুঝলে ?

ছেলেমেয়ে দুটি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে পাড়ার অনুষ্ঠানে হাজির হইলাম। পাড়ার সকলেই উপস্থিত কংগ্রেসের নেতা মহাশয়ও আসিয়াছেন। একটি দামী চকচকে নূতন মোট গাড়িতে আসিয়াছেন। গাড়িটি কোন বড়লোক মাড়োয়ারীর সম্ভবত নেতা মহাশয়ের পরিধানে খদ্দরের ধুতি, ঢিলা-হাতা আজানুলম্বিত খদ্দরে পাঞ্জাবি; পায়ে স্যাণ্ডেল। মুখে প্রবল গাম্ভীর্য। আরও অনেক জায়গা পৌরোহিত্য করিতে হইবে তাঁহাকে। সেইজন্য সভার কাজ শুরু করার জ তাড়া দিতেছেন।

একদল ছেলেমেয়ে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিতে শুরু করিল। ছেলেদের পরিচ্ছদ নানাবিধ। কাহারও হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-হাত শার্ট; কাহারও পায়জামা, জওহরী-কোট; কাহারও বা ধুতি পাঞ্জাবি। মেয়ের সকলে শাড়ি পরিয়াছে, আঁচল কোমরে জড়ানো। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমে সব। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কাহারও স্বাস্থ্য ভাল নয়। স্বাস্থ্যহীনতার চি দেহে ও মুখে সুস্পষ্ট। তবু আজ তাহাদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হইয় উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ। নিত্য দেখে তাহারা, সংসারে তাহাদে কত অভাব, কত কষ্ট, কত অশান্তি। তাহাদের বাবা ভাই আত্মীয়স্বজনর শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারে না। স্বল্প আয়ে সংসারে

ধারণ খাদ্য ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করিতেই তাহাদের বাপ-মায়েরা হিমসিম খাইয়া যায়; ভদ্রতার মুখোশ বজায় রাখিবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করিতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাহাদের প্রাণ ক্ষয় হয়। বর্তমান তাহাদের নিরানন্দময়, ভবিষ্যৎ অনির্দেশ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদেশী রাজারা এতদিন শাসন ও শোষণ করিয়াছে, কিন্তু প্রজাদের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সাফল্যময় করিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নাই। স্বাধীন জীবনে এ অবস্থার পরিবর্তন আসিবে নিশ্চয়। দেশের লোকের জীবনযাত্রা সুগম হইবে; যোগ্যতা অনুসারে উপার্জনের ব্যবস্থা হইবে; যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাইবে প্রত্যেকে জাতি-ধর্ম-শ্রেণীনির্বিশেষে। দেশের লোকের দেহে স্বাস্থ্য, মনে সজীবতা, প্রাণে শক্তি, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য আসিবে। ইহারই স্বপ্ন দেখিতেছে বোধ হয় ছেলেমেয়েগুলি। এই সুখ-স্বপ্নের আভা পড়িয়াছে তাহাদের মুখে।

দূরে পিছনে দাঁড়াইয়া পাড়ার বাউরীদের স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েরা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির কাপড়-চোপড়ের বালাই নাই; কোমরে তেল-চিটা দুনসি। পুরুষদের কোমরে খাটো ময়লা একখানা করিয়া কাপড় জড়ানো। মেয়েদের, দুই-চারজন যুবতী মেয়ে ছাড়া, পরনে মলিন জীর্ণপ্রায় শাড়ি। যেমন করিয়া পূজার সময়ে দূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া পূজা দেখে, এখনও তেমনই দূরে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখিতেছে। কি ব্যাপার হইতেছে জানে না। ভাবিতেছে, বাবুদের ছেলেদের কোন উৎসব বা তামাশা হইতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকারের অনুভূতি তাহাদের নাই। তবে যদি কাঙালী-ভোজন হয়, এক পাশে বসিয়া একপাতা খাইবার আশা আছে। পাড়ার ছেলেরা ইহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। দুপুরে দুইখানা করিয়া লুচি ও একমুঠা করিয়া বোঁদে দেওয়া হইবে পাড়ার 'ছোটলোক'দের প্রত্যেককে। তখন তাহারা দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিবে; সামান্য ভিক্ষা-প্রাপ্তিতেই মুখে আনন্দ ফুটিবে সবারই।

ছেলেমেয়েদের গান শেষ হইল। জমিটার মাঝখানে একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা হইয়াছে; তাহার মাথায় দড়ি বাঁধিয়া পতাকা তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পতাকাটি মাঝ-পথে কাত হইয়া ঝুলিতেছে। নেতা মহাশয় আগাইয়া গিয়া দড়ি ধরিয়া টান দিলেন; পতাকাটি সরসর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, অন্তরাল হইতে পাড়ার

মহিলারা উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন; দম দম শব্দে পটকা ফাটিতে লাগিল। পতাকাটি একেবারে বাঁশের মাথায় উঠিয়া বাতাসে পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা মিলিটারী কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন করিল। তারপর গান ধরিল, "কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—"। গানের মাঝখানে দলপতি হাঁক দিল, ভাইনে ফেরো—। ছেলেমেয়েরা একযোগে আদেশ পালন করিল। আবার হুকুমের হাঁক হইল, সামনে আগাও।

ছেলেমেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইল। নেতা মহাশয় বিদায় লইলেন। আমিও শহরে অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

হরিসাধনবাবুকে একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার বাড়ি আমা বাড়ি হইতে একটু দূরে। প্রথমে সেইখানেই যাওয়া স্থির করিলাম।

সদর-রাস্তা হইতে বাঁ-হাতি একটা সরু গলি দিয়া কতকটা গেলেই একটা পোড়ো জমি। বর্ষায় আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারই মাঝ দিয়া একটি অপরিসর পায়ে-চলা পথ। জমিটার ও-পাশে নীচু মাঠ; মাঠের ওপারে একটা পুরানো বাগান; বাগানের এক পাশে মদের ভাঁটি। দিনের বেলা বেলা তিনটা পর্যন্ত এ দিকটায় লোক-চলাচল বেশি থাকে না। তিনটার পর হইতে পাড়ার ও বেপাড়ার বাউরী, মুচী, মেথর ও অন্যান্য শ্রমিক-শ্রেণীর লোকেরা ক্রমাগত দলে দলে মদের ভাঁটির দিকে যাইতে থাকে। সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত মাতালদের বেয়াড়া ও বেসুরা কণ্ঠের গানে, অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও বিলাপে স্থানটার নির্জনতা ঘুলাইয়া উঠে।

এই জমিটার এক পাশে হরিসাধনবাবুর বাড়ি—মাটির; খড়ের ছাউনি বাড়িটি হরিসাধনবাবুর নিজের নয়; ভাড়া করা। শহরের জনৈক ব্যবসাদার তাহার রক্ষিতার জন্য বাড়িটি তৈয়ারি করিয়াছিল। পাখি অনেকদিন পলাইয়াছে, জীর্ণ পিঞ্জরটা কোন মতে টিঁকিয়া আছে। হরিসাধনবাবু নামমাত্র ভাড়া দিয়া এখানে বাস করিতেছেন।

বাড়ির সামনে চোরকাঁটার জঙ্গল। কোঁচা বাঁচাইয়া যাইতে হইল। সদর-দরজা খোলা ছিল। বাড়ি ঢুকিতেই উঠান; উঠান পার হইলেই পাশাপাশি দুইটি ছোট কুঠরি; সামনে লম্বালম্বি অপ্রশস্ত বারান্দা। ডান দিকের

ঢরিতে তক্তাপোশের উপর মলিন শয্যায় বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন রিসাধনবাবু। অস্থিচর্মসার দেহ। বুকের হাড়গুলা চামড়া ঠেলিয়া উঁচু য়া উঠিয়াছে। হাত ও পা কাঠির মত সরু। পায়ের পাতা ফুলিয়া উঠিয়া াদের মত দেখাইতেছে। মুখও ফোলা; চোখ দুইটা প্রায় ঢাকা ড়িয়াছে। রক্তশূন্যতার জন্য সারা দেহ হলদে হইয়া উঠিয়াছে। চোখের ষ্টি ঘোলাটে। যেন নির্বাপিত-প্রায় ধূম-মলিন দীপশিখা। মাথায় বড় বড় ক্ষ কাঁচা-পাকা চুল। মুখ গোঁফ ও দাড়িতে আচ্ছন্ন। ক্রমাগত হাঁফাইতেছেন। কটা হাপরের মত দুলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিলেন, এস ভাই, ব'স।

হরিসাধনবাবুর স্ত্রী মাটিতে বসিয়া একটা কাঁসার বাটিতে ঔষধের শিশি ইতে ঔষধ ঢালিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিলেন। ারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইয়া, জল খাওয়াইয়া, আঁচলে ামীর মুখ মুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

কহিলাম, কেমন আছেন?

হরিসাধনবাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, ভাল নয়। গলা হইতে সাঁই সাঁই ব্দ হইতে লাগিল।

কহিলাম, ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না? মুখ কুঁচকাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া রিসাধনবাবু কহিলেন, না। বিনা পয়সার ওষুধ তো।—একটু চুপ করিয়া াকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কাল ভারি কষ্ট গেছে সারারাত। এক মিনিট ঘুমোতে পারি নি। তার ওপর সারারাত হাঙ্গামা। হরদম পটকা টিয়েছে ছেলেগুলো।—দম লইয়া কহিলেন, স্বাধীনতা পেয়েছে ব'লে ফুর্তিতে ধৈর্য হয়ে গেছে সব। আরে, কাদের স্বাধীনতা হ'ল বুঝে দেখ আগে, তারপর র্তি করবি। আবার হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, স্বাধীনতা াওয়া গেলেও আমার মত লোকদের কি সুবিধে? দু বেলা পেট ভ'রে খতে পাব আমরা? রোগ হ'লে চিকিচ্ছে হবে আমাদের? ছেলেপিলে ানুষ হবে আমাদের? কিছু হবে না। পরাধীন থাক, আর স্বাধীনই হও, শালগ্রামের শোওয়া-বসা দুইই সমান।

কহিলাম, সুবিধে হবে বইকি। দেশের যাঁরা কল্যাণকামী নেতা, তাঁরাই তা কর্ণধার হলেন।

হরিসাধনবাবু কহিলেন, কর্ণধার তো হলেন, কিন্তু তাঁদের কর্ণ ধারণ ক' থাকবে যে দেশের বড়লোকগুলো। তাদের স্বার্থ বজায় ক'রেই চলতে হ তাঁদের। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার কতদূর কি ব্যবস্থা হবে, ভগবান জানে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বড়লোকগুলোকে তো চিনলে ক বা খ'রে। কারও মুখের দিকে তাকায় না ওরা; নিজেদের স্বার্থ ষোল আন উপর আঠারো আনা দেখে; টাকার পাহাড় জমিয়েও টাকার লোভ মেটে ওদের—যেমন ক'রে হোক্ টাকা চাই; দেশের লোক না খেতে পেয়ে শুকি মরলেও কিছু যায় আসে না ওদের। ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জ জানোয়ারেরও অধম। উত্তেজনায় ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে হরিসাধনবাবু কহিলে অর্থের স্পৃহা যে ভদ্র শিক্ষিত লোককেও কত অবিবেচক করে, আমাদের ব বড় ডাক্তারদের দেখলেই বুঝতে পারবে। মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগ করে, তবু আমাদের মত গরিবের বাড়িতেও পুরো ফী নেয়। এতটুকু দ হয় না। একটিবার ভেবে দেখে না, তাদের একটা পুরো ফী আমাদের ম লোকের সমস্ত পরিবারের এক সপ্তাহের আহার।

টুনু ও তাহার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিল। হরিসাধনবাবু কহিলেন, কোথ গিছলি? একটু পাখা কর্ দেখি। টুনু একটা পাখা লইয়া পাখা করি লাগিল। ছেলেটি মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

হরিসাধনবাবু কহিলেন, কাল রাত্রে যা হ'ল, ভাবলাম, বুঝি হয়েই গে অনেক কষ্টে সামলালাম। বাঁচব না আর বেশিদিন। ওষুধ নাই, পথ্যি না বাঁচব কি ক'রে? কহিলাম, মাখনবাবু কি আসছেন না? ঘাড় নাড়ি কহিলেন, মাখনবাবুর কোন ত্রুটি নাই। দিনে একবার আসেন, দেখেন, ও দেন। একটি পয়সা নেন না। বড় ভাল লোক। কিন্তু কিছু জানেন তো। গুরুপদ ডাক্তারকে যদি একবার দেখাতে পারতাম! শহরের ব ডাক্তার। সেরে উঠব না আর জানি; তবু একটু ভাল চিকিচ্ছে হ'লে য কিছুদিন টিঁকে যেতে পারি। ছেলেটাকে যদি পাস ক'রে একটা ভাল চাকরি করতে দেখি তো নিশ্চিন্তে মরতে পারি। তবে টাকা চাই। ঘ গায়ে এক টুকরো রাংও নাই; সব বিক্রি হয়ে গেছে। তবে বাসন-কো দু-চারখানা এখনও আছে, যদি বাঁধা দিয়ে কিছু পাওয়া যায়—

কহিলাম, ওসব থাক্। গুরুপদবাবুর কাছে যাব আজ। বুঝিয়ে বললে তো ফী নেবেন না। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, পাগল! তা কি সবে! ফী পাবে না জানতে পারলে কোন অছিলা ক'রে পাশ কাটিয়ে যে, দেখো তার চেয়ে বরং—

বাধা দিয়া কহিলাম, আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক নিয়ে সব ওঁকে। আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ—

বেশ, যদি পার তো ভালই। তোমার উপকার— যাক্, ও কথা ব'লে র অপমান করব না তোমার।

বাহিরে আসিলাম। হরিসাধনবাবুর কথা মনে ভাসিতে লাগিল। জীবনে নেক দুঃখ পাইয়াছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না হার। পনরো আনা শিক্ষিত বাঙালীর মত অন্তরের যোগ ছিল। কিন্তু স্তি পাইয়াছেন রীতিমত। মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুলের ডমাস্টার ছিলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়ে তাঁহার বোর্ডিঙের লেরা কয়েকটি হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়ে। জাঁদরেল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই পরাধে তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। কর্তৃপক্ষদের কাছে অনেক আবেদন-বেদন করিয়াছেন; কোন ফল হয় নাই। অনেক স্কুলে নীচু ক্লাসের ক্ষকতার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে, হ তাঁহাকে চাকুরি দিতে সাহস করে নাই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া দ্রলোক বিব্রত হইয়া পড়েন। শেষে আমাদের শহরে আসেন। ওই মাটির ড়িটা অতি অল্প টাকায় ভাড়া লইয়া বাস করিতে শুরু করেন। সেই সময়ের মার সঙ্গে আলাপ হয়। আমি কয়েকটি টিউশনি যোগাড় করিয়া দিই। হাতেই কোন মতে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে ষ্টের সীমা ছিল না। লঙ্গরখানা হইতে লাপসি আনাইয়া খাইতে হইয়া— ল অনেকদিন। এই সময়ে ভদ্রলোক অসুস্থ হইয়া পড়েন। টিউশনিগুলি তছাড়া হইয়া যায়। স্ত্রীর সামান্য অলঙ্কার যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সার চালাইতে হয়। কাজেই চিকিৎসা নিয়মিতভাবে হয় নাই। ফলে রে ধীরে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া গিয়াছেন। বৎসর তিন আগে বড় ছেলেটি টি কুলেশন পাস করিয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের অনুগ্রহে কোন এক

সওদাগরী আফিসে অতি সামান্য বেতনে কেরানীর চাকরিতে ঢুকিয়াছে। তা ছাড়া দুই-তিনটি টিউশনি করে। নিজের খরচ চালাইয়া যাহা বাঁচে, পাঠাই দেয়। তাহাতেই কোন মতে দুই বেলা অনশনকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে ছেলেটি চাকরি করিতে করিতে আই. কম. পাস করিয়া বি. কম. পড়িতেছে পাস করিতে পারিলে চাকরিতে উন্নতি হইবে—আফিসের বড়বাবু আ দিয়াছেন। এইটি চোখে দেখিয়া যাইবার জন্য হরিসাধনবাবু জীবনে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শহরের দিকে চলিলাম। কতকটা যাইতেই রাস্তার ধারে রায় বাহাদু সঞ্জীব সোমের বাড়ি। ইনি অবসরপ্রাপ্ত পুলিসের বড় সাহেব। বারান্দ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। ড্রয়িং-রু রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে। উপরে তাকাইয়া দেখিলাম, বাড়ির মাথ জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে। বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটর-গাড়ি তাহার সামনে একটা পতাকা। ছেলেমেয়েরা, খদ্দরের ধুতি শাড়ি পরি আনন্দ-কলরব করিতেছে। জন দুই মিস্ত্রী বাড়ির কার্নিসে বিদ্যুতের ত বসাইতেছে। রাত্রে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হইতেছে সম্ভবত।

স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে করিতেছেন রায় বাহাদুর। অথ সারা জীবন ধরিয়া স্বাধীনতার স্রোতকে প্রাণপণে রোধ করিবার চে করিয়াছেন ইনি। সামান্য দারোগা ছিলেন প্রথমে। জন কয়েক বিপ্লবী ধরিয়া পদোন্নতি হয়। কাঁথিতে লবণ-আন্দোলনের সময় সেখানে পুলিসে কর্তা ছিলেন। অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন সেখানে। মেদিনীপু বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময়ে শহরবাসী, তথা জেলাবাসীদের উপরে নির্ম নির্বিচার নির্যাতন চালাইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতার সূর্য উঠিতে উঠিতেই অভিনন্দন জানাইতেছেন। পেনশনটি যাহাতে নির্বিবাদে ভো করিতে পারেন, পুত্রকন্যার জীবনযাত্রা যাহাতে বিঘ্ন-সঙ্কুল না হয়, এই আশ বোধ হয়। যাহাদের একদিন নির্যাতন করিয়াছেন, অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় তাহাদে দরজায় দরবার করিবেন সর্বাগ্রে।

পাশের একটা রাস্তা হইতে একটি মিছিল বাহির হইল। শহরের নিকটবর্ত পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছে সম্ভবত। মিছিলের মাথায় একটি লো ঘোড়ায় চড়িয়া পতাকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারই পিছে

য়েকজন লোক নাকাড়া বাজাইতেছে। তাহাদের পিছনে সারিবদ্ধ জন-শ্রেণী। ভিড়ের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে শিঙ্গা বাজিয়া উঠিতেছে; মাঝে মাঝে বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও নেতাদের জয়ধ্বনি। দলের মধ্যে মুসলমান দেখিলাম অনেক। ইহারাও সানন্দে যোগ দিয়াছে। শুভলক্ষণ নিশ্চয়ই। দেশের মুক্তি আসিয়াছে। মুক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, দেশের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের। প্রত্যেকের জীবন বন্ধন-মুক্ত হইল; পূর্ণ পরিণতি লাভের পথ পরিষ্কৃত হইল প্রত্যেকের। মুক্তির আনন্দ সকলে সমানভাবে উপভোগ করিবেন না কেন? চিরদিনই তো করিয়াছে। বিপদে-আপদে, কাজে-কর্মে, সুখে-দুঃখে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বাধা কখনও এককে অপরের কাছ হইতে বিযুক্ত করে নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিকদের কুটিল চক্রান্তে দেশের যাহারা আশু ভবিষ্যতে পদ-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লোভে জাতির দেহে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছে, যাহার ফলে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিতেছে না, এক অপরকে নির্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে দেশ ও জাতির কত অকল্যাণ করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার নেশায় আজ হয়তো তাহা বুঝা যাইবে না; কিন্তু নেশা কাটিলে যখন বুঝা যাইবে, তখন প্রতিকারের উপায় থাকিবে না। তবু আজ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাদের প্রত্যেকার মনের অবস্থা, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি যাহাই হোক, আজ সব পিছনে ফেলাইয়া রাখিয়া আনন্দের দিনে আত্মীয়ের মত যোগ দিয়াছে—ইহা আনন্দের কথা বইকি।

মিছিলটি দ্রুত পার হইয়া গেল। দলে দলে আরও অনেক লোক চলিয়াছে। রিক্‌শা করিয়া অনেক মহিলাও যাইতেছেন। ইহারা শহরের লোক। জাতীয়-পতাকা-উত্তোলনপর্ব দেখিতে যাইতেছেন। আমিও ধীরে ধীরে ভিড় বাঁচাইয়া অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং সাইকেল ঘণ্টির সতর্কধ্বনি ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, আমাদের বিশ্বম্ভর বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পরনে আপাদমস্তক খদ্দর, বুকে স্বরাজ-পতাকা আঁটা। এক হাত হ্যাণ্ডেলে, আর এক হাত সুর-সাধনা-নিরত ওস্তাদের ভঙ্গীতে সম্মুখে প্রসারিত। চোখে মুখে

উত্তেজনা; কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান। আমাকে দেখিয়া বাইকে ব্রেক ক নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চলেছেন নাকি? আসুন পা চালিয়ে। হাতঘ দেখিয়া কহিল, আর বেশি দেরি নাই, আমাকে আবার ওপ নিং সঙ্গ গাইতে হবে। চললাম আমি।—বলিয়া বাইকে চড়িয়া ঘণ্টি বাজাই বাজাইতে ও 'বন্দে মাতরম্' গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

বিশ্বম্ভর আবার কংগ্রেসী হইল কবে হইতে? এতদিন তো তাহা কম্যুনিস্টদের পাণ্ডা বলিয়া জানিতাম। কংগ্রেস বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, কংগ্রে নেতারা পুঁজিপতিদের অর্থদাস, ধনিক ও বণিকদের ধ্বংস ও মজুর-র প্রতিষ্ঠা না হইলে দেশ ও জাতির মুক্তি নাই, মস্কো নিখিল-বিশ্বের নর-নার তীর্থস্থান, স্তালিন নির্যাতিত মানবের পরিত্রাতা, ইত্যাদি বলিয়া গলাবা করিয়াছে। হঠাৎ রাতারাতি কংগ্রেসী বনিয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর কে অনেকেই তো তাই। ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে কংগ্রে একনিষ্ঠ কর্মী শতকরা কয়জন? আন্দোলনের হিড়িকে অনেকে হয়তো জে গিয়াছে, অনেকে খদ্দর পরিয়াছে, দুই-চারজন মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে ক বস্ত্রধারী হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়া কয়জন? কংগ্রেসের কাজে নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে কয়জ আমরা স্বাধীনতা চাহিয়াছি বটে, স্বাধীনতা লাভের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীক করিয়াছি, কতটুকু কষ্ট সহ্য করিয়াছি? চাকুরে চাকুরি করিয়াছে, ব্যবস বেপরোয়া ব্যবসা চালাইয়াছে, চাষী চাষ করিয়াছে, মজুর মজুরি করিয়া মেয়েরা মন-প্রাণ দিয়া সংসার করিয়াছে। দেশের জন কয়েক নেতা, কে সহস্র কর্মী আন্দোলন চালাইয়াছেন, পুলিসের হাতে মার খাইয়াছেন, বন্দুে গুলিতে মরিয়াছেন, ফাঁসি গিয়াছেন, আজীবন জেলে পচিয়াছেন, অনশনে ও দিয়াছেন। আমরা বাহবা দিয়াছি, কখনও ভাবাবেগে অশ্রুপূরিতলো হইয়া উঠিয়াছি; কখনও রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছি; বৈঠকখানায় বসি মজলিস করিয়া চা, সিঙাড়া ও সিগারেটের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে গ বাজি করিয়াছি; সভা-সমিতিতে হুঙ্কার ছাড়িয়াছি; খবরের কাগজে মাসিকের পৃষ্ঠায় কড়া কড়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও গান লিখিয়া ছাপাইয়াছি আবার নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিজ নিজ কর্মে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছি। দেশসেবকে অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, অকাতরে জীবনদান আমাদিগকে নিজ ি

জীবন-পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আমরা কোন দিন বিশ্বাস করিতে পারি নাই—কংগ্রেসের মুক্তি-আন্দোলন এত শীঘ্র সাফল্যমণ্ডিত হইবে। যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম তাহা হইলে দেশের জন্য না হোক, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৎসরে চার আনা পয়সা খরচ করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রাখিতাম। বাক্যে-ব্যবহারে, পরনে-করণে এতটা ঔদাসীন্য দেখাইতাম না। আজ হঠাৎ কংগ্রেসের হাতে শাসনভার তুলিয়া দিয়া ইংরেজ দেশ হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; আমরা হকচকিয়া গিয়াছি। যতটা পারি সামলাইয়া কংগ্রেসের দলে ভিড় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। যে দুঃখের অনলে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হয়, সে আগুনের আঁচ পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগে নাই। আমাদের চরিত্রের খাদ যাহা ছিল, তাহা পুরোপুরি রহিয়াছে। আমরা বাহিরে খাঁটি সাজিয়া সুযোগ-সুবিধায় ভাগ বসাইবার জন্য ছোটাছুটি শুরু করিয়াছি।

কতকটা আসিতেই এক দল মেয়ে বাঁ-হাতি একটা রাস্তা হইতে বড় রাস্তায় আসিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের মেয়ে অধিকাংশ। পরনে মিলের কালোপাড় সাদা শাড়ি, কোমরে আঁচল জড়ানো। নবজীবনের প্রত্যাশায় মুখগুলি আভাময়। গান গাহিয়া চলিয়াছে—"জাগে নব ভারতের জনতা, একজাতি একপ্রাণ একতা—"

এক পাশে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলাম। তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে তারা। সারা দেহে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। আগামী কালে বাংলার ছেলেদের সকল বাধা বিপত্তি বিরোধ অবিচার অতিক্রম করিয়া ভারতের মধ্য অগ্রণী হইতে হইবে, তাহাদের ভাবী জননী ইহারা। যে জাতীয়-পতাকা আজ সাড়ম্বরে তোলা হইতেছে, তাহাকে অনবনমিত রাখার গুরুভার যাহাদের, যাহাদের বুকের রক্ত দিয়া লালন-পালন করিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে চরিত্রগরিমায় দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ করিবার দায়িত্ব ইহাদের। যে আনন্দের রূপ আজ সারা দেশের প্রত্যেকটি মানুষের বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্বাণ রাখিবার দায়িত্ব ছেলেদের চেয়ে ইহাদের এক বিন্দু কম নয়, এ সম্বন্ধে ইহারা যেন আজ হইতে সচেতন হইয়া উঠে।

মেয়েরা চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে চলিলাম। কতকটা যাইতেই ঝড়-ঝড়-ঝড়াং ঝড়-ঝড়-ঝড়াং শব্দে শশব্যস্তে পাশ কাটাইয়া

দাঁড়াইলাম। একটা পুরাতন, রঙ-চটা, ঝড়ঝড়ে মোটর গাড়ি বেসুরা ভেঁ বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ির আরোহীকে চিনিলাম জেলার সি. আই. ডি.র বড়কর্তা। বিপুল দেহ; কোলা ব্যাঙের মত মো খ্যাবড়া নাক; নাকের নীচে কড়া বাটারফ্লাই গোঁফ। মাথার সামনেট বিস্তৃত টাক—পালিশ-করা ব্রোঞ্জের পাতের মত চক্‌চকে। পরনে পুলিশে খাকী পোশাক। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইলেন বৎসর কয়েক আগে ইঁহার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল আমার। ১৯৪ সালের আন্দোলনের সময়। আমার একজন আত্মীয় ও ছাত্র এই জেলা এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করিত। ভদ্রলোক স্থানীয় থানার দারোগা ছিলেন। কোথায় ঘুষ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ছেলেটি বাগড়া দেওয়ায় সুবিধা হয় নাই। আন্দোলন আরম্ভ হইবার মাস কয়েক পরে, একদিন রাতে গ্রামের পোস্ট-অফিসের খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে ধরিয়া গারদে পুরিয়া দিলেন। ছেলেটির বিধবা মা আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ছেলেটি নির্দোষ, ঘটনার দিনে নাকি বাড়িতেই ছিল না আমি দারোগাবাবুর কাছে গিয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিলাম কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছেলেটির জেল হইয়া গেল। শুধু ছেলেটিকে নয়, ঐ সময়ে আরও পঁচিশ-ত্রিশজন ছেলেকে ভদ্রলোক বিন অপরাধে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সরকার বিশেষ পারদর্শিতার জন্য পুরস্কৃত করেন তাঁহাকে। অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হয়। এখন তো অনে উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। ইনিও আজ স্বাধীনতা-দিবস উৎসবে সবেগে ঘো দিতে ছুটিয়াছেন।

চলিতে শুরু করিলাম। কিছুক্ষণ পরে, বাজখাঁই কণ্ঠে—"মহাত্মা গান্ধীকি জ্যায়, জহরলালজীকি জ্যায়, নেতাজীকি জ্যায়' শুনিয়া পিছন ফিরিয় তাকাইয়া দেখিলাম—একটা রিক্‌শা প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে রিক্‌শাওয়ালার দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। ভদ্রলোকের ছেলে নাম পশুপতি। শহরেই বাড়ি। বেঁটে, মোটা, লোমশ দেহ; মুখে এক মু দাঁত; দুই পাশে দুইটা গজদন্ত ঠোঁটের কোণ ঠেলিয়া উঁচাইয়া আছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল, মাথায় বড় বড় চুল। পশুপতি নাম সার্থক উহার। শহরে 'পাগল পশু' বলিয়া খ্যাত। পাগল ঠিক নয়, ভান করে মাত্র। পুলিসের স্পাই ছি

দ্ধর সময়ে। চা ও খাবারের দোকানে বসিয়া যুদ্ধের আলোচনা করিত; টলালের জয়গান করিত; ইংরেজের পতন অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণী করিত। না চমকপ্রদ খবর বানাইয়া লোককে হকচকাইয়া দিত। ওদিকে গোপনে লিসকে শিকারের সন্ধান দিত। যুদ্ধের সময়ে অনেক লোককে ফাঁসাইয়াছে । এখন রেশনের দোকান করে। গরিব লোকদের নামের চিনি রোসিন ও কাপড় কালো দামে বিক্রয় করিয়া রোজগার করে মন্দ নয়। প্লাই-বিভাগের কর্তাদের দালালের কাজ করে। তাহা ছাড়া আর একটি কাজ -পুলিসের লোকদের জন্য বাউরী মেয়ে সংগ্রহ করিয়া দেয়। পশুপতির পরনে দ্ধরের ধুতি, পরনে খয়রা রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি, মাথায় খদ্দরের টুপি, হাতে ছোট একটি জাতীয়-পতাকা আলপিন দিয়া আঁটা। রিক্‌শার ভিতরে াকাইয়া দেখিলাম, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও নেতাজীর ছবি পাশাপাশি সানো। রিক্‌শার সামনের ডাণ্ডায় বাঁধা একটা বাঁশের কঞ্চির মাথায় জাতীয়-তাকা উড্ডীয়মান। আমাকে দেখিয়া পশুপতি থমকিয়া দাঁড়াইল; এবড়ো-খবড়ো দাঁতগুলা বাহির করিয়া হাসিয়া, ড্যাবডেবে চোখ দুইটা চাড়াইয়া ৎকার করিয়া উঠিল—মহাত্মা গান্ধীকি জ্যায়, জহরলালজীকি জ্যায়, নতাজীকি জ্যায়। তারপর লাফাইতে লাফাইতে দ্বিগুণিত বেগে ছুটিতে শুরু রিল।

ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। পাশ দিয়া একটা কালো ঝকঝকে মোটর পার হইয়া গেল। শহরের গুরুপদ ডাক্তার চলিয়াছেন। খনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। আর ডাক্তারের বাড়িতে ছুটিতে হইবে না। খানেই পাওয়া যাইবে তাঁহাকে। দিবারাত্র অর্থোপার্জনে ব্যস্ত থাকেন দ্রলোক। আজ বোধ হয় বিশ্রাম লইবেন। কাজেই ডাকিয়া আনাও াইবে। স্বাধীনতা-দিবসে মনের সুর যদি উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকে তো কাটা রদ করাইবার জন্য বেশি বাক্‌বিস্তারের প্রয়োজন হইবে না।

পাশের একটা গলি হইতে রিক্‌শারোহণে বাহির হইলেন—রায় সাহেব াঘবেন্দ্র। বেঁটে মোটা চেহারা; মেটে রঙ; ভারী মুখ; ফোলা-ফোলা াল; ভোঁতা চিবুক, চিবুকের নীচে থলথলে মাংসের থাক। মাথায় বড় বড় ল, সামনের দিক হইতে পিছনে উলটানো; পিছনে বব-করা। ছোট-ছোট চোখ দুইটি চাতুর্যে চকচক করিতেছে। গালে পান; ফোলা গাল আরও

ফুলিয়া উঠিয়াছে। পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ও চাদর। হাঁকিয়া কহিলা নমস্কার, চলেছেন নাকি? রিক্‌শাওয়ালাকে থামিতে বলিয়া রায় সাহেব ভু নাচাইয়া কহিলেন, যাব না! বলেন কি! জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দি আজ! কাল রাত্রে জহরলালের স্পীচ শুনেছেন? রেডিও নাই, শুনবে কি ক'রে? বাংলায় তর্জমা করেছি, 'সেবকে'র বিশেষ সংখ্যায় বেরুবে আ পড়বেন! রায় সাহেব স্থানীয় পত্রিকা 'সেবকে'র সম্পাদক। কহিলাম, আপ তো হিন্দু-মহাসভার পাণ্ডা, আপনাদের—। বাধা দিয়া রায় সাহেব কহিলে না না, পাণ্ডা নয়, সাধারণ সভ্য। তা অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে কিন্তু আমি তো শুধু হিন্দু নয়, ভারতীয়ও তো; সে হিসাবে কংগ্রেসেরও সভ্য তা ছাড়া, হিন্দুসভার সভ্য ব'লেই তার অন্যায় নির্দেশ মানতে হবে নাকি মুসলমানরা তো স্বাধীনতা-দিবস পালন করতে অস্বীকার করে নি। যা ও কথা। যাচ্ছেন তো ওখানেই। আসুন না, রিক্‌শায় জায়গা হবে।

রিক্‌শাওয়ালার পাতলা ডিগডিগে চেহারা রায় সাহেবের ভার বহনে জখম হইয়া উঠিয়াছে। আবার ভারবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া সকাতরে তাকাইল। কহিলাম; ধন্যবাদ। থাক্‌গে, আপনি চলুন রায় সাহেব। রায় সাহে হাত নাড়িয়া কহিলেন, আর রায় সাহেব না, ওটা ছেড়েই দিলাম। স্বাধী ভারতে দাসত্বের তকমা সহ্য হবে না আর। কহিলাম, তাই নাকি? ভাল।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে।—বলিয়া রায় সাহেব প্রস্থান করিলেন।

আশেপাশে লোক ছুটিতেছে। কেউ রিক্‌শায়, কেউ মোটরে, অধিকাং পদব্রজে। সকলের গন্তব্য স্থান একই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠীর সামে বিস্তৃত মাঠে পতাকা-উত্তোলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পতাকা তুলিবেন জেল কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। নিজ নিজ বাড়িতে পতাকা উঠিয়াছে সবারই তবু ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। কারণ ঐ অনুষ্ঠান সর্ব সাধারণের। যেন বাড়ির পূজা, আর বারোয়ারী পূজা। যেন বাড়ির তোলা জলে স্নান, আর সরোবরে সকলে মিলিয়া অবগাহন। একটা আনন্দ পারিবারিক আর একটি সর্বজনীন। একটা পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে কয়েকটি মনের যোগাযোগ, আর একটি সর্বজন-মনের সঙ্গে সংযোগ। এই সর্বজনী অনুষ্ঠানের মধ্যে এই কথাটি মনে-প্রাণে বুঝা যাইবে, স্বাধীনতা কোন বিশে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের। ইহা রক্ষার

রিত্বও সর্বসাধারণের। স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য সকলের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাই এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

হনহন করিয়া একটা লোক পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। ঢ্যাঙা, কালো। পরনে হাফ-হাতা খাটো টুইলের পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি, পায়ে ালিমারা জুতা। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতেছে। ডাক দিলাম, ওহে, এত তাড়াতাড়ি কেন? দাঁড়াও না। লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া এত নাড়িয়া কহিল, আর দেরি নয়, যাবেন তো পা চালিয়ে আসুন।

লোকটির নাম পাঁচুগোপাল। মনিহারী দোকান ছিল। যুদ্ধের বাজারে উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে যাহাদের দোকান কোন কালে ছিল না তাহাদের নূতন করিয়া পত্তন হইল, আর পাঁচুর পুরাতন দোকান উঠিয়া গেল, তাহার হেতু হিটলার। হিটলারই পাঁচুর স্কন্ধে ভর করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিটলার যে কত ক্ষতি করিয়াছে, পাঁচুই তাহার প্রমাণ। অথচ পাঁচুর মত হিটলারের হিতৈষী ক'জন ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে পাঁচু পাঁচখানি বাংলা-ইংরেজী খবরের কাগজ কিনিয়া দোকানে বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিত। যুদ্ধের খবরগুলির মাথা খাটাইয়া এমন ভাষ্য করিত যে, শঙ্করভাষ্যও হার মানিয়া যায়। দোকানে খরিদ্দার আসিলে বিরক্ত হইত, বলিত, কি তেল-সাবান স্নো-ক্রীম কিনে বেড়াচ্ছেন! দুনিয়াতে কি হচ্ছে একবারটি ভেবে দেখুন গে না বাড়িতে বসে। শেষে বলিয়া দিত, মশায়, আরও দোকান আছে, সেখানে যান না, আমাকে বিরক্ত করেন কেন? যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানরা যখন ঝড়ের মত দুর্নিবার বেগে আগাইয়া চলিয়াছিল, তাহাদের নির্মম আঘাতে শহরের পর শহর উন্মূলিত তরুর মত ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল, পাঁচুর তখন তুরীয় অবস্থা। স্নানাহার ভুলিয়া সারা শহর চষিয়া বেড়াইত, পরিচিত কাহাকেও দেখিলেই পাকড়াও করিয়া যুদ্ধের খবর শুনাইত, হিটলারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করিত। বলিত, আরে, কল্কি অবতার মশায়। যত পাপের আবর্জনা পাহাড়ের মত জমেছে, সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে সত্যযুগ এনে দিয়ে তবে যাবে। এত বড় মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মেছে কি কখনও? এত বড় বীর, এত বড় ধার্মিক? যেমন নির্মল-চরিত্র, তেমনই নির্লোভ। এত বড় দেশের মালিক, একটা পয়সা ব্যাঙ্কে নাই।

মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত দেখে না। তা ছাড়া সদাচারী। মাছ মাংস স্পর্শ করে না, শুনেছি, স্নান ক'রে গীতার এক অধ্যায় পাঠ না ক'রে নাকি চা খায় না। নামেই খ্রীষ্টান, আচারে আচরণে গোঁড়া হিন্দুকেও হার মানিয়ে দেয়। ইংরেজ যখন 'বিসমার্ক' ডুবাইয়া দিল, পাঁচু সাত দিন শয্যাশায়ী ছিল। যুদ্ধের যে দিকটাতে জার্মানদের যখন ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হইল, পাঁচু একবারে দমিয়া গেল। মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত কথা বলিত না, দোকান খুলিত না, ঝ'ড়ো কাকের মত মূর্তি করিয়া এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। শেষে দোকান বন্ধ উঠিয়া গেল, বাড়িতে বসিয়া নিঃশব্দে দাদার ধমক-অপমান, স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিত।

পাঁচুর সঙ্গ লইতেই সে জোরকদমে ছুটিতে শুরু করিল। কহিলাম, এ ছুটছ কেন? পাঁচু মুখ ফিরাইয়া কহিল, ছুটব না! বলেন কি! কি ব্যাপার হচ্ছে বলুন দেখি? আগাগোড়া যদি না দেখলাম তো করলাম কি এত দি ধ'রে? মহামানবের মহাদান সারা দেশের লোক মাথা পেতে নিচে সেই দৃশ্য—

বাধা দিয়া কহিলাম, মহামানবটি কে? অ্যাটলি, ক্রিপ্‌স, মাউন্টব্যাটে ইংলণ্ডেশ্বর—

পাঁচু থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইল। পাঁচুর মাথার সাম দিকটায় চালাও টাক। মুখটায় ঘোড়ার মুখের আদল সুস্পষ্ট; মুখে গোঁফদা স্বল্প; ছোট ছোট চোখ; সেই চোখ দুইটার দৃষ্টি দুইটা সঙ্গিনের ম খোঁচাইতে লাগিল। পাঁচু মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সক্ষোভে বলি লাগিল, সোজা জিনিসটা সোজাভাবে দেখতে জানেন না আপনারা, এইটা হয়েছে আসল গলদ। এত বড় লোকক্ষয়ী যুদ্ধটা বৃথা হয় নি। এর পিছ ছিল একজন মহামানবের মহৎ উদ্দেশ্য। সেই মহামানব মহাপ্রাণ হিটলা মহৎ উদ্দেশ্য—জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। তবে প্রত্যেক মহৎ উদ্দে সাধনের পথেই মহতী বাধা; কাজেই, কাজের শেষ দেখে যেতে পারলেন ন অকালে আত্মগোপন করতে হ'ল। কহিলাম, খবরের কাগজে তো লিখেছে হিটলারের মৃত্যু হয়েছে। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মৃত্যু হয় নি। মৃত্যুঞ্জয়ী বী তিনি, এত সহজে তাঁর মৃত্যু হয় না। উত্তরমেরুতে বরফ-গুহায় তপ করছেন; শক্তি সঞ্চয় করছেন। এবার দৈহিক শক্তি নয়, আত্মিক শক্তি

রজরা জানে। তাই মানে মানে সাম্রাজ্যের জাল গুটোতে শুরু রছে—

আমাদের স্বাধীনতা তা হ'লে—

হ্যাঁ, হিটলারের জন্যে। এই কথাটি মনে প্রাণে বোঝা দরকার সবারই। ধীনতার পতাকা যখন উঠবে, এই কথাটি ভাববেন যে, আর কারও ন্য নয়—একমাত্র সেই মহাপুরুষের জন্যে স্বাধীনতা পেয়েছেন আপনারা।

আবার ছুটিতে শুরু করিল। আমিও চলিতে লাগিলাম। কতকটা গিয়া জ্ঞাসা করিলাম, এখন কি করা হচ্ছে? দোকান? ডান হাতটা চিত্ত রিয়া দিয়া সে কহিল, সে গয়া। ওঃ, যতদিন ছিল, বাড়িতে একেবারে তিষ্ঠ ক'রে দিয়েছিল মশায়! একে মনের সেই দারুণ অবস্থা, তার ওপরে নরাত খেচাখেচি। এখন আর মুখে কথাটি নাই কারও। একটু চুপ রিয়া থাকিয়া কহিল, দাদাকে বলেছি একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিতে, র্জীর দোকান করব।

কহিলাম, কাটছাঁট শিখেছ নাকি?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, ও একরকম শেখাই। স্বাধীন ভারতে তো ার ফ্যাশান-ট্যাশান থাকবে না। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ফতুয়া, বালিশের ড় সেলাই করতে জানলেই হবে।

হঠাৎ কানের কাছে মুখটা আনিয়া কহিল, তা-ছাড়া একটা গাঁথবার চেষ্টায় ছি। কংগ্রেস গভর্মেণ্ট তো। যারা কংগ্রেসের কাজ করেছে, তাদের ার বেকারবৃত্তি করতে হবে না।

কহিলাম, তুমি কংগ্রেসের কাজও করেছিলে নাকি?

ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, করি-নি! বলেন কি! পিকেটিং করেছিলাম গাঁজার াকানে।

জেলে তো যাও নি।

সখেদে কহিল, না নিয়ে গেলে যাব কি ক'রে? ধ'রে নিয়ে গিয়ে যদি ছেড়ে দেয়, সে কি আমার দোষ? আমি তো চেষ্টার কসুর করি নি। থা নাড়িয়া কহিল, আপনি না জানলেও শহরসুদ্ধ সবাই জানে, আমি একজন কংগ্রেস-কর্মী। আর আপনিই বা জানবেন না কেন? সেদিনের থা। মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে পাড়ার সব ভোট যোগাড় ক'রে দিলাম

কংগ্রেসকে। মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, আমার জন্তে ভাবতে হবে না কাউকে, আমার হয়ে যাবে।

মাঠের সামনে পৌঁছিলাম। লোকে লোকারণ্য, তিল ফেলিবার জায়গা নাই। দূরে আদালতের বাড়িগুলি দেখা যাইতেছে। মাথায় মাথায় জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান। ১৯৩০-৩১ সালের আন্দোলনের কথা মনে পড়িল। স্কুল ও কলেজের ছেলেরা আদালত-গৃহের মাথায় জাতীয়-পতাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিস-সাহেব ছিলেন খাঁটি সাহেব। দেশী কুত্তা-বাচ্চাদের দুঃসহ স্পর্ধা দেখিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে পুলিস—আমাদের দেশের লোক, সমস্ত ছেলেকে রুলের বাড়ি মারিয়া আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়া দিল। মারের চোটে একটি ছেলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু আমাদের এখানেই নয়, সারা দেশের জেলায় জেলায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক বিদেশীর দল কোথায় গেল? তাহারা চোখ মেলিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে কি? আর আমাদের দেশের পুলিস যাহারা আজ ভিজা বিড়াল সাজিয়া মুখে স্বদেশী বুলি কপচাইতেছে, তাহাদের এ সব কথা মনে পড়িতেছে কি?

পাঁচুগোপালের পাছু পাছু ভিড় ঠেলিয়া চলিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে দেশের নেতৃবৃন্দের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। নানা রাস্তা দিয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে জনস্রোত বিশাল জনসমুদ্রে আসিয়া মিশিতেছে।

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া অনুষ্ঠান-স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শহরের ও জেলার কংগ্রেসের মাতব্বরেরা সকলে সমুপস্থিত। সকলেই খদ্দরধারী। মুখে গাম্ভীর্য। কংগ্রেসের তরুণ কর্মীরা প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্খলা-বিধানে ব্যস্ত। অত্যন্ত উদ্ধত উন্মাসিক ভাব। এই অনুষ্ঠান যে একমাত্র তাহাদেরই নিজস্ব ব্যাপার, বাকি সকলে রবাহূত দর্শকমাত্র, ভাবে ভঙ্গীতে ইহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ডাক্তার ও উকিল, জমিদার ও কনট্র্যাক্টর, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সভ্যবৃন্দ আসিয়াছেন। অনেক সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত হইয়াছেন। দুই-চারজনের পরিধানে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। পুলিস-কর্মচারী আসিয়াছেন কয়েকজন; পরিধানে পুলিসের পোশাক, কিন্তু হাবে ভাবে পরমবৈষ্ণবসুলভ বিনয়-বিগলিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখে উল্লাসোচ্ছল কোলাহল-মুখর জনারণ্য। পুরোভাগে এক দিকে স ও কলেজের ছাত্রেরা, আর এক দিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা ও শহরের গতিসম্পন্না মহিলাবৃন্দ। মাঝখানে মাস্টার, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার, করানী ইত্যাদি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভিড়। পশ্চাতে শহরের ও শহরের শেপাশের পল্লীগ্রামের হাজার হাজার লোকের বিরাট সমাবেশ। ইহার মধ্যে াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জমি-জায়গার আয়ভোগী সাধারণ ভদ্রলোক, াতদার, মহাজন, ছোটখাটো ব্যবসাদার, শিল্প-জীবী, কৃষক ও মজুর। হাদের স্বার্থ বিভিন্ন, অনেক ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী। তবু আজ কটি বৃহৎ আনন্দ-তরঙ্গে হাজার হাজার মানুষের হাজার ধরনে বাঁধা হাজার কমের মনের তারে একই সুর বাজিয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ হরিসাধনবাবুর কথাটা মনে পড়িল, স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, কন্তু কাহাদের স্বাধীনতা? ঐ নবলব্ধ প্রভাবে স্ফীতগণ্ড কংগ্রেসী নেতা ও ীদের, স্বার্থ-সর্বস্ব অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের, অভাবকণ্টকিত মধ্যবিত্ত দ্রলোকদের, দারিদ্র্য-জর্জর জনগণের? স্বাধীন জীবনের সুখ-সুবিধার যে স্বপ্ন ত্যেকের চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঐ হৃদয়হীন বিবেক-বিচারশূন্য ব্যবসায়ীর—ধ অর্থের লোভে দেশবাসীর খাদ্যে বিষ মিশাইতে দ্বিধা করে না, দেশবাসীর াদ্য ও পরিধেয় লইয়া জুয়া খেলে, ঐ জবরদস্ত জমিদারের—যে প্রজাপীড়ন রিয়া নিজের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করে, ঐ কুসীদজীবী মহাজনের—যে নিরক্ষর রলবুদ্ধি কৃষকদের ঠকাইয়া তাহাদের জীবন-যাত্রার স্বল্প সম্বলকে নিজের সিন্দুকে ঢোকায়, ঐ অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের—দুর্গম জীবন-যাত্রাপথে াহারা দিশাহারা, ঐ দীন দরিদ্র কৃষক ও মজুরদের—যাহারা বংশানুক্রমে পশুর ত জীবন যাপন করিয়া মনে ও প্রকৃতিতে পশুর মত হইয়া উঠিয়াছে, ঐ ব স্বপ্নের প্রকৃতি তো এক হইতে পারে না। একসঙ্গে সকল স্বপ্নের সাফল্য সম্ভব। কাহাদের স্বপ্ন সফল হইবে?

হঠাৎ জনসমুদ্র গর্জন করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। চমকিয়া চাহিয়া খিলাম, জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি মহাশয় পতাকার দড়ি ধরিয়া ানিতেছেন, পতাকা সরসর করিয়া উপরে উঠিতেছে। জনসমুদ্র পুনঃ পুনঃ ঙ্কার ছাড়িতে লাগিল, বন্দে মাতরম্, মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়, জহরলালজীকি জয়—

কে একজন হাঁকিয়া উঠিল, নেতাজীকি জয়। এখানে ওখানে ঐ প্রতিধ্বনি উঠিল।

পতাকা উপরে উঠিয়া পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল।

সকলে পতাকাকে অভিবাদন করিলাম। বক্তৃতা হইল না। সভাপা মহাশয় ফতোয়া দিলেন, বিকালবেলায় এই মাঠে সভা হইবে; এই মা কংগ্রেসের মাতব্বরেরা বক্তৃতা করিবেন; সকলে যথাসময়ে যেন উপস্থিত হ কংগ্রেসকর্মীরা হাঁকিয়া হাঁকিয়া সভাপতি মহাশয়ের আদেশ উপস্থিত জ মণ্ডলীকে জানাইয়া দিল।

ইহার পর মুক্তি-সংগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন-পর্ব। এক কতকটা জায়গার উপরে শহীদ-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। সাজোপাঙ্গ সমভিব্যাহা সভাপতি মহাশয় সেই স্থানের দিকে চলিলেন। অনেকে অনুসরণ করি বাকি জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

আমি ডাক্তারবাবুর খোঁজে শ্যেনদৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিলাম। এখানে আসিয়াছেন নিশ্চয়। হঠাৎ চোখে পড়িল, দূরে এ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। ভদ্রলোককেও চিনিলাম মিউনিসিপ্যালিটির একজন ধুরন্ধর পাণ্ডা। ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়া হাজি হইলাম। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, জয় হিন্দ, কি খবর? নমস্কার করি কহিলাম, জয় হিন্দ। ডাক্তারবাবু কহিলেন, স্বাধীনতা তো পাওয়া গে এর পর?

কহিলাম, এর পরের সমস্যাই তো আসল সমস্যা ডাক্তারবাবু। আ ঝড়ের মুখে মাঝ-দরিয়ায় হাল ছেড়ে দিয়ে মাঝি তো স'রে পড়ল। হাল আ বৈঠা ধরবার ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা এ কাজে অনভ্যস্ত, অনভিজ্ঞ। ঢে কাটিয়ে, ধাক্কা সামলে কূলে পৌঁছানো যাবে, না, মাঝ-দরিয়ায় তলিয়ে যে হবে, এইটাই তো ভাববার কথা।

ভদ্রলোকটি মুচকি হাসিয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিলেন, কিছু চিন্তা নাই স্বায়ত্তশাসন তো কতকগুলো প্রতিষ্ঠানে আমরা আগেই পেয়েছি, তা কৃতিত্বে সঙ্গে চালিয়েও যাচ্ছি। সারা দেশের স্বায়ত্তশাসনেও কোন অসুবিধা হবে না উপযুক্ত লোকের তো দেশে অভাব নাই।—বলিয়া ভাবে ভঙ্গীতে নিজের প্রা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ডাক্তারবাবু কহিলেন, কাজের ভার

গলে তো যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে যাঁরা ভার নিয়েছেন, তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি, হৃদয়ের শক্তি, চরিত্রের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশবাসীর প্রতি দরদ, স্বার্থত্যাগের তো প্রমাণের অভাব নাই। গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, তা এঁরা বহন করতে পারবেন না, এ সম্বন্ধে আগে থেকে সন্দিহান ওয়া উচিত নয় কারও। হাতঘড়ি দেখিয়া কহিলেন, এখনই অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে, জরুরী কেস—

কহিলাম, আমার একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে—

কি বলুন দেখি, বাড়িতে অসুখ নাকি?

বিস্ময়ের আভাস ফুটিল মুখে ও কথার সুরে। ওঁর মত বড় ডাক্তারকে চরাচর ডাকি না আমরা। হোমিওপ্যাথ ডাকিয়া কাজ চালাই। অবশ্য নেহাৎ বাড়াবাড়ি হইলে ওঁদের ডাকিতেই হয়। কহিলাম, না, আমার বাড়িতে য়। আমাদের পাড়ার একজন ভদ্রলোককে একবার দেখতে হবে।

কে বলুন দেখি?

নাম বলিতেই ডাক্তারবাবু কহিলেন, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক তো কোথায় ্যাস্টারি করতেন, গোলমালে প'ড়ে চাকরি গেছে। আমাকে একবার ডেকেছিলেন বটে, অনেকদিন আগে। ওষুধের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছিলাম। তারপর আর খবর দেন নি।

কহিলাম, ওষুধ তো নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন নি। আজকাল াম জানেন তো। অভাবী মানুষ—

এক টুকরা বাঁকা হাসি হাসিয়া শ্লেষের সুরে কহিলেন, ওষুধ না কিনতে পারেন তো ডাক্তার দেখিয়ে লাভ কি? ডাক্তারের মুখ দেখলেই তো রোগ পারবে না।

ভদ্রলোক সায় দিয়া কহিলেন, সত্যিই তো। মিছিমিছি ওঁদের সময় ষ্ট। তা ছাড়া রোগী টেঁসে গেলে দুর্নাম।

কহিলাম, ভদ্রলোকের অসুখটা খুবই বেড়ে উঠেছে। তবে ওঁর বিশ্বাস, আপনি একবার দেখলেই হয়তো সেরে উঠবেন। ডাক্তারবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাই নাকি! আমি দেখলেই সেরে উঠবেন? আমার ওষুধ খেতে হবে না? কহিলাম, ওষুধ খাবেন বইকি, নিশ্চয় খাবেন। তবে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের চেহারা দেখলেও রোগী আধেক সেরে যায়।

ভদ্রলোক আমার কথায় সায় দিয়া কহিলেন, তা সত্যি। ডাক্তারবাবুর প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলাম, আজ কি একটি বার যেতে পারবে ডাক্তারবাবু কহিলেন, এখন তো অসম্ভব। শুনলেনই তো, অনেক দূর যা সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারব ব'লে মনে হয় না।

কহিলাম, সন্ধ্যের পরে কি খবর নেব?

বেশ, নেবেন। আচ্ছা, আমি চলি।

মিউনিসিপ্যালিটির ভদ্রলোককে কহিলেন, যাবেন নাকি? চলুন, নাবি দোব আপনার বাড়ির সামনে।

কাছেই তাঁহার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। দুইজনে গিয়ে গাড়িতে উঠিলে

শহরের ভিতর দিয়া চলিলাম। অত্যন্ত ভিড়। প্রত্যেক দোকা মাথায় স্বরাজ-পতাকা উড্ডীয়মান। চা-খাবারের দোকানগুলা সরগরম। খরি অধিকাংশ মফস্বলের। সকাল হইতে এতখানি মেহনত করিয়া ক্ষুধাত তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে সকলে। দোকানীদের নূতন-করিয়া-ভাজা বাসি আকণ্ঠ গিলিতেছে। স্বাধীনতা-দিবস-পর্ব সারিয়া থলি হাতে বাজারের দি ছুটিয়াছে অনেকে। আজিকার মত দিনে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্য করা দরকার। তরি-তরকারি যাহাই হউক, মাছ একটু নিশ্চয়ই দরকার। যাহাই হউক। মাংস তো পাওয়া যাইবে না। পাঁঠাদের আজকার দিনটির বাঁচিয়া থাকিবার সনদ মিলিয়াছে—দিল্লীর দরবার হইতে।

পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। দিনেশবাবুর বাড়ি যা হইবে। দিনেশবাবু আমার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। তাঁ পুত্রবধূ এখানের মেয়ে-স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস। সেই সূত্রে এখানে বস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র জীবিত নাই। বিপ্লবী ছিল সে। যাবজ্জী কারাদণ্ড হইয়াছিল তাহার। কারাবাসেই মৃত্যু হইয়াছে। সে খবর দি বাবুকে দেওয়া হয় নাই। তিনি এখনও জানেন, পুত্র তাঁহার বাঁচিয়া আ একদিন বাড়ি ফিরিবে। নিদারুণ রোগের আক্রমণে চোখের দৃষ্টি হারাইয়া অনেকদিন, পুত্রবধূর বৈধব্য-দশা চোখে দেখিতে পান না। ভারত স্বাধী পাইয়াছে, এই খবরে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। কবে তাঁহার ছেলে ফিরিবে—এই আশায় দিন গনিতেছেন।

মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে গিয়া বসি। ছেলের গল্প ছাড়া আর কোন কথা বলেন না। মাতৃহীন শিশুকে মানুষ করিয়াছিলেন তিনি। ছেলেও তেমন ছেলে, যেমন বুদ্ধি, তেমনই গায়ে শক্তি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সকলের সেরা ফল করিত, গায়ের জোরে সব ছেলেদের মাথার উপরে থাকিত। বি. এ.-তে রেকর্ড মার্ক পাইয়াছিল অর্থনীতিতে। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, ছেলে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেয়। দিলে পাস করিতই সে। ছেলে রাজী হইল না। পূর্ববঙ্গের কোন এক বে-সরকারী কলেজে চাকুরি লইয়া চলিয়া গেল। সেইখানে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসিল। বৈপ্লবিক কর্মে যোগ দিল। চরিত্র ও কর্মশক্তি-মহিমায় দেখিতে দেখিতে দলের নেতা হইয়া উঠিল। নগেনবাবুর এক বন্ধু পুলিসে চাকরি করিতেন। তাঁহার কাছে খবর পাইয়া তিনি ছেলেকে নিজের গুরুতর অসুখের খবর দিয়া বাড়ি আনাইলেন। সুন্দরী শিক্ষিতা একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কলিকাতার এক কলেজে চাকরি যোগাড় করিয়া দিলেন। ছেলে কলিকাতায় বসিয়া বিপ্লবের কাজ চালাইতে লাগিল। পুলিসের তাহা অগোচর রহিল না। হঠাৎ একটা ব্যাপারে ধরা পড়িল সে। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল তাহার। নগেনবাবু এই আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। নিদারুণ রোগে পড়িলেন; চোখের দৃষ্টি গেল; চাকরি গেল। গ্রাসাচ্ছাদন চালাইবার জন্য তাঁহার পুত্রবধূ চাকরিতে নিতে বাধ্য হইলেন।

মাঝে মাঝে ছেলেকে চিঠি লেখেন তিনি। নিজে লিখিতে পারেন না; বধূকে দিয়া লেখান, কবে আসবি? চোখে দেখতে পাব না কোনদিন; করার তোকে ছুঁয়ে মরতে চাই, বাবা।

চিঠি জমা থাকে বউমার একটি বাক্সে। বাক্স ভর্তি হইয়া গেছে চিঠিতে। চিঠির জবাব আসে মাস খানেক পরে; জবাব লেখেন বউমা, পড়িয়া শুনান— তার দেরি নাই, বাবা। ভারতের বুকে জোঁকের মত ব'সে যারা রক্ত চুষে খেয়ে উঠেছে, খ'সে পড়বে তারা শীগগির। পরাধীনতার বেড়ি প'রে কারাবাসে ছিলাম, শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে মাথা উঁচু ক'রে বেরোব।

বাবার দুই চোখ হইতে জল পড়ে, বর্ষার অপরাহ্ণের মত আর্দ্র ম্লান হাসি হাসেন।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে এক ফালি রোয়াক। ভিতরে ঢুকিতেই

অপরিসর উঠান, সামনে বারান্দা। বারন্দায় একটি ডেক-চেয়ারে বসিয়া ছি দিনেশবাবু। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। জীর্ণশীর্ণ দেহ। রঙ ধবধবে ফর আবক্ষলম্বিত দাড়ি কাশফুলের মত সাদা। মাথায় এলোমেলো দুধের সাদা চুল। পরিধানে খদ্দরের খাটো ধুতি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। ডান হা কোলের উপরে ন্যস্ত। অনবরত কাঁপিতেছে হাতটি। বাম পাশে এ ছোট টেবিলের উপরে একটি আনকোরা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জা একটি খদ্দরের জাতীয়-পতাকা।

আমার পায়ের শব্দে সচকিত প্রশ্ন করিলেন, কে? আমি আগাইয়া গি কহিলাম, আমি। বৃদ্ধের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল; নিস্তেজ ক কহিলেন, ওঃ, তুমি! এস, ব'স। পাশে একটা টুলে বসিলাম। বৃদ্ধ কহিলে সকালের গাড়িতে এল না তা হ'লে। দুপুরে একটা গাড়ি আছে, ন সেটাতে তা হ'লে আসবে নিশ্চয়।

প্রশ্ন করিলাম, কে?

কেন? আমাদের শিবু। ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়। আজই আসবার দিন। স্বাধীনতার প্রথম দিন আজ। বাড়িতে বাড়িতে উৎস তারাও আজ নিজের নিজের বাড়িতে এসে উৎসব করবে। স্বরাজ-পতা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি আনিয়ে রেখেছি। সে এসে স্নান ক'রে শুদ্ধ-শান্ত হ খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বন্দে মাতরম্ গান গাইতে গাইতে পতাকা তুলবে তারই জন্যে তো অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি ভোরবেলা থেকে বন্দে মাতরম্ গান তার শুনেছ তো? সমস্ত প্রাণ দিয়ে গায়। শুনলে ম হয়, মা যেন মূর্তি ধ'রে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাও তখনক দিনে ভয়ে ভয়ে গাওয়া, পুলিস শুনতে পেলেই চোখ রাঙিয়ে তেড়ে মার আসত; আজ স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে মুক্তির হাওয়ায় বুক ভ'রে নিয়ে গাই মায়ের গান, প্রাণ ভ'রে শুনবে কতদিন শুনি নি!—বৃদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাই লাগিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, দুপুরের গাড়িতে আস নিশ্চয়ই, কি বল? বউমাকে রান্না করতে বলেছি। কি কি খেতে ভালবা সবই তো জানে। হ্যাঁ হে, রইমাছ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না? বড় প্রিয় ি তার। কহিলাম, শিবুদাদা ছাড়া পান নি সম্ভবত। দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি বিস্ফারি করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন; কেন? ছাড়া পাবে না কেন? সবাই পেয়েছে—

সব রাজবন্দী তো এখনও ছাড়া পান নি।

সে কি! দেশের মুক্তি হয়েছে, দেশের জন্যে যারা জীবন ক্ষয় করেছে, তাদের মুক্তি হয় নি?

হবে, পরে। জাতীয় সরকার কর্মভার হাতে নিয়ে সকলকে মুক্তি দেবেন।

সক্ষোভে কহিলেন, তবে এ উৎসবের অর্থ? এ যে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো! যারা মাতৃপূজার ঘট স্থাপন করলে, বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের বেদীকে অর্চনা করলে, জীবনের সব সুখ-সম্ভাবনাকে উৎসর্গ ক'রে দিলে মায়ের উদ্দেশে, তারা রইল অন্ধকার কারাবাসে বন্ধ হয়ে, আর বাইরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জাঁকজমক ক'রে মায়ের পুজো হতে লাগল।

কহিলাম, আমাদের নেতারা তাঁদের স্মরণ করেছেন বক্তৃতায়—

তীব্রকণ্ঠে দিনেশবাবু কহিলেন, তবে তো সব দুঃখ ঘুচে গেল আমাদের! যা ক'রে তাদের কথা স্মরণ করেছেন! এ দয়াটা নাই বা করতেন।—উত্তেজনায় মুখ লাল হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সামলাইয়া কহিলেন, পশ্চিম-বঙ্গের কথা জানি না, পূর্ববঙ্গে কত ঘরে কত বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, কত আশা নিয়ে পথের পানে তাকিয়ে ছিল আজ; কতদিন পরে তাদের ছেলে, ভাই, স্বামী বাড়ি ফিরবে; তারা আজ মুখ শুকনো ক'রে ঘরের কোণে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগল, উৎসবে যোগ দিলে না।

কহিলাম, পূর্ববঙ্গের কেউ তো যোগ দিলে না। তারা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে।

তাও তো বটে! স্বাধীনতা পেলাম আমরা, কিন্তু কি হবে এ স্বাধীনতা নিয়ে, যা সবাই মিলে ভোগ করতে পারলাম না, যা সবার মনে মুক্তির আনন্দ আনলে না?

চুপ করিয়া রহিলাম। দিনেশবাবু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা হ'লে আসবে না এখন? খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ও পতাকা বাম হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি আর হবে এসবে, রেখে দিকগে তুলে। পতাকা তুলতে হবে না আমাদের। গভীর হতাশার সহিত কহিলেন, হয়তো আসবেই না, দাঁড়বেই না হয়তো তাদের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে, প্রত্যাঘাত করে, তাদের শাসক মাত্রেই ভয় করে,—শাসক দেশীই হোক, আর বিদেশী হোক। শাসকই বদলেছে দেশের,

শাসন-পদ্ধতি তো বদলায় নি। যখন বদলাবে, তখন হয়তো মুক্তি পা তখন আমি থাকব না।

কহিলাম, তা কি হয়! ছেড়ে দেবে সবাইকে, আজ না হোক, দু পরে।

সোৎসাহে কহিলেন, দেওয়াই তো উচিত। সসম্মানে তাদের সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত। দেশের জন্যে যারা এত দুঃখ ভোগ ক জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করলে, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশের সরকা উচিত, সব কাজের আগে তাদের সব ক্ষয় সব ক্ষতি পূরণ করা; তা বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রতিভা, কর্মশক্তি, যা এত দিন বৃথা নষ্ট হ'ল, তাকে দেশ ও জা কল্যাণে নিয়োগ করা।

কহিলাম, সবই হবে।

সক্ষোভে কহিলেন, হবে তো, কবে? নিজের নিজের ব্যবস্থাই ক তোমাদের নেতারা। এদের কথা কারও মনে থাকবে ব'লে মনে হয় যারা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, সভা-সমিতি ক'রে তাদের শুকনো নিবেদন করা হবে, কিন্তু তাদের অসহায় বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা হবে কি? কিছু হবে না। তেলা মাথাতেই ে ঢালা হবে, যেমন বরাবর হয়েছে; রুখু মাথায় খড়ি উড়তে থাকবে চিরদিন।

চুপ করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, চে দেখতে পাই নে; নড়তে-চড়তে পারি নে; মরণের প্রতীক্ষা করছি প্রতি মুহূ তবু ভগবানের কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করছি, মরবার আগে যেন সে দি আসে; যেন দেখে যেতে পাই, সে সংসারী হয়েছে, সন্তানের পিতা হয়ে এ কি অসম্ভব প্রার্থনা? ভগবান পূর্ণ করবেন না কিছুতেই? আমার মর সঙ্গে সঙ্গে বংশের ধারা শেষ হয়ে যাবে, অভাগী মেয়েটা একেবারে অনাথা যাবে? ভেবে রাতে চোখ বুজতে পর্যন্ত সাহস হয় না আমার।

বউদিদি এক কাপ চা আনিলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। ছিপছি গঠন। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। পরিধানে শুভ্র বিধবার বেশ। মু গঠন সুন্দর। চোখ দুইটিতে ক্লান্ত বিষণ্ণতা। নাক ও চিবুকের গঠন দৃঢ়তার পরিচায়ক। মুখের ভাবে আজীবন কৃচ্ছ্রব্রতী তপস্বিনীর বৈরাগ্য। মাথায় অল্প অবগুণ্ঠন। শুভ্র সীমন্তরেখার দুই পাশের চুলে দুই-

ছি পাকা চুল রূপার তারের মত চিকমিক করিতেছে। কহিলেন, বাবা, পনি চা খাবেন?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, না মা, থাক্। আশা করেছিলাম, এখনই আসবে, সঙ্গে ব'সে খাব। এল না; আসবেও না। আমার নাম করিয়া কহিলেন, ছে, ছাড়া পায় নি ওরা। ধুতি পাঞ্জাবি পতাকা রেখে দাওগে তুলে। জ স্বাধীনতা-দিবস নয় আমাদের। ও যেদিন বাড়ি আসবে, সেই দিন কেই আমাদের স্বাধীন জীবন শুরু হবে, সেই দিনই উৎসব হবে আমাদের।

কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম। দরজার কাছে বউদিদি দাঁড়াইয়া লেন; জলভরা মেঘের মত থমথমে মুখ। আমাকে দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে হলেন, ঠাকুরপো, আর কতদিন ওকে ভুলিয়ে রাখব? আর তো রছি না।—বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িতেই দেখিলাম, আনন্দ-প্রবাহ আগের মতই হয়া চলিয়াছে। মনে হইল, যেন একটি হিম-শীতল অন্ধকার গুহা হইতে হির হইয়া সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে, আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশের মধ্যে সিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরে এত আলো, এত উল্লাস, এত উদ্দীপনা—ইহার টি কণাও সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আজিকার দিনেও সেই হাবাগীরা দুর্ভাগ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে সরিয়া রহিল। কেহ হাদের ডাকিয়া বাহিরে আনিল না। শুধু এই শহরেই নয়, সারা বাংলা শে, সারা ভারতে, এমনই কত শত নর-নারী আজিকার আনন্দ উৎসবে গ দিল না; তাহাদের কথা দেশের জনসাধারণের বা তাহাদের নেতৃবৃন্দের হারও মনে পড়িল না।

সামনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছি আর একজন এমনই গুহাচারিণীর বাদ লইবার জন্ত। আমার এক বন্ধুর বোন বীণা। বন্ধু বড়লোকের ছেলে, জে বড় ব্যবসায়ী। শহরে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাবা বাঁচিয়া নাই, সে-ই এখন ড়ির কর্তা। বীণা তাহার ছোট বোন। বীণার স্বামীও ব্যবসা করিত; লিকাতায় ফার্নিচারের দোকান ছিল। বাড়ি ও দোকান দুইই ছিল পার্ক স্ট্রীটে। র্তেজাল মুসলমান-পল্লী। বাড়িটি ছিল দোতলা। নীচের তলায় দোকান, পর-তলায় বীণারা বাস করিত—বীণা, বীণার স্বামী আর বীণার মেয়ে।

একটি মাত্র মেয়ে বীণার, আর সন্তান হয় নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনরো এই পল্লীতে অনেকদিন বাস করিতেছিল, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ছি কলিকাতায় হাঙ্গামা শুরু হইবার পরও প্রতিবেশীরা বরাবর তাহাদের সা দিয়াছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তের দল যখন আক্রমণ করিল, প্রতিবেশীরা সাহায্য ক দূরে থাক্, অনেকে আক্রমণকারীদের দলে যোগ দিল। দোকান লুঠ হই বীণার স্বামী দোকানেই খুন হইল। দুর্বৃত্তের দল দোতলায় উঠিয়া বীণা সর্বস্ব লুঠ করিল, বীণার পনরো বছরের মেয়েকে তাহার বুক হইতে ছিনা লইয়া গেল; বীণাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় ফে চলিয়া গেল। স্বামী-সন্তানহীনা বীণা জনৈক সহৃদয় প্রতিবেশীর সাহা এখানে চলিয়া আসিল। তারপর হইতে সে তাহার দাদার বাড়িতেই ক করিতেছে।

বীণাকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়াছি। হাসি গানে গল্পে, আনন্দে, প্রা প্রাচুর্যে উৎসের মত উচ্ছ্বাসময়ী। বিবাহের আমিই ঘটকালি করিয়াছিলা বরের নাম করিয়া ঠাট্টা করিলে কৃত্রিম রাগে মুখ লাল করিত, কথা বন্ধ করি আবার যাচিয়া কথা বলিত। বিবাহের পরে তাহার কলিকাতার বাস গিয়াছি। তখন সে স্বামীর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী। কলস্বনা স্রোতস্বি তখন বৃহৎ নদীর মত বিপুল বিস্তারে ও গাম্ভীর্যে গৌরবময়ী। কত আপ্যায় কত সেবা, কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা! মেয়েটিও তেমনই, দেখিতে যেমন সুং তেমনই মিষ্ট স্বভাব। নিজের মামার মত শ্রদ্ধা করিত আমাকে। বীণ সাজানো সুখের সংসার একদিনে ছারখার হইয়া গেল, রাজরাণী পথের ভিখা হইল।

বীণার কাছে মাঝে মাঝে যাই। মস্ত বড় বাড়ির একান্তে একটি ছো ঘরে থাকে সে। সারাদিন চুপচাপ বসিয়া থাকে। এখন আর কাঁদে না অশ্রুপাথার মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। যাই, কাছে বসি। একই কথা, কোথা কেমন করিয়া আছে মেয়ে। শুষ্ক শীর্ণ কণ্ঠে কহে, মরতে পারছি না শুধু তার জন্যে। যদি জানতে পারি, সে ম'রে গেছে, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

আজ স্বাধীনতা-দিবস। বন্ধু আমার কংগ্রেস-পন্থী। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাড়িতে উৎসব চলিয়াছে নিশ্চয়। সকলের মুখে হাসি, মনে আনন্দ। আত্মীয়

নদের আনন্দময় সংস্রব হইতে দূরে নিজের অন্ধকার ঘরটিতে একলা বসিয়া
রপাশে শোকের হোমানল জ্বালিয়া দুশ্চর তপস্যাব্রতী সন্ন্যাসিনীর মত বীণা
ল তিলে নিজেকে দগ্ধ করিতেছে। কেহ তাহার কাছে যাইতেছে না,
ছ তাহার শোকের কালিমা আজিকার নির্মল আনন্দটিকে মলিন করিয়া
ল।

বীণাদের বাড়িতে গেলাম। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। বাড়ির মাথায়
াণ সাইজের রেশমী স্বরাজ-পতাকা উড়িতেছে। বাড়ির সামনে বাগানে
টি ছেলেমেয়েরা ভাল ভাল পোশাক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সারা
ড়িটাতে একটি আনন্দময় চাঞ্চল্য। বাড়িতে ঢুকিতেই বন্ধুর মায়ের সহিত
খা হইল। সস্নেহ-আপ্যায়ন করিলেন, কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার অন্যান্য
য়েরা আসিল, সকলের মুখে চোখে হাসি ঝলমল করিতেছে। উৎসবের ঢেউ
গিয়াছে সকলের মনে। রান্নাঘর হইতে রান্নার সুগন্ধ নাকে আসিতেছে।
ং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে নিশ্চয়। মা কহিলেন, অমর বলছিল
মার কথা। যেতে পারলে না। ভারি ব্যস্ত তো আজ ওরা। এসেছ,
লই করেছ। একেবারে নাওয়া-খাওয়া সেরে যাবে। মেয়েরা আবদারের
র মাকে সমর্থন করিল। হাঁ বা না—কিছুই না বলিয়া প্রশ্ন করিলাম, বীণা
থায়? মায়ের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। কহিলেন, আছে ওর ঘরে।
থেকে তো বেরোয় না; দিনরাত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আর ভাবে। কি
করব ওকে নিয়ে? যাবে নাকি ওর কাছে? যাও, পার তো বুঝিও।
জকের দিনটাতেও যদি একবার বাইরে এসে সকলের সঙ্গে বসে, দাঁড়ায়!
সি ফুর্তি ওর ফুরিয়ে গেছে জানি, তবু অদৃষ্টকে তো মেনে নিতে হবে।
গেও কত মেয়ের স্বামী সন্তান একসঙ্গে ম'রে যায়। তা সামলেও তো
রা বাঁচে, সাধারণ মানুষের মত খায়-দায়, গল্প করে, ও যে কিছুতেই পারছে
তা! সকলের মুখের দিকে তাকিয়েও তো ওর সামলানো উচিত।

মায়ের কথায় বিরক্তির রেশ। শোককে আমরা বেশি দিন সহ্য করিতে
রি না। নিরবচ্ছিন্ন শোক সুমধুর সুর-সঙ্গতির মধ্যে বেয়াড়া বেসুরের
ও মনের গায়ে কাঁটা ফুটাইতে থাকে। পারিপার্শ্বিক প্রশান্তিকে ঘুলাইয়া
ল। মন বিরক্ত হয়, বিরূপ হয়।

একতলার এক প্রান্তে একটা ঘরে থাকে বীণা। বীণার ছোট বোন

আমাকে বীণার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিলাম অন্ধকার ঘর। এক পাশে মেঝের উপর বীণা বসিয়া আছে। ডাকিলাম বীণা! মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল কিছুক্ষণ, যে মন ওর অন্য ব্যাপৃত ছিল, তাহাকে যেন বহু চেষ্টায় দৃষ্টির সঙ্গে যোগ করিল, তারপর উদাস কণ্ঠে কহিল, দাদা! আসুন —বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বসুন।

এক পাশে একটা মাদুর পাতা ছিল। এক দিকে বীণার স্বল্প শয্যা গুটানো মাদুরে বসিয়া কহিলাম, তুমি ব'স। বীণা নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এক বৎসরের মধ্যে বীণা কত বদলাইয়াছে! শীর্ণ মলিন দেহ, পারিপাট্যহীন অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ। মাথার চুলগুলা এলোমেলো, রুক্ষ। চোখ দুইটি কোটরে ঢুকিয়াছে, চোখের কোলে কালি। মুখে নৈরাশ্যময় সুগভীর ঔদাস্য শোক যেন মূর্তিমতী হইয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে। এই দিগন্তগ্রাসী গাঢ় শোকান্ধকারে সান্ত্বনার ক্ষীণ দীপ জ্বালিয়া কি হইবে? চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল, খুকীকে আর পাওয়া যাবে না! আমার চোখের সামনে তিনি গেছেন। তাঁকেও আর পাওয়া যাবে না জেনেও মনকে বোঝাতে পারি। ভোলবার চেষ্টা করতে পারি; হয়তো ভুলতেও পারি একদিন। মেয়েটাকে যে কিছুতেই ভুলতে পারি না দাদা! কিছুতে ভুলতে পারি না, ফুলের মত মেয়ে আমার হিংস্র জানোয়ারদের হাতে গিয়ে পড়েছে। দিনরাত কত অত্যাচার, কত যন্ত্রণা সহ্য করছে! আমি মা হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে কি ক'রে বেঁচে থাকি? সবাই বলে ভুলে যা, মনে কর্ মা'রে গেছে ব'লে। তা কি সম্ভব? যদি সত্যি মা'রে গেছে খবর পাই, তা হ'লেও নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তাও তো পাচ্ছি না। চুপ করিয়া রহিলাম। বীণা বলিতে লাগিল, তোমাদের স্বাধীনতা এসেছে দেশের রাজশক্তি তোমাদের নেতাদের হাতে এসেছে; তোমাদের নেতারা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছেন; যারা পশুর দলকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করেছে, তারাও নাকি রাতারাতি সাধুপুরুষ হয়ে উঠে অহিংস-মন্ত্র জপ করতে শুরু করেছে; তোমাদের নেতারা তাদের সব দোষ ক্ষমা ক'রে কোল দিয়েছেন; তাদের সঙ্গে মিলে ভাঙা-চোরা তালি দিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে হতভাগিনীরা পশুদের গহ্বরের

য় প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের কথা তো কেউ ঘুণাক্ষরে বলছেন —কি তোমাদের নেতারা, কি দেশের আর কেউ! একবার মুসলমানদের ছেন না, তাদের ফিরিয়ে দাও! তাদের ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের সঙ্গে ক্রতা আমাদের হবে না।

কহিলাম, নেতারা তো অন্যায় করেন নি বীণা। দেশে তো শান্তি স্থাপন রতে হবে। না হ'লে স্বাধীনতা পাওয়া তো কোন দিন সার্থক হবে না। বীণা ীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কে বলছে দাদা, শান্তি চাই না? কে বলছে, তোমাদের াধীনতা ব্যর্থ হোক? তবু, সেই সব হতভাগিনীদের ফিরিয়ে আনতে হবে না? ামার মত যারা স্বামী-সন্তান—সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের কের আগুন এমনই জলতে থাকবে?

কহিলাম, রথ যখন চলে, তার চাকার তলায় পথের ধূলো গুঁড়ো হবেই। লোকে বাঁচিয়ে চলা তো সারথির চলে না, বীণা। আমাদের জাতীয় জীবনের থ চলেছে স্বাধীনতার পথে, দেশের মানুষকে অনেক রকমের অনেক কষ্ট হ্য করতে হবে। সব দেশেই হয়েছে। এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে হবে যে, ামাদের বুকের উপর দিয়েই চ'লে গিয়ে রথ স্বাধীনতায় পৌঁছেছে।

পথের ধূলোর তাতে সান্ত্বনা কোথায় দাদা? স্বাধীনতায় পৌঁছে কে আর থের কথা ভাবে, বল? পথের ধূলোর কথা ছেড়ে দাও।—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া াকিয়া বীণা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আজ সারা দেশে কত আনন্দ! াড়িতে বাড়িতে উৎসব। আমাকে তো ছোটবেলা থেকে জানেন। াধীনতার স্বপ্নও দেখতাম একদিন; ছেলেদের মত কষ্ট সহ্য করবার সুযোগ াচ্ছি না ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। আজ স্বাধীনতা পাওয়ার দিনে সকলের ঙ্গে উৎসবে যোগ দিতে পারছি না, সবাই বিরক্ত হচ্ছে।—এ কি সাধ ক'রে? ারছি না কিছুতে যোগ দিতে। এগুতে গেলেই মনে হচ্ছে, সারা দেশের লাক তাদের কথা ভুলেছে ব'লে আমরাও তাদের ভুলব? যে আনন্দের ন্যায় তাদের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে নিয়ে যাচ্ছে, আমরাও কি ক'রে তাতে াঁতার দিই? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ যেখানে তারা আছে, সেখানেও সবাই হয়তো আনন্দে মেতে উঠেছে। কালীপুজোর রাত্রে বলির পশুদের মত উন্মত্ত জনতা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তারা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে। বলির পশুরাও ওদের চেয়ে ভাল। তাদের মৃত্যু আসবে এক মুহূর্তে। আর

ওদের মৃত্যু চলবে দিনের পর দিন, তিল তিল ক'রে। এই দীর্ঘায়িত মৃত্যু মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কথা আজ আনন্দের দিনে একটি বারও কি কেউ ভাবছে, দাদ বড় বড় আদর্শের, বড় বড় ভাবের, বড় বড় কথার দেওয়াল গেঁথে তাে কান্নার শব্দকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তোমাদের নেতারা। কিন্তু বাবা ভাই-বোনদের কাছ থেকে তা কি আড়াল ক'রে রাখা যায়? সে কা যে তাদের প্রাণের মধ্যে এসে তীরের মত বিঁধছে সারাক্ষণ।

বাড়ি ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। একটা চিঠি আসিয়া দেখিলাম। বন্ধুর চিঠি। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে বাড়ি। ডাক্তারি প করিয়া আজ বিশ বৎসর ধরিয়া গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। মুসলমানপ্রধ গ্রাম। চারিপাশের গ্রামগুলিতেও মুসলমানরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বন্ধু বাবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তেজারতি কারবার ছিল তাঁর। বন্ধু ডাক্তার হিসাবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন গত বৎসর নোয়াখালীতে মুসলমানরা যখন হিন্দুমেধ যজ্ঞ শুরু করিয়াছি ঐ গ্রামের মুসলমানরাও—নোয়াখালীর মত অতটা ফালাও করিয়া না হউক-ছোটখাটো রকমের শুরু করে। ফলে, গ্রামের কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার হৃত সর্বস্ব হইয়া পথের ভিখারী হয়, কয়েকটি হিন্দু রমণী তাহাদের স্বামী-পুত্রে চক্ষের সামনে ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিতা হয়, এবং সেই হতভাগিনীদের চক্ষে সামনে তাহাদের স্বামী-পুত্রেরা নৃশংসভাবে নিহত হয়। সেই সময়ে মুসলমানদে দলপতির দয়ায় বন্ধু নিষ্কৃতি লাভ করে। এখন বিরোধের অগ্নিশিখা নিবিয়া বটে, আগুন নিবে নাই, আপাত-নিবৃত্তির ভস্মাচ্ছাদনের তলে তেমন গনগন করিতেছে। ফলে যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহা আর ফিরিতে সাহস করে নাই। যাহারা কোনমতে গ্রামে টিকিয়া ছি অবিরত অপমান অবিচার ও অত্যাচারের অঙ্কুশাঘাতে তাহাদের জীব অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অতি দীর্ঘ চিঠি। নানা নির্যাতন-কাহিনীতে ভরা। প্রতিদিনের জীব যাত্রা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বহু পুরুষের পিতৃভূমি শত্রুভূমিতে পরিণত যাহারা একদা আপন ছিল, তাহারা পর হইতেও পর। শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ সহানুভূতির সুদৃঢ় বন্ধন ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পুরুষ

য়েদের অবস্থা যুদ্ধে বন্দী ও বন্দিনীর চেয়েও শোচনীয়। মাথা উঁচু করিয়া
হজ মানুষের মত চলা-ফিরা করিবার উপায় নাই। পদে পদে লাঞ্ছনা ও
পমান। সামাজিক জীবনের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত তাহারা।
রীত্বের চরম লাঞ্ছনার সম্ভাবনা সর্বদাই শাণিত খড়্গের মত উদ্যত হইয়া আছে
য়েদের চক্ষের সম্মুখে। নিজেদের পুরুষদের উপর নির্ভরতা হারাইয়াছে
য়েরা। এক দিকে মৃত্যুর অতলস্পর্শ গহ্বর, আর এক দিকে জীবনব্যাপী
ন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড; মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা নিদারুণ ভয়ে পলে পলে মৃত্যু-
ন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হিন্দু গ্রামবাসীরা, যাহাদের সামর্থ্য আছে, ভিটে-
াটির মায়া কাটাইয়া পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যাহাদের
ামর্থ্য নাই, মুখ বুজিয়া সমস্ত অপমান সহ্য করিতেছে। মুসলমানরা মাঠের
ান কাটিয়া লইয়া যাইতেছে, গোয়ালের গরু খুলিয়া লইয়া যাইতেছে, ঘরের
য়োজনীয় দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে, এমন কি কন্যা-বধূদের বাড়ি
ইতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নিষ্ফল ক্রোধে, নিরুপায় ক্ষোভে চাহিয়া
খিতেছে তাহারা। মনে সাহস নাই, দেহে শক্তি নাই, হাতে হাতিয়ার নাই,
নিজেদের মধ্যে একতা নাই, সর্বোপরি আত্মসম্মান ও আত্মীয়াদের সম্ভ্রমরক্ষার
ন্য প্রাণ দিবার মত নির্বিচার নির্ভয়তা নাই। কোনমতে টিকিয়া থাকা,
াঁচিয়া থাকাই ইহাদের উদ্দেশ্য। যদি ধর্ম পরিবর্তন করিলে নিরুপদ্রবে বাস
করিতে পারা যায়, ইহারা হয়তো একদিন তাহাই করিতে দ্বিধা করিবে না।
ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু বলিয়া আর কেহ থাকিবে না।

শেষে লিখিয়াছে, ভাই, তোমাদের বড় আনন্দের দিন। তোমাদের দিগন্তে
াধীনতার স্বর্ণাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা কি পাইলাম? স্বাধীনতার
ংগ্রামে আমরা কি কোনদিন কাহারও পশ্চাতে ছিলাম? কাহারও চেয়ে
কম দুঃখ, কম ক্লেশ ভোগ করিয়াছি আমরা? দেশ-মাতৃকার মুক্তিকল্পে
আমাদের ছেলে-মেয়েরা দুঃসাহসিক কর্ম-প্রচেষ্টায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে,
নির্বিচার জীবনদানে, কোনদিন কি দ্বিধা করিয়াছে? দেশের মুক্তি-যজ্ঞে
স্বামী-পুত্র-কন্যাকে বলি দিয়া যে মেয়েরা মর্মান্তিক বেদনাকে আজীবন নিঃশব্দে
সহ্য করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কি পূর্ববঙ্গে কম? বঙ্গ-ভঙ্গ-বিপ্লব, অসহযোগ-
আন্দোলন, লবণ-সত্যাগ্রহ, আগস্ট-বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন বিক্ষোভ ও
আন্দোলনের মধ্যে দুলিতে দুলিতে আমরাও তোমাদের মতই আসমুদ্র-

হিমাচল সমগ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। বিদেশী শাসকের আমাদের মুক্তি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার জন্য বিরোধ ও বিদ্বেষের বিষ আমাদের দেশবাসীর এক বিরাট অংশের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলে আমরাও আশা করিয়াছিলাম, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি দেশপূজ্য নেতাদের চরিত্র, আচরণ, স্বার্থত্যাগ, আত্মবলি, ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর প্রতি প্রেম, বিষন্ন ওষধির মত বিষ-ক্রিয়া নিঃশেষে নাশ করিবে; চল্লিশ কোটি ভারতবাসী একজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, এক প্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, একযোগে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিবে ভারতকে আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের নেতৃবৃন্দের অশেষ চেষ্টা, ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তবু তোমাদের সৌভাগ্য যে, তোমরা ভারতের মূল দেহে আশ্রয় পাইলে; আমরা বিচ্ছিন্ন অংশে বিরোধীদের মধ্যে পড়িয়া রহিলাম। যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে প্রাণপণে বাধা দিয়া আসিয়াছি এতদিন, সেই বিচ্ছেদকে স্বীকার করিতে হইবে আমাদের না স্বীকার করিলে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও লাঞ্ছনার সম্ভাবনা উদ্যত হইয়া থাকিবে। কাজেই স্বাধীনতা-দিবসে তোমরা যখন স্বাধীন ভারতের পতাকাকে অভিবাদন করিবে, সেই সময়ে আমরা ইহাদের কড়া পাহারায় পাকিস্তানের পতাকাকে অভিবাদন করিব।

তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইব বলিয়া মনে হয় না। এ দেশে যদি ধন প্রাণ ও মান বজায় রাখিয়া বাস করিতে হয়, তো নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি হয়তো ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইবে।

ভাই, তোমাদের আনন্দের দিনে আমাদের কথা ভুলিয়া থাকিও না। মনে রাখিও, প্রায় দুই কোটি হিন্দু মর্ম-যাতনায় আর্তনাদ করিতেছে। তোমাদের দিগন্তব্যাপী আনন্দধ্বনির মধ্যে একবার কান পাতিয়া তাহাদের আর্তনাদ শুনিবার চেষ্টা করিও।

সর্বশেষে লিখিয়াছে—ভাই, এমন করিয়া এখানে বাস করা সম্ভব হইবে না। গ্রাম ছাড়িতেই হইবে। পূর্বপুরুষের ভিটা জন্মের মত ছাড়িয়া যাওয়ার কষ্ট ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না। পূর্বপুরুষদের ধর্ম কর্ম, সামাজিক শুভ অনুষ্ঠান, জন্ম ও মৃত্যুর স্মৃতি ইহার প্রত্যেকটি ইট কাঠ মৃত্তিকাকণার সহিত

দাঁড়াইয়া আছে। বাসগৃহের পাশেই দেবমন্দিরে বাস্তুদেবতা কত পুরুষ ধরিয়া পূজা পাইতেছেন। বাগানের এক প্রান্তে সারি সারি পিতা-পিতামহের স্মৃতি-মন্দিরে কতদিন ধরিয়া সংসারের সকলে মিলিয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া আসিয়াছি। এখান হইতে চলিয়া গেলে দেবতার পূজা বন্ধ হইবে, স্মৃতি-মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিবে না। বিধর্মীরা দেবতাকে কলুষিত করিবে, মন্দির ও মঠ ভাঙিয়া মাঠ করিয়া দিবে। মা এখন হইতে হায়াকাটি শুরু করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এখন তোমাকে অনুরোধ, তোমাদের ওখানে যেমন করিয়া হোক আমাদের জন্য একটু মাথা গুঁজিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। বহুদিনের বন্ধুত্বের দাবিতে এই অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, নিরাশ করিবে না।

দুপুরে হরিসাধনবাবুর ছেলে-মেয়ে দুইটি খাইতে আসিয়াছিল। মেয়েটি কহিল, কাকাবাবু, মা জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? কহিলাম, দেখা হয়েছে; একটা ডাকে বেরিয়ে গেলেন; সন্ধ্যের সময়ে ফিরবেন। আমি খ'রে নিয়ে আসব এখন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা এখন আছেন কেমন? মেয়েটি মুখ চুন করিয়া কহিল, তেমনই। খাবার সময়ে বড় ছেলেকে দেখিলাম না। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিলেন, পাড়ার ছেলেদের ফিষ্টি হচ্ছে; নেমন্তন্ন করেছে ওকে। কহিলাম, সে আবার কি? বাড়িতে এত খাবার আয়োজন করেছ; বাড়িতে না খেয়ে সেখানে গেল কেন? দলে প'ড়ে যা-তা খেয়ে অসুখ ধরিয়ে বসবে। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, বললাম তো তাই। শুনলে কই! বললাম এত ক'রে, কত বেলা হবে, দু মুঠো খেয়ে পিত্তি রক্ষা ক'রে যা; তা কে কার কথা শোনে! মুচকি হাসিয়া কহিলেন, কেমন লোকের ছেলে! গম্ভীর মুখে কহিলাম, লোকটার আবার কি দোষ হ'ল?

না দোষ আর কি! কোথাও নেমন্তন্নর কথা শুনলে বেসামাল হয়ে ছুটতে থাকে এই যা। কথাটা চাপা দিয়া কহিলাম, এর জন্যে আবার চাঁদা লাগবে তো?

তার কথা তো কিছু বলে নি। তা ছাড়া চাঁদা তো আদায় করেছে; আবার কিসের?

আহারের পরে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গৃহিণীর ডাকে ঘুম ভাঙিল। চোখ মেলিতেই গৃহিণী কহিলেন, একবার ওঠ দেখি। মুচী-বউ কি বলছে।

কে মুচী-বউ?

গৃহিণী ধমকের সুরে কহিলেন, জান না নাকি? আমাদের ঘুঁটে দেয়। ঐ যে খোঁড়া মুচীর বউ।

মনে মনে বিরক্ত হইলাম। কে কোথাকার মুচীর বউয়ের জন্য কাঁ ঘুমটা ভাঙিয়া দিল। বিরক্তি চাপিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলাম, কি ব্যাপার?

গৃহিণী ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, জানি নে কি ব্যাপার। জিজ্ঞেস করগে ওকে। বিরক্তির সহিত কহিলাম, বারণ করলাম বার বার, যাস নে মিথ্যে যত ছোট ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া—

চোখের ঘুম ছাড়িয়া গেল। বাহিরে আসিলাম। মুচী-বউ উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল।

আমার বাড়ির পিছনে, কতকটা গেলেই ধানের ক্ষেত—রেল-লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই একাংশে কতকটা উঁচু জমির উপর কয়েক ঘর মুচী বাস করে। সকলেই জাত-ব্যবসা করে; আজকালকার দিনে রোজগার কম মন্দ নয়। শুধু মহেন্দ্র মুচীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। লোকটা বেতো রোগী বৎসরে ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকে। বাকি ছয় মাস উঠিয়া দাঁড়ায়; লাঠি উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। কাজকর্ম কিছুই করিতে পারে না। সংসার চালায় মুচীর বউ। বেঁটে কাহিল মেয়েটি। অত্যন্ত পরিশ্রমী। সারাদিন রাস্তায় মাঠে গোবর কুড়াইয়া আনে; ঘুঁটে তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। আজকাল বিড়ি বাঁধিতে শিখিয়াছে। তাহাতেও কিছু রোজগার হয়। তাহা ছাড়া চামড়া কষ করার কাজ জানে। তাহা করিয়াও কিছু আয় হয়। কয়েকটি পাঁঠা-পাঁঠী আছে। পাঁঠাগুলি বড় করিয়া বিক্রয় করে; পাঁঠীর দুধ বিক্রয় করে। মোট কথা, পাঁচ রকম করিয়া কোন মতে নিজের ও স্বামীর গ্রাসাচ্ছাদন চালায়।

কহিলাম, কি হয়েছে তোমার? মুচী-বউ ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, পাড়ার বাবু-ছেলেরা আমার একটি কচি পাঁঠা খেয়ে দিয়েছেন এজ্ঞে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি! দাম দেয় নি তোমাকে?

ঘাড় নাড়িয়া মুচী-বউ 'না' জানাইল। কহিলাম, তোমাকে বলে নি?

মুচী-বউ কহিল, বললে দিতাম নাই, এজ্ঞে। কচি পাঁঠা আবার কেউ দয়!

কহিলাম, ছেলেদের কাছে গিয়েছিলে?

উয়াকে পাঠিয়েছিলাম। গেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনেক কষ্টে। তো বাবু-ছেলেরা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন করিলাম, ওরা যে খেয়েছে তার প্রমাণ কি?

আর কে খাবেক এজ্ঞে? ওনাদেরই আজ ভোজ হইছে—

তোমরা পাঁঠার খোঁজ করেছ? কারও মাঠে হয়তো পড়েছে, খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে।

বাবুদের ঘর গেছলম। ওনাদেরই জমি সব। ওনারা বললেক, পাঁঠা-টাঠা ছাড়ে দেয় নাই ওনারা।

বাবু, অর্থাৎ অভয়বাবু। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এ পাড়ার প্রাচীন বাসিন্দা। শহরের এই অংশটা যখন শহরের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই, তখন এদিকটার জমিদার ছিলেন ওঁরা। এ পাড়ার অধিকাংশ বাড়ি ওঁদের জমিতেই নির্মিত।

তলাস করেছি এজ্ঞে, সারা পাড়ায়, উদিকে লাইন তক। কোথাও পাই নাই। ওনারাই কেটে খেয়েছেন, বাবু। এর একটা বিহিত করেন আপুনি।

কহিলাম, আমি কি করব? তোমাদের বাবুর কাছে যাও।

ওনার কাছে যেয়ে কি হবেক, বাবু, ওনার ছোট খোঁকাই তো পাওা। আপুনি একবার ডেকে ব'লে স্থান। আমার অনেক ক্ষেতি হইছে। বড় হ'লে অনেক টাকা দাম হ'ত। তা বাবু-ছেলেরা যখন খেয়েইছেন তো কি বলব। আমার ন্যায্যি দাম দিয়ে স্থান ওনারা।

ছেলেদের কাছে গিয়ে বল না বুঝিয়ে।

আমার কথা কি কানে লিবেন ওনারা? উয়াকেই তো হাঁকিয়ে দিয়েছে। আবার গেলে হয়তো মারধোর করবেক। যা খোকাবাবুর মেজাজ!

আমার কথাই কি তোমাদের খোকাবাবু শুনবে? তার চেয়ে তুমি অভয়বাবুর কাছে যাও। উনিই ব্যবস্থা করবেন। মুচী-বউ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উনি কিছুই করবেক নাই, বাবু। উল্টে গাল-মন্দ করবেক। এমনই তো ক বছর খাজনা বাকি আছে ব'লে কেবলই শাসাচ্ছে, উঠিয়ে দিব। খোকাবাবু

পাঁঠা কেটে খেয়েছেন শুনলে বলবেক—বেশ করেছে খেয়েছে; টাকার উসুল হয়ে গেল। মিনতি করিয়া কহিল, আপুনিই একবার ওনাদের কাউ ডাকিয়ে ব'লে ছান। খোকাবাবুকে নাই বা হ'ল, আর কাউকে। কহিলা আচ্ছা যাও, আমি ডাকাচ্ছি এখনই। মুচী-বউ চলিয়া গেল।

বড় ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোদের আজ কি কি খাওয়া হ'ল রে?

সে কহিল, লুচি, পাঁঠার মাংস, আলুর দম—

মাংস পাওয়া গেল কোথায়? আজ তো বাজারে মাংসের দোকান বন্ধ।

তা তো জানি নে। খেলাম তো মাংস।

প্রশ্ন করিলাম, তোদের পাণ্ডা কে? ঘনশ্যাম।

সে ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইল।

ঘনশ্যাম অভয়বাবুর ছোট ছেলে। লম্বা, চওড়া, বলিষ্ঠ চেহারা। উগ্র প্রকৃতি। লেখাপড়া বিশেষ করে নাই। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়া-আসা করিয়াছিল কিছুদিন। যে কয়েকদিন স্কুলে ছিল, স্কুলের মাস্টাররা তাহার উপদ্রবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে পাড়ায় রেশনের দোকান চালায়। পাড়ার কাহাকেও বিশেষ খাতির করে বলিয়া মনে হয় না। গত বৎসর কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখাইয়া রীতিমত কংগ্রেসী হইয়া উঠিয়াছে।

খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অপরেশও তো তোদের দলের একজন কেউ নয়? তাকেই একবার ডেকে নিয়ে আয়।

অপরেশ আসিয়া হাজির হইল। কলেজের ছাত্র। পরনে পাৎলুন হাফহাতা শার্ট। ব্যাপারটা শুনিতেই যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহি আমরা তো এসব ব্যাপার কিছু জানি নে, সার্। ঘনশ্যামের হাতেই টাকা, ওই সব ব্যবস্থা করছে। কেথেকে পাঁঠা নিয়ে এল ওবেলা। জিজ্ঞাসা করতে বললে, ওদের নিজেদের পাঁঠা। কহিলাম, তা তো নয়। নেহাৎ গরিব লোকের জিনিস। ওদের দাম দিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

অপরেশ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ঘনশ্যাম কি মিথ্যে কথা বলেছে?

সত্যি-মিথ্যে তো আমিও জানি না। তবে মেয়েটি আমার কাছে এসে ব'লে গেল ঐ কথা। সে-ও তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে বলতে সাহস করবে ব'লে মনে হয় না।

অপরেশ কহিল, ঘনশ্যামও ওরকম ছেলে নয়, সার্। ওকে তো অনেক
ন থেকে জানি। অত্যন্ত চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,
মি যাচ্ছি এখনই; ঘনশ্যামের কাছে সব জেনে আপনাকে খবর দেব।

অপরেশ আর আসিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মুচী-বউ আসিল। চোখে
খ কান্নার চিহ্ন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপুনি কি খোকাবাবুকে ডাকিয়ে-
লেন?

কহিলাম, তোমাদের খোকাবাবুকে তো নয়, আর একটি ছেলেকে।

মুচী-বউ কহিল, খোকাবাবু এসে লাফাতে লাগল। উয়াকে মারলেক।
মাকে গালাগালি করলেক। আকালের বছর পাঁচটি টাকা দিয়েছিলেন।
তে লেরেছি। বললেক, টাকা না দিলে পাঁঠাগুলোকে সব কেড়ে নিয়ে যাব,
ল কেটে বাস তুলে দিব। হাতে পায়ে ধ'রে ওনাকে ঠাণ্ডা করতে হ'ল।
াকে আর কিছু বলবেন নাই দয়া ক'রে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, তুমি বলেছিলে ব'লেই তো বলতে গেলাম, না হ'লে
মার কি?

এজ্ঞে তা তো বটেই। তবে জমিদারের ছেলে তো। কচি একটা
ঠা খেয়েছেন তো কি করা যাবেক বলুন? ওনাদের খেয়েই তো বেঁচে আছি
মরা।

বেশ, আমি আর কিছু বলব না।

আপনাকে কষ্ট দিলম মিছামিছি। ক্ষেতি আমার হইছে বইকি; কি
রব বলুন; চুপ ক'রে সওয়া ছাড়া গতি কি আমাদের?

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কহিলেন, ক্ষতি কি ক'রে হ'ল? পাঁচটি
কা তো নিয়েছিলে; তা শোধ দিতে হবে তো?

তা নিয়েছিলম বইকি, গিন্নীমা। মিছে কথা বলব কেনে? তবে উ ভাল
কলে ওনাদের বাড়ির সব্বাইকার পুরোনো জুতো সেরে-সুরে দেয়। একটি
য়সাও কখনও দেয় না ওনারা। ওনাদের বাড়িয় কামিন না থাকলে কামিনের
াজও ক'রে দিয়েছি কতবার। একটা কড়িও কখনও নিই নাই। একটু
মিয়া কহিল, কি করব গিন্নীমা; একলা মেয়েমানুষ, কি ক'রে যে পেট চালাই
। ভগবান জানেন। উ যদি ভাল থাকত, তা হ'লে কি আর ভাবতাম মা?

মুচী-বউ চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গৃহিণী কহিলেন, স্বাধীনতা-দিবসের ছুটিটা ভালই হ'ল ছেলেদের। গরিবে সম্বল জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে নিজেদের পেট-পুজো হ'ল। স্বাধীন ভারতেও চলবে নাকি?

কহিলাম, যা এতদিন ধ'রে চ'লে এসেছে, তা কি একদিনে বন্ধ হবে যতদিন না দেশের সব মানুষ সব দিক দিয়ে সমান হয়ে উঠবে, ততদি মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার বন্ধ হবে না।

তা কি আর হবে কোন দিন?

হবে আশা ক'রেই তো সবাই আনন্দ করছে আজ। আমাদের মহা তো সেই কথাই বলেছেন বার বার। তাঁর মত দীন-দরিদ্র-দুর্বলের শুভাশুধ্যা আর কে আছে বল?

সত্যি। বেঁচে থাকুন তিনি। তিনি বেঁচে থাকলে লোকের আশা হয়ে একদিন মিটবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কতকগুলো লোক রাজার হালে আছে আর বাকি লোকগুলোর হাড়ির হাল হচ্ছে, আর সহ্য করা যায় না, বাপু

হাসিয়া কহিলাম, সবাই সমান হ'লেই কি সহ্য করতে পারবে? মুচী-ব তোমার হেঁসেল-ঘরে এসে দাঁড়াবে, এক পংক্তিতে ব'সে নেমন্তন্ন খাবে; ভজু মেথর এসে তোমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে—

মুখ চুন হইয়া গেল গৃহিণীর। দম লইয়া কহিলেন, তা সহ্য করতে হ বইকি। যখন যা রীত হবে, মানতে হবে—শুধু তো আমাকেই নয়, সবাইকে।

হরিসাধনবাবুর মেয়েটি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কেমন মেয়েটি ম্লান মুখে কহিল, বাবা ভারি ছটফট করছেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা কি করছেন?

মেয়েটি কহিল, মা বাবার বুকে মালিশ করছেন।

গৃহিণী রান্নাঘরের দিকে গেলেন। মেয়েটি তাঁহার পাছু পাছু গেল। আ একটু পরে মেয়েটি চলিয়া গেল। হাতে একটি বাটিতে কি লইয়া গেল গৃহিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নিয়ে গেল বাটিতে?

গৃহিণী কহিলেন, দুধ। ওর মা চেয়ে পাঠিয়েছে ওর বাবার জন্যে।

বিকাল পাঁচটায় বাহির হইলাম। শহরে বিরাট জনসভার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস-নেতারা বক্তৃতা করিবেন। সভা সারিয়া ডাক্তার-বাবুর বাড়ি যাইতে হইবে।

সভাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। বিস্তৃত মাঠের এক পাশে সভামঞ্চের উপরে কংগ্রেস-নেতারা ও বিশিষ্ট কর্মীরা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপবিষ্ট। বক্তৃতা শুরু হইয়া গিয়াছে।

বক্তৃতা করিতেছেন নকুড়বাবু। বহুদিনের পুরাতন কংগ্রেসকর্মী, জেলার অন্যতম কংগ্রেস-নেতা। লম্বা কাহিল দেহ, পরিধানে মহাত্মা গান্ধীর মত কটিবাস, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। খঞ্জন পাখির মত নাচিয়া নাচিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। স্বাধীনতা-লাভের জন্য কংগ্রেস-কর্মীরা তিনি নিজেও কি কি কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহারই দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতেছেন। অবশেষে কহিলেন, ইংরেজরা সহজে স্বাধীনতা দিয়া সরিয়া পড়ে নাই। সাম্রাজ্য রক্ষা করা আর সম্ভব নহে বলিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। এখন এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই সমস্যা। ঘরে বাহিরে শত্রু। ঘর ও বাহির—দুই সামলাইতে হইবে। সমগ্র দেশবাসী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না। স্বাধীনতা-পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম সুখ ও সুবিধার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলে চলিবে না। অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে এখনও। স্থির ও ধীর ভাবে মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত পথে চলিলে সব বিপদ কাটিয়া যাইবে একদিন।

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হইল। আর একজন দাঁড়াইলেন। বেঁটে মোটা, মেটে গায়ের রঙ, বয়স পঞ্চাশের উপর, মাথায় কাঁচা-পাকা ছোট ছাট চুল; মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে খদ্দরের খাটো কাপড়, খদ্দরের ফতুয়া, কাঁধে খদ্দরের চাদর। জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, স্বাধীনতা আমরা এখনও পাই নাই। স্বাধীনতার পথে পা দিয়াছি মাত্র। সত্যকার স্বাধীনতা পাইতে অনেক দেরি। সারা দেশের লোকের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন দরকার, সমগ্র দেশবাসীর কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। দেশের জন্য বাঁচিবার ও মরিবার মত শক্তি আহরণ করা দরকার। চাই শৃঙ্খলা, সংযম, ধৈর্য ও নেতাদের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথে চলিবার মত চাই নিয়মানুবর্তিতা। না হইলে সব পণ্ড

হইবে। দেশে নানা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের জনশক্তিকে খণ্ড-বি করিয়া জাতিকে শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। কোন দলে যোগ না একমাত্র কংগ্রেসের পশ্চাতে দাঁড়াইতে হইবে সকলকে। আজ পঞ্চাশ-বৎসর অবিরত সংগ্রাম করিয়া কংগ্রেস দেশের শাসন-দণ্ড আয়ত্ত করিয়া স্বাধীনতার সূচনা হইতে না হইতেই ক্ষমতালোভী লোকেরা শাসন-শক্তি ক করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এ কথা সকলের সর্বদা স্মরণ রাখা উচি কংগ্রেস কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নহে। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গল-সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। ভারতের এ শক্তিই তাহার শক্তির উৎস। দেশের সমগ্র জনগণের মধ্যে শান্তি ও স আনিতে একমাত্র কংগ্রেসই সক্ষম।

আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া তিনি থামিলেন। যথারীতি করতালি-ধ হইল।

তারপর দাঁড়াইলেন আর একজন। ইনি বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী; বিপ্লবপন্থী ছিলেন, পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। লম্বা একহারা গঠ ফরসা রঙ; পরনে দুধের মত সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, চোখে সো চশমা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কহিলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতমা মুক্তি পেয়েছেন। দুর্গম গিরিশিখরে দুর্ভেদ্য কারাগারে ছিলেন বন্দী। দি পর দিন তাঁর উপরে চলেছে অকথ্য অত্যাচার, অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অসহ উৎপীড়ন। তাঁর আর্তনাদে সারা পৃথিবীর আকাশ আন্দোলিত হয়ে মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা দিনের পর দিন করজোড়ে প্রভুদের কাছে মায়ের মুক্তি জন্য প্রার্থনা করেছেন। সে প্রার্থনায় ক্ষমতা-মত্ত দাম্ভিক প্রভুরা কান দেয় নি শেষে একদল দুরন্ত ছেলে দুর্গম গিরিভূমি পার হয়ে সশস্ত্র প্রহরীদের স প্রহরা এড়িয়ে কারাগারের লৌহদ্বারে করলে আঘাত। লৌহদ্বার ঝন ক'রে উঠল। বিপুল বিস্ময়ে প্রভুরা সচকিত হয়ে উঠল। নেংটি ইঁদুর এত স্পর্ধা! প্রতিহিংসায় হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। মারলে তাদের পশুর মত খুঁচি খুঁচিয়ে; বন্ধ ক'রে রাখলে অন্ধকার কারাগারে; পাঠাল দূর দুর্গম নির্বাসনে যন্ত্রণার নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে তাদের প্রাণশক্তিকে পিষে গুঁড়ো ক'রে দিতে কিন্তু নিরস্ত হ'ল না মায়ের ছেলেরা। প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে দলে দলে তারা এগিয়ে গেল, করলে আঘাতের পর আঘাত কারাগৃহের দ্বা

রাগৃহের ভিত্তিমূলে। মরলও তারা দলে দলে; তাদের দেহের কঙ্কাল জ'মে য়ে পাহাড় হয়ে উঠল; তাদের বুকের রক্তে গিরির কঠিন বুক নরম হয়ে ল। শক্তিমানের বিপুল শক্তির কাছে ব্যর্থ হ'ল তারা। কিন্তু তাদের য়ে পায়ে দুস্তর গিরিবক্ষের উপরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল একটি পরিচ্ছন্ন পথ।

তারপর সেই পথে হ'ল এক অভিনব অভিযান। অভিযানের নেতা ন্ধীজী—ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। কৃশ খর্ব দেহ, কিন্তু লোহার চেয়ে ঠন মন। অহিংসামন্ত্রে সিদ্ধ হয়ে এলেন সাগর-পার থেকে। তিনি রতমাতার কোটি কোটি সন্তানদের ডেকে বললেন, এস তোমরা আমার হনে সকলে। সমবেত কণ্ঠে মায়ের মুক্তি চাইব আমরা। অস্ত্র চাই না, মাদের চাই মনের শক্তি, মরবার সাহস। ওরা মারবে আমাদের, মার খা পেতে নেব আমরা; মারের বদলে মারব না কাউকে। যদি মরতে হয়, সিমুখে মরব। কিন্তু মরতে মরতেও চাইব মায়ের মুক্তি—

চল্লিশ কোটি সন্তান জয়গান ক'রে উঠল তাদের নেতার; পূজো করলে কে ঘরে ঘরে, তাঁর নাম করতে করতে ভাবে গদগদ হয়ে যেতে লাগল, কে ডাকতে লাগল মহাত্মা ব'লে। কিন্তু এগিয়ে গেল না বেশি লোক। যা গেলেন তাঁরা সব দিক দিয়ে মায়ের সেরা সন্তান, আগুনে পোড়-খাওয়া ননার চেয়েও খাঁটি। এঁদের নিয়ে গান্ধীজী দিনের পর দিন জানাতে লেন দাবি—মায়ের মুক্তি চাই। মুখে প্রশান্ত হাসি, কিন্তু কণ্ঠে বজ্রের ক্তা। তাঁর ক্ষমা-সুন্দর মূর্তির সামনে আততায়ীর উদ্যত অস্ত্র স্তব্ধ হ'ল, দের দম্ভ বিন্ধ্যগিরির মত মাথা নোয়ালে—

হঠাৎ ডান বাহুর উপর প্রবল চাপ অনুভব করিতেই পাশে চাহিয়া খিলাম, এক ব্যক্তি গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। লম্বা হিল চেহারা; ফরসা রঙ; মুখে আবক্ষলম্বিত দাড়ি; চোখে চশমা।

পরনে খাকী রঙের পাজামা ও হাফ-হাতা শার্ট। পায়ে বুটজুতা। মাথায় পাগড়ি। আপাদমস্তক তন্নতন্ন করিয়া দেখিলাম। পূর্বপরিচয়ের চিহ্ন মাত্র থাও দেখিতে পাইলাম না। লোকটাকে অবাঙালী বলিয়া মনে হইল। দু না মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দী জানি না, তবুও কোন ত প্রশ্ন করিলাম, ক্যা বোলতা?

লোকটি পরিষ্কার বাংলায় কহিল, আসুন আমার সঙ্গে। বিশেষ প্রয়োজন ৮

গলার স্বর চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিলাম, কেন? কোথায়?

লোকটি কহিল, ভয় নাই। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

মনে মনে কহিলাম, ক্ষতি তো করবে না বলছ, কিন্তু বিশ্বাস কি? তোমার চেহারা আর পোশাক। আজকাল ঐ পোশাকে কলিকাতায় কত লোক কত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে! আকাশের দিকে তাকাইলাম, সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। কহিলাম, বক্তৃতা শুনব না? লোকটি কহিল, বক্তৃতা ঢের অনেক শুনেছেন। আরও শুনবেন। এর পর বক্তৃতার বন্যা বইবে দেশে সামলানো দায় হবে। আসুন আমার সঙ্গে।—বলিয়া হাত ধরিয়া টান দিল। জোর করিয়া লইয়া যাইবে নাকি? ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কোথা যেতে হবে? যা বলবার এখানে বলুন না।

এখানে হবে না। গোপনীয় কথা।

হাজার হাজার লোকের মধ্যে বাছিয়া শুধু আমাকেই গোপন কথা শুনাইবার জন্য এই অপরিচিত লোকটার আগ্রহ কেন, বুঝিলাম না। সসঙ্কোচে কহিলাম, আপনার গোপনীয় কথা শোনবার আমার প্রয়োজন?

লোকটি কহিল, আপনার শোনবার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার শোনাবার প্রয়োজন। সোৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, আমাকে চেনেন নাকি? লোকটি 'হাঁ'-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সঙ্গে যাইতে হইল। মনটা কিন্তু সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিল। মতলব কি লোকটার? ধাপ্পা দিয়া লইয়া গিয়া, কোন গলি-ঘুঁজিতে ঢুকাইয়া পকেট মারিবে নাকি? সঙ্গে কয়েকটা টাকাও লইয়া বাহির হইয়াছি। হরিসাধনবাবুর জন্য এক শিশি হরলিক্স পাউডার কিনিয়া লইয়া যাইব। বুক হাত দিয়া পাঁচ টাকার নোটটি যথাস্থানে নিরাপদে আছে কি না দেখিয়া লইলাম।

একটা অন্ধকার ছোট গলির মুখে আসিতেই সভয়ে কহিলাম, এদিকে কেন? বড় রাস্তা দিয়ে চলুন না। লোকটি কহিল, এ দিকেই যেতে হবে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সকাতরে কহিলাম, না না, এ দিকে না। লোকটি হাসিয়া কহিল, কি মুশকিল। ওদিকে যাবার দরকার নাই, তবু যেতে হবে?

দরকার নাই কেন?

এই গলিতেই যে আমি থাকি। ভারি ভীতু হয়েছেন তো! বুড়ো য় গেছেন দেখছি।

কণ্ঠস্বরে আবার পূর্ব-পরিচয়ের রেশ বাজিল। চেনা লোক নাকি? কে হা হইলে?

গলির মধ্যে কতকটা গিয়া একটা পুরাতন দোতলা বাড়ির সামনে আসিয়া ইল, এই বাড়িটাতে থাকি, আসুন।

ভিতরে ঢুকিলাম। ছোট উঠান; তাহারই এক পাশে কুয়া। কুয়ার টু দূরে রান্নাঘর। উনানে আঁচ দেওয়া হইয়াছে। সারা বাড়িটা ায় ভরিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের বারান্দায় চাকর মসলা পিষিতেছে। সের ঠাকুর এক পাশে একটা টুলে বসিয়া হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে য়ের সহিত রসালাপ করিতেছে।

অত্যন্ত পুরাতন বাড়ি। দেওয়ালের চুন বালি খসা। সামনে বারান্দায় টা তক্তাপোশ; তাহার উপরে একটা কম্বল পাতা। দেওয়াল ঘেঁষিয়া টা তেলচিটা ময়লা বালিশ। দেওয়ালের উপরে কয়লা দিয়া আঁকাবাঁকা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—আপিস। অর্থাৎ এইখানে বসিয়া হোটেলওয়ালা বসা পরিচালনা করে। ঐ তেলচিটা বালিশটায় ঠেস দিয়া বসিয়া খাদ্যের মে অখাদ্য খাওয়াইয়া হোটেলের বাবুদের স্বল্প মাহিনার সবটাই কেমন রিয়া আত্মসাৎ করিবে, সেই সম্বন্ধে ফন্দি আঁটে। স্বাধীনতা-দিবসের সভায় ও যোগ দিয়াছে সম্ভবত।

লোকটির পাছু পাছু দোতলায় উঠিলাম। সিঁড়ির মাথার কাছেই একটা রের সামনে আসিয়া কহিল, এইটাই আমার আস্তানা। দরজা তালা-দেওয়া ল। খুলিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

নেহাৎ ছোট কুঠরি। এক পাশে একটা ভাঙা চৌকি। তাহাতে াকটির স্বল্প শয্যা বিছানো। মেঝেতে একটা মাঝারি-গোছের সুটকেস; এক কোণে একটা দড়িতে গেরুয়া-রঙের একটি লুঙ্গী ও একটি গামছা ঝুলিতেছে।

লোকটি কহিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। বিছানার উপরে বসিয়া ড়িলাম। নড়বড়ে চৌকিটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

লোকটি মাথার পাগড়ি ও চোখের চশমা খুলিয়া ফেলিয়া সামনে আসিয়া াড়াইয়া হাসিয়া কহিল, চিনতে পারছেন এবার?

মাথায় বড় বড় চুল; সামনের চুলগুলা একটু পাতলা; চওড়া কপাল ডান চোখের ভ্রূর এক পাশে একটা কাটা দাগ; উজ্জ্বল আয়ত চোখ, যে প্রাণের দীপ্তি ঐ দুইটি চোখের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। খাড়া নাক কানের পাতা দুইটির একটি বিশেষ ধরনের গঠন।

চিনিলাম, সুনির্মল। ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের একজন ছাত্র নেতা। কলিকাতায় এম. এ. পড়িত তখন। প্রতিভাবান ছাত্র ছিল। এম. এ. পাস করিলে যে কোন প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় পাস করিয়া সরকারী চাকুরী লাভ করিতে পারিত। আমাদের জেলায় এক গ্রামে বাড়ি। তাহার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। অতি কষ্টে ছেলেটির পড়ার খরচ চালাইতেন ও ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখিতেন।

এক রাত্রির কথা মনে পড়িল। ভাদ্র মাস সম্ভবত। অন্ধকার রাত্রি দুর্যোগ নামিয়াছে। রাত্রি দুপুরে দরজায় ধাক্কা পড়িল। প্রথমটা ভয়ে দরজা খুলি নাই। তারপর নাম ধরিয়া ডাকিতেই দরজা খুলিয়া দেখি, এক ভদ্রলোক মুখে দাড়ি; মাথায় পাগড়ি, চোখে চশমা। চিনিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দাড়ি পাগড়ি ও চশমা একে একে খুলিয়া ফেলিল। তখন চিনিলাম, আমাদের সুনির্মল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? হাসিয়া কহিল ফেরার; পুলিস পাছু নিয়েছে। বাড়ি যাচ্ছি। বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আজই স'রে পড়তে হবে। ক্ষিদে পেয়েছে ভারি। খাবার আছে নাকি বাড়িতে?

ছিল না। স্ত্রী উঠিয়া তাড়াতাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিলেন। যাইবার সময় কহিল, অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ। পায়ে-পায়ে শত্রু। আর ফিরতে পারব কি না কে জানে!—বলিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

কহিলাম, দাড়ি-গোঁফগুলোও খুলে ফেল। দাড়িটা হাত দিয়া টানিয়া সুনির্মল কহিল, এখন আর নকল নয়, আসল। গজাতে অনেক সময় লেগেছে।—বলিয়া হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম, কখন এলে?

জবাব দিল, কাল রাত্রে। স্বাধীনতা এসেছে। আর লুকিয়ে থাকব কেন। বাবা কেমন আছেন? আর আর খবর কি?

সুনির্মলের বাবা আসেন মাঝে মাঝে শহরে। আমার বাড়িতেই উঠেন। দেখিলাম, ভাল নাই বিশেষ। বুড়ো হয়ে গেছেন একেবারে। মাথার চুল ঃ পেকে গেছে। কুঁজো হয়ে গেছেন। দেখলে হয়তো চিনতেই পারবে না ধকে। বউমা তোমার বাবার কাছেই আছেন। নিজের মেয়ের মত সেবা-ন্ন করেন ওঁর। তোমার বাবা খুব প্রশংসা করছিলেন। গত বৎসর ামার বাড়িতে এসেছিলেন বউমা আই. এ. পরীক্ষা দেবার জন্তে। ভাল রেই পরীক্ষা পাস করেছেন। সুনির্মল মৃদু হাসিয়া কহিল, তাই নাকি?

কহিলাম, বাড়ি যাচ্ছ কবে?

কালই যাব।

দাড়িগুলো কামিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। পোশাকটা বদলাও।

সুনির্মল মৃদু হাসিল। পাশে বসিয়া কহিল, এবার কি করা যাবে বলুন খি?

কহিলাম, পরীক্ষা দিয়ে যাও। পাস করবে নিশ্চয়। তারপর চাকরি-কির করবে। দেশের নেতারা এখন দেশের শাসক। তোমাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন নিশ্চয়।

সুনির্মল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দেশের কাজ করেছি ব'লে পুরস্কার?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কংগ্রেসের ছোট বড় নেতারা, ছোট বড় র্মীরা, এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যাদের নামমাত্র যোগ ছিল কোনও দিন তারাও, সবাই নূতন শাসন-ব্যবস্থায় কে কি সুবিধা আদায় করবে তারই হসাবে ব্যস্ত। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের কেমন ক'রে দুঃখ-মোচন হবে, দু-চার জন ছাড়া এ কথা কেউ ভাবছে না। এ ক বছর ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে মিশে, এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, দেশের ধিকাংশ লোকই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচিত্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ। শুধু ব্যক্তিগতভাবে য়, প্রদেশগতভাবেও স্বাধীনতা-লাভের পর এই মনোবৃত্তি যদি মাথা চাড়া য়ে ওঠে তো মুশকিলের কথা। চিলের মুখ থেকে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি বটে, কিন্তু সে তো আর পালায় নি। কাছেই ডালে ব'সে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নাল ফেলছে। তা ছাড়া আরও অনেক চিল আশে পাশে উড়ছে—

কহিলাম, যার চেষ্টায় আমাদের মুক্তি-লাভ হয়েছে, তিনিই আমাদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। যত বিপদই আসুক, যত বাধাই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাক্, তাঁর নেতৃত্বে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর প্রিয় মন্ত্র গোষ্ঠী দেশকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তারপর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশে জন্মাবে নূতন মানুষ; পুরাতনের পচা জন্মাবে নূতন প্রাণশক্তি; তখনই শুরু হবে ভারতের জয়যাত্রা।

নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার গাঢ় হইয়া উ সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। সকলে সভায় গিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝিটার খ গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে। চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে সম্ভ

এক সময়ে কহিলাম, আমার ওখানে যাচ্ছ কবে?

সুনির্মল কহিল, কাল যাব, বউদিদিকে বলবেন।

কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম। দোকানে দোকানে আলো জ উঠিয়াছে। রাস্তায় ভিড়। সভাভঙ্গের পর লোকে বাড়ি ফিরিতেছে। বাি বাড়িতে আলোকসজ্জা। রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে।

সুনির্মলের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি। শ্যাম ভারি শান্ত-শিষ্ট। বুদ্ধিমতী। স্বামীকে বেশিদিনের জন্য পায় নাই। স্বামীর গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বামীর কথা বলিতে তাহার চোখ-মুখ দীপ্ত হইয়া উঠে। স্বামী তাহার একদিন ফি আসিবেন। আশাভঙ্গের শত আঘাতেও এ বিশ্বাস সে কোনদিন হারায় না এই বিশ্বাসটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে স্বামীর সহিত দীর্ঘ-বিচ্ছে ভার নীরবে বহন করিয়াছে। আজ তাহার মুখে হাসি ফুটিবে।

বাংলা দেশে যাহারা আজ সুনির্মলের মত ফিরিয়া আসিল, তাহা বাড়িতে আজ আনন্দের আলো ফুটিবে। যাহারা ফিরিল না, ফিরিবে তাহাদের বাড়ির অন্ধকার আজ হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিবে।

এক শিশি হরলিক্স কিনিবার জন্য একটা ঔষধের দোকানে উঠিয়া চাহিতে দোকানের মালিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, নাই। তারপর একবার মুখে দিকে তাকাইয়া কম্পাউণ্ডারকে কহিল, দেখ তো হে, হরলিক্স আছে কি ন কম্পাউণ্ডার একবার ভিতরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, নাই। মালি মোলায়েম হাসিয়া কহিল, বলেছিলাম তো, ও-জিনিস থাকতে পায় না, আসব মাত্র বিক্রি হয়ে যায়।

ব দোকানের মালিকেরই ঐ এক ভাব। কোন জিনিস চাহিলেই থাকে
কিলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; দোকানের কর্মচারীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া
হইয়া যায়, তবুও না। মহা মুশকিলে পড়িয়াছে বেচারারা! আর একটি
ষ, এ বিষয়ে মালিকদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত,
সী-অকংগ্রেসী, হালি-পুরাতন—সব এক ধরনের।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে চলিলাম। রাস্তার দুই পাশে বাড়িগুলি দীপ-
য় সজ্জিত। কাহারও বাড়িতে রেডিও, কাহারও বাড়িতে গ্রামোফোন
তেছে। কোন বাড়িতে গানের আসর বসিয়াছে। ডাক্তারবাবুর
তেও অপরূপ আলোক-সজ্জা। ডাক্তারবাবু বাড়িতে ছিলেন। ড্রয়িং-রুমে
ও বাজিতেছিল। খবর পাইয়া বাহিরে আসিলেন। হরিসাধনবাবুর
তে যাওয়ার কথা বলিতেই কহিলেন, আজ আর হবে না মশাই। কয়েকজন
লোককে নেমন্তন্ন করেছি, তাঁরা এসে পড়লেন ব'লে।

কহিলাম, বেশি দেরি হবে না, কাছেই। দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন,
করবেন; আজ আর হবে না। কাল সকালে বরং একবার খবর দেবেন।
চ্ছা, আসুন আপনি, নমস্কার।—বলিয়া আর কিছু বলিবার আগেই চলিয়া
া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

হরিসাধনবাবুর বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, অবস্থা সঙ্গিন। বিছানায় শুইয়া
ছেন। অত্যন্ত অবসন্ন ভাব। চোখ দুইটি মুদ্রিত। মুখ দিয়া শ্বাস
নিতেছেন। উপরের ঠোঁটটা গুটাইয়া গিয়া সামনের কয়েকটা হলুদ রঙের
ত দেখা যাইতেছে। গলার ঘড়ঘড় শব্দ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।
রিসাধনবাবুর স্ত্রী বুকে মালিশ করিতেছেন। ছেলেমেয়ে দুইটি এক পাশে
নমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

একটু দূরে একটা টুলে মাখনবাবু বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া
ঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার হাতে টিপ্‌নি দিয়া বাহিরে গিয়া
াখের ইঙ্গিতে ডাকিলেন। বাহিরে যাইবামাত্র ফিসফিস করিয়া কহিলেন,
বস্থা ভাল দেখছি নে; রাতটা কাটলে হয়। মাখনবাবু শুধু রোগীর জীবনেরই
ায়িত্ব লইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, মৃত্যুর পরের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সমধিক সচেতন।
হিলেন, যে রকম ফুর্তির ফোয়ারা ছুটছে চারদিকে, লোকজন পাওয়া গেলে
য়! কি যে করা যাবে? তবে আমার কম্পাউণ্ডার চৌকস লোক। ওকে

আজ ছাড়া হবে না। বাড়িতে চারটি খাইয়ে দেব। আপনিও খেয়ে আসুন।

মাখনবাবু একেবারে শেষের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া ঘাবড়াইয়া কহিলাম, আজ রাত্রেই কিছু হবে নাকি?

মাখনবাবু চোখ দুইটি বুজিয়া ঘাড় কাত করিয়া কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ তা হ'লে?

তা হ'লে আর কি? খেয়ে-দেয়ে চ'লে আসুন। আমরাও আসছি।—চলিয়া গেলেন। মাখনবাবুর চিকিৎসাবিদ্যা স্বল্প; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি সমধিক। আজকাল চিকিৎসকদের মধ্যে ইহার অত্যন্ত অভাব।

হরিসাধনবাবুর মেয়েকে ডাকিয়া কহিলাম, তোমাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা রান্না হয়েছে? মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল। হরিসাধনবাবুর স্ত্রীকে কহিলাম, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাচ্ছি। ওরা ওখানেই খাবে। আমি আসছি একটু পরে।

ছেলেমেয়েদের লইয়া বাড়ি গেলাম। গৃহিণী তাহাদের খাওয়াইয়া পাঠাইয়া দিলেন। হরিসাধনবাবুর স্ত্রীর জন্যও খাবার দিলেন মেয়েটির হাতে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছাদের উপরে গেলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশ তারায় সমাকীর্ণ। উত্তর-পূর্ব কোণে জমিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। কোথায় যেন বৃষ্টি হইয়া গেছে করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। বাড়িতে বাড়িতে দীপসজ্জা রায়বাহাদুরের দ্বিতল বাড়িটি বিদ্যুতের লাল-নীল দীপমালা পরিয়া উৎসবে সালঙ্কারা ধনী-গৃহিণীর মত অহঙ্কারে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। বাতগানের মিষ্টি সুর ভাসিয়া আসিতেছে। হরিসাধনবাবুর বাড়ির দিকটা অন্ধকার। মৃত্যু যেন কালো জটা বিস্তার করিয়া ক্ষুধার্ত আগ্রহে ঘুপটি মারিয়া বসিয়া আছে। ওখানে পাড়ার ছেলেদের হল্লা শুনা যাইতেছে না। দুপুরে ভূরিভোজনটা পরিপাক করিবার জন্য সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছে হয়।

দেহ ও মনে গভীর ক্লান্তি। সারাদিন নানা ধরনের আনন্দ ও বেদনা নানা চিন্তা ও ভাবের দোলায় দোল খাইয়াছে মনটা। দেহটাও ছুটাছুটি করিয়াছে বিস্তর। ইহার উপর রাত্রে যদি হরিসাধনবাবু মারা যান, তাঁহার

ত্যর ব্যবস্থা ও শোকার্ত পরিবারের ব্যবস্থা—এই দুই গুরুভারের
টা আমার ঘাড়ে পড়িবে। একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া প্রয়োজন।
উপরে একটা মাদুর পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন গৃহিণী। তাহাতেই
য়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে নিদ্রার গাঢ় কুহেলিকা সমস্ত চেতনাকে
ন করিয়া দিল।

ন অন্ধকার রাত্রি। বিপুল জনপ্রবাহের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছি। অত্যন্ত
। তবু থামিবার উপায় নাই। জনতার চাপ ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।
শ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। তাহারই
কে সঞ্চরমাণ বৃহৎ জনপ্রবাহ মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

ঠাৎ জনস্রোতের গতি রুদ্ধ হইল। সম্মুখে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ
র। এই অন্ধকারের মধ্যে দূরে একটি আলোক-শিখা দৃষ্টিগোচর হইল,
ত কণ্ঠের ক্ষীণ ধ্বনিও কানে আসিতে লাগিল; যেন ঐ অন্ধকার
রের মধ্য দিয়া কাহারা আসিতেছে। জনতা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তাহাদের
মন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার তরল হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি অবসানপ্রায়।
দিগন্তে উষার ঈষৎ আভাস দেখা দিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া
লাম, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে।

আবার সম্মুখে চাহিলাম। উষার অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলাম,
র একটি শিবিকা ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে। পাশে পাশে
তেছেন নগ্নকায়, কটিবাসধারী, ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান—মহাত্মা গান্ধী।
ও কাছে আসিতে বাহকদেরও অনেককে চিনিতে পারিলাম।
তমাতার যেসব সন্তান মায়ের মুক্তিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,
রা। ধীরে ধীরে শিবিকা সম্মুখে নবনির্মিত মর্মর বেদীর উপরে স্থাপিত
ল। শিবিকার ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক অপূর্ব মহিমাময়ী নারী;
জীর কাঁধে ভর করিয়া ক্লান্ত শ্লথ চরণে জনতার সম্মুখে আসিয়া
াইলেন। সমগ্র জনতার মধ্যে অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, মা মা—

এমন সময়ে পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হইল। তরুণ অরুণালোক মায়ের
ও দেহের উপর পড়িল। দেখিলাম, ঋজু সুঠাম দেহ; শুষ্ক পদ্মের পাপড়ির
; ম্লান শুভ্র রূপ, যেন গলিত রৌপ্যের উপর ভস্মের সূক্ষ্ম প্রলেপ পড়িয়াছে।

মুখখানি শীর্ণ; ফ্যাকাশে; যেন রক্তশোষী জোঁকের দল দেহের সমং শোষণ করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘ রুক্ষ আলুলায়িত কেশ পিঠের লুটাইতেছে। পরিধানে জীর্ণ বসন; সর্বদেহ রিক্তাভরণ। আয়ত দুইটিতে অপরিমেয় স্নেহ ও অপার করুণা টলটল করিতেছে; শুষ্ক ওষ্ঠ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বিশাল জনসমুদ্র উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, বন্দে মাতরম্। সেই ধ্বনি গর্জনের মত দিক্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, মা অঙ্গহীনা। ডান হাতটি সদ্য-ছিন্ন। ছে হইতে অবিরত রক্তক্ষরণ হইতেছে। অপরিসীম যন্ত্রণা দুই ওষ্ঠ চ মা নিঃশব্দে সহ্য করিতেছেন।

জনতা 'বন্দে মাতরম্' গান শুরু করিল। সমবেত কণ্ঠের স্তুতিধ্বনি ত তরঙ্গে মায়ের পদ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

মাতৃবন্দনা বিচিত্র সুরে-লয়ে আকাশে বাতাসে তরঙ্গিত হইতে লা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল বেসুরা হইয়া উঠিতেছে। যেন দূর দিগন্তের ওপার হইতে কাহাদের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ক্ষীণ তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মাতৃবন্দনার সুরমাধুর্যকে বি করিয়া দিতেছে।

মায়ের মুখের দিকে তাকাইলাম। মুখের সেই প্রশান্ত প্রসন্ন হাসি অম্ল কিন্তু দুই চোখের কোণে দুইটি মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু।

হঠাৎ কাহার ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। গৃহিণী বলিতেছেন, ওগো, শু ওঠ দেখি। ওদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হরিসাধনব হয়ে গেল বোধ হয়।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। ছাদের ওপাশে গিয়া দাঁড়াইলা রায়বাহাদুরের বাড়িতে লাউডস্পীকারে 'বন্দে মাতরম্' গান বাজিতেছে। ব পাতিয়া শুনিতেই শুনিতে পাইলাম, নারীকণ্ঠের ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি অন্ধকারের বুক চিরিয়া চিরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

শ্রীঅমলা দেব

চক্রবাকী

চক্রবাকবধূত্র, আমন্ত্রেদি সহচরম্। উবচিতা রজনী।—(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

নুচরে চক্রবাকের পিপাসায়
দহে প্রাণ—
দিছে চক্রবাকী।
ী নামিছে;
াকিছে,
চরাগত সাথী,
ন জড়াও জীবনে তোমার;
। অনেক বাকি।
দিছে চক্রবাকী।
, শিথিলচরণা রজনী বিরহ-
বেদনা-নত।
সর কাজ শেষে
ফিরে সবে দিবসের মত।
া গৃহের বাতি
দিনের শেষে।
ায় আমার সাথী?
ারি ব্যথায় অন্ধ তামসী মেশে;
বেদনার দেশে
আসে মম বিরহের বেশে।
কী শয়ন মম
দ, 'কই প্রিয়তম?'
ম আসে মম রঞ্জার বেশে।
মনী বক্ষ চিরে
হাহাকার-ধ্বনি,
লও তুমি লও ফিরে,
ফিরে লও অভিশাপ।
ক্রুদ্ধ তাপস, ঘৃণ্য তোমার আক্রোশ-
অভিশাপ
লও, লও তুমি ফিরে।
আমারি বিলাপধ্বনি
রজনীর তীরে তীরে কান পেতে
আমি শুনি
যুগান্ত পার হয়ে প্রাচীন কালের ক্ষণে
সেই পুরা তপোবনে;
চক্রবাকীর অসহায় বেদনায়
কেবলি মিশাতে চায়।
আমার রজনী নামে—
চাহি দক্ষিণ-বামে
তুমি নাই, তুমি নাই।
যখনি বুকেতে চাই
তখনি বিরহ আসে
চক্রবাকের চক্রবাকীর সেতুবন্ধন নাই।
সকলে গৃহেতে আসে
আমারি গৃহেতে বিদায়-বিলাপ
ধ্বনি ওঠে চিররাতি,
'বিদায় এবার, সাথী।'
অজানা তাপস, শোন—
ফিরে লও অভিশাপ।

শ্রীমতী বাণী রায়

চিরজয়ী

ম যদি শোনাও সঙ্গীত;
শহারা হয়ে যাই—
লীন অন্তরের গোপনীয় স্তরে
আজো জাগে ঊর্ধ্বমুখী চাতকের
চির আশা,
জাগে ভালবাসা।

যৌবনের মদিরতা, বাসনা মলিন
নিস্তব্ধ লজ্জায় মরে।
প্রগল্‌ভ চিতে
নেমে আসে তারালোক চিরশান্তি
দিতে।

তুচ্ছ-দীন এই প্রাণ
ধরণী-ধূলায় থাকে তার তুচ্ছতর
বিলাসিতা নিয়ে।
কাটিছে প্রহর
লঘু চপলতা দিয়ে;
কেটে যায় দিন;
তুমি রাখো কি সন্ধান?
তোমার সুরের বাণী হয়তো, প্রেয়িক,
রেখেছে লুকায়ে বক্ষে দেহের কামনা,
হয়তো তোমারও গান
সহস্র সমান
নিরুপায় ভিক্ষাভাণ্ডে শরীর বন্দনা।
তবু থাকি অন্ধ হয়ে—
ভাবি মনে মনে,
আমারে বেসেছে ভাল কেহ এতদিনে;
যে প্রেম আলোক স্বপ্নে,
তারই রূপ ল'য়ে
অমর-সঙ্গীতে কেহ নিতে চায় চিনে।
আমার প্রমাদ প্রিয়, ট্রাজেডি আমার,
জেনেছি অনেক কিছু।
ভীরু আঁখি নীচু
অভিসারী পদে আসে সলাজ কিশোরী
প্রিয়ের সান্নিধ্যে তার,—
নহে মোর গতি।
জেনেছি অনেক আমি।
প্লেটনিক প্রেমে কতখানি থাকে
সোনা কয় রতি!
যদি বলো, ক্ষুদ্রমনা।
কভু মানিব না।
জেনেছি সকল তথ্য নিজেরেও
প্রেমের মুকুর 'পরে
আপন অন্তরে
চমকি উঠেছি দেখি বাসনার ছ
স্পন্দহীন বিশ্ব শোনে যে কাব্যে
সে কবিতা আনে নাই চিত্তমাঝে
দেহাতীত রূপে বাণী আকাশের
কিছু আছে সত্য তার, কিছু ব
অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক বা
যে মনের একপাশ সুধার প্লাবনে
ভুলে যায় নিখিলের শত অসঙ্গ
প্রতিষ্ঠা-পূজারী সে যে কোন ও
বিলায় নিজেরে কোন চারণ-চর
সে মনেরি অন্য পাশ সিনিক অ
সবজানা মৃদু হাস্যে চুপিচুপি বে
এখনও প্রেমের গান!
জানি পংক্তি তলে
গুমরিয়া কেঁদে যায় মৌন আবে
তবু থাকি অন্ধ হয়ে; কেন প্রিয়,
পিপীলিকা পক্ষভরে মরে কেন
কেন জান সূর্যমুখী সূর্যে দেয় মন
কেন জান চাতকের আশা যে গ
ধূলো ওঠে সোনা হয়ে—
অতৃপ্ত এ প্রাণ
পেতে চায় মাঝে মাঝে অমৃত-স

শ্রীমতী বা

সমাজ ও সংস্কৃতি

বন-মথিত যে অমৃত আজ ভারতবর্ষে উৎসারিত হইতে চাহে, তাহা বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়।

বিংশ শতাব্দীর, এই হিংসায় ও বঞ্চনায় সৃষ্ট মানুষের সুসভ্যতার তা হইতে মুক্ত হইবার সন্ধিক্ষণে জীবন ও সংস্কৃতিকে সুসংবদ্ধ করিবার একদা ভারতবর্ষ উচ্চারণ করিয়াছিল, মনপ্রাণ দিয়া একবার তাহাকে ক্ষ করি, তাহাকে বরণ করিয়া লই। ভাঙিতে ভাঙিতে গড়িতে গড়িতে কে সচ্ছল করিতে করিতে জীবনের যে কোন দিক দিয়া যাহা কিছু উঠিবে তাহার প্রসাদ ও সৌরভ আজ বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়।

কন্তু আত্মসংস্কৃতির যে-স্তরে উন্নীত হইলে মানুষ অপর সাধারণের সুখ তকে এমন আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, আমরা সেই লাভ- ও -হীন শিক্ষার উপযুক্ত হইয়াছি কি? সর্বসাধারণের জন্ত যে আকুলতা, নিজেকে বিলাইবার আকুলতা। প্রেম দ্বারা সকল মানুষকে নিজের মধ্যে করিতে ও ত্যাগের দ্বারা নিজেকে সকলের মধ্যে উৎসর্গ করিতে না লে এতবড় আদর্শকে কেবল মাত্র রাষ্ট্রবিধির শাসনে সফল করিয়া তোলা নহে। বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়—ইহা প্রেমের ও ত্যাগের বাণী; ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী।

ীকার করিতেই হইবে, কালক্রমে এ আদর্শ হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। নিজের সুখকে নিরাপদ ও বৃদ্ধি করিবার জন্ত বলিতেছি, Survival of fittest; স্বার্থসংঘাত যেখানে ব্যক্তিগত, সমাজ বা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের তা সেখানে নিষ্পেষিত। এই কারণে সমাজের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আজ শিথিল হইতেছে, স্বার্থোদ্ধত নানা ইজ্‌ম্-এর স্বৈরশৃঙ্খল ততই ইহার ধিকে আঁটিয়া বসিয়া জনসাধারণকে বিচকিত করিতেছে। রাষ্ট্রপরিচালনায় টর প্রয়োজনে তুচ্ছতম মানুষকে আজ গায়ে পড়িয়া ভাই-ভাই রবে বিমুগ্ধ তেছি; গণশক্তি করায়ত্ত করিবার এ কৌশলকে মানবতার ব্যাখ্যা দিয়া য়া রাখিয়া বিনিময়ে দুই মুষ্টি অন্নের প্রতিশ্রুতি দিয়া মনে ভাবিতেছি, দান করিলাম, নিরন্নের হাহাকার ঘুচাইয়া তাহাদের কৃতজ্ঞচিত্তের আশীর্বাদ লাম। এ দাক্ষিণ্যে মানুষ পেটে-খাইয়া বাঁচিতে পারে, কিন্তু এত সামান্ত সমাজ বাঁচিবে না। অন্নদানের সহিত প্রত্যেককে সম্মানদান করিতে

হইবে। অন্নের ভাগ, সেই সঙ্গে সুখ ও দুঃখের ভাগ, আশা ও আনন্দের যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারিব, তখনই সমাজ পাইবে। আজ শুধু লোক ডাকিয়া দল বাঁধিয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি, সমাজ রক্ষা নহে।

স্বরাজ্য গড়িয়া তুলিবার বীজ নিহিত রহিয়াছে আমাদেরই সমাজ অভ্যন্তরে। কিন্তু সমাজ-জীবন আজ বিচ্ছিন্ন, কেহ কাহারও আপন নয়। মানুষের শ্রম অর্ধমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপকার পরিশোধ করিতে আমরা কাজ লইতেছি, মানুষটিকে লইতেছি না। কেবল স্বার্থ লইয়া সংস্রব গড়িয়া উঠে, কাজ ফুরাইলে তাহা টিকিয়া থাকে না। কাজের দিয়া দেনা-পাওনাই চলিতেছে, কাজের মান দিয়া সম্বন্ধ পাতাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

ধোপা-নাপিত, কামার-কুমার, মজুর-চাষী প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রমিক-সাহায্য লইয়া তবে মানুষের সুখ-সুবিধা ও সমাজ গড়িয়া উঠে। কি আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আর আর সতর্ক নহি, অবজ্ঞা ও অবহেলায় তাহাদের দূরে রাখিয়াছি। অথচ, সকল অপাঙ্‌ক্তেয়দের লইয়াই রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র মতবাদ গড়িয়া তুলি হৃদয়ের ঔদার্য দেখাইতেছি। ইহা ছলনা মাত্র। শিক্ষিত ও উন্নত তাড়নায় সমাজেই আজ যাহাদের আসন দিই না, তাহাদের জন্য রাজসিংহা ছাড়িয়া দিলেই কি তাহারা সুখে ও সম্মানে থাকিবে? ইহা সত্য, মা সমান সামর্থ্য ও সমান বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া জন্মায় না, সুতরাং সমান অধিকা দাবি অবাস্তব। একটা উচ্চ-নীচ বৈষম্য, একটা জাতিবিভাগ থাকিয়াই যা যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদেরই সামর্থ্যের উপর পরিচালনা ও আধিপত্যের ক্ষম আসিয়া বর্তায়। এই নিয়মে মনুষ্যসমাজ আজও চলিতেছে, চিরদিন চলিবে। সাধারণ চিরদিনই সাধারণ থাকিয়া অনন্যসাধারণের নির্দেশ পাল করিতে থাকিবে। তবে কি যাহারা নীচে রহিল আজীবন, তাহারা নী হইয়াই কাল কাটাইবে, তবে কি এই অভিশাপ প্রতিপালন করিতেই এ মানুষ জন্মিতেছে ও মরিতেছে? তাহা নহে, মানুষের ইন্‌স্টিন্‌কট (Instinct যেমন এক দিকে আত্মরক্ষার্থে স্বার্থবোধে সজাগ, আর এক দিকে তাহার কালচা আত্মত্যাগে ও পরার্থে উদার। এক দিকে সে নিজে বাঁচিতে চাহে, আর এব

সে সকলকে লইয়া বাঁচিতে চাহে; অহর্নিশি এই দ্বন্দ্বে মানুষ কখনও কখনও দেবতা।

আজ আমাদের শিক্ষাচারের সহিত, আমাদের উন্নতির সহিত সংস্কৃতির যোগ নাই। নিজের সহিত সকলকে ও সকলের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া দেখিবার নীতিশিক্ষা এবং সংস্কৃতি না পাইলে রাজনীতির যে-কোন রূপই প্রহসনে পরিণত হইবে। একদা রাজারও নীতি ছিল প্রজানুরঞ্জন। সকল সুখে থাকিবে—এ আদর্শও যথেষ্ট মহান ছিল। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ববোধের অভাবে এ রাজনীতি দেশে দেশে ভাঙিয়া পড়িতেছে, এবং আজও ডেমোক্রেসির সংখ্যাগুরুত্বের একাগ্রজনের চাপে উনপঞ্চাশ জনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত হইতেছে।

আমরাও আজ নিজের দেশে যে রাজনীতি গড়িয়া তুলিতে চাহি, যদি তাহাকে সর্বসাধারণের সুখে ও সেবায় ধন্য করিতে হয়, পরস্পরের জন্য যাহাতে মমতা জাগিতে পারে তাহারই জন্য আগে-ভাগে সমাজনীতিকে শোধন করিয়া তাহা সর্বশ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল করিতে হইবে। এ কারণ, কাজের স্পর্শের সহিত মানুষে মানুষে অবসরের সম্পর্ক সৃজন করিতে হইবে। নিত্যহিক জীবনে নিজের নিজের প্রয়োজন সামলাইতে প্রত্যেককেই ব্যস্ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, অপরের জন্য চিন্তা করিবার অবসর নাই। তিদিনকার বৈচিত্র্যহীন প্রয়োজন হইতে অবসর লইবার জন্য মাঝে মাঝে উৎসব সৃজন করিয়া পরস্পর মিলিবার মিশিবার উপায় করিয়া লইয়াছি। উৎসবের দিনে নিত্যকর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লইয়া যে সম্প্রীতি গড়িয়া উঠে, তাহাতে দায় নাই, ভরি নাই। স্বার্থহীন সম্বন্ধ বলিয়া উৎসবের আনন্দ-কোলাহল গৃহধর্মের অপরিহার্য ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে অবহেলা করিয়া ক্লান্ত-জীবনে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার ও গতিসঞ্চালনে সক্ষম হয়। উৎসব সমাজ-জীবনের মিলন-ক্ষেত্র। তবু, মানুষের মিল সচরাচর সমানে সমানে, সমশিক্ষা ও সমসংস্কৃতি-সম্পন্নের মধ্যেই আবদ্ধ। এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি মানুষের পেশাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। তাই, সম বা অনুরূপ পেশার মানুষেরা,—যাহারা চাষী-মজুর, যাহারা কারিগর, যাহারা ব্যবসায়ী ও যাহারা বুদ্ধিজীবী, তাহারা সকলেই যে যাহার আপন আপন জাতি বা গণ্ডি করিয়া মেলামেশা করিতেছে; সকলের সহিত সকলে মিলিতে

পারিতেছে না। আমাদের সমাজ এই বিভেদ নি
প্রকৃতির এই বিভিন্নতাকে পর্যালোচনা করিয়া প্রভেদে
মাত্র। তবু এককালে যাহা সমাজের নিয়ম ছিল,
বলিয়া মনে হইতেছে; মানুষে মানুষে স্বাভাবিক
পরিণত।

প্রয়োজনবোধে জাতিভেদকে আমরা ঘৃণা করিতেছি
ভাঙিয়া দিবারও সময় আসিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-শূদ্রে
করিয়া ঘুচাইলাম, তবু ধনী ও দরিদ্রের, শিক্ষিত ও অজ্ঞে
পার্থক্য, পরস্পরের মধ্যে সঙ্কীর্ণ বিভেদ রক্ষা করিয়া
নব নব সমস্যা সৃজন করিতেছে, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা
ব্যবস্থা? পুরাতন সমাজ যেমন বিভাগ মানিয়া লইয়া
করিবার শিক্ষা ও ঔদার্যও তাহার আয়ত্তে ছিল। সক
ও সহ্য করিবার যে শিক্ষা, তাহা সমাজ-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ শি

শিক্ষায় ও উপার্জনে যাহারা উন্নত নহে, সঙ্কোচে ও
সহিত যাচিয়া মিলিতে পারে না, সামাজিক ক্রিয়াক
ডাকিয়া মিলাইবার বিধান দিয়াছে। বিভিন্ন উৎসবে
বিচারের মধ্যে পুরাতন সমাজের এই প্রথা ও আদ
খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিবাহের আনন্দোৎসবে ব্রাহ্মণের
ক্ষৌরকারের অমার্জিত গ্রাম্য-ছড়া একত্রে সম্পৃক্ত
পূর্ণাঙ্গ হইতে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিবার বিধি নাই
করিবে, বর-বধূর চারিচক্ষুর মিলন ঘটাইবে, কিন্তু সেই শু
বসন-আচ্ছাদনে দৃষ্টি-বিনিময়টিকে গোপন করিয়া না
সম্পূর্ণ হইবে না। আজিকার বিচারবিবেচনায় এই এ
মাত্র। বিবাহের সত্যগ্রন্থিবন্ধনে দান ও গ্রহণের মন্ত্র বা
আত্মীয়-কুটুম্বের আসরে ক্ষৌরকারের উপস্থিতি নিষ্প্রো
কিন্তু সমাজ যখন চলমান ছিল, সকল মানুষকে সে এ
হইয়াছে, কাহাকেও উপেক্ষা ও বর্জন করিয়া চলে ন
অনুষ্ঠানে নাপিতের হাতে বসনের প্রান্তটুকুমাত্র ধরাইয়া
দাঁড়া করাইয়াছে। সমাজের সর্বোচ্চের সহিত সর্বনিম্ন

য়োজনে একত্রে গাঁথিয়া একখানি মালা বিরচন করিয়াছিল। বিবাহের বে ক্ষৌরকারের উপস্থিতি অহেতুক হইলেও এত প্রয়োজনীয়। এই যে গ্যককে লইয়া প্রত্যেকের জন্য সমাজ, ইহাই ছিল আমাদের ভারতবর্ষ। যের যোগাযোগকে কেবলমাত্র কাজ ও দেনা-পাওনার দায়ে ক্ষুণ্ণ না হইতে আমাদের সমাজব্যবস্থা বিবিধ প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন দ্বারা ধ পেশার মানুষকে মর্যাদার দিক দিয়া বাধ্যবাধকতার সূত্রে আহ্বান য়া একটা সামাজিক সম্পর্কে নিবিড় করিতে চাহিয়াছে।

আজ আমরা এই আদর্শের দিক দিয়া নিজেদের সমাজকে চিনিয়া লইতে ও মত তাহার সংস্কার করিতে চাহিতেছি না। শ্রেণীভেদ প্রকট হওয়ায় পর পরস্পরকে দূরে রাখিতেছি, সমাজের বন্ধন ইহাতে দৃঢ় হইতে রিতেছে না। তাই, শিক্ষায় ও মানবতায় যাহারা উন্নতমনা, তাহাদের চেষ্টা জ এই জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া সকলকে সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া মানুষের মন তে ঘৃণা ও হিংসা দূর করা। করিতেই হইবে, কিন্তু পথ ইহা নহে। তিভেদ তুলিতে হইলে জাতিবৈষম্যকে মানিয়া লইতে হইবে সর্বাগ্রে। কৃতি, পেশা ও উপার্জনের বৈষম্যেই জাতিভেদের সূত্রপাত। 'সচেষ্ট সমাজ লকে সমান হইবার সুযোগ দিতে পারে, কিন্তু সমান সামর্থ্য দিতে পারে না। মর্থ্য মানুষের ব্যক্তিগত; ইহা তাহার শরীর ও বুদ্ধির শক্তি অনুযায়ী তুলনায় ম-বেশি হইয়া থাকে। এই কম-বেশির তারতম্য মানুষকে কখনই সমান তে দিবে না। সুতরাং এক নিয়মে ও এক শাসনে সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রিত রিবার চেষ্টা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হইবে। মানুষে মানুষে ষোল-আনা মিল ুব নহে, এবং জোর করিয়া এ মিল কাম্যও নহে। প্রত্যেকটি মানুষকে াহার নিজের সীমায় ও স্বাধীনতায় বিচরণ করিতে দিতে হইবে। সকল ণীকে তাহার নিজের দিক দিয়া উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার পথ মুক্ত খিতে হইবে। প্রত্যেকের আশা-আদর্শ যদি তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী ফুটিতে ারে তাহা হইলে কেহ কাহাকেও ঈর্ষা করিবে না; শ্রেণীভেদ আজিকার ন্যায় ু আকারে মানুষের সম্পর্ককে কুটিল করিবে না। সমাজে যেমন জাতি হিয়াছে, জাতি তুলিয়া সকলের সহিত উৎসবে এক হইবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে ত্য, তবু আমরা অপরের ছায়া মাড়াইলে অশুচি মনে করিতেছি কেন? শের অভাব-অনটনে সামাজিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ছিল

সংস্কৃতির ধারক। আজ সংস্কৃতি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণকেও সম্মানিত করি প্রয়োজন হইতেছে না। এক কালে সমাজে যাহারা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছে, আজ তাহারই নেশায় তাহারা সম্মান আদায় করিয়া ল চাহে। সম্মানের দৈন্যে সম্মানের জন্য এই উঞ্ছবৃত্তি। তাই ছলে-বলে ধ আশ্রয়ে সকলকে নীচ ও অনধিকারী বুঝাইয়া জীবনধারাকে খণ্ড খণ্ড কা নিজেদের উচ্চ-সম্মান বজায় রাখিতেছে। এ সম্মান রাজ্যহীন রাজার সম্মা ন্যায় হাস্যাস্পদ। সমাজ প্রাণ ফিরিয়া পাইলে, তাহার রসে সংস্কৃতির শা পল্লব যখন নূতন করিয়া মঞ্জরিত হইবে, সেদিন শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সে-যুগের ব্রাহ্মণেরা পুনরায় সমাজের সকলের নিকট হইতে ন্যায্য সম্ফিরিয়া পাইবে। আজ প্রতিষ্ঠার মায়ায় লুব্ধ হইয়া যাহারা অন্ত্যজদের ছ বাঁচাইয়া চলিতেছে, সেদিন তাহারাই নিজেদের আলোকে যাহারা হ তাহাদের ছায়া মুছিয়া লইবে। সংস্কৃতিগত অবনতি জাতিভেদকে তীক্ষ্ণ মারাত্মক করিয়াছে। সংস্কৃতি মানুষকে নিজের এবং অপরের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আপনার অভ্যন্তর হইতে সচেতন ও সশ্রদ্ধ হইবার শিক্ষা দেয়। সে শিক্ষ কেবল জাতিবিচার নহে, বহুবিধ গ্লানি নির্বিচারে উপেক্ষিত হইবে। এ কাল সমাজকে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেকের চিত্ত ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধন করিবা নিমিত্ত সমাজব্যবস্থাকে সংস্কৃতিগত করিতে হইবে। আজ তর্ক-বিতর্ক আদেশ-উপদেশ দ্বারা যে সকল জটিলতার সমাধান হইতেছে না, তাহা আপন আপনি সরল হইয়া যাইবে।

সংস্কৃতির অভাবে সর্বদিক হইতে কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন হইয়া আমাদে সভ্যতা আর্তনাদ করিতেছে। শিক্ষাহীনতার জন্য জীবন সম্বন্ধে সম্যক বো অস্পষ্ট হওয়ায় সংস্কারের অন্ধ প্রশ্রয়ে আমাদের দীনতা ও হীনতা সমাজকে পঙ্ করিতেছে। সমাজে শিক্ষাদান করিতে পারিলে এ অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে,— এই সিদ্ধান্তে তৎপর হইয়া আমরা আজ বিদ্যা প্রচারের জন্য সর্বাগ্রে উৎকণ্ঠিত, কিন্তু জীবনের একটি কোন বিশেষ কোণ হইতে ইহার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নহে। জীবন-ধারণের সকল দিক ও সকল বিষয় হইতে একযোগে সমাজের উপর আলোকসম্পাত করিতে হইবে। দরিদ্র ও অশিক্ষিতের গৃহে সন্তানের দেহে ক্ষত হইলে জননী তেল-পড়া লেপন করিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ব্যাধি ক্রমশ দুরারোগ্য হইয়া উঠিলে অনন্যোপায় মাতা পুত্রের পায়ে

বাঁধিয়া দেবতার শরণ লইয়া নিরুপায়-বিশ্বাসে দিন গুনিতে থাকে। যদি ভাগ্য হয় তাহা দেবতার দয়া, নতুবা জননীর দুর্ভাগ্য। ইহাকেই আমরা কুসংস্কার বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছি, এবং অচিরাৎ এ অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তাগিদ দিতেছি, বলিতেছি,—দেবতার দয়া মিথ্যা, ধর্মবিশ্বাস ভ্রান্ত। আমাদেরই জ্ঞানদান, আমাদেরই উপদেশ মিথ্যা ও ভ্রান্ত হইবে, যদি না এ ক্ষেত্রে ইহার প্রতিকার আমরা চিকিৎসার বিধান করিতে পারি। রাষ্ট্রের ব্যয়ে গ্রামে যদি সর্বসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সুযোগ করিতে পারিতাম, জননীকে দেবতার দয়ায় বিশ্বাস করিতে হইত না, চিকিৎসকের ঔষধে নির্ভর করিয়া তাহার বিচারেই সংস্কারের হাত হইতে রক্ষা পাইত; সন্তানকেও বাঁচাইত, মাকেও বাঁচাইত।

দেখা যাইতেছে, সমাজের প্রতিটি মীমাংসা আর একটি সমস্যার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাই সকল কাজের কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উৎসাহ না পাইলে সংস্কৃতি সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। চারিদিকে যে বিবর্ধণ হয়,ঢাল বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহা এক স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয়। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, শিল্পী-শিক্ষক, উকিল-ডাক্তার, শ্রমিক-চাষী প্রভৃতি সকলের সুযোগিতায় যে সমৃদ্ধি পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সুখৈশ্বর্য বর্ধিত করে, সংস্কৃতি তাহারই আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠিয়া সকল প্রকার শ্রমকে শ্রীমণ্ডিত করে।

সংস্কৃতি মানুষের সত্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ, ও মঙ্গল করিবার ঐকান্তিকতা হইতে উদ্ভূত হইয়া জীবনকে প্রসারিত করিতেছে। যাহারা শিক্ষিত, বিচার-বিবেচনায় যাহারা পরিপুষ্ট, তাহাদের যে সংস্কৃতি তাহা শিক্ষা-সংস্কৃতি; এবং সর্বসাধারণ লোকাচারের মধ্য দিয়া যাহা নির্বিচারে পালন করিতেছে,তাহা ধর্ম-সংস্কৃতি। শিক্ষাচার শিক্ষিতের ধর্ম, লোকাচার সর্বসাধারণের ধর্ম। ধর্ম ই মানুষের ও মনুষ্যত্বের আশ্রয়।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় আজ রাজনীতি ধর্ম সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত ও ভীত, এবং মূক না হইলেও মৌন রহিয়া এত বৃহৎ একটি সমস্যা এড়াইয়া চলিতেছে। বিরোধ এড়াইবার এই নিষ্ক্রিয় চেষ্টা মানুষের বিভিন্ন ধর্ম-বোধকে উৎসাহের অভাবে পরিস্ফুট না হইতে দিয়া ধর্ম-জীবনকে পশ্চাতে রাখিতেছে এবং জনসংস্কৃতির মূল উৎস রুদ্ধ হওয়ায় তাহার স্বতঃস্ফূর্ত ধারা ব্যাহত হইতেছে। ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্র যে আগ্রহশীল হইতে শঙ্কিত, তাহা অহেতুক নহে।

ইতিহাসে পৃথিবীব্যাপী যত রাজনীতির উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, তাহ প্রতিটির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে তৎতৎকালে এক-একটি মাত্র ধর্মমত পা হইতে পারিত, এবং অন্য ধর্ম ও অপরের বিশ্বাস রূঢ় অত্যাচারে নিরুদ্ধ রহি কিন্তু আজিকার রাজনীতি সর্বসাধারণের আধিপত্যে পরিচালিত, কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে; বরং ধর্ম হইতে ইহা সতর্কতার সহিত সযত্নে বিচ্ছি ধর্ম সম্বন্ধে ইহা উদারতা নহে, ইহা উদাসীনতা। বিরোধ মিটাইতে হা প্রতিটি ধর্মমত যাহাতে আপনা-আপনি মার্জিত আকারে ফুটিয়া উঠি পারে, তাহার জন্য রাষ্ট্রগত ভাবে প্রতিটি ধর্মের প্রতি সমান সহানুভূ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। প্রতি ধর্মেরই আদর্শ—উৎকর্ষ। আপন আ পরিপূর্ণতায় ধর্ম পরিণত হইলে, আপন বিশ্বাস ও মতবাদে মানুষ পরি রহিলে, অপরের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করিবে না। আপন-আপন ধ প্রেরণায় নিজের নিজের আদর্শমত আত্মসংস্কৃতির স্পষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইবে ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্র যতই নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিবে, ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞানের অভা মূঢ়-অন্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতা ধর্মবিরোধকে ততই গোপনে লালন করিতে থাকিবে রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সুস্থভাবে গড়িয়া তুলিবার উৎসাহ ও অবকাশ দান করি ধর্মই মানুষকে শাসন ও শোধন করিয়া রাজনীতির আভ্যন্তরীণ জটিলতা লা করিবে। জনসাধারণ রাজনীতি বুঝে না, আপন আপন ধর্মকেই সশ্রদ্ধ প্রতিপালন করে। ধর্মকে পৃথক রাখিয়া যে রাজনীতি তাহা শিক্ষিত সমাজ গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় তুল্য-মর্যাদা না পাইলে রাজনীতি রাজ্যের কাহাকেও আকৃষ্ট করি না। এ মর্যাদা ধর্মের ভিত্তিতে শাসনভার বণ্টন করিয়া সম্ভব নহে; সম্ভ হইবে—শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষা এবং লোকশিক্ষা দ্বারা সকলে স্ব-স্ব ধর্ম-বৈশিষ্ট্যকে নির্মল ও উজ্জ্বলতর করিতে সহায়তা করিয়া, সকলে বিশ্বাস ও আদর্শকে পরিপূরণ করিয়া।

বিজ্ঞান-আলোকে উদ্ভাসিত এই মধ্যাহ্ন-বেলায় ধর্ম তাহার কুহেলিকাজ প্রত্যুষের মহিমা লইয়া আর কি মানুষের কাজে লাগিবে? ধর্মের অপব্যবহ এ যুগে, বিজ্ঞানেরও অতিপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ন্যায় নিরন্তর মানুষে চিত্তকে সন্দেহে ব্যাকুল করিতেছে।

মানুষের ধর্ম মানুষের অনন্ত-জিজ্ঞাসা। কোন উদাহরণ বা কোন নি

। দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা উচিত নহে, সম্ভবও নহে। বিচিত্র জীবনে বিচিত্র
। অনুভব, বিচিত্র ইহার ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনা। সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়া
, শিক্ষিতের জ্ঞান সেইখানে নির্দিষ্ট ও নিঃসংশয়। যুক্তিতর্কের বাহিরে
পরিজ্ঞাত অন্ধকার রহিয়া যায়, তাহার ছায়া তাহাদের স্পর্শ করিতে
র না। জ্ঞান মানুষের ধর্ম।

কিন্তু শুধু জ্ঞান নহে, অজ্ঞানতাও মানুষের ধর্ম। যেখানে অন্ধকার, বিচার-
বচনায় মানুষ যাহার নাগাল পাইতেছে না, সেই সংশয়াকুল রহস্য লইয়া
ানের আরও একটা দিক মানুষ আলোড়িত করিতেছে। জন্ম-মৃত্যু-জন্মান্তর,
লোক-পরকাল প্রভৃতির যথাযথ উত্তর যতদিন না মানুষ খুঁজিয়া পাইবে,
দিন আপন আপন বিশ্বাসমত আচার পালন করিতে থাকিবে এবং ততদিন
র বিশ্বাসকে অপরে কুসংস্কার বলিয়া নিন্দাও করিতে থাকিবে। ইহ-
ন এবং ইহ-জগৎকেই যদি মানুষ আদি-অন্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিত,
য়োলজি যদি মানুষের জন্ম-মৃত্যুর শেষ মীমাংসা হইত, মানুষের ধর্ম এবং
চার এত জটিল হইত না। এই জটিলতা মানুষ ইচ্ছা করিয়া সৃজন করে
ই, তাই চেষ্টা করিলেই সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না। মানুষ
র্ধেক তাহার মস্তিষ্ক, অর্ধেক তাহার হৃদয়; অর্ধেক তাহার Reason,
র্ধেক তাহার Emotion। যুক্তি ও উপযুক্ত নজির লইয়াই মানুষ ক্ষান্ত
হতে পারে না, তাহার চেতনায় শেষকথা বলিয়া কিছু নাই। তাই সত্যের
হিত কল্পনা, বস্তুর সহিত ভাব, ভাবের সহিত আবেগ মিলিয়া মিশিয়া মানুষ
াহার চিন্তাকে সুদূর ও সরস করিয়া লয়, তাহার বক্তব্যকে অনির্বচনীয় করিয়া
র্ণনা করে।

স্থির-নির্দিষ্ট জ্ঞানের বাহিরে মানুষের যে অনির্দেশ অনুসন্ধান চলিতেছে
খানে অনুমান আছে, হয়তো সত্যও আছে, হয়তো মিথ্যাও রহিয়াছে।
বং এই সত্য-মিথ্যা-অনুমান ও অনুভব লইয়াই মানুষের শান্তি ও প্রশান্তি
ড়িয়া উঠিতেছে। কথা হইতে পারে, যে সকল অনিশ্চিত বিশ্বাস প্রমাণের
পেক্ষায় সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইতে পারে না, তাহাকে অবলম্বন করিয়া
য ধর্মাচার, যে লোকাচার গড়িয়া উঠে, মানুষের পক্ষে তাহা মঙ্গলের হইবে কি?
য়তো মঙ্গলের হইবে না, হয়তো ভ্রান্ত বিশ্বাসের শতমুখী শিকড়গুলি মানুষের
চিন্তাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিবে। যে ধর্মস্পৃহা মানুষকে সত্য ও সততার

পথে চালনা করিবে, তাহাই হয়তো তাহাকে পিছনের দিকে টানিতে থাকি তখন Reason-এর সহিত Emotion-এর বিরোধ মানুষকে এক স্থ গতিহীন করিয়া রাখিবে।

আজ এই জটিলতা সমাধানের জন্য আধুনিক সভ্যতা Emotion বর্জন করিয়া চলিতে চাহে। যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের দ্বারা ইহা সম্ভব সে নাই; কিন্তু যাহারা সাধারণ, ইহা তাহাদের অন্তর ও বিশ্বাসের প্রতি অসম্মা জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা মানুষ যে সত্যে উপনীত হয়, তাহাতে তাহার যে বি তাহাই তাহার জীবনের মন্ত্র ও মাধুর্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ জীবনকে জগৎকে বুদ্ধি দিয়া দেখিবার ক্ষমতা পায় না, হৃদয় দিয়া বুঝিবার চেষ্টা ব মাত্র। অজানাকে জানায় তাহার কৌতূহল নাই, তাহার আনন্দ অজানা ভয় করায়, তাহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করায়। একজন জীবনকে ত দিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, আর জন ইহাকে প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে চা সুতরাং যাহা জ্ঞানীর ধর্ম, সাধারণ তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে চাহিবে —একের ধর্ম অপরে কখনই বহন করিবে না। তাই Emotionকে আঘ করিলে সাধারণ মানুষের উন্নতি ও উপকার করিবার সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইবে।

মাত্রাজ্ঞানের অভাবে ভাবপ্রবণতা আমাদের বিভ্রান্ত করিতেছে Emotion হৃদয়ের বিশেষ গুণ, ইহা গ্লানি নহে, সর্ববস্তুর ন্যায় ইহারও আধি গহিত। Reason ও Emotionকে মনুষ্যজীবনে সমগ্ররূপে না দেখি আজ পৃথক ও খণ্ড করিয়া দেখিতেছি কেন? ইহার কারণ রহিয়াছে ধর্মযাজকদের নিপীড়নে মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবতার উদ্দেশে ভ তাহারা চুরি করিয়া লইতেছে। দেবতাকে মাঝখানে রাখিয়া এই প্রতার ধর্মের ঐকান্তিকতাকে পরিহাস করিতেছে। ধর্মের নিঃসারতা সম্ব সন্দিহান হইয়া তাই এক দল মানুষ আজ ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করি চাহে। আর এক দল অন্ত আর এক দিক দিয়া ধর্মের আবশ্যকতাকে অর্থহী প্রতিপন্ন করিতেছে। তাহাদের যে যুক্তি, তাহা এ জগতেরই যুক্তিকে কে করিয়া ধূলি উড়াইতেছে। মানুষের নিত্য প্রয়োজন দিয়া মানুষের সী নির্দিষ্ট করিতে চাহে। যাহা দেখিতেছি বুঝিতেছি, যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার উর্ধ্বে এ দৃষ্টি আর কিছু অন্বেষণ করিতে প্রস্তুত নহে। যাহা নগ বুঝিয়া পাই, কেবল তাহা লইয়াই জীবনের সুখ-সম্পদ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা

। হিসাবের বাহিরে তাহা উহ্য, তাহা লইয়া সমস্যার উদ্ভব করা চিন্তার ব্যবহার মাত্র। কিন্তু এই বাস্তবতা মনুষ্যত্বের উন্মেষমাত্র, ইহা তাহার বিস্তৃত বিকাশ নহে। ফুল ফুটিবার ও ফল ধরিবার জন্য বিস্তারিত শাখা-বর প্রয়োজন, কেবলমাত্র মূল—বৃক্ষের পরিচয় নহে। চিন্তাশক্তি সংকেপ লে মানুষের সভ্যতা অন্নবস্ত্রেই সীমাবদ্ধ রাহবে।

তথাপি এই মতবাদের ছায়া বর্তমান রাজনীতিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কারণ মানুষের উন্নতিকল্পে ইহার যে প্রচেষ্টা তাহা পাথিব দেনা-পাওনাতেই দ্ধ। যে দেশই আজ উন্নতি করিতেছে, তাহা কেবল সুখ-সুবিধা ও খাওয়া-র উন্নতি মাত্র, তাহা মনুষ্যজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নহে। অন্নবস্ত্রের ান সর্বপ্রযত্নে করিতেই হইবে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি কিছুই জ দিবে না? প্রাচুর্যই মানুষের জীবন,—এ প্রচুরতাকে কোন্ দিক দিয়া ল করিয়া তুলিব? উদরপূর্তির পর মানুষের জীবন রোমন্থনে কাটিয়া না, স্বজনে ভরিয়া উঠে। ধরিত্রী হইতে যাহা পাইতেছি এবং যাহা ইতেছি না, তাহারই সন্ধানে মানুষ ঘুরিয়া মরে। অবিশ্রাম খুঁজিয়া ফিরিয়া । আবিষ্কার করে, যাহা উপলব্ধি করে, তাহাই তাহার কলা-বিজ্ঞান এবং াকেও অতিক্রম করিয়া চেতনার সূক্ষ্মতম যে স্তর তাহাই উদ্ঘাটন করিতে হ। এই সূক্ষ্মতম বৃত্তি লইয়া মানুষ তাহার ধর্ম ও অধ্যাত্মবোধ মুকুলিত ধতেছে। ইহা তাহার বুদ্ধির একটি অতিরিক্ত চাহিদা, নতুবা পেট রলেও মানুষের মন ভরিবে না। মনের ভরণ-পোষণের জন্য বিভিন্ন য়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আত্মোৎকর্ষ ও আত্মসংস্কৃতির পথে মানুষ অগ্রসর তে চাহে। এই চলাই তাহার সভ্যতা।

আমাদের স্বদেশ—এই বৃহৎ ভারতবর্ষ আজ মন-মরা। বিবাদ-বিচ্ছেদ ও ংস্কারের বিষ সমাজের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এ বিসম্বাদ কেবল বস্ত্রের জন্য হইলে এত ভয়ঙ্কর হইত না, অন্নবস্ত্রের সূত্র ধরিয়া ইহার নাশ মনুষ্যত্বের সমস্ত দিকগুলি আক্রমণ করিতেছে। যুগে যুগে মানুষের ত মানুষের সম্পর্ক হিংসায় ও স্বার্থে কুটিল আকার যে ধারণ করে নাই ন নহে, কিন্তু সে বিরোধ কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-না-ান একটি বিষয় লইয়া। তাহা আজিকার ন্যায় জীবনের প্রতিটি বিষয় য়া প্রত্যেকটি মানুষের আত্মকলহের নিগ্রহে সংক্রামিত ছিল না।

এ বিরোধ আজ প্রমত্ত Instinct-এর সহিত শিথিল culture-এ অন্তর্দ্বন্দ্ব। সৌন্দর্যচর্চার অভাবে বৃত্তি ও সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য যোজনা ক সম্ভবপর হইতেছে না। তাই একা Instinct তাহার খণ্ড ও অসম্পূর্ণ রূ লইয়া মানুষকে পরিপূর্ণ না হইতে দিয়া সভ্যতাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে প্লাবনের জলধারার ন্যায় সংস্কৃতির শাসন-ভাঙা প্রবৃত্তিরাশি আবর্ত রচ করিতে করিতে আপনার প্রবল আবেগে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া সমা যাহা খুশি করিতেছে। কিন্তু বৃত্তির সহিত সংস্কৃতির সম্পর্ক বিপরীতমু হইবার কথা নহে। যাবতীয় বৃত্তিই মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রেরণার মূল উৎস প্ররোচক; তাই বৃত্তিকে দমন বা নিস্তেজ করিবার ব্যর্থ চেষ্টার সিদ্ধান্ত করিয়া সৌন্দর্যশিক্ষার প্রয়োগে ইহার শাসন ও শোধন দ্বারা মনুষ্যসমাজে সুসংস্কৃত এবং সুরক্ষিত করিতে হইবে। কাম-প্রবৃত্তিকে প্রেমের ব্যবহা দিয়া সৌন্দর্যে ও গভীরতায় ব্যাপ্ত করিয়া লইবার ন্যায়—মানুষের সংস্কৃ অস্ফুট কোরক হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাহার জন্মগত আদি বৃত্তির চর্চা-অর্জিত ক্রমবিকাশ মাত্র। বৃত্তির প্রকোপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে সমাজে এক-চক্ষু স্বার্থ ও লোভ প্রশমিত করিতে হইলে, মানুষের সকল ক্রিয় কলাপের মধ্যে সৌন্দর্যের বীজ নিহিত রাখিতে হইবে। বৃত্তিগুলি সৌন্দর্যে আকারে ফুটিয়া উঠাই সংস্কৃতি,—বৃত্তি ও সংস্কৃতি একই অঙ্গে নিবিড় হইবে।

সৌন্দর্যচর্চার বিলুপ্তি ঘটায় শুভ-অশুভ-মিলিত আমাদের সংসার হই মানুষের মঙ্গল-অংশটুকু চিনিয়া লইতে না পারায় অকল্যাণের সৃষ্টি হই অব্যাহতি পাইতেছি না। জীবনধারণের প্রণালীকে চর্চা দ্বারা অর্জন করি হয়। আজ যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারায় পর্যুদস্ত, তা আমাদেরই উদাসীনতার অভিশাপ। নিজেদের চেষ্টায় ও সতর্কতায় গৃহে অঙ্গন ও বাহির উদ্যানে রূপান্তর না করিয়া যদি চারিপার্শ্বে আবর্জনা স্তূপীকৃ রাখিয়া আস্তাকুড় রচনা করি, স্বহস্তে বেষ্টিত সে দুর্ভোগ নিজেদেরই যন্ত্রণা কারণ হইবে। দার্শনিক-তত্ত্ববাক্য উচ্চারণ করিলেই ভবযন্ত্রণার নিরস হইবে না।

কেবলমাত্র সদুপদেশ দ্বারা সমাজকে পরিচালিত করা সম্ভব নহে সর্বসাধারণের অগ্রসর হইবার পথ বাঁধিয়া দিতে হইবে। সরল পথ খুঁজি পাইলে মানুষ বক্রপন্থায় পা বাড়াইবে কেন? জীবনকে সুসংস্কৃত ও সুন্দ

হতে হইলে সুন্দর আবহাওয়া ও সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজন। মানুষের
গুলি সুকুমার ও শোভন করিবার একটা পদ্ধতি রহিয়াছে, কিন্তু আজ
জে শিল্প নাই, কলাবোধ মৃত, সে কারণ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছে না।
কারণেই আজ কলাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য শিল্পবস্তুকে দৈনন্দিন
নের অঙ্গীভূত করিতে হইবে। ইংরেজ শাসনে আমরা শিল্পের প্রয়োজন
মত হইয়াছি। ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় যেটুকু রা অবশিষ্ট আছে তাহা
র ঐশ্বর্য, সর্বসাধারণের ভোগ করিবার সম্পদ নহে। শিল্পকলা বলিতে
ও আমরা কেবল চিত্র বা ভাস্কর্য বা পৌথিন সামগ্রীই বুঝিয়া থাকি, তাই
। বস্তু হইতে পৃথক করিয়া একটা উচ্চ সম্মানের প্রাসাদে বন্দী করিয়াছি।

শিল্প অকারণে গড়িয়া উঠে না, মানুষের স্থূল সূক্ষ্ম বিভিন্ন প্রয়োজনেই
র সৃষ্টি। কেবলমাত্র সৌন্দর্যবৃত্তি তৃপ্ত করিবার জন্য, মানুষের রসবোধকে
তরলোকে সমুন্নত করিবার জন্য যে শিল্পকলা শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্পর্শে সৃজিত
তাহা শিক্ষায় দীক্ষায় উদ্ভাসিত উন্নততর মানুষের চেতনাকে আনন্দিত
তেছে। এই জাতীয় কলাসৃজনীকে বাক্যের সীমায় বিধিবদ্ধ করা
চীন নহে। যুগে যুগে কচিৎ কোন মহাশিল্পীর আবির্ভাবে কলাবোধের
ন তাৎপর্য মানুষের শিল্প-সভ্যতাকে নূতন যাত্রাপথে সঞ্চালিত করে।

কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য মোটা ভাত-কাপড়ের ন্যায় শিল্পকলারও একটা
টামুটি বিধি-বিধান করিয়া সাধারণ সংস্কৃতিকে উদ্বুদ্ধ রাখিবার একটা
তি পথ নির্ধারণ করিতে হইবে। কলা-মন্তর্গত সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য,
্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্প মানুষের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে রহন ও পালন করিতেছে।
যাদের দেশে সাহিত্যই শুধু আজ পরিচয়োপযোগী কিঞ্চিৎ উন্নত, এবং
ক সংস্কৃতি ভদ্রসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সাহিত্য-রসসিঞ্চিত।
ার ব্যাপকতর অভাবে ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে সহজগ্রাহ্য না হওয়ায়
লের উৎকর্ষবিধানে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাহারা
ক্ষিত নিজেদের ভাল-মন্দ বিচারে তাহারা অক্ষম, যাহারা অর্ধশিক্ষিত
রা নিজেদের ভালটুকুই শুধু বিবেচনা করে, কেবল সুশিক্ষিত যাহারা
রাই মাত্র নিজের ও পরের সকলের মঙ্গল-চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু
ক্ত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট বিদ্যাভ্যাস সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ নহে। ইহাই
লক্ষ করিয়া এককালে ধর্ম ও উৎসবের অবলম্বনে কথকতা, যাত্রা ইত্যাদির

সাহায্যে অভিনয়, নৃত্য, গীত, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পগুলিকে একত্রে সম্বদ্ধ করি এক আধারেই সর্বসাধারণের শিক্ষা, নীতি, রুচি ও রসগ্রাহিতার সার্থক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আজ ধর্মচর্চার অভাবে ধর্মাচারের আনুষঙ্গিক এই সব শিল্পকলা বিস্মৃত ও বিলুপ্ত। পুনরায় ইহাদিগকে ফিরিয়া পাইবার সময় আসন্ন হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে এবং কোন্ আকারে, অনুমানে তাহার নির্দেশ নিরূপণ যুক্তিযুক্ত নহে। ধর্ম সর্বদা গতিশীল। মানুষের জাগতিক পরিবর্তনের সহিত ইহারও বাহ্যিক রূপ বদল অনিবার্য। এক এক যুগে মানুষ এক এক বিশ্বাস ও আদর্শকে বরণ করিয়া লয়। বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা আজ ধীরে ধীরে ধর্মের মহিমায় গড়িয়া উঠিতেছে। সর্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচুর প্রভাব কালক্রমে সরলভাবে বিস্তারলাভ করে, বিজ্ঞানধর্মের ভাবধারা সেদিন সমাজকে পরিচালিত করিবে এবং স্বাভাবিক কারণে শিল্পকলাও এক আদর্শেরই অনুগা ও বাণীবহ থাকিবে। কিন্তু বর্তমান জনসমাজ আজই ইহার জন্য প্রস্তুত হই নাই। তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে সহসা বাতিল না করিয়া বরং তাহাকে অবলম্বনের উপায় হিসাবে লইয়া সাধারণের মধ্যে পুনরায় শিল্পচেতন গতিসঞ্চারে যত্নবান হইতে হইবে। গতিপ্রবাহ প্রাণবন্ত থাকিলে নদী যে তাহার দুই তট আপনার অনুকূল ও প্রতিকূল বুঝিয়া প্রয়োজন অনুযা কোথাও ভাঙিয়া কোথাও বা গড়িয়া অগ্রসরের পথ করিয়া লয়,—সেইম মানব-মনের সৌন্দর্যলিপ্সা সদাজাগ্রত রাখিলে শিল্পসংস্কৃতি তাহার যুগধ অনুযায়ী আপনার সার্থক পথ চিনিয়া লইতে অনায়াসে সক্ষম হইবে। আ সাহিত্য সচল, এবং সমাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাই ধর্মের অনুগামী হইয়াও সামাজিক বিষয়বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া কথাশিল্প আপনার মূল আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ সফল করিবার জন্য আর দূর-অতিক্রান্ত পশ্চাতে পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে না।

আমাদের যাবতীয় লুপ্ত শিল্পের সকলগুলির পুনরায় প্রতিষ্ঠার বিস্তারি আলোচনা এই প্রসঙ্গের বক্তব্য নহে। পট, প্রতিমা এবং যে শিল্প ও কারুক হাতের কাজ বলিয়া বিদিত, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

বস্তুরাজির মধ্যে বসবাস করিয়া ব্যবহারের বাস্তব বস্তুগুলিকে সুন্দর মনোরম করিয়া সৃজন করিতে না পারিলে কিসের ঐশ্বর্যে আমাদের পরিবে সুন্দর হইবে? যাহা সুন্দর নহে, তাহা মনকে আকৃষ্ট করে না, তাহা ও

াজসারা। আমাদের জীবন-পালন আজ এই দায়-সারা, ইহার কোন আকর্ষণ াই। অথচ শিল্পকে এককালে আমরা ফেলা-ছড়া করিয়া ভোগ করিয়াছিলাম। র-দ্বার পোশাক-পরিচ্ছদ তৈজস-পত্র—ব্যবহারের যাবতীয় বস্তুকেই শিল্পমণ্ডিত রিয়া সুন্দর করিয়া লইতাম। ভাঁড়-খুরি প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুতেও সৌন্দর্য ারোপ করিয়া আমাদের সংসারখানি শিল্পসৌরভে উদ্ভাসিত ছিল। প্রাণের শ্বাসবায়ুর ন্যায় ইহা অগোচরে জীবন, ধর্ম ও সেই সঙ্গে সমাজকে উজ্জীবিত াখিয়াছিল। ব্যবহারের সামান্য বস্তুকেও অবজ্ঞা না করিয়া মূল্যহীনকে সোনা রিয়া লইবার যে শিক্ষা, তাহা শ্রম ও সময়ের অপচয় নহে, ইহা মানুষের ৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয়। কিন্তু শিল্প আজ সমস্যা। এমনই ঘটিয়া াকে, বাতাসে অম্লজানের অসঙ্কুলান ঘটিলে তখনই জীব শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে চকিত হয়।

কিন্তু আমাদের সৌন্দর্যস্পৃহা আজ জাতিগতভাবে নিস্তেজ হইয়া পড়িল কন? গৃহদ্বারের দুই পার্শ্ব শিল্পশোভায় ভূষিত না করিয়া নির্বিকার চিত্তে গাময়-পিষ্টক লেপন করিতেছি। জ্বালানি প্রস্তুতের স্থানের কি এমনই ভাব ঘটিয়াছে? সামান্যতর রূপজ্ঞানের প্রতি এ মর্মান্তিক নিস্পৃহা, চিবোধের এ অপঘাত মৃত্যু সম্ভব হইল কোন্ কারণে? আজ ইহা অনুসন্ধান া করিলে নবপ্রেরণায় শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা কার্যকরী হইবে না।

বিদেশী শাসন তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের স্বার্থে আমাদের হজাত শ্রমশিল্পগুলি দমন করিয়াছে। তাহাদের পণ্য সরবরাহে আমাদের প্রয়োজন ঘুচিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাহিরের এই বানের জল আমাদের ঘরের ল—দেশীয় শিল্পকে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছে। কোলাপাহাড়ের নির্দয় হাতুড়ি আমাদের শিল্পকলায় আঘাত হানিয়াছিল; কিন্তু ইংরেজের সদয় ব্যবসা-চাতুর্যের ায় এমন করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া শিল্পকে, তৎসহ সমাজ-সংস্কৃতিকে, বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলি লইয়াই গ্রাম্যশিল্প গড়িয়া উঠে, কিন্তু সে প্রয়োজনের সমস্তটুকুই যদি এক কলকারখানা মিটাইতে ব্যগ্র হয়, গাহা হইলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ হাতের কাজের অভাবে অলস ও পার্জনে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

শিল্পের পট-প্রতিমা গ্রাম্যজীবনে ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু এই হাতের কাজের কারুশিল্প, যাহার দ্বারা ঘর-দ্বার, আসবাবপত্র-বাসন, বসন-ভূষণ জীবনের

নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীর সমস্তগুলিই সৌন্দর্যশোভায় বিকাশ লাভ করিয়া থ সে সমুদায় বস্তুই আজ বিদেশ হইতে আনীত। নির্মাণকৌশলে ই সায়েন্‌টিফিক্, কিন্তু দেশের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানসম্মত আর্টিস্ট নহে। ই কেবল প্রয়োজনই সাধিতেছে, শিল্পসাধন করা তাহাদের উদ্দেশ্যের বাহি এক দিকে পণ্যবিনিময়ে বিদেশীকে অর্থ যোগাইয়া আমরা যেমন নিঃস্ব হই অপর দিকে শিল্প ব্যতিরেকে সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির চর্চা বিনা আমাদের রুচির হীনতা দেখা দিয়াছে।

এই হীন রুচি মানুষের ব্যবহারকে বিকৃত করিতেছে, বসবাসের ঘর শ্রীহীন করিতেছে, ধর্মবোধকে আচারে বিচারে খিন্ন রাখিতেছে; এবং সকল গ্লানি লইয়া সমাজ আজ শতধা। এই গ্লানি মানুষ শুধু নিয়মানুবর্তি কঠোর আইন-শৃঙ্খল দিয়া দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। ত কার্যকলাপকে পরিমিত সীমায় সুসংযত করিতে হইলে বাহিরের আরোপ বিধিনিষেধের উপর একমাত্র নির্ভর না করিয়া অন্তরের দীপ্ত সৌন্দর্য জীবনকে মাধুর্যে বিকশিত হইতে দিবার পূর্ণ অবকাশ দিতে হইবে। শৃং বাঁধিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই রূপ রস রুচির মুক্তলোকে মানুষকে মুক্তি হইবে।

শিল্পকলা তাহার অজস্র রূপে রসে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, কি ব্যসনে ও উৎসবের মাদকতায় সমাপ্ত নহে, তাহার বিকিরিত সৌন্দ সঙ্গীত-অন্তে সুরের স্মৃতির ন্যায় অগোচরে মানব-মনের কন্দরে কন্দরে ও করিয়া প্রতিমুহূর্তেই সেথাকার পুষ্পপর্ণ গোপনে জাগাইয়া তুলিতেছে, মা সর্বকর্মে তাহারই গন্ধ বর্ণ আভাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিজ্ঞানী না হই বিজ্ঞানবস্তুর নিত্য সংসর্গে থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে মানুষের বুদ্ধি বিচারশীলতায় গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে, সেইরূপ নিত্যকর্মে শিল্পের সংস্পর্শে রহিলে মানব-মনে তাহার সূক্ষ্ম প্রভাব কালে কালে মা আচরণকে আপনার অন্তর হইতে মধুর ও আর্টিস্টিক করিয়া তুলিতে সং করিবে।

এই কলাবোধ ফিরাইয়া আনিবার মানসে শিক্ষিত সমাজে শিল্পের বি আবেগসঞ্চার অনুভূত হইতেছে। নগরীর শিক্ষিত শিল্পীরা চিত্র ও ভা বহুলপ্রচারের জন্য আজ উদগ্রীব। এ উৎসাহ ভবিষ্যতে কাজে লা

কেবলমাত্র ছবি আঁকিয়া মূর্তি গড়িয়া সাধারণ মানুষের সমাজে শিল্প-না ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। নিত্যব্যবহার্য বস্তুর সহিত জীবনের অঙ্গাঙ্গী, গ্রাম্যশিল্পে হাতের কাজ বা কারুকলা যোজনা করিয়া একক্ষে-রও প্রয়োজন সাধিতে ও রুচিজ্ঞান জাগাইতে হইবে। শ্রমশিল্পের এই খণ্ড শিল্পসম্ভার বর্ধিত আকারে আপন গতিতেই এককালে গ্রামে চিত্র- ও র-কলায় পরিণত শোভায় প্রস্ফুটিত হইবে। গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যখন-ায় গ্রামের কারিগরেরাই প্রস্তুত করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখিবে, দিনকার প্রয়োজন মিটাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রয়োজন কেবল ই মাত্র দিনযাপনে উদ্বেগমুক্ত মানুষের মনকে অনায়াসে অনুপ্রাণিত ব্। গ্রামের ভার যখন গ্রামই বহন করিবে, শিল্পকলার চর্চা তখন বিক হইবে। নতুবা বলদের স্কন্ধে লাঙলের ন্যায় গ্রামে শিল্পভার চাপাইলেই তর ফসল ফলিবে না।

আমাদের এই শিল্প-সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়া চলিবার কর্তব্য ইংরেজের ছিল তাহারা রাজা নহে, তাহারা ব্যবসায়ী। ধীরে ধীরে গৃহজাত শিল্পীর র সাধিয়া গ্রামে কাজের অভাবে মানুষকে অলসতায় বিবাদ-বিসম্বাদে ন-বিনোদনের প্রচুর অবকাশ দিয়া সমাজকে আবর্জনার পঙ্কে নিমজ্জিত াছিল। একটা জাতিকে নিষ্ক্রিয় ও অবশ করিয়া অবলীলাক্রমে আপনার রাখিতে কৃতকার্য হইয়াছে। দুই শত বৎসরের মৃত্যু-গহ্বর হইতে ফিরিবার জীবনে নবীন শিখায় শিল্পের দীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিবার প্রয়োজন আজ ক। ধর্মানুষ্ঠানের সুস্থ পুনঃপ্রবর্তন দ্বারা নিত্য নিত্য ব্রত ও পূজাপার্বণে জিত করিয়া অথবা নবতর উৎসব সৃজন দ্বারা গৃহললনাদিগকে গার্হস্থ্য-র্মে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। গৃহে গৃহে সৌন্দর্যচর্চায় সংসারখানি যেমন ম্র ও প্রফুল্ল রহিবে, আর এক দিকে দ্বিপ্রহরে অবকাশের অভাবে নিদ্রালস পরচর্চার বিষোদ্গার হইতে সমাজকে জাতিবিচ্ছেদে উৎসাহিত করিতে ব্ না। গ্রামের পুরুষেরাও চাষ-আবাদ সারিয়া হাতের কাজের কাজ পাইলে, অভাব-অনটনের হাত হইতে মুক্ত রহিলে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ কার ন্যায় দুর্বলের সর্বনাশের মন্ত্রণায় বীভৎস হইবে না।

ইরূপে নিয়ত সর্বকর্মের মধ্যে সৌন্দর্যের চর্চা ও তাহার স্পর্শলাভ করিতে ে মানুষের চিন্তায় কোন কিছু অসুন্দর, কোন কিছু কদর্যতা একদা তাহার

ধাতে সহিবে না। তাবৎ শিল্পকলার মধ্য দিয়া রসস্রোতে আত্মোৎকর্ষের দিকে মানুষ যখন আপনা-আপনি অগ্রসর হইবে,—আশা করা যাইতে পারে সেদিন মানব-সভ্যতা সৌন্দর্যের তাল-ভঙ্গের আশঙ্কায় তাহার অন্তরাত্মার শ্রীহীন মনের সকল কদাচার, সকল পাপাচার, শুধু সুন্দর নহে—ইহা বিবেচনা করিয়া সযত্নে পরিহার করিবে। মানুষের সম্পর্ক কেবল রাজশাসনে নির্ধারিত না হইয়া পরস্পরের আচরণ-বিনিময় সেদিন সৌন্দর্যে গভীর ও উদার হইবে। আজিকার ন্যায় সেদিন রাজনীতির প্রদীপশিখা আলোর জ্যোতি অপেক্ষা তাহার ধূমাঙ্কিত কালি ঘনাইয়া তুলিবে না। মানুষের সৌন্দর্য-বোধই সেদিন রাজনীতি সমাজনীতি ও তাহার ধর্মচেতনাকে পরিচালনা করিয়া কুসংস্কারের অবোধ অন্ধকার দূর করিবে, জ্ঞানকে উজ্জ্বলতায় এবং প্রেমকে মাধুর্যে সুন্দর করিবে। বিভিন্ন শিল্পবৃত্তির সুন্দর প্রকাশে সমাজ যেদিন আত্মসচেতন ও আত্মসংস্কৃত হইবে, নিজের এবং অপরের সীমানা ও সীমা সম্বন্ধে অন্তর হইতে উদ্বুদ্ধ হইবে, তখনই মাত্র বর্তমান রাজনীতির বহু বিভাগে সমন্বিত এই সম্মিলিত কর্ম-প্রচেষ্টার মূল-মন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার দূর স্বপ্নখানি নিকটবর্তী হইবে। সেদিন জয় হইবে, সৌন্দর্যের আজ্ঞাবহ মানুষের জয় হইবে। সেই সঙ্গে আমাদের এই ভারতবর্ষেরও জয় হইবে।

* * *

কিন্তু মানুষের আত্মোৎকর্ষ ও সংস্কৃতির যাত্রাপথ অন্নবস্ত্রের সমস্যায় আজ পঙ্গু। গ্রাসাচ্ছাদনের মান এমনই নিম্নস্তরে অবনত হইয়াছে যে, অন্নবস্ত্রের সঙ্কট মানুষকেই গ্রাস করিতেছে। অন্নবস্ত্রের ভিত্তিতে জীবনকে সুদৃঢ় করিতে না পারিলে সংস্কৃতির ললিত সুষমাকে ধারণ করিতে পারা সম্ভব নহে। কুসুম কোমল, কিন্তু তাহার বৃন্তটি কোমল নহে।

খাওয়া-পরার চাহিদা মিটাইতে রাষ্ট্রকে সজাগ হইতে হইবে। এই কার্যে এবং দেশের অন্যবিধ উন্নতিবিধানে, ভারতবর্ষেও আজ বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতা, ও যন্ত্রপাতির সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কেবল মাত্র যন্ত্রের উন্নতিচর্চায় ইউরোপ-আমেরিকায় যে-তৎপরতার সাড়া জাগিয়াছে, তাহাতে মনুষ্যত্বের সম্মান নাই। এই দৃষ্টান্তে সতর্ক রহিয়া আজ ইহার ব্যবহারকে সংযত করিতে না পারিলে যন্ত্রের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যন্ত্র-শিল্পের সহিত শিল্পকলার প্রসার যদি সমতালে অগ্রসর না হয়,

সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হইবে, যান্ত্রিক উন্নতির মদমত্ততায় ভারতবর্ষেও দানবের তাণ্ডব চলিবে। যন্ত্র আমাদের যে সাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বহন করিয়া আনিবে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সীমাজ্ঞান,—সে কারণ কলাবোধের প্রয়োজন। কেবলমাত্র উন্নতি আমাদের সভ্যতার কাম্য নহে, বাহিরের প্রাচুর্যের সহিত অন্তরের যে প্রসারতা তাহাই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি। কলা-বিজ্ঞানে সম্মিলিত যে পরিপূর্ণ জীবন তাহাই আমাদের কামনা। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের দাবিতে বিজ্ঞান নির্দিষ্ট আকারে গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু অন্নচিন্তার ন্যায় শিল্প-কলার দাবি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নহে। তাই কল-কারখানায় হাত লাগাইবার পূর্বে শিল্প-কলার জন্য, বিশেষ করিয়া কুটির-শিল্প বা হাতের কাজগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত অবহিত থাকিতে হইবে, নতুবা যন্ত্রের শব্দে জীবনের সঙ্গীত নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যাইবে।

যন্ত্রের সহায়তায় অন্নবস্ত্রের সহজ সমাধান করিয়া প্রাণ-ধারণকে সুখের এবং একই সঙ্গে শিল্প-কলার সাহায্যে জীবন-পালনকে সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। ইহার জন্য একটা নীতিগত জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। খাওয়া-পরায় ভারতবর্ষ নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, খাওয়া-পরা যেখানে শেষ সেখান হইতেই তাহার আরম্ভ; এ আরম্ভের শেষ নাই। আজ নিরাপত্তার অভাবে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় কল্যকার জন্য আমরা সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করিতেছি। সঞ্চয়ের নেশায় মানুষে মানুষে স্বভাবতই ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়া বঞ্চনায় ও বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভে সমাজকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। সঞ্চয়লিপ্সার কৃত্রিম কৌশল সমাজের অঙ্গ সকলকে অতিরিক্ত বাস্তবতার অযথা আঘাতে পীড়ন করিতেছে। কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষ আজিকার সভ্যতার ন্যায় মানুষকে লোভে ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে নাই। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার আবর্তেই মানুষ যাহাতে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করিয়া না রাখে, তাহারই জন্য ধর্মাচরণ, উৎসব, শিল্পকলা প্রভৃতি মহৎ আদর্শে সকলকে ব্যাপৃত করিয়া প্রয়োজনকে কখনই প্রয়োজন অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় নাই। সঞ্চয় তাহার ধর্মের নিষেধ।

সে নিষেধ, সে আদর্শ আজ জোর করিয়া চাপাইয়া দিলেই কার্যকরী হইবে না। মোটা ভাত-কাপড় যোগাইবার অবস্থা যখন দেশের ছিল, তখন অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলাম না। অন্নবস্ত্রই

আজ আমাদের সর্বস্ব। রাষ্ট্রের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় উৎপাদন পর্যাপ্ত হইবে সকল মানুষ মোটা ভাত-কাপড়ের নির্ভরতা পাইলে সাধারণের মুখের গ্রাস হরণ করিয়া কাহারও ধনী হইবার বাসনা ও উপায় থাকিবে না। সাধারণও অধনিকের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকিবে না। আত্মনির্ভরতায় সক্ষম পুষ্ট হইলে অন্ন লইয়া ধনী-দরিদ্রের এই বিরোধ, এই প্রাথমিক প্রয়োজনের মাত্র লইয়াই মানুষের সর্ববিধ কর্মশক্তির নিঃশেষ অপচয় সহজেই নিবৃত্ত হইবে। অন্নবস্ত্রের পরিমিত প্রয়োজন মিটাইয়া জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা উপনীত হইতে না পারিলে মানুষের সহিত মানুষের সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। সম্পর্কহীন সমাজ লইয়া শিল্প ও সংস্কৃতির সম্ভাবনা স্বপ্ন মাত্র।

শ্রীসুনীল পাল (ভাস্কর)

ব্যবস্থাপত্র

বেদান্তের বালাপোষে ঢেকে রাখো পীড়িত আত্মাকে,
কখন ঝাপটা দেবে ভবসমুদ্রের জলো হাওয়া,
ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। যদি বা সত্যের সূর্য ঢাকে
জীবনের কুয়াশায়, শঙ্করাচার্যের কাছে পাওয়া
মোক্ষম দাওয়াই আছে ; মাঝে মাঝে করিও সেবন।
ধর্মসাক্ষী ক'রে যদি ব্যর্থ ব'লে জানাও নালিশ,
চতুর্গুণ খেসারত—চারিখণ্ডে বেদান্তদর্শন,
উপরন্তু বিনামূল্যে কবিরাজ প্লেটোর মালিশ।

আত্মাকে বাঁচানো চাই, কেন না আত্মার মৃত্যু নাই—
মৃত্যু যার নাই তাকে কোনক্রমে বাঁচাতেই হবে ;
অমৃতের পুত্রকন্যা, স্থির যদি করেছ নাচাই,
আজাহু ঘোমটা দিও—শ্যাম-কুল সব ঠিক রবে।

অনেক অমর আত্মা হেলায় মরেছে যুগে যুগে,
সাবধানে থেকো তুমি, বোকারা মরুক ভুগে ভুগে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নিজের কথা

নতুন জীবন

রক্তপাত ক'রে বিসর্জন ধাতে সইল না। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বোঝেই ছবি আঁকা শুরু ক'রে দিলাম। বাবুজী বেগতিক দেখে হাল ছেড়ে দিলেন। গারদখানা থেকে অব্যাহতি পেয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। স্কুল ছাড়ার পর ঘরোয়া আবেষ্টনী অধিকতর অপ্রীতিকর হয়ে উঠল, ভাল ছেলেদের সঙ্গে আটক পড়লাম। ভাইজী—আমার পিসতুতো ভাই ফণীন্দ্রনাথ বর্মণ—বয় বুঝে সসম্মানে বি. এ. পাস ক'রে ফেললেন। তিনি আমাদের এখানে থেকেই লেখাপড়া করতেন। পাশের বাড়ির ভবানী—ভবানীপ্রসন্ন চাটুজ্জে—ক্লাসের আড্ডার কাণ্ডারী বললে অত্যুক্তি হয় না। বলা নেই কওয়া নেই, কলেজী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণপদকের ব্যবস্থা ক'রে নিলে। আমার অবস্থা কাহিল, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘের মত। উঠতে বসতে গুরুজনার পীড়নে কান ঝালাপালা হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় ভাল ছেলেকে নজরে দেখার কথা নয়, তথাপি ভাইজী ও ভবানীর প্রতি কখনও আমার দ্বেষ-ভাব আসে নি। ভাল ছেলের কর্তব্যে বহু প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকলেও ভবানী পাস করার বেশি ঝক্কি ঘাড়ে নেয় নি। ভাইজীর একটু বাড়াবাড়ি ছিল, নম্রতা সুভাষণ ইত্যাদি অনেক দম্ভভরা গুণ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলেন। সংসার শাসনে এমনই কাবু হয়ে পড়েছিলেন যে, ঠাকুরঘর কাছে তিনি ধর্মান্তিক সংস্কৃত শ্লোক অবলীলাক্রমে আবৃত্তি ক'রে যেতেন। মুখস্থের কর্তব্য কলেজের পর দিন বাড়িয়েই চলেছিলেন, বোঝার প্রয়োজন ছিল না ব'লে। চেহারাটাও ছিল আদর্শ-ঘেঁষা, একেবারে ভদ্রজনোচিত গোলগাল, তার ওপর গৌরবর্ণ—সুদর্শন ব্যক্তি। এতগুলি অস্বস্তিকর গুণ থাকা সত্ত্বেও ভাইজীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল। আমার নিজের ভাইবোন কেউ না থাকায় ভাইজীকেই ভাইয়ের পাওনা দিয়েছিলাম। ভবানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আমার আঁকা ছবি দেখতে ভালবাসত ব'লে। গোড়ার দিকে ভবানীর উৎসাহ শোনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। ছেলেটা নিশ্চিন্ত মনে সকলের মনেই ছবি দেখত এবং ভালই বলত। তখনকার দিনে ওইটুকুতেই ভাল ছেলের ইজ্জৎ খোয়া যেত, ভবানী এ বিষয়ে ছিল একেবারে বেপরোয়া।

নিজের কথায় নামি। কথায় বলে, লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। স্কুল

ছাড়ার পর তুলনার মন্ত্রশক্তি আমাকে নির্ভীক ক'রে তুললে। যার কোন গুণই নেই, তাকে কত আর খারাপ করা যায়। ছবিতে যুবতীদের আসা-যাওয়া চালাতে লাগলাম। পিসীমা কি ভাবে আমার অবৈধ কীর্তি দেখে ফেলে ছিলেন। একেই গোল্লায় গিয়েছি, তার উপর আসল চরিত্রহানির সম্ভাবনা থাকায়, বাবুজীকে ধ'রে বসলেন, এখুনি ছেলের বিয়ে দাও, তা নইলে একটা কেলেঙ্কারি হ'ল ব'লে, যাচ্ছেতাই কাণ্ড, ছেলেটা সোমত্ত মেয়েদের ছুঁয়ে আঁকে।

বিবাহের প্রস্তাব রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। আমার অবস্থা দাঁড়াল ভাগাড়ে গরু পড়ার মত, কন্যাপক্ষীয়েরা আমাকে ছিঁড়ে খাবার যোগাড় করলেন। অনূঢ়া কন্যাদের গুণকীর্তনে বাড়ি তোলপাড় হয়ে উঠল প্রত্যেকেরই ধারণা, তাঁর মেয়ে বিবাহ না করলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার গৃহস্থালী স্থাপনের উপদেশ যে বীমা-কোম্পানির লাভজনক প্রতিশ্রুতি অপেক্ষ অবরদস্ত হতে পারে, আমার জানা ছিল না। বাড়িতে নতুন কেউ এলেই মনে হ'ত, ওই বুঝি আর একজন এল। বিয়ের কথায় ভয় শুরু হয়ে গেল।

কনে বাছার ভার তখনকার দিনে বরের ওপর ছাড়া হ'ত না, আমার ক্ষেত্রে অধম তো দূরের কথা, বাবুজীও কোন কথা বলার অধিকার পান নি। ঠাকুরদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোপনে এদিকটা নজর রাখছিলেন। বংশগৌরবের ফর্দে দেখা গেল, আগন্তুকরা অনেক ধাপ তলায়, অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় যৌতুকের দিকটা কেউ সামলে উঠতে পারেন নি। সকলের আরজি বরখাস্ত হয়ে গেল।

একদিন সুপ্রভাতে শুনলাম, আমার টিকার (পাকা-দেখা) দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। ধনী জমিদার রমানাথ বর্মণের কন্যা, একমাত্র সন্তান, সব দিক দিয়ে উপযুক্ত। ঠাকুরদা যে উকিল মারফৎ কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, তা বাড়ির কেউ জানত না। তুলনার কোন বড় মহাল নিয়ে ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে মকদ্দমা চলছিল, সেই প্রাচীন মামলা তুলে নেবার শর্ত দাঁড়াল আমার বিবাহের যৌতুক হিসাবে।

মামলাকে মধ্যস্থ ক'রে আমার বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের রাত্রে প্রথম যৌবনানুভূতির অভিজ্ঞতা পেলাম। কৌতূহল ও অজ্ঞাত ভয় এমন একটি পুলক সৃষ্টি করতে পারে, অজ্ঞাত ছিল। নারীর সংস্পর্শে মন মাতাল হয়ে উঠল। আধ্যাত্মিক আদর্শজড়িত ঊর্ধ্বগামী

ালবাসার খবর আমার কাছে পৌঁছয় নি, এইটুকু বুঝেছিলাম, নারীদেহের ান্নিধ্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

ঠিক এই সময় নবজাত প্রেমের সহজ গতি বাধা পেল। শ্বশুর মহাশয় জার তত্ত্বে ঘরোয়ানা চাল বজায় রাখতে পারেন নি। সামাজিকতার জটিল ন্ত্রণায় যা ধার্য হ'ল, তা ভিন্ন প্রকারে আমার উপর শাসন। শুনলাম, কুটুম্ব চ স্তরের লোক, ওখানে ছেলে পাঠানো শোভনীয় নয়। বিয়ের পর তখন ংসর ফেরে নি, বউ ঘরে আসার বাধা ছিল, এটাও সামাজিক অনুষ্ঠানের ধান, আমি যেতাম নিজের স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে। এ খবর কেমন ক'রে বার য়ে গিয়েছিল, কোন শুভার্থী জানিয়ে দিলেন। এর পর ওদিক মাড়ানো লে না।

অসুবিধা নানা দিক থেকে বেড়ে ওঠায়, দিনকতক অশোভনীয় কাজ থেকে নজেকে আগলে রেখেছিলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না। মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল য়ে ওঠায় সামাজিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে দিলাম। সকলের মনে দিয়েই নিজের স্ত্রীর কাছে যাব ঠিক ক'রে ফেললাম।

অন্তরের দারুণ আলোড়নের কথা বাবুজীকে জানালাম। তিনি খুশি য়েই উত্তর দিলেন, এর মধ্যে কিন্তু বোঝ করার কিছু তো নেই। আমার াচার-ভ্রষ্ট প্রস্তাব মা শুনেছিলেন। ছেলে পর হয়ে যাবার ভয় আমার বাহের পূর্ব থেকেই ছিল। পিতা-পুত্রের কথোপকথনে তিনি যোগ না দিয়ে ারলেন না। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড কোথাও শুনি নি। বনা নিমন্ত্রণে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি যায়? মায়ের মনের কথা জেনেও নজেকে সংযত করতে পারলাম না। দুর্দান্ত যৌবনচেতনা আমাকে সকল াধা ভাঙবার জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলল।

শ্বশুর মহাশয় সহজলব্ধ জামাই পেয়ে খুশিই হলেন। দিনকতক পরমানন্দে াতায়াত চলল। সুখ যে আমার কপালে সয় না, তা জানতে পারলাম শ্বশুর হাশয়ের স্নেহপূর্ণ ডাকে। পাশে বসিয়ে পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন শুরু ক'রে দিলেন। কখনও তাঁর কাছে স্নেহের ভাষণ শুনি নি, অশুভ ঘটনার আশঙ্কায় দ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। অবিলম্বে বিপদের আবির্ভাব ঘটল।

কুশল-প্রশ্নের মাঝে অকস্মাৎ জমিদারি দেখার প্রস্তাব ক'রে ফেললেন।

আমি তাঁর বক্তব্য বোঝার আগেই তিনি মাস্টার মশায়ের স্থান দখল ক'রে ফেলেছিলেন। ভয়াল স্মৃতি আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। গুরুর কর্তব্যজ্ঞান তখন মারমুখি হয়ে উঠেছে। শিক্ষাদানের এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ আয়োজন কুত্রাপি দেখি নি। গোড়াপত্তন করলেন, সবই তো তোমার হবে, এখন থেকে দেখে শুনে নেওয়া ভাল। তার পরেই কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ শুরু হ'ল। প্রথমেই এল দাঙ্গার কথা। জমিদারি চালাতে হ'লে প্রয়োজন অনুসারে মানুষের মাথা ফাটানো যে মহৎ কর্ম, তা নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা চলতে লাগল। সবই সুচিন্তিত উপদেশ, আমার অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই; অপর দিকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভারময় হয়ে উঠেছে, আমার অজ্ঞতার দাবি পেশ করার সুযোগও পাচ্ছি না। স্নেহের অপূর্ব পরিবেশনে ভিতরটা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। পরিত্রাণের সুযোগ পেলাম কোন মহলের নায়েব এসে পড়ায়। খবর খারাপ, দাঙ্গায় নাকি সত্যই দারোগার মাথা ফেটেছে। সরকার জটিল ধারায় কেস খাড়া করেছেন, তার সঙ্গে বন্ডি-ওয়ারেণ্টের ব্যবস্থা চলেছে।

দীক্ষাদানের পূর্বেই শিষ্যের সামনে যাবতীয় উপদেশ ফেঁসে যাওয়ায় নায়েবের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণার দরকার হয়ে পড়ল। আমি তখনকার মত ছুটি পেলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের নিয়মিত উপদেশ-বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর বাড়ি যাওয়া থামাতে পারলাম না, স্ত্রীকে ভাল লেগে গিয়েছিল। উপদেশ গা-সওয়া হয়ে আসছিল, মাথা নত ক'রে সবই শুনতাম। আমার জ্ঞান সম্বন্ধে যখন তিনি প্রশ্নমালা গাঁথতেন, তখনই তাঁর হৃদয়হীনতায় অস্থির হয়ে উঠতাম, পালাবার অজুহাত খুঁজতাম।

সেদিন প্রশ্ন আরম্ভ হবার পূর্বেই পালাবার সদিচ্ছা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলাম। শ্বশুর মহাশয় ধৈর্য হারালেন। কিছুমাত্র গৌরচন্দ্রিকা না ক'রেই জানিয়ে দিলেন, আমার দ্বারা কোন ভাল কাজই হবার নয়। সিদ্ধান্তের পিছনে নতুন কিছু ছিল না; কিন্তু আমলাদের সামনে অপদার্থ প্রমাণিত হওয়ায় আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। রোকা হ'লেও ইজ্জৎ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ছিলাম। এই ঘটনার পর আমার স্ত্রী সুশীলাকে আমাদের এখানে নিয়ে এলাম।

আমাদের বাড়িতে কত রকমের আত্মীয় আসতেন ও থাকতেন তার গোনাগুনতি ছিল না। তাঁদের সকলকে আমি চিনতামও না। কালীদর্শন,

চড়িয়াখানা দেখা বা মামলা উপলক্ষ্যে সদরে দিন কতক নিখরচায় থেকে যেতে ’লে সেজোর তরফের বাড়ি ছিল অবারিতদ্বার।

এক প্রকারের মানুষ আছে যারা সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন সুবিধা াতের নাগালে পেলেই কাজে লাগিয়ে নেয়। অপরিচিত আত্মীয়দের ভিতর অনেকেই ছিলেন এই দলভুক্ত। ঠাকুরদার কাছে আমাদের ম্লেচ্ছাচারিতার বশদ বিবরণ বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে শুনেছি, যথা—বড় বংশে এ কি কাণ্ড! াবা, মা, ছেলে একসঙ্গে কি ব’লে সাহেবী খানা খায়! একে মুরগীর মাংস, তায় আবার বাবুর্চীর রান্না। এ ছাড়াও আছে, বড়বাবু অর্থাৎ, বাবুজী একটু াধটু কড়া পানি চালান। কোনটিই মিথ্যা নয়;—বাস্তবিকই, আমাদের াত্রের আহার সরবরাহ করত পেলিটি, বাবুজীও পানাসক্ত ছিলেন। এর ধ্যে একটু আধটুও লুকো-ছাপার বালাই ছিল না। এইখানে সাফাই গাওয়া াল, যাঁরা ডবল জাতিচ্যুতির খবর দাদার কাছে জানাতেন, তাঁরাই আমাদের বাসী প্রসাদ লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। ম্লেচ্ছাহারীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক পাকস্থলীর সৎক্রিয়া কখন পিছপাও হতে দেখি ন।

গুণকীর্তনকারীদের ভিতর অনেকে সুশীলার প্রতি সাংঘাতিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। কারণ ছিল, সুশীলাই কারও না কারও কন্যার স্থান খল ক’রে বসেছিলেন। বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার ভার তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এইটুকু খবর রাখতেন, একান্নবর্তী রিবারে নতুন বউ সম্বন্ধে পুরাতন ভৃত্যেরও এ অধিকার থাকে, সুতরাং াদের হিতোপদেশ-দান নিরচ্ছিন্ন দাবির কথা।

উপদেশের পিছনে শাসনের আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। সুশীলা গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝে নিজেকে মেলামেশা থেকে সরিয়ে রাখতে লাগলেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি স্বচ্ছন্দে অবহেলার পাত্রকে কৃপার চক্ষে দেখতে ারতেন। কৃপার মাত্রা বেড়ে ওঠায় নিজেকে নিরালায় বন্দী ক’রে ফেললেন।

অস্বস্তিকর অবস্থায় এসে পড়লাম। নিজে উপায়ক্ষম নই যে, প্যাঁচালো রিবার থেকে আলাদা হয়ে যাব। আমাদের বংশে উপায়ক্ষম হওয়া চলন ছিল না। স্বাবলম্বী হতে হ’লে জমিদারির পেশাই শোভনীয় মনে করা হ’ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ’রে আমাদের নিষ্কর্মা সম্ভ্রান্ত বংশ মাথা খাড়া ক’রে

চলেছে। আমিই প্রথম বংশমর্যাদা খর্ব করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠ কার্যত তখনও অগ্রসর হতে পারি নি, কেবল বাসনার প্রকাশেই পিতৃ মাতৃকুল আসন্ন কলঙ্কের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ইতিপূর্বে খরচের যথেচ্ছাচারিতা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অ সংযমের আদেশ পাঠাল। মামার ওখান থেকে মায়ের নামে যে মাসো আসত, তা ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম ক'রে যেতে লাগল। ঠাকু আমাদের কিছু দিতেন না, একান্নভুক্ত পরিবারে থেকেও আমরা পৃথক ছি ব'লে। আয় নেই, অথচ ব্যয়ের দিক কিছুমাত্র না কমায়, ঋণ জমা হতে লা

ব্যয়শীলতার আভিজাত্যে মামা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাগিদ, অঙ্ক করি, ঊর্ধ্বগামী খেতাবের মোহ। খরচের প্রতিযোগিতায় লাট-বেলাটের তো বেড়ে চলেছিলই, অধিকন্তু স্পোর্টসম্যানের খ্যাতি কায়েমী করার অনেক-কিছু উপরি-ব্যয়ের ভার গ্রহণ করেছিলেন। কুকুর পোষার সা শৌখিনতা তার মধ্যে একটি।

মামা বংশগৌরব দেখে কুকুর বাছাই করতেন, মানুষের জাত উঁচে গে কুকুরের পেডিগ্রির সম্মান এখনও কাটে নি। গ্রীষ্মের সময় হাউওরা দার্জিলিঙে। কুকুরের দৌলতে অনেকে স্বাস্থ্য শুধরে নিত। বড় খরচের সি হস্তভার ছোটখাট কর্তব্য সম্বন্ধে সব সময় খেয়াল রাখতে পারতেন না।

পরিবর্তন

এর জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, কারণ সকলেরই ব্যক্তিগত স্ সার্থক করার অধিকার আছে। রাজ্যহীন মহারাজার স্থান ঊর্ধ্বলোকে, কল্প দেশে। ভেজালহীন আত্মস্তুতির এমন একটি সুবিধা দাম দিয়ে কেনার যে থাকলে যা ঘটে, তা মামার বেলাতেও ঘটল। তাঁর অত্যধিক সচ্ছলত আড়ালে অভাবের উঁকি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ক্রমে আমাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে এল।

যে সময় অনটন আমার অস্তিত্বকে উপহাস করতে আরম্ভ করেছে, সে সময় আমি কন্যার পিতা হলাম; বয়স সবে উনিশ পার হয়েছে। খুকী ম ছয়েকের না হয়ে উঠতেই, আমার স্ত্রী আবার গর্ভবতী হলেন। প্রথম ক জন্মাবার পরেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভেঙেছিল, দ্বিতীয় বার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার প সূতিকাগৃহেই মারা গেলেন। নবজাত শিশু কয়েক দিনের ভিতর মায়ে

সরণ করলে। খুকীকে মা-হারা অবস্থায় বেশি দিন ধ'রে রাখা গেল না।
ধ্র আমি করতে পারি নি, বাবুজীর উপর ভার দিয়েছিলাম। বৎসরে
কের ভিতর এল আমার মায়ের পালা। মায়ের মৃত্যুর পর রইলেন বাবুজী—
রে পরম বন্ধু, আমার শেষ বন্ধন।

ালের স্রোতে শোক স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। এই সুযোগে আদিত্য
ত ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু ক'রে দিলে। চরিত্রকে আদর্শবদ্ধ
ত হ'লে বিবাহ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু অভাবকে পাশে নিয়ে ও কথা
তেও আতঙ্ক আসে। অপর দিকে ভিতরে জলন্ত আগুনের জ্বালা অসহনীয়
উঠল। কোন দিকে পরিত্রাণের পথ নেই, সর্বত্রই সংস্কারের বেড়াজাল,
ই নীতির পাহারা সঙিন খাড়া ক'রে আছে। আমার অবস্থা দাঁড়াল
রাবদ্ধ বুভুক্ষু শার্দূলের মত। খাঁচার বাইরে আহার দেখা। রক্ষকের
ণায় আত্মরক্ষা।

কত সময় আত্মপ্রশ্নে যুক্তির আশ্রয় খুঁজেছি, মাংসাশীকে নিরামিষভোজী
য়-কো'ন্ বৃহৎ আদর্শ সার্থক হয়ে থাকে? উত্তর পাই, প্রয়োজন অনুসারে
জের শৃঙ্খলা। ভাবতে থাকি, শাসন দ্বারা বাঘকে ভেড়া বানানোর মত বড়ই
ত্য থাকুক, তা প্রকৃতিদত্ত ধর্মকে অস্বীকার, ব্যক্তিগত শক্তিক্ষয়ের
শল। কেউ বলে, সমষ্টির শক্তির জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা
ছে। শক্তিশালী ভোগীর সমর্থন পাই, ত্যাগের উদ্দেশ্য বৃহত্তর স্বার্থকে
ঠর পথে নিয়ে চলা; কিন্তু চলার পিছনে শক্তি না থাকলে পথ অফুরন্ত হয়ে
ঠ এবং দুর্বল কোন প্রকারে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেও যেটুকু লাভ হয় তা মুমূর্ষুর
াসের কথা। যা দেবার জন্য পথ চলা, তার ভার বহনের অক্ষমতায়
নের দ্রব্য মাঝপথে প'ড়ে থাকাও বিচিত্র নয়। এমত অবস্থায় যা পাওয়া
ল, তাকে সুস্থ অস্তিত্বের অবলম্বন করা চলে না। সুতরাং সমাজের হিতার্থে
লার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিবিশেষের শক্তিকে না মেনে উপায় নেই। এক
ক্তির বিকাশে যে আর এক শক্তির জন্ম হতে পারে—এ কথা নির্বিচারে
ীকার করায় জটিল উদ্দেশ্য গ'ড়ে ওঠে, বৃহৎ আদর্শ খর্ব হয়।

ইঞ্জিনের বাষ্পাধারে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, তার সার্থকতা গতিতে।
তিকে থামিয়ে বাষ্পাধার পূর্ণ করা শুধু অর্থহীন নয়, বিপদজনকও বটে।
রণ সীমাবদ্ধ আধারে শক্তির মাত্রাধিক্যে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী এবং বিস্ফোরণ

যদি ঘটে তো শক্তির বিকাশ অবাধনীয় পথও খুঁজে নিতে পারে। ও আধার ছাড়া ভরাল গতিকে বাধা দেবে কে?

এইরূপ অনুকূল প্রতিকূল মতের সংঘর্ষণে যে আগুন জ্বলে উঠল, ও তাত সহ্য করা গেল না। তিলে তিলে দগ্ধে মরা অপেক্ষা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সব কুণ্ঠাকে ভস্মসাৎ ক'রে ফেলার জন্য।

আত্ম সংযমের অপারগতায় কত সময় অনুশোচনা এসেছে, পুনরায় আত্মতাড়নায় প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছি, অন্তরের ক্ষিপ্ত দানবদের শান্ত ক'রে পারি নি।

নূতন জীবন

এই ভাবে আমার বাঁচার ধারা দিনের পর দিন পরিবর্তিত হয়ে যেতে লাগল। প্রবাহের টানে গা ঢেলে দিলাম। ভেসে চলেছি, কূলের ঠিকানা নেই, বাঁচারও উদ্দেশ্য নেই। সমাজেরও আমাকে প্রয়োজন ছিল না, আমার চারিত্রিক দৃষ্টান্ত তখন মানুষের কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে।

এই সময় যে দরদীকে কাছে পেলাম, তা ছবির ঝাপসা রূপ। খোঁজা বন্ধুকে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতাম। কখনও-সখনও নাগালের কাছে পেয়ে গেলে ছবিকে সাজিয়ে দেখার ইচ্ছা আসত, ক্রেমে চড়াতাম।

এই কারণে সেদিন রগ মার্কেটে যাবার দরকার হয়েছিল। ট্রামে তেমন ভিড় ছিল না, সামনেই দেখলাম জপমালা হাতে প্রাচীন কালের মানুষ, চটা ফাটা পুরানো পাথরের মত মুখ। কড়া ও রিহি রেখা চার ধার থেকে মুখাবয়ব বেড় দিয়েছে। মুখের উপর এক ঝলকা আলো নানা রঙের ঢেউ তুলেছে ছবি আঁকার লোভ চেপে গেল। খসড়া করার সরঞ্জাম কাছেই ছিল কাজে লেগে গেলাম। চলতি গাড়িতে পুরোপুরি সাদৃশ্য আনতে না পারলেও কাজটা সঙ্কোচহীন হয়ে উঠল।

ছবি আঁকার সময় পাশের সাহেব যাত্রী কুতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কাজ শেষ হবার আগেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনতে লাগলাম। ভাবলাম, যদি প্রতিলিপি কাগজে ধরলাম, তিনি নিশ্চয় ছবিটা দেখতে চাইবেন। ঘটল বিপরীত। নিশ্চয় আমার শৌখিনতার অত্যাচারে তাঁর ভদ্রতা হিসাব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক দুই হাতে ভগবানের নাম চেপে ধ'রে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। আমারও গন্তব্য স্থান নিকটে এসে

য়ছিল। পাত্তাড়ি গুটিয়ে নামবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, পাশের সাহেব থাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিটা বেচবে? উপস্থিত পঁচিশ টাকার বেশি ত পারছি না, বাড়িতে এলে বাকিটা পুষিয়ে দেব।

সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছ থেকে এইরূপ প্রস্তাব উপহাস ব'লে মনে হ'ল। ান্ত একটা পেনসিলের খসড়া, কয়েক মিনিটে আঁকা, তারই দাম পঁচিশ কার অধিক হতে পারে কল্পনাও করতে পারি নি। ভাবলাম, সাহেবের দয়া। াদজনক কেন্দ্রে পৌঁছবার আগে নেমে পড়াই সুবুদ্ধির কাজ হবে। নিজের ত বিশ্বাস ছিল না, হঠাৎ সাহেবের কৃপা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চেয়ে বসা আমার ক্ষ কিছুমাত্র বিচিত্র নয়; এবং প্রশ্ন শুরু হ'লে তার পরিণাম কোথায় গিয়ে ঠাবে তারও স্থিরতা নেই, কারণ ছদ্মবেশী করুণা আমার কাছে বীভৎস।

চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা না থাকলেও সদ্য আঁকা ছবির উপর শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ ল্পীর কাছে মর্মান্তিক। মাতা যতই দীন হোক, সন্তান যতই কুৎসিত হোক, ানের প্রতি মাতার স্নেহ প্রকৃতিদত্ত। দোষগুণ বিচারে স্নেহের প্রকাশ ব-বেশি হয় না। সাহেবের আচরণ অসহ্য লাগছিল, উঠে দাঁড়ালাম নেমে পড়ার ন্যে। সাহেবও দেখি আমার সঙ্গে উঠলেন, সমীহ ক'রে জানালেন, ছবিটা ামার বড় ভাল লেগেছে, এখন এই নাও, বাড়িতে এলেই উপযুক্ত দাম দিয়ে ব। তাঁর আন্তরিকতায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম; এরই ভিতর নোটগুলো ামার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে। বিহ্বল অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতেই ত পেতে দিয়েছিলাম। নোটের সঙ্গে একটি কঠিন কাগজের স্পর্শানুভূতি পাচ্ছিলাম। চিত্তচাঞ্চল্যে তখন অন্তর ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, সাহেবের ধন গ্রহণ ক'রে চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

গাড়ি বেগে ছুটছিল, মুহূর্তে আমাদের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেল। একটু ধতস্থ হতেই দেখি, ছবিটা আমার বগলদাবায় র'য়ে গিয়েছে। হাতের ালুতে নোটগুলো কণ্টকপূর্ণ হয়ে উঠল, অবশেষে ভিক্ষাজীবী হয়ে গেলাম। নোটের সঙ্গে একটি ভিজিটিং কার্ড এসে গিয়েছিল; নাম পড়লাম—আরজেন-াইন, য়্যালি ব্রাদার্সের বড় সাহেব। বাড়ির ঠিকানা অ্যালেকজান্দ্রা কোর্ট, চৌরঙ্গী।

অন্তঃশুদ্ধির একমাত্র উপায়, টাকাটা এখুনি ফেরত দেওয়া। পথ চলতে লতে ছবি-বাঁধানো দোকানের কাছে এসে পড়েছিলাম। দোকানে ঢুকেই

বললাম, বড্ড ছোঁড়া, কি ক'রে বাঁধাতে হবে কাল এসে বুঝিয়ে দেব। ছবি রইল।

দোকানের স্বত্বাধিকারী পথ আগলে জানালেন, কথা আছে, কাজের কথা আর এক ঘ্যাসাদ, আমার সঙ্গে আবার কি কথা থাকতে পারে? ভদ্রলোক দেখলাম, তোয়াজের দিকে গড়াচ্ছেন, মজা লাগছিল। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তাঁর উপর নিক্ষেপ করতে তিনি বললেন, তোমরা শিল্পী লোক, হাওয়ায় ঘোরা অভ্যাস একটু ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় থাকলে মাটিকে চেনারও সুবিধা পেতে। ছবি সম্বন্ধে আকাশ মাটি ভাবুকতা ইত্যাদি কিছুই বুঝতাম না, এইটুকু জানতাম ছবি আঁকতে ভাল লাগে, রঙের প্রতি ঘোরতর আকর্ষণ ছিল, যেখানে যা মানানসই মনে হ'ত, লাগিয়ে দিতাম।

কাজের কথার যেরূপ গাম্ভীর্যসহ শুরু হ'ল, তাতে ভয়ের কারণ ছিল, পাছে ভদ্রলোক কোন প্রফেসর অব আর্টের অনুকরণ ক'রে বসেন। ভীতির কারণ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। আর্ট সম্বন্ধে পণ্ডিত লোক বেশি কেতাব পড়লেই, ছবির উদ্দেশ্য, শিল্পীর কর্তব্য, রসচর্চায় ধর্মের স্থান, তদুপরি আধ্যাত্মিক সোপান ইত্যাদি অনেক কিছু মন্ত্রপাঠের মত ব'লে যান, যার অর্থকরণ আমার মত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে মাথা নত না করলেও ক্ষতি নেই, স্পষ্ট ভাষায় শুনতে হয়—ঐখানেই তো গলদ, তোমরা এখনও রসিকে ধাপে ওঠ নি। আসলে তোমরা কারিগর, শিল্পী, মহৎ জীব, তাদের চিনিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ। সোজা কথায় যদি বলেন, তোমাকে চিনি না, তা হ'লে জ্ঞানীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাথার টনক ন'ড়ে যায় না কপালগুণে এ যাত্রা বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। ভদ্রলোক কাজের কথা নামলেন; বিলাতী একরঙা ছাপা ছবি বহু রঙ দিয়ে খ'ড়া করতে হবে বাজারে এর চাহিদা আছে। ছবি পিছু তিন টাকা পর্যন্ত দিতে তাঁর আপত্তি নেই।

ছেলেবেলায় পাঠ্য-পুস্তকের ষ্টীল প্রিণ্ট একরঙা ছবি শুকিয়ে রঙ করতাম, কাজটা মনে হ'ল আমার ক্ষমতার বাইরে নয়। সাহস সংগ্রহ ক'রে তখনই রাজি হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় বেশ কিছুদিনের। তথাপি আমাকে বিশ্বাস করার সাহস তাঁর ছিল না। দোকানের পুরাতন লোকের হাতে মাল

গটি ছবি দিয়ে বললেন, ছবিওলা বাবুর বাড়ি দেখে আসিস। এখন কপট কাজের কথায় প্রথমটা বিগড়ে যাবার অবস্থা এসে গিয়েছিল। পরে বে দেখলাম, ভদ্রলোক আসল কাজের মানুষ। বহু অভিজ্ঞতা লাভের ব সাবধানতা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ওইটুকু আয়ত্ত করতে পারলে নেক লোকসান থেকে বেঁচে যেতাম, চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মার যথেষ্ট অমার্জিত অভ্যাস বাধ সেধে বসত। অবিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ কলেও মানুষকে নিজের দুর্বলতা জানাতে পারতাম না। আমিও অনেক ক্ষেত্রে ভদ্রাচারের আতিজাত্য দেখিয়ে ফেলতাম। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ক না ভাববার বিষয় হ'লেও লিখলাম, কারণ সত্যই এরূপ ঘটনা আমার ীবনে অনেকবার ঘটেছে।

সেদিন আর সাহেবের বাড়ি যাওয়া হ'ল না।

পরের দিন সকালেই সাহেবের ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। খাসলায় বহ্যতিক ঘণ্টার বোতাম টিপতেই সুসজ্জিত বেয়ারা বেরিয়ে এল। ঘরে কলাম। অপূর্ব সরঞ্জাম, আবেষ্টনীতে মনোরম নতুনের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। য়ালে দেয়ালে ছবি—একটিও ছাপা নয়, সব হাতে আঁকা, আসবাবপত্র বশিষ্ট্যপূর্ণ, সবই সুন্দরকে আঁকড়ে ধরেছে। বাহুল্যবর্জিত এমন ছিমছাম াবেষ্টনীর সংস্পর্শে ইতিপূর্বে কখনও আসি নি। মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ঠল।

সাহেব স্নান করছিলেন। ইতিমধ্যে ছবিগুলো দেখে নেবার লোভ স্বরণ করিতে পারলাম না। ছু পা দেয়ালের কাছে এগুতেই দেখি, অনেক দেশী চালের ছবি, আর পাশে বিলাতী ছবিও আছে। ভদ্রলোকের প্রতি ্রা এসে গেল। সস্তার মাল তিনি ঘরে রাখেন না।

কিছুক্ষণ বাদে সাহেব এলেন। ভদ্রাচারের পালা শেষ ক'রে জানালাম, টাকা ফেরত দিতে এসেছি। সাহেব অবাক্, জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিটা বেচবে না? উত্তর দিলাম, ছবির দাম কি ভাবে দাঁড়ায় আমার জানা নেই, তবে ছবিটি তোমার ভাল লেগে থাকলে নিতে পার। তোমার ভাল লাগাকেই বড় দাম মনে ক'রে নেব। সাহেব আমার কথা শুনে এমনই খুশি হলেন যে, আগের দেওয়া মূল্য তো ফেরত নিলেনই, অধিকন্তু তিন শুন নোটের তাড়া শুনে আমার হাতে তুলে দিলেন। ভ্যাবাচাকার ঘটনা ঘ'টে গেল। খসড়া সাহেবের

হাতে তুলে দিলাম। ভদ্রলোক যেন হারানো রত্ন উদ্ধার করলেন। ছবিটি টেরিলের উপর রেখে, ফিরে এলেন আমার কাছে। আমি তখন কর্তব্যবিমূঢ়ের মত হয়ে গিয়েছি। সাহেবের দরদে আনন্দাশ্রু গিয়েছিল। বেশি কথা বলার শক্তি ছিল না। সাহেবের কাছে বিদায় চাইলাম। সাহেব আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, It is privilege to possess one Chowdhury। জীবনে উপায়ক্ষম সোপান তৈরি করলেন গ্রীস দেশের মানুষ আরজেনটাইন সাহেব।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই স্বোপার্জিত নোটগুলি গুনতে আরম্ভ ক'রে দি সাহেবের হিসাবে সন্দেহভঞ্জনের প্রয়াস ছিল না। সোনার আনন্দে ম হবার ব্যবস্থা করছিলাম। জাগ্রত স্বপ্নের মৌজে ভুলে যাচ্ছিলাম। ক যে সোনার পুনরাবর্তন হ'ল বলতে পারি না।

ট্রিস প্রিন্টের রঙিন কারবার পরের দিন থেকে চালালাম। ম দেশের কাজ অল্প দিনের ভিতরেই শিখে ফেললাম। ব্যবসার মাথা খুলে এক দোকানের কাজ দেখিয়ে ভিন্ন দোকানের কাজ সংগ্রহ করতে লাগলাম

অল্প দিনেই কারবার ক্যাপানের স্তরে উঠে গেল। এখন আর ছবি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করার প্রয়োজন হয় না। দোকানদারা ঘরে কাজ দিতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে মাটির কারবার এমন কেঁপে যে, নিজের ছবি আঁকার আর সময় পাই না; বাধ্যতামূলক কোন কাজই আ খাতে সইত না। দোকানদারেরা যখন জলদি কাজ আমার বাড়িতেই পা বসিয়ে করিয়ে নিতে আরম্ভ করলে, তখন অর্থোপার্জনের উপর বীতরাগ গেল। নিজের পরিকল্পনাকে রঙ ও রেখার রূপ দেবার জন্যে অস্থির উঠলাম। নিজের কথা বলার জন্যে সময় খুঁজে নিলাম। কড়া সিদ্ধান্ত স নিয়ে পিছনে দাঁড়াল, ঠিক ক'রে ফেললাম, এই ভাবে পয়সা উপায় চলবে না।

কল্পনার রূপকে ছবিতে ধরবার জন্যে যে উন্মাদনা অর্থের লোভ পরিত করাল, তার প্রকাশ দেখলাম সাধনাসাপেক্ষ। সাধনারও নির্দিষ্ট পথ আ আর হদিশ পুঞ্জ-প্রদর্শক ব্যতীত পাবার উপায় নেই। গুরুর সন্ধানে খাবিত হ'ল। কেবল একমাত্র চিন্তা আমার পিছু নিয়ে রইল, কে আমাকে দেখিয়ে দেবে?

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌ

ভগবান যদি এখানে আসেন

ভগবান যদি এখানে আসেন—এখানে তাঁর
শঙ্খে চক্রে গদা ও পদ্মে চমৎকার
পীত-অম্বর জলদবরণ মোহনকায়
প্রকাশ পায়;
ভেবে দেখ তবে সে কি অদ্ভুত বেখাপ্পা,
সে কি বেমানান্ বিশ্রী যে হবে অবস্থা—
আজগবি কথা বলছি না আমি বলছি না।
ভেবে দেখ শুধু তারপরে ক'রো হেলনা।
এই রাস্তাতে এইখানে এই রাস্তাতেই—
গোবরে কাদায় ছড়ানো রয়েছে একাকার,
তার ওপর দিয়ে ধুয়ে ব'য়ে চলে বৃষ্টিধার।
চলতে গেলেই পায়ে ঝামা বেঁধে ঢিল ফোটে,
ন্যাংটো ছেলেরা তারই ওপরেতে খুব লোটে।
কাঠি দিয়ে দিয়ে নোংরা খোঁচায় নর্দমায়
পিঠের ওপর চটাস চটাস চাপড় খায়
মা রেগে গেলেই—কারণ থাক্ আর নাই বা থাক্
চোখ বুজে ভাবে, যাক, সময়টা কেটেই যাক
মুখ ব'সে গেছে, সর্দি ঝরছে নাক দিয়ে,
চামড়া উঠেছে পাঁজরে পাঁজরে পাক দিয়ে,
সকলেই জানে, তারও জানা আছে সে জঞ্জাল।
এইখানে যদি হঠাৎ আসেন বালগোপাল,
বলব না কিছু, ভেবে দেখ শুধু একটিবার
উদ্ভব হবে সে কি অদ্ভুত অবস্থার!

ভগবান যদি এখানে আসেন—এইখানে।
নোনা-ধরা ইট ফাঁক ফাঁক খোলা পলকা কাঠ
আব্রু বাঁচানো বাঁখারির বেড়া ঘেরা খোপর,
হাড় নিয়ে কাক ঝগড়া করছে তারই ওপর,

ভগবান যদি এখানে আসেন

ঝুলি ভরা শিকে ভূষোমাখা কোন্ কুলুঙ্গির
ঝুলে গেছে দড়ি তার ব'য়ে ধুতি ও জুজির
দেয়ালের গায়ে সে কোন্ খেয়ালী চিত্রকর
ধুয়ে ধুয়ে চুন খসিয়ে বালির পলেস্তর,
এঁকে গেছে ছবি—ভিখারী শিশুর কল্পনার···।
অসহ্য স্বরে এবং নোংরা ভঙ্গিমায়
তরুণী মেয়েরা ঝগড়া ক'রেই দিন কাটায়,
অল্পবয়সী ছেলেরা কাশছে খকর-খক্,
বুড়োরা কেবল ধমকের পর দেয় ধমক,
ভিজে মাটিতেই গড়াগড়ি লোক দেয় যবে,
গুরু-অগুরুর মৃদু সুমধুর সৌরভে।

ভগবান যদি এখানে হঠাৎ প্রকাশ পান,
মনে হবে না কি, এ কি অদ্ভুত কি বেয়ানান!
এই রাস্তাতে এইখানে ফুটপাথের 'পর
পাগলা বুড়িটা বলছে বেসের জোর খবর,
ভূত-ভবিষ্যৎ বলে আধকানা গণৎকার,
জুতোর দোকানে রেডিয়ো চালায় কি চীৎকার,
মোড়েতে ভিক্ষে ক'রে বিধবার দিন কাটে,
বিকারবিহীন ব'সে ব'সে লোক ঘাড় ছাঁটে,
ছোকরা পানওলা নারকেল-দড়ি জ্বালাতে যায়;
কিছুতে জ্বলে না, শেষে জ্বলে গিয়ে যন্ত্রণায়
ঘন বর্ষার কালো মেঘ তাকে গাল পাড়ে,
ফেরিওলাগুলো থেকে থেকে ঝাঁকা নেয় ঘাড়ে।
ওই রে পাহারা ওই এল বুঝি ওই তাড়ে
এতটুকু ঘুঁটি খুঁজে মরে, খোঁজে অন্ধকার···
ভগবান যদি এখানে আসেন—হঠাৎ তাঁর
কি যে হতে পারে আমি শুধু তাই ভাবি
নিঃসংশয়ে ভেঙে যাবে তাঁর অহংকার

ভ'রে যায় মন শিল্পীসুলভ যন্ত্রণায়।
লজ্জা লজ্জা—স্বীয় সৃষ্টির ব্যর্থতায়
জ্যোতিষ্কহারা তমিস্র লোকে অতঃপর
মগ্ন হবেন নবপ্রকাশের তপস্যায়।

অসিতকুমার

ডানা

(৪৯৩ পৃষ্ঠার পর)

লো ঝাড়তে লাগলেন। প্রচুর ধুলো জমেছিল। কবি একদৃষ্টে চেয়ে লেন তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভ'রে উঠল সহসা। বারো বছর বসের যে কিশোরীটিকে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন তিনি বহুকাল পূর্বে, তাঁকে ন তিনি দেখতে পেলেন হঠাৎ। সেই থেকে ক্রমাগত সেবা ক'রে চলেছেন। ছুতেই থামবেন না। মন্দাকিনীর মত স্ত্রী না পেলে কি তাঁর মত মধ্যবিত্ত াকের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হ'ত? সংসারের কোন আঁচটি তাঁর য়ে লাগতে দেন নি। তখনই কিন্তু মনে হ'ল, তা দেন নি বটে, কিন্তু ন্দাকিনী তাঁর জীবনে ঠিক সেই প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছেন কি, যার ন্যে তাঁর কবি-চিত্ত সতত উন্মুখ হয়ে আছে? এমন একটি মহিমময় মুহূর্ত ন্দাকিনী তাঁর জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন কি, যার জন্যে সমস্ত সুখ-বিধা তুচ্ছ ক'রে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও লোকে ইতস্তত করে না? তিনি বি, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ তিনি, তাঁর সমিধ-সম্ভারে একটি স্ফুলিঙ্গও দিতে পেরেছেন ন্দাকিনী কোনও দিন? সে আগুনের জন্যে বারে বারে তাঁকে অপরের ারস্থ হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। ডানার মুখখানা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত একটা বহ্নি আছে মেয়েটির মধ্যে, যার সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত মন প্রদীপ্ত হয়ে ঠে। না, ঠিক যৌন-লালসা নয় এটা—বৈজ্ঞানিকেরা যা-ই বলুন, আকর্ষণ ত্রেই যৌন-আকর্ষণ নয়। লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটা কি যৌন? এক-একটা বিশেষ লোককে দেখলেই মনে হয়, এই তো সে, যাকে খুঁজছিলাম তদিন, তা সে নারী পুরুষ যেই হোক। তার কাছে গেলেই মনে ছবি াগতে থাকে উদার আকাশের, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, তুষারোহ পর্বতের, ামাহীন সমুদ্রের। অপূর্ব পুলকে সমস্ত চিত্ত ভ'রে ওঠে, অদ্ভুত উৎসাহ

সঞ্চারিত হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কোনও কিছু অসম্ভব ব'লে মনে হয় না, মনে হয় পারব, মন ডানা মেলে উড়তে চায়। মন্দাকিনী ঠিক এ জাতের মন্দাকিনী বিচক্ষণ সচিব, অভিজ্ঞ গৃহিণী। কিন্তু প্রিয়সখী নন, ললিতা বিধির কোনও ধার ধারেন না তিনি।

আশ্চর্য, ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মন্দাকিনীও ঠিক এই কথাই ভাবছিলে নিজের চরিত্রে বা আচরণে যদিও কোন দোষ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, ব কবি-প্রতিভা সম্বন্ধেও হঠাৎ তিনি যে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাও নয়, কেমন যেন আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এ লোকটির ঠিক সঙ্গিনী তিনি পারেন নি। মনে হওয়ামাত্রই রাগ হ'ল তাঁর, নিজের উপর নয়—কবির উ বুড়ো বয়সে ওই সব ছেলেমানুষি মানায় নাকি! সঙ্গে ক'রে তীর্থে যেতে চাও রাজি আছি, পাখি দেখে বেড়াবার বয়স আছে কি আর এখ ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন একবার। কবি জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন দে দূরবীন লাগিয়ে। আশ্চর্য মানুষ! হেঁট হয়ে শেল্‌ফের তলার ধুলোও পরিষ্কার ক'রে নিলেন। একটা কাগজে সেগুলো নিপুণভাবে তুলে বা ফেলে দিলেন। আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। তখনও দাঁড়িয়ে আ কবি নিস্পন্দ হয়ে, চোখে দূরবীন।

কি দেখছ অত তুমি?

কবি চমকিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, একটা ফিঙে। দি দেখেছ ভাল ক'রে কখনও? ওয়াণ্ডারফুল!

টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর কি চমৎকার ব'সে আছে তখন থেকে! কুচ কালো, গা থেকে রোদ পিছলে পড়ছে যেন। সূর্য যেন শত ধারায় সে ঢালছে ওর গায়ে আর ও যেন ঘাড় বেঁকিয়ে বলছে, চাই না তো সোনা, নিয়ে যাও, নিছক কালোই ভাল আমার, অলঙ্কার দরকার নে থ্যাঙ্কস!

হেসে ফেললেন মন্দাকিনী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তরও যেন বিগলি হয়ে পড়ল যেন। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোক নিতান্ত ছেলেমা এখনও। ছি ছি, এ রকম লোককে নিয়ে কি সংসার করা চলে?

দেখবে?

ওসব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই আমার এখন।

মুখে যদিও এ কথা বললেন, কিন্তু মনে মনে দেখবার লোভ যে একটু ছিল তা নয়।

একটুখানি দেখ না।

খুব অনিচ্ছাসহকারে যেন কবিকে বাধিত করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন কিনী। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখলেন ফিঙেটাকে। বাঃ, বেশ চমৎকার াচ্ছে তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ছুটলেন ঘরের ক—ওই যাঃ, ডালটা পুড়ল বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে, কি যে ছেলেমানুষি কর য়! পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন। কবি দেখতে লাগলেন ফিঙেটাকে বার। একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কাল ভোরে অদ্ভুত রকম মিষ্টি সুরে টা পাখি ডাকছিল। উঠে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন, অভিনব কোন পাখি , ফিঙে। পাশে সঙ্গিনীটিও ব'সে আছে ব'লে মনে হ'ল। কি রে মেকি মেকি কি মেকি কি—ক্রমাগত ডেকে চলছে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে াকাশে। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি। কবির হঠাৎ মনে , যা কিছু মেকি তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ও যেন। সূর্যের ানা ও চায় না, ফরসা হবার কোনও লোভ নেই ওর। আফ্রিকার জুলুর , ভারতবর্ষের কালা-আদমির মত কৃষ্ণবর্ণের গৌরবেই ও গৌরবান্বিত, র সেটাকে প্রচারও করতে চায় স্পষ্টভাবে। শ্বেতাঙ্গদের বহু শতাব্দীর ত্যাচারের আগুন ওর বুকের ভিতর জ্বলছে। ভোরবেলায় খ্রিঃকে সম্বোধন রবার বেলাতেও তাই বোধ হয় ওর মনে হয়, এও মেকি নয় তো? সুরে রে বার বার প্রশ্ন করছে তাই—কি রে, মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি?

ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
চেনে নি তোমায় আজও যাহারা
কোন দেশে বাস করে তাহারা
উদ্যত ওগো কালো পতাকা
সদা-জাগ্রত কড়া পাহারা
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—।

কখনও বসিয়া আছ সু-উচ্চ টেলিগ্রাফ পোস্টে
গরু ছাগলের পিঠে কখনও বা ঘুমিতেছ গোষ্ঠে

ফিং দিয়ে ছুটে যাও কখনও বা পতঙ্গ লক্ষি?
ওগো ফিঙে পক্ষী,
খাইয়া তোমার তাড়া
কাক চিল পাড়াছাড়া
নিমেষে
ঠোকর খাইয়া মরে যদি হয় এতটুকু ঢিমে সে।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

বুকে যে আগুন জ্বলে সারা গায়ে তারই কালো ঝুল কি?
জ্বলজ্বলে লাল চোখে দেখা যায় বুঝি তারই ফুলকি,
তাই বুঝি চোখে মুখে ফুটে আছে 'আয় দেখি' তর্জী
ওগো ফিঙে জঙ্গী,
পুচ্ছেতে এক জোড়া
বাঁকা বাঁকা কালো ছোরা
শাণিত
জবাব তখুনি দেবে যদি কেউ করে অপমানিত।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

আঁধার রজনী-শেষে আলোর আভাস যবে ঝলকে
প্রেয়সীর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের সুর তোলে বল কে
মেকি কি মেকি কি তুমি বল বল জীবনের সঙ্গী—
ওগো ফিঙে রঙ্গী
তখন যে গাও গান
ওঠে রসিকের প্রাণ
মাতিয়া
রাগে আর অনুরাগে প্রেয়সীও ওঠে বুঝি তাতিয়া
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কবিতাটা লিখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে। হঠাৎ মনে হ'ল, বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে, কর্ণিকার ফুলে কি অদ্ভুত স্বর্ণকান্তি, অশোক-গুচ্ছের কি রূপ!

কু-কু-কু-কু—

কলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল একটা স্ত্রী-কোকিল। সূর্যের সোনালী গায় ঝলমল ক'রে উঠল তার জংলা শাড়িখানা।

মন্দাকিনী এক কাপ দুধ হাতে ক'রে প্রবেশ করলেন।

বুঝলে, সুন্দরীর দুধ আজকাল এত ঘন হয়েছে যে, চড়িয়ে উনুন-গোড়া ক নড়বার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে তলা ধ'রে যাবে।

ডালটা পুড়ে গেল?

না। খুব বেঁচে গেছে।

মন্দাকিনীর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

কবি দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বললেন, রামুনটা রাখ, কত আর খাটবে?

তুমি বোঝ না, রাখব কি ক'রে, মাইনে দিতে হবে তো একটি কাঁড়ি?

কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে।

কোথা থেকে?

আমি রঘুবংশ আর কুমারসম্ভবের যে নোট লিখেছিলাম গেল বছর, সে টা একজন ছাপাতে চায়, মাসে আমাকে আশি টাকা ক'রে দেবে বলছে।

খুব খুশি হলেন মন্দাকিনী এ সংবাদে।

তবে রাখ। মাইনে ঠিক করেছ কিছু?

না। তুমিই যা হয় কর না গিয়ে।

সানন্দে মন্দাকিনী নীচে নেমে গেলেন।

কবিও বাইনাকুলার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অমরবাবুর চাকর জি এসে গোটা দুই বই দিলে তাঁর হাতে। অমরবাবু একটা ছোট চিঠিও পাঠিয়েছেন,—এই বই দুটো উলটে পালটে দেখবেন। সাধারণ পাখিদের অনেক বর আছে এতে। আমাদের বাড়ির সামনে 'চাখ গেল' খুব ডাকছে। পাখিটাকে দেখতে পাই নি এখনও। একটু খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। খতে চান তো আসুন।

কবি বই দুটো টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

ক্রমশ

"বনফুল"

ভূত-বালক-কথা

অস্তি বরিশালভুক্তৌ মুগঘট্টেতি জনপদঃ। তত্র চ মহাপ্রমাণবৃক্ষবটগাছাশ্রয়ঃ মামদো নাম ভূতঃ।

অস্য বটস্যাধস্তাৎ কাঁটাবুহরীরোপা বর্ত্তন্তে।* বালকা বুহরীলুব্ধাঃ ভূশমত্র গচ্ছন্তি, ইটলগুড়াদিভিস্তদ্বনং তাড়য়ন্তি, ভূতস্য চ বিশ্রামবাধামুৎপাদয়ন্তি। অতোঽসৌ ভূতঃ মহাক্রুদ্ধঃ বালকঘাড়বিভাঙিযুরেব কালং নয়তি।

অথৈকদা কাঁটাবুহরীকামঃ কশ্চিদ্বালকঃ গ্রীষ্মমধ্যাহ্নসময়ে তদ্বনং গতঃ। একাকিনমেনমায়ান্তমবলোক্য ভূতশ্চিন্তয়ামাস, অহো মহাবসরো মেঽদ্য সমুপস্থিতঃ। এতৈর্বানরবৎসকৈরুত্যক্ত এব কালং হরামি। তদনন্তরং ভগ্নঘাড়শোণিতেন ক্রোধঃ মে উপশাম্যতু।

ইতি বিচিন্ত্য স ভূতঃ বিকটং ভেংচিতাস্যঃ প্রসারিতবাহুর্বালকমন্বধাবৎ অচিরাচ্চৈনং দৃঢ়মুষ্ট্যা পপাকড়।

অথ তদ্বিধৃতঃ স বালকঃ অত্যর্থং ভীতঃ উচ্চৈঃ ক্রন্দিতুমারেভে। ভূতঃ আহ, চুপ্পী ভব। ন চীৎকারৈস্তিলমপি ফলং লপ্স্যসে। ঘাড়ং তেঽদ্য ভাঙিষ্যামি

তদ্ভয়কাম্বিশুষ্কলোচনঃ বালকঃ ফুঁপয়ন্নাহ, কস্মাদ্ভাঙিষ্যসি। কথং মে ঘাড়ভাঙ্তা ইতি।

ভূতেনোক্তম্, ভূতোঽহম্। অত্রৈব বটবৃক্ষে নিবসামি। ত্বদ্বিধানামুপদ্রবাঃ কদাপি স্বস্তিং প্রাপ্নোমি।

বালক আহ, অপি মমোপদ্রবাদেব। ভূত আহ, অরে রে চ্যাঙড়—

প্রত্যহং ঘুঘো দুর্বৃত্ত ভক্ষয়সি ধানানি মে।
ধৃতোঽসি ঘুঘো দুর্বৃত্ত নয়াম্যদ্য প্রাণান্ হি তে॥

বালক উবাচ, নৈবৈতৎ যুক্তম্। অস্তি তে তে চক্ষুর্ঘর্ষম্। পশ্যসি এব নাহং ঘুঘুঃ। ন চ ময়া ভক্ষিতানি তে ধানানি। তৎ কথমজ্ঞাতঠিকানস্য ঘুঘোরপরাধান্নিরপরাধস্য মে প্রাণা নীয়ন্তে। নূনং ন ময়াপরাদ্ধম্ ভবতি।

ভূতেন সঘাড়নাড়মুক্তম্, চালাকিন চলিষ্যতি। জানাসি সম্যক্ ঘুঘুরত্রোক্তমুপময়া, ধানানি চোপময়ৈব। অপি চ, ঘুঘব এব যূয়ম্, বয়মুক্ষণমত্রাগতা ময়াধিকারাদ্ধরাণি ভক্ষয়িত্বা পলায়েধ্বে।

বালক আহ, কিং ময়ৈব ভক্ষিতানি। অহং চেৎ ব্রূয়াম্, অন্যৈব প্রথমমহমত্রাগতঃ, ন চ একমপি বুহরং মুখে পূর্তুং শক্তস্ত্বয়া বলাদ্ধৃতঃ।

---

* 'বুহরীবুহরঘুন্টৈরুচীতি বঙ্গপাঠঃ'।

ভূত আহ, তথাপি হন্তব্যোঽসি, যতো বহুনামেকঃ বহোরাচরণস্ত ফলং ভুক্তে। উক্তঞ্চ—

সর্পবিষং প্রাণঘাতী মানবাঃ সর্পঘাতিনঃ।
নির্বিষং গলিতদংষ্ট্রম্ কিং তে ছাড়ন্তি মারিতুম্॥

তীক্ষ্ণা চ মে শোণিততৃষ্ণা। তদ্‌যথা তে তর্কবিস্তারঃ।

ইত্যুক্ত্বা স ভূতস্তং বালকং ঘাড়ং ভাঙ্‌ত্বা নিজঘাণ।

হন্যমানশ্চ বালকঃ সখেদমাহ, ওরে বাপু রে—

বহুরাণি ন ভক্ষ্যাণি বুভুক্ষুঃ সাবধানো ভবেৎ।
বরং হি বাজারে ক্রয়ঃ, ন গচ্ছেদ্ভূতজঙ্গলম্॥

অপি চ,

মূঢ়োঽহং নাস্মরং যস্মাৎ ন খলস্তাছিলাভাবঃ।
নেকৃড়েবাঘঃ অহং ছাগং জলাঘূলনভূতয়া॥

তথা চ,

মাংসলোভী ছাগং হন্তি কিং তস্ত ছাগক্রন্দনাৎ।
ক্ষুধার্ত্তে প্রজালক্ষে কিং বা রেশনমন্ত্রিণঃ॥

"সমুদ্ধ"

ওয়েসিস

মোর ক্যারাভান চলিয়াছে মরুপথে,
অথ শতক চলেছে অহর্নিশ,
ভাঙিয়া পড়েছে তবুও তা কোনো মতে
ক্লান্ত চরণে খুঁজে চলে ওয়েসিস।
আসিয়াছে আঁধি উড়িয়াছে বালুঝড়,
তৃষ্ণাকাতর দেহ না চলিতে চায়,
মরীচিকা-টানে টেনেছে দিগন্তর,
উষর-ব্যথায় করিয়াছে, হায় হায়!
সন্ধ্যা ঘনায় সহসা নয়নে জাগে
ধূসু মরুবুকে সজল শ্যামল শোভা,
প্রখর নয়ন মুদে আসে অনুরাগে—
মরুভূমি হয় অরণ্য মনোলোভা।
হায় রে ভ্রান্ত, এও ক্ষণ-মরীচিকা,
যাত্রীর ভালে শুধু দু-দিনের লিখা।

ক্ল্যাপ-স্টিক-কাব্য

আমার মনের স্টুডিওতে ভাই
স্যুটিং চলিছে রাত্রিদিন।
ডাইরেক্শন একে একে দেয়
বিবেক হৃদয় মগজ মিলে।
শত শত ফিট জমেছে ফিলিম
কল্পনা আর স্মৃতির রীলে,
কাব্য-হাউসে প্রজেক্ট করিব
বিনা এডিটেই সে সব 'সিন'। ফেড ইন
এক এরোপ্লেন, শত ঘুড়ি উড্ডীন,
ক্রাউড মেয়ের ভিড়ে যেন হিরোয়িন। কাট্

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছি এবং উঠছি কভু ঘেমে,
ম্যালেরিয়া হয় নি আমার পড়েছি ভাই প্রেমে। কাট্

বিবাহেতে সুখী হবে সেই দম্পতি
বউ যদি কানা হয়, কালা হয় পতি। কাট্

বিবাহ যদি কর প্রেমেতে নাহি প'ড়ে,
প্রেমেতে তবে পড় বিবাহ নাহি ক'রে। কাট্

অলসরা প্রেমে পড়ে, খুব খাঁটি কথা,
প্রেমে যবে পড়ে সে
ছুটোছুটি করে সে,
থাকে নাকো আর তার কোন অলসতা। কাট্

তোমার প্রেমে পড়েছিলাম শনিবার
কিই বা তাতে ক্ষতি,
তোমায় আবার ভুলে গেলাম রবিবার
সত্যি কথা অতি। ফেড-আউট।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

ভোরবেলায় উদাত্ত ভদ্র-কণ্ঠে মাতৃস্তুতি শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলাম, দেবতাকুলের ঘোর বিপদের মধ্যে মহিষমর্দিনী মা কেমন করিয়া আবির্ভূতা হইলেন, কেমন করিয়া চরাচরে আনন্দরোল খিত হইল, ধনধান্যে প্রাচুর্যে উৎসব-কোলাহলে বিশ্বভুবন ভরিয়া গেল। ছুকাল ধরিয়া ঘরে বাহিরে সর্বত্র অভদ্রকণ্ঠে সর্ববিধ অভাব-অনটনের অনুযোগ নিতে শুনিতে বিবিধ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছিলাম। হঠাৎ-ভাঙা মের মধ্যে আনন্দপ্রাচুর্যের কথা মন্দ ঠেকিল না। মহিষমর্দিনী মাকে প্রণাম রিলাম।

* * *

পরক্ষণেই নানা দার্শনিক চিন্তা মনে উদিত হইল। যে মা মহিষাসুরের ছেনে ধাওয়া করিয়া খড়্গ বল্লম হাতে একবার ঘরের বাহির হইয়াছেন, নি কি আবার নাড়ু-মোয়া হাতে ঘরে ঢুকিয়া সন্তানপালিনী হইতে রিয়াছেন? পুরাণের ধারা ধরিয়াই ইতিহাস; পুরাণ যাই বলুক, তিহাস অন্য কথা বলে। মা মহিষাসুরের রক্তমাখা মুণ্ডটা মাথায় তুলিয়া থে পথে এখনও তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন, ঘরে ফিরিলে লার জনসংভরণ-মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এত বিপদ হইত না, মায়ের পায় তিনি সহজেই মায়ের সন্তানদের জন্য দুমুঠা অন্ন ও এক ফালি স্ত্রর সংস্থান করিয়া দিতে পারিতেন, মন্ত্রীত্বের সৌকুমার্য রক্ষা করিতে অতুল্য-ঞ্চনা ভোগ করিতেন না; বাঙালী জাতির সর্বরোগহর কণ্ডুদাবানল ধানচন্দ্রকেও জ্ঞানাঞ্জনশলাকাহত হইয়া "মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়" ন করিতে করিতে শিলং পাহাড়ের জন্য অশ্রুবিসর্জন করিতে হইত না; র্তমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন ময়মনসিংহী গর্জনেই কাজ হাঁসিল করিতে পারিতেন, স্থানের জীবনবীমায় ইস্পাহানের সাহায্য তিনি কদাচ লইতেন না; লার শ্যামাপ্রসাদ রামপ্রসাদ হইয়া দিল্লীর পথে পথে রামধুন গাহিয়া রিতেন না। মোটের উপর, আমাদের মা সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছেন, ঘর ফেরেন নাই।

* * *

ইহাই বাস্তব ইতিহাস, পুরাণের কথা আমরা মানি না। চৌষট্টি বৎসর র্বে ১২৯১ বঙ্গাব্দে ঠিক এই পূজার সময় রবীন্দ্রনাথও কবিদৃষ্টিতে এই মহাসত্য নুভব করিয়া "কাঙালিনী" কবিতায় লিখিয়াছিলেন,—

"মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গলকলস।
আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

কিন্তু এও আজ প্রাচীন ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাঙালিনীর জন্য মায়ের দোহাই পাড়িয়া যে ধনীদের কাছে কবি আবেদন জানাইয়াছিলেন—আবেদনই বা বলি কেন, দাবি জানাইয়াছিলেন—তাঁহারা আজ ম্যামথ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিলুপ্ত। দেশে আর ধনী নাই। ধনিক আছে, শ্রমিক আছে, আর সরকার আছে। ধনিকদের আজ চিনিবার জো নাই, চোরাবাজারের কৃপায় শ্রমিক ধনিক হইয়া শ্রমিকের সহিত বিবাদে মাতিতেছে। ইহারা দুই বিবদমান দল হইলেও ইহাদের শ্রেণী বা জাতের কোনও ঠিক নাই। পরান্নপুষ্ট বহু জমিদারকেও শ্রমিকের দালালি করিতে দেখা যাইতেছে—রাশিয়া হইতে এক বিচিত্র মুখোশের আমদানি হইয়াছে। সুতরাং কাঙালিনীরা আজও বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে। আমদানি-করা বহু বুলি ও স্লোগানের মাহাত্ম্য সত্ত্বেও দেশের আনন্দোৎসবে তাহারা প্রবেশাধিকার পায় নাই। চৌষট্টি বৎসরে তাহাদের সংখ্যা এক হইতে কয়েক কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ধনিক-শ্রমিকের বাজারে ধনীদের অভাব আজ অত্যন্ত বেশি অনুভূত হইতেছে।

* * *

এখন ভরসা এক সরকার। ধনীর উচ্ছেদে সরকারই এখন ধনী হইয়াছেন। সুতরাং কাঙালিনীদের সমস্ত দায়িত্ব সরকারে বর্তাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এখনও চরকা-খদ্দরের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছেন, স্বরূপে আবির্ভূত হইতেছেন না। ধনীর দরবারী চেহারা যতক্ষণ প্রকট

না হইতেছে, ততক্ষণ কাঙালিনীদের বিপদ। তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে, কাহার নিকট কুর্নিশ করিয়া অভাব-দুঃখের কথা নিবেদন করিবে? তাই তাহারা অসহায়ভাবে কণ্ট্রোলে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, কিউয়ে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। কণ্ট্রোলের চালের কাঁকর মন্ত্রীদের পাতানো কাঙালিনী মাতাদের অভিযোগ সত্ত্বেও দূর হইতেছে না—চাউল পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ আজ যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে সক্ষম ভাষায় সরকারের কাছে কাঙালিনীদের কথা নিবেদন করিতে পারিতেন, আমাদের ভাষার সে জোর নাই। আমরা শুধু কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—হুজুরেরা আর খদ্দরের মুখোশ পরিয়া গরিবদুঃখীদের ছলনা করিবেন না, আসাসোটা হাতে মুকুট মাথায় কিংখাবের চোগা দুলাইয়া এবার আত্মপ্রকাশ করুন, দোহাই আপনাদের, গরিবের সঙ্গে আর অশোভন ইয়ার্কি দিবেন না। পাঁজা মাইতি বর্মণ নস্করদের ছদ্মবেশ আমরা ধরিয়া ফেলিয়াছি প্রভু। আপনারা সকলেই বিধান-নলিনী হইয়া দরবারে অবতীর্ণ হউন, আমরা আপনাদের শরণ লইয়া বাঁচি। মহাত্মা গান্ধীর ঠেঁটিপরা ছবি দেখাইয়া রাজদরবারে রামধুন গাহিয়া আর আমাদের প্রতারিত করিবেন না—করিবেন না—করিবেন না।

* * *

দার্শনিকতা কখন নিদারুণ ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছিল, সহসা বেতারযোগে রামধুন শুনিয়া মনে হইল—আজ ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। আজ মহালয়াও বটে। মহালয়ায় আমরা বিধিমতে পিতৃপুরুষকে স্মরণ করি। আজ জাতির পিতা গান্ধীজীকে শুদ্ধচিত্তে স্মরণ করিবার দিন। যিনি অসহায় অস্পৃশ্য সকল-অধিকারচ্যুত দরিদ্রদের জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; দরিদ্রদেরই আজ তাঁহাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা করিবার কথা। কিন্তু আড়াইলাখী রাজাগোপালাচারী ও দেড়লাখী কাটজুরা দরিদ্রের প্রতিভূ হইয়া সমারোহের সহিত সেই কাজ সারিয়াছেন, দরিদ্রেরা আজ নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। যে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তিনিই আজ ভারতবর্ষের প্রধান রাজদরবারে এবং প্রাদেশিক দরবারসমূহে চিত্র ও মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, তাঁহার পবিত্র দেহভস্ম

প্রধান প্রধান নদীজলযোগে ভারতবর্ষের মাটিকে সর্বত্র স্পর্শ করিয়াছে। তুচ্ছ যত রকমে করিবার সকলগুলিই আমরা রাজকীয় সমারোহে করিয়া ফেলিয়াছি। আর আমাদের ভয় নাই। তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল অকপটতা, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা। মৃত্যুর পরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ঐশ্বর্যের মধ্যে। এবার তাঁহার পূজা চলিবে, তাঁহার আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন আমাদের ফুরাইয়াছে।

* * *

এখানে একটি সম্পূর্ণ নূতন গল্প মুদ্রিত করিতেছি। গল্পটির নাম "বাণী ও ভস্ম"; লেখক শ্রীভুবনমোহন সরকার।

"মহামানব প্রেমানন্দ মহাপ্রয়াণ করিবেন। প্রধান শিষ্যদের ডাকিয়া ঘরোয়া বৈঠকে সেই সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন।

বলিলেন, জগতের কাছে আমার যা বলার ছিল, আমি বলেছি। মানুষের মুক্তির পথ, আনন্দের পথ আমি নির্দেশ করেছি। সে পথে চলার দায়িত্ব তোমাদের—জগতের মানুষের। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

বলিলেন, কিন্তু ভুলো না আমি দেহত্যাগ করলেও বেঁচে থাকব। বেঁচে থাকব আমার বাণীর ভেতরে—তোমাদের অন্তরে, তোমাদের কর্মে। যেখানে প্রেম থাকবে, ভালবাসা থাকবে, সহজ সরল অনাড়ম্বর নিষ্কাম জীবনাদর্শ থাকবে, সেইখানেই আমি বেঁচে থাকব।

শিষ্যগণ কৌচার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া অধোবদন হইলেন।

শিষ্য মাধবানন্দ কহিলেন, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু। আপনার যাবার সময় হয়েছে, আমরা বাধা দেব না।

শিষ্য যোগানন্দ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিলেন, না, বাধা দেওয়া আমাদের সঙ্গত হবে না।

শিষ্যা আনন্দময়ী নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

মহামানব শিষ্য ভাবানন্দের দিকে এক ঝলক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু হাস্য করিলেন। সরলকণ্ঠে বলিলেন, এই আমি আশা করেছিলাম। জানতাম, তোমরা বাধা দেবে না। তেমন শিষ্য তোমরা নও। তবে তাই হোক। আর একটা কথা। আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে আমার কতকগুলি

নির্দেশ আছে। অক্ষরে অক্ষরে সেগুলি পালন করতে হবে। আমি নিজে যাতে নির্দেশপত্র লিখে রাখব।

সভা ভঙ্গ হইল। শিষ্যগণ উঠিয়া গেলেন। শুধু ভাবানন্দ উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া মহামানব প্রেমানন্দের কাছে বসিলেন।

সব চ'লে গেছে?—মহামানব প্রশ্ন করিলেন।

হ্যাঁ।—ভাবানন্দ জবাব দিলেন।

ব্যবস্থা সব ঠিক আছে?

আছে।

মহামানব কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, জীবনে একবার মাত্র—এই প্রথম আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এ মিথ্যায় পাপ নেই ভাবানন্দ। কারণ এ মিথ্যার প্রয়োজন আছে। সত্যান্বেষী আমি, সত্য আমাকে জানতে হবে। আমার ধর্ম, আমার জীবনাদর্শের সঙ্গে এ মিথ্যার কোন বিরোধ নেই।

ভাবানন্দ বলিলেন, আমি বুঝেছি গুরুদেব।

মহামানব প্রেমানন্দের মহাপ্রয়াণের পর এক বৎসর পার হইয়াছে। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর মহামানব প্রেমানন্দ ভাবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিঃসংশয় হইয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে কোনদিকে কাহারও মনে কোন সংশয় ঘটে নাই। প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পর্যন্ত মহাসমারোহসহকারে সর্বত্র সম্পন্ন হইয়াছে, কোন প্রশ্ন ওঠে নাই। কোন শ্রাদ্ধবাসরে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

ধীরপদক্ষেপে স্বীয় আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। আশ্রমের শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল।

কিসের শঙ্খ?—মহামানব জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূজা হইতেছে।—ভাবানন্দ জবাব দিলেন।

কিসের পূজা? কোন বিশেষ দেবতার প্রতিষ্ঠা তো আমি করি নি।

ভাবানন্দ বলিলেন, এঁরা বোধ হয় করেছেন। জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।

আশ্রমযাত্রী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিস্মিত এবং আহত হইলেন। বলিলেন, আপনারা এখানে নতুন এসেছেন?

হাঁ।

কিন্তু এও আশ্চর্য। তীর্থে এসেছেন, কোন্ তীর্থ জানেন না!—ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, মহামানব প্রেমানন্দ যেখানে তিরোভাব করেছিলেন সেখানে দিবারাত্রি আরতি হয়। জেনে রাখুন।

ভদ্রলোক দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেলেন।

মহামানব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাবানন্দের পানে তাকাইলেন। উভয়ে নীরে চলিতে লাগিলেন।

একদল লোক আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রেমানন্দ বলিলেন, ভুখ মিছিল ব'লে মনে হচ্ছে। দেখ তো। ভিখারীর দলও হ'তে পারে।

ভাবানন্দ একটি লোককে থামাইয়া ব্যাপারটি জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, আশ্রমে কি আজ ভিখারী-বিদায় হচ্ছে?

লোকটি চটিয়া উঠিল, কি বলছেন মশাই? ভিখারী-বিদায় মানে আমরাই ভিক্ষে দিয়ে এলুম। বুঝেছেন?

পাশের লোকটি নরমসুরে কহিল, ভিক্ষে নয়, চাঁদা। দুদিনের খাওয়া খরচ বাঁচিয়ে চাঁদা দেবার হুকুম হয়েছিল। এখানে আমরা সবাই গরিব মানুষ তো! খাওয়া বন্ধ না করলে চাঁদার টাকা কোত্থেকে হবে? আর চাঁদা হ'লে এই সব বড় বড় কাজ হবেই বা কি ক'রে?

কি কাজ?—মহামানব প্রশ্ন করিলেন।

অনেক কাজ।—লোকটি বলিল, দেশে দেশে আমাদের আশ্রমের শাখা আপিস আছে। সেখানে টাকা পাঠাতে হয়। মাতা আনন্দময়ী যেখা আছেন সেখানে খাঁটি গাওয়া ঘি বা দুধ কোনটাই নেই। একখানা উড়ো জাহাজে রোজ দুধ আর ঘি পাঠাতে হয় তাঁর কাছে। স্বামী যোগানন্দ—

একটু ধীরে বল ভাই।—ভাবানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, একখা উড়োজাহাজে তা হ'লে ঘি আর দুধ পাঠাতে হয়?

না পাঠালে চলবে কি ক'রে? মাতা আনন্দময়ীর আবার সাত্ত্বিক আহার তো? তা ছাড়া শুধু দুধ ঘিটাই—একমাত্র কথা নয়। এতে ক'রে বিদেশে আশ্রমের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়।

মহামানব হঠাৎ চলিতে শুরু করিলেন। ভাবানন্দ সঙ্গ লইলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই একজন আশ্রমবাসী অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, যে, এদিক দিয়ে আসুন।

কোথায় ?—ভাবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশ্রমবাসী একটু বিস্মিত হইল।—আগে দেখে নেবেন না ?

কি দেখব ?

আগন্তুকদের অজ্ঞতা আশ্রমবাসী ক্ষমা করিল। বলিল, মহামানব কোথায় তেন, কিসে বসতেন, কোথায় শুতেন, কি পরতেন, কি দিয়ে লিখতেন—এই ই লোকে এসে আগে দেখে কিনা। অবশ্য আপনাদের অভিরুচি।

মহামানব প্রেমানন্দ এবার কথা বলিলেন, আমরা যত শীঘ্র সম্ভব, স্বামী ধবানন্দের দেখা পেতে চাই।

তবে ওই দিকে যান।

আশ্রমবাসী সরিয়া গেল।

সুসজ্জিত কক্ষে স্বামী মাধবানন্দ দেখা দিলেন।

মহামানব নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

আপনারা বিলম্বে এসেছেন।—মাধবানন্দ কহিলেন, কিন্তু পাবেন নিশ্চয়ই, ত বেশি নয়।

কি জিনিস ?—ভাবানন্দ প্রশ্ন করিলেন।

জবাবে বাধা পড়িয়া গেল। একজন আশ্রম-কর্মী প্রবেশ করিয়া স্বামী ধবানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বাগদাদ থেকে চিঠি এসেছে। এক ড়ি পাঠাতে অনুরোধ করেছে।

এক হাঁড়ি পারব না।—মাধবানন্দ হুকুম দিলেন, এক প্যাকেট রেজিষ্ট্রি রে পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা।—আশ্রম-কর্মী চলিয়া গেল।

কি জিনিস ?—ভাবানন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

স্বামী মাধবানন্দের দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু অসীম মনোবল তাঁহার ৎ তে ক্রোধ দমন করিয়া প্রশান্ত বদনে বলিলেন, আপনারা কি ভস্ম নিতে সেন নি ?

কিসের ভস্ম ?—মহামানবের রুদ্ধকণ্ঠ যেন ভাঙিয়া পড়িল।

মহামানব প্রেমানন্দের চিতাভস্ম, যা নিতে সকলে আসে। আপনা কেন এসেছেন ?

ভাবানন্দ বলিলেন, ভস্ম নিতে হয় আমরা জানতুম না। আমরা এসেছি আপনার শ্রীমুখে মহামানবের বাণী শুনতে। তাঁর ধর্ম, তাঁর জীবন, তাঁর নির্দেশ আপনার জীবনে প্রতিফলিত দেখব, দেখে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করব—এই আশা ক'রেই আমরা এসেছি।

তার অর্থ—মহামানবের ভস্মে আপনার বিশ্বাস নাই। কিন্তু আমি বিশ্বাসী। অত সব বাণী, ধর্ম, জীবন, নির্দেশ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না, সময়ও কম। আচ্ছা, আসুন তবে।—মাধবানন্দ উঠিলেন।

দাঁড়াও। বজ্রকণ্ঠে মহামানব গতিরোধ করিলেন। ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন।

চিনতে পার ?

বিবর্ণ মৃতপ্রায় পতনোন্মুখ মাধবানন্দকে ভাবানন্দ ধরিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্তমাত্র। মহামানব পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। অসীম ঘৃণাভরে কহিলেন, শোন্ মূঢ়, ভেবেছিলাম এই মিথ্যার তাসের ঘর ভেঙে দিয়ে আবার নূতন ক'রে সত্যের প্রতিষ্ঠা করব। সে ভুল আমার ভেঙেছে সত্যের মৃত্যু হয়েছে। আমার মৃত্যুই তবে সত্য হোক।

ভাবানন্দের হাত ধরিয়া মহামানব দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।"

এবার পূজার "সার্বজনীন" ডামাডোল কিঞ্চিৎ কম। মনে হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রের ভিত্তিতে আশাতিরিক্ত চাঁদার লেপে যে "সার্বজনীনতা" গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে এবার ভাঙন ধরিয়াছে বোধ হয়। মনে হইতেছে, ইহা আসন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্বলক্ষণ। চাচারা আপন বাঁচাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। রাষ্ট্রীয় শাসনদণ্ড যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা এই ইঙ্গিত পাইয়া অবহিত হইতে পারেন।

এক বৎসর স্বাধীন হইয়া আমরা কি পাইয়াছি—এই প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর জবাব হইবে—সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা। ব্যবস্থা যাঁহারা করেন এরূপ লোকেরা বিদায়ীকৃত ইংরেজদের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন;

রূপ দৃশ্যও বিরল নয়। ইংরেজের ঘুষি আমরা যতটা রপ্ত না করি
াহাদের ঘুষপ্রথা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজরা
লিতেছেন, তাঁহাদের আমলে ঘুষে কাজ হইত, আজ ঘুষের মাত্রা চ
ঠিয়াছে, কিন্তু কাজ হইতেছে না। নূতন কর্তারা শাঁখের করাত হ
নসাধারণকে কাটিতেছেন।

* * * *

অন্ন ও বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থার নিন্দা করিব না, কারণ এখনও অনশন
লজ্জতা বরণ করিতে হয় নাই; কিন্তু শিক্ষাবিভাগে ও রেলওয়েগুলিতে
ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। আবগারি-খাতে ট্যাক্স
ঠিলে যে দেশে শিক্ষাখাত শুষ্ক হইয়া যায়, সে দেশের গবর্মেণ্টকে ধিক্, শি
ানুষ মাত্রকেই ধিক্। ভবিষ্যৎ জাতির গঠনকার্যে যাহাদের সহায়তা সর্বা
াবশ্যক, তাহাদিগকে আধপেটা খাইতে দিবার ব্যবস্থাও সরকার করেন নাই—
থচ সরকার বাহাদুরের কমিটি ও স্কীমের অন্ত নাই। টেক্স্টবুক কমি
া দেখিলেই শিক্ষাব্যবসায় কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে অনুমান করা য
রকার বৎসরের পর বৎসর শুধু স্কীমের পিছনেই টাকা ঢালিয়া আশ্রিতবা
ভ্যাস করিতেছেন, যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার সাম
প্রয়াসও তাঁহারা করিতেছেন না। স্বাধীন হইয়াও অবস্থার পরিবর্তন হ

রেলযোগে শিয়ালদহ হইয়া যাঁহারা যাতায়াত করিয়া থাকেন, পা
অব্যবস্থার অজুহাতে অলস ও আরামপ্রিয় হিন্দুস্থানী কর্মচারীরা সাধারণের
খানি অসুবিধা ঘটাইতে পারেন, তাহা তাঁহারা বিশেষভাবেই অবগত আ
প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া একটা ট্রেনের আগমন-নির্গমনের সময় জ্ঞাপন করেন
বলিয়া বসেন—পাকিস্তান-আগত ট্রেন ও মালের কোনও সংবাদ তাঁহ
জানেন না, অথচ ট্রেন যথাসময়েই আসিয়া পৌঁছে—খবর করিয়া সাধারণের
ক্লেশ লাঘব করাটাকে তাঁহারা কর্তব্যের মধ্যে ধরেন না।

সর্বত্রই এই নিদারুণ অব্যবস্থার স্পর্শ লাগিয়াছে—ইহাই আমাদের স্বাধীনতার
লাভ। আমরা যেন সকল বিষয়ে কেমন শিথিল দায়িত্বজ্ঞানহীন হ
পড়িয়াছি। যাঁহারা বর্তমানে গবর্মেণ্ট পরিচালনা করিতেছেন, পূর্বেই বলিয়
তাঁহারা স্ব স্ব পদের স্থায়িত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। দলাদলি-ভোট তাঁহাদের চি
সবখানি অধিকার করিয়া আছে, তাঁহাদের সময় কোথায়?

শুনিতে পাই, আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ আজ জাগ্রত, নিজেদের দা
তাহারা আদায় করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখিতে
অতিকারীকে পুলিসের কবল হইতে ছিনাইয়া লইবার এবং চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীগু
চলিতে হাঙ্গামা বাধাইবার কাজেই তাহাদের চৈতন্য উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে
যেখানে সত্যকার প্রতিরোধ প্রয়োজন, সেখানে আমরা নিষ্ক্রিয়। সাম
ব্যক্তিগত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া মূল্য দিয়াও আমরা চোর
কারবারীদের সমর্থন করিয়া চলিতেছি, সমবেতভাবে তাহাদের দমন করিব
কোনও চেষ্টার কথা শুনি নাই। আমরা সকলেই যেন প্রলয়ের মুখে আসি
পড়িয়াছি। কিছুতেই কাহারও কিছু যায় আসে না। অব্যবস্থা ও অলসত
ধনও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না।

* * *

দেখিতে পাইতেছি অতিরিক্ত লোভে আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি আমাদে
কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ চেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছি। বাংলা দেশে হিন্দুস্থা
পাকিস্তান বিভেদ অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমরা নিজে
চলিলে বেশিদিন টিকিত না। নিজের রাষ্ট্রের সর্বনাশ করিয়া হিন্দুস্থানী
পাঞ্জাবী-মোসলমানারীশিশুনির্বিশেষে পাকিস্তানের সহিত চোরা-কারবার করিতেছে
সমস্ত জিলার প্রত্যন্ত সীমানায় উপস্থিত হইলেই তাহা চোখে পড়িবে
ইত্যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত মালদহ-মুর্শিদাবাদের নদীপথে পাওয়া যাইতেছে
রিণ মানুষেরা এত লোভী হইলে গবর্মেণ্টের সাধ্য কি এই সর্বনা
প্রতিরোধ করে। অথচ রাষ্ট্রানুগত্যের বিস্ময়কর আদর্শ সীমানার ওপারে
বর্তমান। সেখানকার মানুষেরা নিদারুণ আর্থিক কষ্ট সহ্য করিয়াও রাষ্ট্রে
রক্ষা করিতেছে। আমরা যে ডালে বসিয়া আছি, প্রতিদিন তাহা সমবেতভা
কর্তন করিয়া চলিয়াছি। কাটা ডাল লইয়া অপর পক্ষ ঘর বাঁধিতেছে
বা, তাই হইল বর্তমান ইতিহাস।

তাঁহা নিজের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাহারা নিজের স্বার্থের বশবর্
হইতেছে, সরকার তাহাদের শাস্তিবিধান অবশ্যই করিবেন; কিন্তু দেশসু
গ্রামসুদ্ধ জিলাসুদ্ধ লোকে যদি তাহাদিগের সহিত সহযোগিতা করে, তা
না হইলে কাহারও কিছুই করিবার থাকে না। লোভ এখন সর্বগ্রাসী হইয়াছে
ভাঙ্গুলের কচি-কচি ছেলেরাও ডবল কাপড় পরিয়া এপার ওপার করিতেছে

ভী ব্যবসায়ীরা আবহাওয়া এমনই বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে যে, মানুষে
কল্যাণবোধ নষ্ট হইয়াছে। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ট্র্যাজেডি।

—

হায়দ্রাবাদ সমস্যা মোটামুটি মিটিবার পর যদি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা
সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইত, তাহা হইলে ভারত-সমবায়-রাষ্ট্রের
ত্যন্ত কল্যাণ হইত। বাঙালী মুখে বহুজোবান্ বলিলেও অন্তরে কখনও
প্রাদেশিকতা সমর্থন করে নাই। করিলে, বাংলা দেশের প্রধান নগর
লিকাতায় বড়বাজারের পত্তন হইত না। নদীমাতৃক বাংলা দেশের খাল
বিল বাহির হইতে যে সকল কুমীরের আমদানি হইয়াছে, তাহারা বাংলা
দেশের মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বাংলা দেশেরই বালুতটে আরামে রোদ
পোহাইয়াছে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুশাসনসত্ত্বেও বাঙালী কখনও তাহাদের
তাড়না করে নাই।

আজ কয়েকটি ব্যাঙ্কের ব্যাপারে হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছে—ইহারা নিরী
ধীর মাত্র নয়, আস্ত তিমিঙ্গিল। বাংলা দেশে বাঙালীরা ব্যবসা করিয়া
ইবে, ইহাও তাহারা বরদাস্ত করিবে না। ছলে-বলে-কৌশলে যে সকল
তিষ্ঠান বাঙালী ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করে, সেগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়া
জদের বাধার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিতেছে। বিধানচন্দ্র শাক দিয়া মাছ
ঢিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিদ্বেষ ইহাতে কমে
ই। বাংলা দেশের বুকে বসিয়া যাহারা দাড়ি উপড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে
কিন্তু বিচারে তাহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইলে দুষ্কৃতিকারীরা সাবধান
ইতে পারিত। আমরা প্রাদেশিকতার সমর্থন মোটেই করিতেছি না, বাংলা
শের মাটির রসে পুষ্ট হইয়া যাঁহারা বাংলা দেশের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকা
রিতেছেন, তাঁহাদিগকে সজ্ঞান ও সচেতন করার কথাই বলিতেছি।

ত্যকার প্রাদেশিকতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বিহার, আসাম, উড়িষ্যা
লা দেশ সম্পর্কে। একদা-উন্নাসিক বাঙালীর উদ্দেশ্য যে হীন ছিল না, তাহা
মাণ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের সর্বত্র এখনও মিলিবে। এখনও
কল স্থানের শিক্ষাবিভাগ ও চিকিৎসাবিভাগ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে
াঙালীর সামান্য অপরাধের যে শাস্তি স্থানীয় সরকারেরা বিধান করিতেছেন

চীন প্রতিহিংসার স্তরে পৌঁছিয়াছে। এই মানসিকতা কোনও প্র
পক্ষেই কল্যাণকর হইবে না।

* * *

কটি কথা মনে পড়িয়া গেল। ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দেওয়া
বা বেশী খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে, বৈদ্যুতিক
উৎপাদন করিয়া নানাবিধ শিল্পের প্রসার হইবে—ইহার জন্য পশ্চিম-ব
তোড়জোড় শুরু হইয়া গিয়াছে। বীরভূমে ভাদুর গান গাহিবার
এবার গ্রামের কবিরা গাহিয়াছে, "ভাদু টেরাকে (Truck-এ)
বহা ভেঙে মোরাক্ষিকে বাঁধিবে"; কিন্তু ময়ূরাক্ষীর বিপদের অন্ত নাই। তাই
আসে ধানি বিহারের এলাকায় সাঁওতাল পরগনার ভিতর দিয়া যহি
য়া গেছে। যেখানে ময়ূরাক্ষী বেলপাহাড়ী পরগনার দক্ষিণে পর্বতমালা ে
য়িয়া সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিতেছে, সেখানে একটি বড় বাঁধ দিলে তবে
সমগ্র ময়ূরাক্ষীর উন্নতির পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে। বীরভূমের মা
দিয়া না, জলসেচের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে; প্রাচীন পুকুরগুলি অযত্ন
পর্যাভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৮-এর মধ্যে দুর্ভি
নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টকে উনিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।
অবস্থায় যত দ্রুত বাঁধ হয়, খাল হইতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়, ততই ভাল।

কিন্তু শোনা যাইতেছে, মালিকানা স্বত্ব লইয়া গোল বাধিয়াছে। বিহা
গবর্মেণ্টের অধিকারীবৃন্দের নাকি ভয় হইয়াছে যে, এরূপ ব্যবস্থা কাজে পরিণ
হইলে অন্নাভাব ঘুচিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী যে অং
বিভক্ত হইবে, তাহার আনুগত্য বিহারের প্রতি বৃদ্ধি না পাইয়া বাংলা
প্রতি বেশি বৃদ্ধি পাইবে। এই সম্ভাবনাকে নাকি তাঁহারা আদৌ ভাল চোখে
দেখিতেছেন না, বরং নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধার সৃষ্টি
করিতেছেন।

উক্ত সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, দারিদ্র্য দূ
করা অপেক্ষা জমিদারি রক্ষার মন্ত্রীমণ্ডলের উৎসাহ বেশি। জমিদারি বজা
রাখিয়া যদি দরিদ্র চাষীকে দরিদ্রই রাখিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি
নাই। আমার গোয়ালের গরু যদি না খাইয়া মরিয়াও যায়, তবু দড়ি খুলিয়া
দিয়া তাহাকে ঘাস খাইতে দিব না, পাছে আমার গোবরের সারে

র মাঠ পুষ্ট হয়। এদিকে গরুকে খড় বা খইল খাওয়াইবার
ার নাই।

আজ বৃদ্ধিশীল প্রাদেশিকতার পিছনে রাজনৈতিক জমিদারি-মে
-পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে মুক্তির উপায় এ নয় যে, রোগে
, তাহাই শুধু দেখাইয়া মানুষকে ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা এবং একটা গো
ব্রব বাধানো। ইহা হইতে মুক্তির উপায় হইল, প্রাদেশিকতার বিরু
গাইয়া তোলা এবং স্থির দৃঢ় কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তাহাকে রূপায়িত করা
ই জাতির জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ-ব্যাধির সংক্রা
রিবর্তে দরিদ্রতম মানুষের স্বার্থপোষণকেই ধ্রুবতারার মত গ্রহণ
াহারই প্রতি অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কর্মের তরী পরিচালনা কি
াময়িকভাবে যে ক্ষুদ্রতার ঝড় বহিতেছে, তাহা তরণীকে উল্টাইলে
রিতে পারিবে না।

ময়ূরাক্ষীর উপত্যকার যে অঞ্চল বিহারের এলাকাভুক্ত, তাহা
ন্তর্ভুক্ত করিবার কথা না ভাবিয়াও আমরা উভয় প্রদেশের আর্থিক
ল্পে আশু ময়ূরাক্ষীর বাঁধ বাঁধার দাবি করিতে পারি। বাংলার গভর্মে
ই সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হন, বাংলার কংগ্রেস
ারিদ্র্য-মোচনের সমস্যাকে মূল সমস্যা ভাবিয়া তাহার অনুকূল জনমত
ৎপর হন, বাংলা প্রদেশের সীমা-বিস্তারের চেয়ে ইহাকে অধিক মূল্য
তবে বিহারের গভর্মেণ্টও স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায় অর্থাৎ কেন্দ্রের তাড়না
সই শুভপথে চলিতে বাধ্য হইবেন।

দরিদ্রতমের কল্যাণকে ধ্রুব লক্ষ্য করিলে আমরা নিশ্চয়ই নানা
াম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মরুভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত